খুতুবাতে উসমানী

আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী

খুতুবাতে উসমানী

মূল
শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী [দা. বা.]

অনুবাদ
মাওলানা ইয়াসীন বিন ইউসুফ
মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম,
শ্যামলী, ঢাকা।

সম্পাদনা
হাবীবুর রহমান নদভী
শিক্ষক মাদরাসাতুল মাদীনাহ,
আশরাফাবাদ, ঢাকা।

মাকতাবাতুত্ তাকওয়া
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

প্রকাশনায়
ইবন সামসুজ্জামান (কুতুব ভূঁইয়া)
মাকতাবাতুত্ তাকওয়া
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৬২৪১৫০৭০

প্রকাশকাল
জিলহজ্জ : ১৪৩৩ হিজরী
নভেম্বর : ২০১২ ঈসায়ী

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।

কম্পিউটার কম্পোজ
এম. হক কম্পিউটারস
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য : ৪৬০.০০ টাকা মাত্র।

মুদ্রণ
শাহ্ শরীফ প্রিন্টার্স
৫২ আরামবাগ, ঢাকা।

উৎসর্গ

ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক ও
মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে যিনি আলেমদের
অন্তরে গুরুত্ব জাগিয়েছেন, সেই মহামানব
সমাজ সংস্কারক, মুজাহিদে আযম
হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

সম্পাদকের কথা

পাক ভারত উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষ আলিমেদীন আল্লামা তাকী উসমানী (দা.বা.)। বর্তমান গ্রন্থখানি তাঁর অনেকগুলো জুমুআ বয়ানের সংকলন যা মূলত কুরআনুল কারীমের বহুল পঠিত ছোট ছোট সূরাগুলোর তাফসীর। এই সূরাগুলোর তাফসীরের আলোকে মানুষের মাঝে বিদ্যমান ভ্রান্ত আকীদা, শিরকী রীতিপ্রথা ও আমলী বিদআত এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রচলিত অন্যায় ও অশ্লীলতাকে মাওলানা অত্যন্ত দরদের সাথে চিহ্নিত করেছেন এবং তা দূর করার পথ ও পন্থা বাতলে দিয়েছেন। ওয়ারিছে নবীরূপে প্রতিটি বয়ানে তিনি উপস্থিত মুসল্লীয়ানে কেরাম এবং তাদের মাধ্যমে সকল মুসলমানকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করেছেন। ইকামাতে দীনের দাওয়াত দিয়েছেন এবং দীন শেখার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। মাওলানার এই মূল্যবান তাফসীরি বয়ানগুলো আমাদের ইমাম খতীব ও ওয়ায়েযিনে কেরামের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে। এর সারাংশ সাবলীল ও প্রাঞ্জল বাংলায় বাংলাভাষাভাষীদের জন্য পেশ করা যেতে পারে।

নবীন অনুবাদক ইয়াসীন বিন ইউসুফ উৎসাহের সাথে বয়ানগুলো অনুবাদ করেছেন। তার অনুবাদকর্মকে নির্ভুল ও বিশুদ্ধ করতে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি।

গ্রন্থটি সংক্ষেপিত কলেবরে প্রকাশিত হলে তা আরও সুখপাঠ্য হবে বলে মনে হয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে কুরআনী খিদমতে জুড়ে রাখুন। আমীন।

হাবীবুর রহমান নদভী
মাদরাসাতুল মাদীনাহ, ঢাকা
২৫ শে শাওয়াল ১৪৩৩ হিজরী

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের লক্ষ কোটি শুকরিয়া তিনি তাঁর এই অযোগ্য বান্দার মাধ্যমে তাঁর প্রিয় যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, ফকিহে মিল্লাত, হাদিয়ে জামান জাস্টিস আল্লামা তকী উসমানী সাহেব দা.বা. এর ইসলাহী খুতুবাতের পর জুমআ বয়ানের অন্যতম গ্রন্থ খুতুবাতে উসমানী যার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছোট ছোট সূরার তাফসীর, যুগ-জিজ্ঞাসার আলোকে, সমাধান ও পর্যালোচনার ইসলামী চিন্তা-চেতনার খোরাক। আমরা বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মুসলিম উম্মাহ গণতন্ত্রের বেড়াজালে বেষ্টিত। ইসলামী রাজনীতিতে আমাদের অবস্থা অবস্থান শূন্যের কোটায়। তাই মুসলিম উম্মার এই পরিস্থিতিতে কী করণীয় কোরআন হাদীসের আলোকে তার সঠিক সমাধান দিয়েছে। আশা করি এই কিতাবটি আমাদের বাংলাভাষী মুসলমানদের জন্য মূল্যবান পাথেয় হবে ইনশাআল্লাহ।

কিতাবটি নির্ভুলভাবে ছাপানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এরপরও ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। পাঠক মহলে যদি কোন ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় তা জানালে কৃতজ্ঞ হব এবং পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

ইবনে সামসুজ্জামান
(কুতুব ভূঁইয়া)

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ্ তাআলার দরবারে লাখো শোকর, তিনি এই গুনাহগার বান্দাকে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে একটি ভাল কাজ করার তৌফিক দিয়েছেন। অনেকটা কাকতালীয়ভাবেই ভাই তালহার মাধ্যমে খুতুবাতে উসমানীর তিন খণ্ডের কিতাবটি আমার হাতে আসে, তারপর পড়তে গিয়ে শখের বশে তার অনুবাদও শুরু করি। সূরা ফাতিহা অংশ শেষ হওয়ার পর বন্ধুদের উৎসাহে অনুবাদ অব্যাহত রাখি এবং এরই মাঝে একদিন এক প্রকাশক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি আমাকে তিনখণ্ডের অনুবাদ শেষ করার তাকিদ দেন। তার উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে কয়েক মাসের মধ্যেই কাজটি শেষ করি। অনুবাদ করার সময় বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নজনের আন্ত রিক সহযোগিতা পেয়েছি। প্রিয় উস্তাদ মাওলানা আতীকুল্লাহ সাহেবের সার্বিক দিক-নির্দেশনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া জনাব রফিকুল আমীন, সহসম্পাদক আমার দেশ, অনূদিত পাণ্ডুলিপির শুরুর দিকের অংশবিশেষ দেখে দিয়েছেন। আর কিতাবটির সার্বিক সম্পাদনা করেছেন উস্তাদে মুহতারাম মাওলানা হাবীবুর রহমান নদভী দা.বা.। আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের সকলকে এবং এই কিতাবের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন এবং আমার এই নগণ্য কুরআনী খিদমতের উসিলায় আমার ভবিষ্যৎজীবনকে কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন। আমীন

নিবেদক
ইয়াসীন বিন ইউসুফ
মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম,
শ্যামলী, ঢাকা।

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

আরোগ্যদানকারী

এটা শিরকের অন্তর্ভুক্ত ৪০
সাহায্যও আল্লাহ্‌র কাছেই চাইতে হবে ৪০
আরোগ্য দানকারীওআল্লাহ্ ৪০
ওষুধ আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে ৪১
ক্রেতা-গ্রাহক কে পাঠাচ্ছেন ৪১
সব কাজে আল্লাহ্‌র সাহায্য চান ৪১
আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চান ৪২
ইনশাআল্লাহ্ বলার অভ্যাস করুন ৪২
আগুনকে পুষ্পোদ্যান বানিয়েছেন ৪২

সেজদা অন্য কারো জন্য জায়েয নাই

ভূমিকা ৪৪
একত্ববাদে বিশ্বাস ৪৫
সেজদা অন্য কারো জন্য জায়েয নেই ৪৫
সম্মানের জন্য কাউকে সেজদার অনুমতি নেই ৪৫
কবরের উপর সেজদা করা শিরক ৪৬
এটা ছিল মুশরিকদের বিশ্বাস ৪৬
তাওয়াফ ৪৬
কারো সামনে ঝুঁকা জায়েয নেই ৪৭
অন্যের সামনে হাত বেঁধে দাঁড়ানো ৪৭
হাজারো সেজদার দ্বারা মানুষকে দেয়া হয় জান্নাত ৪৭
আমরা তো সকাল সন্ধ্যা অন্যের কাছে চাই ৪৮
রোগমুক্তি কি ডাক্তারের ক্ষমতায়? ৪৮
সাহায্য আল্লাহ্‌র কাছেই চান ৪৯
প্রকৃত কার্যক্ষমতা আল্লাহ্‌র ৪৯
আল্লাহ্ তা'আলাই বৃষ্টি দান করেন ৪৮
বাহ্যিক আসবাব শুধু জীবিতদের কাছ থেকে ৫০
কবরবাসীর সাহায্য চাওয়া ৫০
প্রার্থনা শুধু আল্লাহ্‌র কাছে ৫১

বিষয় ..... পৃষ্ঠা

সর্বাত্মক চেষ্টা করো

সূচনা..... ৫২
সোজা পথ কী?..... ৫৩
সিরাত (পথ) এই শব্দ গ্রহণ করার কারণ..... ৫৩
হিদায়াত দুই প্রকার..... ৫৪
প্রথম হেদায়াত আ'ম আর দ্বিতীয় হেদায়াত হলো খাস ৫৪
ব্যাপক অর্থবহ একটি দু'আ..... ৫৫
তিন কাজ করো ৫৬
হযরত ইউসুফ (আঃ) এর কর্মপদ্ধতি..... ৫৬
তুমিও এই দুই কাজ কর..... ৫৭
এই আয়াতের শিক্ষা ৫৮
এর আগে দুইটি কাজ..... ৫৮

আল্লাহ্‌র দিকে রুজু করা

সূচনা..... ৬০
আল্লাহ্‌র কাছে সীরাতে মুসতাকীম চান..... ৬১
বাঁকা সিঁথির জন্য তাবীয ৬১
এই যুগে আমরা কীভাবে আমল করবো..... ৬২
আল্লাহ্‌র দরবারে সওয়াল জাওয়াব ৬২
আমার অভিমুখী কেন হওনি?..... ৬৩
হযরত ইউনুস (আঃ) কীভাবে রুজু করেছেন..... ৬৪
এভাবে মুমিনকে নাজাত দেন..... ৬৫
নিরাশ হয়ো না ৬৫
চল্লিশ দিন পর্যন্ত এই দু'আ করুন ৬৫
দুনিয়ার চিন্তায় বিভোর ৬৬
প্রতিদিন আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন..... ৬৬
মনোযোগের সঙ্গে এই শব্দগুলো পড়ুন..... ৬৬

সীরাতে মুসতাকীম হাসীলের তরীকা
তাফসীরে সূরা ফাতিহা (১৩)

সূচনা..... ৬৮
সব ক্ষমতার পরিসমাপ্তি ঘটবে..... ৬৯
সবক্ষেত্রে সীরাতে মুস্তাকীমের প্রয়োজন..... ৭০
চিকিৎসাতেও সীরাতে মুস্তাকীম প্রয়োজন ৭০

বিষয় পৃষ্ঠা
আমাদের হালত ৭০
আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে উত্তর ৭০
এক বুযুর্গের ঘটনা ৭১
সীরাতে মুসতাকীম অর্জনের পদ্ধতি ৭২
ভুল সংশোধন ৭৩
দুটি জিনিস একই সঙ্গে অবতরণ ৭৩
রাসূলদের দিক-নির্দেশনা ৭৪

সূরা নাস (১)
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যাদুর প্রভাব এবং তা কর্তন

অবতরণিকা ৭৫
সূরা ফালাক ও সূরা নাসের শানে নুযূল ৭৬
ইহুদীদের জাদু ৭৭
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্ন ৭৭
সূরা ফালাকের তরজমা ৭৮
একেকটি আয়াতে একেকটি গিঁট খুলে গেল ৭৮
নবুওয়াতের আবশ্যকীয় বিষয়ে বাধা দেয়া অসম্ভব ৭৯
আম্বিয়া (আঃ) যাদুগ্রস্ত হতে পারেন ৭৯
সকাল-সন্ধ্যা এই দুই সূরার আমল ৮০
মৃত্যুশয্যায় রাসূল (সাঃ) এর অবস্থা ৮১
দুশমনের অনিষ্ট থেকে বাঁচার উত্তম মাধ্যম ৮১
অন্যায়ের প্রতিশোধ নিও না ক্ষমা করে দাও ৮২

হিংসুকের হিংসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা
সূরা ফালাক (২)

প্রথম আয়াতের উদ্দেশ্য ৮৪
ছয় মাস রাত ৮৪
কষ্ট লাঘবকারী সত্তা তিনি ৮৫
কোন বস্তুর পানাহ চাচ্ছি ৮৫
কষ্টমুক্ত কোন মানুষ নেই ৮৬
তিনটি জগত ৮৬
আল্লাহর দিকে রুজু করুন ৮৬
মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য ৮৭

বিষয় পৃষ্ঠা
কষ্ট ও কল্পনার সময় বলো ৮৭
আউযুবিল্লাহ্ পড়া ৮৮

হিংসুকের হিংসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো
সূরা ফালাক (৩)

সূচনা ৮৯
এই আয়াতে সব অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে ৯০
অন্ধকার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো ৯০
হযরত ইউনুস (আঃ) ৯১
অন্ধকার থেকে পানাহ কেন? ৯২
গ্রন্থির উপর ফুঁকদানকারীদের অনিষ্ট থেকে ৯২
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যাদু ও ফুঁক ৯৩
হিংসুকের হিংসা থেকে পানাহ ৯৩
হিংসা কাকে বলে? ৯৩
ঈর্ষা করা জায়েয ৯৪
হাফেজ ইবনে হাজার (রঃ)-এর ঈর্ষা ৯৪
অনিচ্ছাকৃত কল্পনা গুনাহ নয় ৯৫
অনিচ্ছাকৃত কল্পনার চিকিৎসা ৯৫
হিংসুক থেকে প্রতিশোধ গ্রহণীয় না, মাফ করে দাও ৯৬

হিংসার স্তর এবং তার চিকিৎসা
সূরা ফালাকের তাফসীর

সূচনা ৯৭
হিংসার অর্থ ও তার অনুক্রম ৯৮
হিংসার দ্বিতীয় স্তর ৯৮
হিংসার তৃতীয় স্তর ৯৮
হিংসার প্রথম দুই স্তরের মূলতত্ত্ব ৯৯
দু'ভাবে তার চিকিৎসা ৯৯
দ্বিতীয় চিকিৎসা হলো তার জন্য দু'আ করা ১০০
মানুষের সামনে তার প্রশংসা করা ১০০
প্রত্যেকের একই অবস্থা ১০০
হিংসা করা ভাগ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার নামান্তর ১০১
হিংসার কারণে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে ১০১

বিষয় পৃষ্ঠা
ঈর্ষা করা জায়েয ১০১
হাফেজ ইবনে হাজারের দু'আ ১০২

শয়তানের বিষের প্রতিষেধক
সূরা নাসের তাফসীর

সূচনা ১০৩
সূরা নাসের তরজমা ১০৪
দুই সূরার মাঝে সামঞ্জস্য ১০৪
সূরা ফালাকে একটি গুণ ও তিনটি অবস্থা থেকে পানাহ ১০৫
সূরা নাসে তিনটি গুণ ও একটি বস্তু থেকে পানাহ ১০৫
আশ্চর্য ও অভিনব ইঙ্গিত ১০৫
নিরাপত্তা নির্দেশক গুণ ১০৬
তিন ছিফাতের মধ্যে একটি আশ্চর্য সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে ১০৭
শয়তানের কুমন্ত্রণা দেয়া ১০৭
আল্লাহ্‌র যিকিরের কারণে শয়তান পালিয়ে যায় ১০৮
পশ্চাদপসারণকারী ১০৮
শয়তানের বিষের প্রতিষেধক ১০৯
একটি বিষাক্ত গাছের চারা ও তার প্রতিষেধক ১০৯
গুনাহ হলো দৃষ্টিনন্দন গাছের মত ১১০

ধারণা ও অনুমানের চিকিৎসা
সূরা নাস

অবতরণিকা ১১১
সূরার তরজমা ১১২
ওয়াসওয়াসার প্রকার ১১২
মন মস্তিষ্ক সর্বদা যা ভাবে ১১৩
দু'ধরনের কু-মন্ত্রণা ১১৩
এই ওয়াসওয়াসা ঈমানের আলামত ১১৩
সম্পদশালীর ঘরেই চোর আসে ১১৪
এসব কু-মন্ত্রণার চিকিৎসা ১১৫
শুচিবায়ু এক ধরনের ওয়াসওয়াসা ১১৫
শুচিবায়ুর 'এলাজ' ১১৬
হযরত গাংগুহির (রহ.) ঘটনা ১১৬

বিষয় পৃষ্ঠা
নামাজে সন্দেহের ঘটনা ১১৬
কিছু মানুষ ভুলের মধ্যে আছে ১১৭
নিজের সিদ্ধান্তই গোমরাহ করে ১১৭
শুচিবায়ু রোগের দ্বিতীয় চিকিৎসা ১১৮
শুচিবায়ুর কারণে জীবন কষ্টসাধ্য ১১৮
সারমর্ম ১১৮

যাদু ও দুষ্ট আত্মার প্রতিকার
সূরা নাস (৩)

সূচনা ১১৯
কুমন্ত্রণা দাতা শয়তান ও মানুষ ১১৯
শয়তানের সমাবেশ ও কারগুযারী ১২০
আমি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাদ বাধিয়েছি ১২০
শয়তানের শিষ্য সংখ্যা অগণিত ১২১
শয়তান মানুষের শরীরে অনুপ্রবেশ করে ১২১
শয়তানের রণকৌশল বড় দুর্বল ১২২
নকসও কু-মন্ত্রণা দেয় ১২৩
আত্মশুদ্ধির উপায় ১২৩
হযরত ইউসুফ (আঃ) কীভাবে বেঁচেছেন ১২৪
দুটি কাজ করা উচিৎ ১২৫
মরযে মওতেও দম করতেন ১২৫
আজ মসজিদগুলো অরক্ষিত ১২৬
মসজিদে আগমনকারীদের দেহ তল্লাশী করা হবে ১২৬

ঝাড় ফুঁক এবং তাবীজ তুমার
সূরা নাস (৪)

সূচনা ১২৮
আমার আশ্রয় প্রার্থনা করো ১২৯
কুরআনে কারীমের দু'আ রদ হতে পারে না ১২৯
হযরত ইউসুফ (আঃ) এর আশ্রয় গ্রহণ ১৩০
আযাদী আন্দোলনের একটি ঘটনা ১৩১
এ সূরায় এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ১৩১
ছালাতুল হাজত পড়ে দু'আ করুন ১৩২
যে কোন কাজের জন্য তাবীজ নেয়া ১৩২

বিষয় পৃষ্ঠা
নবীজী কখনো তাবীজ দেন নেই ১৩৩
সাহাবায়ে কেরাম তাবীজ লিখেছেন ১৩৪
এ জাতীয় তাবীজ হারাম ১৩৪
তাবীজ দু'আ রূহানী চিকিৎসা নয় ১৩৪
তিলাওয়াতের ছাওয়াব পাবে না ১৩৫
চিকিৎসার সঠিক পন্থা ১৩৫
অদ্ভুত তাবীজ ১৩৫
তাবীজের সূচনা ১৩৬

জগতসমূহের ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা
সূরা ফাতিহার তাফসীর (১)

সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত ১৩৭
সব কিছুর প্রশংসা যেন আল্লাহ্ তা'আলারই প্রশংসা ১৩৭
বিশ্ব জগতের প্রতিপালক ১৩৮
একটি প্রশ্ন ১৩৮
আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞানের দৃষ্টান্ত ১৩৯
এক বিচ্ছুর অদ্ভুত ঘটনা ১৩৯
বিচ্ছুর জন্য খোদায়ী কিশতী ১৪০
এক বিচ্ছু তোমার মোহসিন ১৪০
জগতসমূহের মহাব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ১৪১
হযরত মুসা (আঃ) এবং খিজির (আঃ) এর ঘটনা ১৪১
মাছ হারিয়ে গেল ১৪২
আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না ১৪২
শিশুকে হত্যা করলেন ১৪৩
প্রতিটি কাজ পরওয়ার দিগারের হুকুমেই করেছেন ১৪৪
সব কাজের পিছনে আছে একটি গোপন রহস্য ১৪৪
আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকুন ১৪৫
সারকথা ১৪৬

আল্লাহ্ তা'আলা রহমানও রহীমও
সূরা ফাতিহার তাফসীর (২)

বিশ্ব জগতে রয়েছে অসংখ্য জগত ১৪৭
সমুদ্র জগত ১৪৮

বিষয় পৃষ্ঠা
এই পৃথিবী কণা বরাবরও নয় ১৪৮
আলোকবর্ষ পরিচিতি....১৪৮
দ্বিতীয় আয়াত ১৪৯
'রহমান' সিফাতে প্রকাশস্থল....১৫০
الرَّحِيْمِ। এই গুণবাচক নামের প্রকাশস্থল....১৫০
দুনিয়ার রহমত অসম্পূর্ণ....১৫০
তিনটি জগত....১৫১
দুনিয়াতে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আশঙ্কা ১৫১
আল্লাহর রহমত তাঁর ক্রোধের চেয়ে প্রবল....১৫২
ভুল হয়েছে তাহলে তাওবা করো....১৫৩
গুনাহের উপর অটল থেকো না....১৫৩
রহমতই আল্লাহ্ তা'আলার আসল গুণ ১৫৪
অন্যের প্রতি দয়ার্দ্র হও....১৫৫
আমাদের জন্য তিনটি পয়গাম তিনটি সবক ১৫৫

বিচার দিবস অবশ্যম্ভাবী

তিনটি আয়াতে তিনটি গুণ....১৫৭
তিনটি মৌলিক বিশ্বাস....১৫৮
প্রথম আয়াতে তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস....১৫৮
দ্বিতীয় আয়াতে রিসালাতের দলীল....১৫৮
ইলম অর্জনের তিনটি মাধ্যম....১৫৯
জ্ঞানার্জনের প্রথম মাধ্যম পঞ্চ ইন্দ্রিয় ১৬০
পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান সীমাবদ্ধ....১৬০
ইলম অর্জনের দ্বিতীয় মাধ্যম হলো আকল ১৬১
ইলম অর্জনের তৃতীয় মাধ্যম হলো 'ওহী' ১৬২
ওহী আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে....১৬৩
মানুষের মতপার্থক্য ১৬৩
আম্বিয়া (আঃ) এর ধারাবাহিকতাও একটা রহমত ১৬৪
মানুষের দুই শ্রেণী....১৬৪
দ্বিতীয় শ্রেণী....১৬৪
প্রতিদান দিবস ও আল্লাহর রহমতের তাকাযা ১৬৫
তৃতীয় আয়াতে আখেরাতমুখিতা ১৬৬

বিষয় পৃষ্ঠা

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী
সূরা ফাতিহা (৪)

আম্বিয়া (আঃ) এর প্রেরণ রহমতেরই তাকাযা ১৬৮
কুল-কায়েনাতের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা ১৬৮
আমাদেরকে অস্থায়ী মালিক বানানো হয়েছে ১৬৯
একদিন বাহ্যিক রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে ১৬৯
আজ বাদশাহী কার? ১৭০
পার্থিব জীবন মূল্যহীন হয়ে যাবে ১৭০
এই দুনিয়াই কি সবকিছু? ১৭২
এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। ১৭২
দুনিয়ার জন্য এতটুকুই কর ১৭৩

এই দুনিয়া শেষ ঘাঁটি নয়

প্রথম আয়াতে তাওহীদের প্রতি ইশারা ১৭৪
দ্বিতীয় আয়াতে রিসালাতের প্রতি ইঙ্গিত ১৭৫
তৃতীয় আয়াতে আখেরাতের বর্ণনা ১৭৫
সব বাদশাহী এবং রাজত্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে ১৭৫
তোমাদের কথা ও কাজের হিসাব হবে ১৭৬
দুনিয়া থেকে একদিন যেতে হবে ১৭৭
সূরা ফাতিহার রহমত ওয়ালা ছিফাত ১৭৭
এই দুনিয়া তোমাদের শেষ বাসস্থান নয় ১৭৮
আজকের পৃথিবী কেন অন্যায় অনাচারের পৃথিবী ১৭৯
এক মহিলার শিক্ষণীয় ঘটনা ১৭৯
বাচ্চা জন্মের অপেক্ষা ১৮০
ঐ মহিলার দৃঢ়তা ১৮০
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযা পড়ালেন ১৮১
এটা ছিল পরকালের শাস্তির ফলাফল ১৮১

আল্লাহর হুকুম সবার আগে

তিনটি আয়াত তিনটি আকীদা ১৮২
এর উপর কীভাবে আমল হবে ১৮৪
আয়াতের ভাষ্য ১৮৫
আল্লাহর অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য হতে পাঁরে না ১৮৫
পিতা-মাতা এবং স্বামীর আনুগত্যে ধোঁকা ১৮৬

বিষয় পৃষ্ঠা

মা-বাবার আনুগত্যের সীমা ১৮৭
আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করো ১৮৭
এই মিথ্যা স্বীকারোক্তি তুমি করছ না ১৮৮
ইবাদতের অর্থ কী ১৮৮
শরাবের অভ্যাস ১৮৮
ইউরোপে মদের ফলাফল ১৮৯
আরববাসী এবং মদ ১৮৯
আরবে মদ হারাম করার ফল ১৯০
এক সাহাবীর শিক্ষণীয় ঘটনা ১৯১
আল্লাহর হুকুমের সামনে সব কিছু কোরবান ১৯২

শুধু আল্লাহর কাছে চাও

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এর ব্যাখ্যা ১৯৪
গুরুত্বপূর্ণ প্রেশক্রিপশন ও মহান শিক্ষা ১৯৪
এমন পরিবেশে কী করে চলবো ১৯৫
হাশরের মাঠের কল্পনা করুন ১৯৫
এর কী জবাব আছে? ১৯৬
অকৃত্রিমভাবে চান ১৯৬
এই দু'আ করুন ১৯৬
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ১৯৭
আমার ভেতরের মুসলমান জেগে উঠল ১৯৮
দু'টি কাজের উপর তাকে রাজি করান ১৯৮
আল্লাহ্ তা'আলাকে স্বচক্ষে দেখেছি ১৯৯
আমাকে মুসলমান বানাও ১৯৯
আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই দান করেন ২০০

আল্লাহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম

ভূমিকা ২০১
এই আয়াতের এক দিক ২০১
আল্লাহরই কাছে চাও ২০২
এই আয়াতের দ্বিতীয় দিক ২০২
একটি সূক্ষ্ম বিষয় ২০৩
আল্লাহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম ২০৩

বিষয় পৃষ্ঠা

এক. অবুঝ শিশু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন ২০৪
সব প্রয়োজনে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে চাও ২০৪
বিভিন্ন হালতের দু'আসমূহ ২০৫
আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় হয় ২০৬
সারমর্ম ২০৭

প্রয়োজন পূর্ণকারী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা
সূরা ইখলাসের তাফসীর

সূরার নামকরণ ২০৮
এই সূরার শানে নুযূল ২০৮
ইবাদতের যোগ্য শুধু আল্লাহ তা'আলা ২০৯
মূর্খদের মূর্খতাসুলভ প্রশ্ন ২০৯
খোদা তিনিই যিনি নির্মুখাপেক্ষি ২০৯
এই সূরা কোরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান ২১০
এর ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে ২১০
এই সূরা প্রয়োজন পূরণের মাধ্যম ২১০
আল্লাহ এক অদ্বিতীয় ২১১
أَحَدٌ এবং واحد এর মাঝে সূক্ষ্ম পার্থক্য ২১১
আল্লাহ বস্তু এবং অংশ থেকে পবিত্র ২১১
তিনি নির্মুখাপেক্ষী ২১২
আল্লাহ বস্তু নির্মিত নন ২১২
প্রতিটি বস্তু তাঁর মুখাপেক্ষী ২১২
আল্লাহ তা'আলার কোনো পিতা নেই ২১৩
আল্লাহর কোনো সন্তান নেই ২১৩
দুই খোদা হয়ে যায় ২১৩
কেউ তাঁর সমকক্ষ নয় ২১৪
ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য ২১৪
সমস্যা সমাধানকারী আল্লাহ তা'আলা ২১৪
অপরকে সাহায্য করার তাওফীক আল্লাহর পক্ষ থেকে ২১৪
মৃত ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা করা শিরক ২১৫

সূরা লাহাবের তাফসীর

অবতরণিকা ২১৬
সূরার তরজমা ২১৬

বিষয় পৃষ্ঠা

সাফা পর্বতে ঘোষণা ২১৭
وَاصَبَاحَاهُ এর ঘোষণা ২১৭
শানে নুযূল ২১৭
স্বগোত্রকে সতর্ক করুন.....২১৮
তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে? ২১৮
আমরা অবশ্যই তোমাকে বিশ্বাস করবো ২১৮
আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের ঘোষক হও.....২১৯
এই উদ্দেশ্যেই কি আমাদের ডেকেছ?.....২১৯
আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীলের কৃতকর্ম.....২১৯
নবীজীর নিকৃষ্ট শত্রু..... ২২০
আবু লাহাবের উভয় হাত ভাঙ্গা..... ২২০
আবু লাহাবের ইহকালীন পরিণতি..... ২২০
তার সম্পদ তার কাজে আসেনি.....২২১
পরকালীন পরিণতি.....২২১
তার স্ত্রীর পরিণতি.....২২২
তার গলায় থাকবে দড়ির শৃঙ্খল ২২২
কোরআনুল কারীমে তার মন্দ পরিণতির উল্লেখ.....২২২
জেনে বুঝে সত্যকে অস্বীকার করার ফল..... ২২৩

এই ধন-সম্পদ কাজে আসবে না
সূরা লাহাবের তাফসীর (২)

অবতরণিকা..... ২২৪
সর্বমহলে দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি..... ২২৪
আবু লাহাব এবং তার স্ত্রীর অভ্যাস..... ২২৫
সূরার তরজমা ২২৫
প্রতিটি ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করা.....২২৬
বদদো'আ অনুচিত ২২৬
আবু লাহাবের জন্য কেন বদদো'আ ২২৬
কতিপয় লোকের জন্য হুযূর সা. এর বদদো'আ..... ২২৭
ব্যাপকভাবে বদদো'আ করা জায়েয ২২৭
না কাজে এসেছে তার সম্পদ না তার উপার্জন..... ২২৮
ধন-সম্পদ সাময়িক সঙ্গী..... ২২৮
তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির সঙ্গী হয়..... ২২৮

বিষয় পৃষ্ঠা
সম্পদ কতদিন ভোগ করবেন ২২৯
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ২২৯
টাকার নাম শান্তি ২৩০
ঐ সম্পদ না দুনিয়াতে কাজে এসেছে না আখেরাতে ২৩০
একমাত্র বৈধ সম্পদ কাজে আসবে ২৩০

মক্কা বিজয়ের ঘটনা
সূরা নাসরের তাফসীর

সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা ২৩১
এই সূরার তরজমা ২৩২
খায়বার যুদ্ধের পর অবতীর্ণ সূরা ২৩২
মক্কা বিজয়ে সুসংবাদ ২৩২
মক্কার সর্বশেষ পরিণতির অপেক্ষা ২৩৩
ফাতহে মক্কার পর ব্যাপক ক্ষমার ঘোষণা ২৩৩
রহমাতুল্লিল আলামীন এর রহমতের অনুপম নিদর্শন ২৩৪
ব্যাপক ক্ষমার ফলাফল, ইসলাম গ্রহণ ২৩৪
অন্যান্য আরব গোত্রের ইসলাম গ্রহণ ২৩৪
সূরা নাসর অবতীর্ণ হওয়ার সময় সাহাবাদের (রা.) আনন্দ ২৩৫
তাঁর বিদায়ের সময় সন্নিকটে ২৩৫
তাসবীহ, প্রশংসা এবং ইস্তেগফারের আধিক্য ২৩৬
সিজদায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাসবীহ ২৩৬
কামিয়াবী আল্লাহর মদদে হয় ২৩৭
সফলতার চাবিকাঠি আল্লাহ তা'আলার হাতে ২৩৭
ক্রিয়া সৃষ্টিকারী আল্লাহ তা'আলা ২৩৭
গ্রাহক আল্লাহ তা'আলাই পাঠান ২৩৮
আজ ছুটি কাটাই ২৩৮
আমার আল্লাহই তাকে পাঠিয়েছেন ২৩৮
মানুষের কাজ চেষ্টা করা ২৩৯

আল্লাহর শোকর নেয়ামত বৃদ্ধির মাধ্যম
সূরা নাসরের তাফসীর (২)

অবতরণিকা ২৪০
হুযূরের বিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসছে ২৪০
কামিয়াবী আল্লাহর সাহায্যে হয় ২৪১

বিষয় পৃষ্ঠা
কামিয়াব হওয়ার পর করণীয় ২৪১
সফলতার উপর বড়াই করা অহংকারের আলামত ২৪২
মক্কা প্রবেশের সময় হুযূরের অবস্থা ২৪২
মক্কাবাসীদের জন্য নিরাপত্তার পয়গাম ২৪৩
আনন্দের মুহূর্তেও আল্লাহভিমুখী থাকা ২৪৩
শুকরিয়া আদায় করার মাধ্যমে নেয়ামতে বৃদ্ধি ঘটে ২৪৪
শোকরের বিনিময় জান্নাত ২৪৪
শোকরগুজার বান্দা শয়তান থেকে নিরাপদ থাকে ২৪৪
সর্বদা শোকর আদায় করো ২৪৫
শোকর একটি বিরাট সুপ্ত ইবাদত ২৪৫
তেইশ বছরে পুরো চিত্রই পাল্টে দিয়েছেন ২৪৬

সূরা মা'উন এবং তার প্রেক্ষাপট (১)

ভূমিকা ২৪৭
সূরার তরজমা ২৪৭
পরকালের বিশ্বাস জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে ২৪৮
অত্যাচার আর অত্যাচারিত সমান হতে পারে না ২৪৯
এই বিশাল কারখানা কে গড়েছেন? ২৫০
প্রাণীকুল তোমাদের সেবায় নিয়োজিত ২৫০
আম্বিয়া আ. কে নাযীর, সতর্ককারী বলা হয়েছে ২৫১
মুসলমান পরকাল সম্পর্কে বে-খবর ২৫১
কয়েকটি প্রশ্ন অবশ্যই করা হবে ২৫২
আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ২৫৩

সূরা মা'উন এবং তার প্রেক্ষাপট (২)

সূচনা ২৫৪
কিছু মন্দ কাজ ২৫৫
ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয়া ২৫৫
ইয়াতীমের প্রতিপালনের ফযীলত ২৫৬
ইয়াতীমের অধিকার হরণের শাস্তি ২৫৬
উত্তরাধিকারী সম্পদ বণ্টন না করা ২৫৬
এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় সাহাবীদের অবস্থা ২৫৭
নাবালেগ বাচ্চাদের হক্ব ২৫৯
বাচ্চাদেরকে হাদিয়া দেয়ার তরীকা ২৫৯

বিষয় পৃষ্ঠা

'মীরাছ, বণ্টন না হওয়ার পরিণতি ২৬০
প্রথমে মুফতী সাহেবের কাছে এরপর আদালত ২৬০

সূরা মা'উন এবং তার প্রেক্ষাপট (৩)

অবতরণিকা ২৬২
আখেরাত বিস্মৃত হওয়ার পরিণাম ২৬৩
মুনাফিকদের অন্যায় কাজ ২৬৩
মুনাফিকদের আলামত ২৬৩
মুসলমানদেরকে সতর্ক করা ২৬৪
নামায কোন অবস্থায় মা'ফ নেই ২৬৪
জামাতের গুরুত্ব নাই ২৬৫
জামাতের ছাওয়াব ২৬৫
নামাযের আদব এবং শর্তসমূহের প্রতি লক্ষ্য না রাখা ২৬৬
প্রতিটি বিষয়ের নিয়ম কানুন থাকে ২৬৬
সুন্নতের নূর হাসিল হবে না ২৬৬
মুফতীয়ে আজম পাকিস্তান এবং নামাযে ইশকাল ২৬৭
খালি মাথায় নামায পড়া সুন্নাতের খেলাফ ২৬৭
আদব ও শর্তবিশিষ্ট নামায ২৬৮
জামাতে কাতার সোজা করার গুরুত্ব ২৬৮
ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে যাওয়া ২৬৮

সূরা কাফিরূন (১)

ফজরের নামাযে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ২৭০
ঘুমানোর আগে কী পড়া উচিৎ ২৭১
সফরে পড়লে পেরেশানী দূর হয় ২৭১
বিচ্ছু দংশনের ক্রিয়া দূর হয় ২৭২
এই সূরার শানে নুযূল ২৭২
আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করতে পারবো না ২৭৩
কাফেরদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব ২৭৩
তোমরা আল্লাহর ইবাদত করতে না ২৭৪
তোমাদের খোদা এবং আমাদের আল্লাহ ২৭৪
আমি তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবো না ২৭৫
তোমরা ভবিষ্যতেও ঈমান আনবে না ২৭৫
আমার জন্য আমার ধর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম ২৭৪

বিষয় পৃষ্ঠা

সূরা কাফিরূন (২)

ভূমিকা ২৭৭
সূরা কাফিরুনের ফাযায়েল ২৭৭
কাফেরদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব ২৭৮
সূরা কাফিরূনের তরজমা ২৭৮
আল্লাহকে কাফেরও মানে ২৭৮
আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করে ২৭৯
তারা দেবদেবীকে অংশীদার মনে করে ২৭৯
সমুদ্রের ঝড়ে এই কাফেররা শুধু আল্লাহকেই ডাকে ২৮০
শিরকী আক্বীদা থেকে বাঁচা ২৮০
গ্রামাঞ্চলে ভ্রান্ত বিশ্বাস ২৮১
মাযারে গিয়ে কী করা উচিৎ ২৮১
কোন বুযুর্গকে দাতা বলা জায়েয নেই ২৮১
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বড় বুযুর্গ কে? ২৮২
সন্ধির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ২৮৩
আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়ে কারো আনুগত্য চলতে পারে না ২৮৪
হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাইফা রা.-এর শিক্ষণীয় ঘটনা ২৮৫
একশটি প্রাণ উৎসর্গ করতাম ২৮৫
কাফের বাদশার ললাটে চুম্বন ২৮৬
জান বাঁচানোর জন্য গুনাহ করা জায়েয ২৮৬
এটাই দ্বীনের বুঝ ২৮৭

প্রত্যেক ইবাদতের পর দু'টি কাজ
সূরা নাসরের তাফসীর (৩)

সূচনা ২৮৮
সাফল্যের উপর শোকর আদায় করুন ২৮৮
চিন্তার বিষয় ২৮৯
মদ নিষিদ্ধকরণ ২৮৯
এখন আমার প্রতি এ আশা রেখো না ২৯০
এই মহা বিপ্লব কি কোন গুনাহ ছিল? ২৯১
ভাল কাজের পরও ইস্তেগফার করো ২৯১
হক্ব আদায় করে কেউ আল্লাহর ইবাদত করতে পারে না ২৯২
অসতর্কতার উপর এস্তেগফার করুন ২৯২

বিষয় পৃষ্ঠা
সে স্বীয় ইবাদতের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করে.....২৯২
নামাযের পর তিনবার ইস্তেগফার ২৯৩
নামাযের অসম্মান না করা ২৯৩
সকল ইবাদতের পর দু'টি কাজ করা, শোকর এবং ইস্তেগফার.....২৯৪
আল্লাহ তা'আলা আমাদের ইবাদত থেকে বেনিয়ায ২৯৪
সে আমার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে.....২৯৫
এক বুযুর্গের ঘটনা ২৯৫
প্রত্যেক ইবাদতের পর দু'টি কাজ করো.....২৯৭

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান মর্যাদা
সূরা কাউসারের তাফসীর

ভূমিকা ২৯৮
সূরা কাওছারের শানে নুযুল.....২৯৮
কাফেরদের আনন্দ উল্লাস ২৯৯
সূরা কাউসার অবতীর্ণ হওয়ার পর নবীজীর আনন্দ ২৯৯
কাউসার অর্থ এবং হাউযে কাউসার ৩০০
হাউযে কাউসার থেকে লোকদের পানি পান করানো.....৩০০
কিছু মানুষকে হাউযে কাউসার থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে.....৩০০
এই দোআ করা দরকার.....৩০১
হাশরের ময়দানে হুযূরের নাম.....৩০১
আপনি আপনার ইবাদতে নিমগ্ন থাকুন.....৩০১
কোরবানির আদেশ কেন দিয়েছেন ৩০২
ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্য ৩০২
যশ ও খ্যাতির কোরবানি অনর্থক.....৩০২
মৌখিক শোকরের সাথে সাথে কাজের মাধ্যমে শুকরিয়া করুন ৩০৩
শুকরিয়া স্বরূপ নফল আদায় করা.....৩০৩
আপনার শত্রুর বংশ নির্মূল ৩০৪
হুযূরের সুমহান আসন.....৩০৪
শত্রুরা নির্মূল আর আপনার গুণগান চিরস্থায়ী ৩০৪

মেরাজের ঘটনা

রমযান মাসের পূর্বাভাস এবং রজব মাস.....৩০৬
হুজুর সা.-কে একান্ত সান্নিধ্য দান ৩০৭
আল্লাহ তা'আলার সাথে গোপন কথোপকথন ৩০৮

বিষয় পৃষ্ঠা
নামায উম্মতের জন্য উপঢৌকন স্বরূপ ৩০৮
সিজদা চূড়ান্ত নৈকট্যের মাধ্যম ৩০৮
আল্লাহ তা'আলা আমাকে ভালবেসেছেন ৩০৯
সিজদার স্বাদ কীভাবে অর্জিত হবে ৩১০
সিজদায় দু'আ করা ৩১১
এমন লোকেরা সিজদা করতে পারবে না ৩১১
এই এক সিজদা যাকে আপনি ভারী মনে করেন ৩১২
দ্বিতীয় উপহার হলো শিক্ষা এবং বিধান ৩১২
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'বান্দা' সম্বোধন ৩১৩
মানুষের সর্বোচ্চ মর্যাদা হলো বন্দেগী ৩১৪
বন্দেগী হলো পূর্ণ আনুগত্যের নাম ৩১৪
এই রাতে বিশেষ কোন আ'মল সাব্যস্ত নেই ৩১৫
রজবের রোযা সাব্যস্ত নেই ৩১৫

শা'বান মাসের ফযিলত

রজব মাসের চাঁদ দেখে মাসনূন দু'আ পড়া ৩১৬
শা'বান মাসে কাযা রোযা রাখা ৩১৭
রমযানের দুই দিন আগে রোযা না রাখা ৩১৭
রমযানের রোযায় বৃদ্ধি ঘটবে ৩১৭
সাহরী শেষ সময়ে খাওয়া ৩১৮
ইফতারি তাড়াতাড়ি করা ৩১৮
মূল কাজ হলো আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা ৩১৮
শবে বরাতের ইবাদত ৩১৯
এই রাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আহ্বান ৩১৯
শবে বরাতে হালুয়া রুটি ৩২০
শবে বরাতে আতশবাজি ৩২০
এই রাতে ইবাদতের তরীকা ৩২১
এই রাতে শুধু অনর্থক কাজ হয় ৩২১
১৫ শা'বানের রোযা রাখা ৩২১
এই রাতে ক্ষমার আধিক্য ৩২২
অন্তরে বিদ্বেষ পোষণকারীর ক্ষমা নেই ৩২২
টাখনুর নিচে সিলওয়ার পরিধানকারীদের ক্ষমা করা হবে না ৩২২
এই রাতে কবরস্থানে যাওয়া ৩২৩

বিষয় পৃষ্ঠা

রমযান মাস
যাকাত ও সদকা আদায় করার মাস

সূচনা ৩২৪
রমযানে ফরয আমলের সাওয়াব সত্তর গুণ ৩২৪
রমযান সহমর্মিতার মাস ৩২৫
দান খয়রাতের মাধ্যমে সহমর্মিতা ৩২৫
রমযানে অবারিত বায়ু প্রবাহের ন্যায় দান করা ৩২৬
রমযান যাকাত আদায়ের মাস ৩২৬
যাকাত কার উপর ফরয ৩২৬
কোন তারিখে যাকাত আদায় করবেন? ৩২৭
সব মালের উপর বছর অতিক্রান্ত হওয়া আবশ্যক নয় ৩২৭
যাকাত আদায় করার জন্য রমযানের অপেক্ষা করবেন না ৩২৮
এখন রমযানের কোন তারিখকে যাকাতের জন্য নির্ধারণ করে নেয়া ৩২৮
তিন ধরনের সম্পদের উপর যাকাত আসে ৩২৯
অনুমান করে যাকাত দেয়া না জায়েয ৩২৯
যাকাতের বিশদ বিবরণের জন্য রিসালা দেখুন ৩৩০
যাকাত গরীবের হক্ব ৩৩০
যাকাতকে উপহার এবং হাদিয়া বলে দেয়া ৩৩১
নিকটাত্মীয়কে যাকাত প্রদানে দ্বিগুণ ছাওয়াব ৩৩১
জায়গা যমীনের যাকাত ৩৩১

বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয়

সূচনা ৩৩২
বর্তমান নাজুক পরিস্থিতি ৩৩২
ইসলাম আমাদেরকে কী শিখিয়েছে? ৩৩৩
এই পরিস্থিতি সম্পর্কে আল্লাহ অবগত ৩৩৩
সকল পরিস্থিতির জন্য পথ বিদ্যমান রয়েছে ৩৩৪
আল্লাহ তা'আলা থেকে নিরাশ হওয়া গোমরাহি ৩৩৪
এটা দুনিয়া, জান্নাত নয় ৩৩৪
দুঃখ কষ্ট ক্ষণস্থায়ী ৩৩৫
মুক্তির সূর্য উদিত হবে ৩৩৫
পেরেশানির কারণ আমাদের কৃতকর্ম ৩৩৬
ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া ৩৩৭

বিষয় পৃষ্ঠা
বাহ্যত কোনো যোগসূত্র নেই ৩৩৭
নামায এবং রাজ্য জয়ের সাথে তার সম্পর্ক ৩৩৭
কায়সার কিসরার প্রাসাদের সুসংবাদ ৩৩৮
কোদাল চালানোর সাথে প্রাসাদ বিজয়ের সম্পর্ক ৩৩৮
শাসকবর্গকে গালি দিও না ৩৩৯
নামায এবং সমস্যা দূর হওয়ার মাঝে সম্পর্ক ৩৩৯
নিজেকে পরখ করে আত্মসংশোধনে ব্রতী হোন ৩৩৯
বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই আল্লাহমুখী হয়ে তাওবা ইস্তেগফার করুন..... ৩৩৯
অধিক ইস্তেগফারের কারণে নেয়ামতের বারি বর্ষিত হয় ৩৪০
নিজের বদ আমলের কথা চিন্তা করুন..... ৩৪০
আমার কারণেই এই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে.....৩৪১
সর্বোত্তম ভুলকারী ৩৪১
এ সকল শব্দে ফরিয়াদ করুন ৩৪২
ইউনুস (আ.) এর সম্প্রদায় থেকে কেন আযাব হটে গেল..... ৩৪২
বেশী বেশী সায়্যিদুল ইস্তেগফার পড়ুন ৩৪৩
সংশোধনের ফিকিরে মগ্ন হোন ৩৪৪
আপনার নামাযের যাচাই করুন ৩৪৪
স্বীয় লেনদেন ও সামাজিক আচার আচরণকে যাচাই করুন..... ৩৪৪
নিজের গুনাহের তালিকা করে একটা একটা করে দূর করুন ৩৪৪
সাথে সাথে আল্লাহর কাছে দু'আ করুন ৩৪৫
আল্লাহ তা'আলার আযাব দূর করার জন্য এই কাজ করতে হবে..... ৩৪৫
প্রদীপ থেকে প্রদীপ জ্বলে ৩৪৬
বেশী বেশী এই আয়াত তিলাওয়াত করুন..... ৩৪৭
সকল মুমিনই কী মাছের পেটে যাবে?..... ৩৪৭
আমরা আমাদের কাজ করেছি..... ৩৪৮
দু'আ..... ৩৪৮

আল্লাহওয়ালাদের পরিচয়

সর্বোত্তম লোক কে?..... ৩৫০
সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা.....৩৫১
এই লোক মিথ্যাবাদী হতে পারে না.....৩৫১
নফল ইবাদত আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের মাধ্যম..... ৩৫২
নফল ইবাদত আল্লাহ তা'আলার ঘনিষ্টতম হওয়ার উপায় ৩৫৩

বিষয় পৃষ্ঠা
নামায মুমিনের মেরাজ ৩৫৩
সিজদার কাছে সব স্বাদই বিস্বাদ ৩৫৪
নফল ইবাদত কাকে বলে? ৩৫৪
নফল ইবাদতকারীর অবয়বই দাওয়াত ৩৫৫
এমন হওয়ার চেষ্টা করুন ৩৫৫
সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে? ৩৫৫
কূটনামী করা শরাব পান এবং যিনা থেকেও নিকৃষ্ট ৩৫৬
ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা জায়েয ৩৫৭
শয়তানের চেলাদের কাজ ৩৫৮
সমুদ্রের উপর শয়তানের জলসা করা ৩৫৮
নিকৃষ্ট বিবাদ হলো স্বামী স্ত্রীর মাঝের মনোমালিন্য ৩৫৯
অন্যের দোষ অন্বেষণ করা ৩৫৯
আমরা আজ কেন লাঞ্ছিত হচ্ছি ৩৫৯
অশ্লীলতা ছড়ানো নিকৃষ্ট গুনাহ ৩৬০
এইড্‌স ব্যাধি অশ্লীলতার কারণ ৩৬০
বেহায়াপনার মাধ্যমগুলো বন্ধ রাখুন ৩৬১

সূরা ফীল-এর প্রেক্ষাপট

ভূমিকা ৩৬২
সূরা ফীলের তরজমা ৩৬৩
এই সূরার প্রেক্ষাপট ৩৬৩
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের নিদর্শনাবলী ৩৬৪
বাইতুল্লাহর প্রয়োজন ৩৬৪
হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং বাইতুল্লাহ বিনির্মাণ ৩৬৪
মানুষের মাঝে হজ্বের ঘোষণা ৩৬৫
জাহেলী যুগ এবং বাইতুল্লাহর গুরুত্ব ৩৬৬
আব্‌রাহার মনে হিংসা ৩৬৬
গির্জা অপবিত্র করা ৩৬৭
হস্তীবাহিনী ৩৬৭
অমুসলিমদের ইবাদত খানার সংরক্ষণ ৩৬৮
হযরত ফারুকে আ'যমের সর্বশেষ অসিয়ত ৩৬৮

বিষয় পৃষ্ঠা

সূরা ফীল-এর পেক্ষাপট

ভূমিকা ৩৬৯
ইয়ামানের গভর্নর আবরাহার হিংসা ৩৭০
কোরাইশদের মাঝে দুশ্চিন্তা ক্রোধের শিখা ৩৭০
বাইতুল্লাহর উপর হামলার প্রস্তুতি ৩৭১
তায়েফবাসীর সন্ধিস্থাপন ৩৭১
মক্কাবাসীকে বার্তা প্রেরণ ৩৭২
আমি আমার উটের ফিকির করছি ৩৭২
এটা আল্লাহর ঘর ৩৭৩
কাবা আঁকড়ে দো'আ করা ৩৭৩
আবরাহা বাহিনীর উপর আযাব ৩৭৪
দুইজন প্রাণে বাঁচে ৩৭৫
এই সূরার তরজমা ৩৭৫
প্রকৃত ক্ষমতা আল্লাহরই ৩৭৫

সূরা কোরাইশ এবং শোকরের শিক্ষা

ভূমিকা ৩৭৭
সূরার তরজমা ৩৭৮
খুন খারাবি ও লুটতরাজ ছিল চরমে ৩৭৮
কোরাইশ গোত্রের স্বাতন্ত্র্য ৩৭৮
মক্কা অঞ্চল পানিশূন্য অনাবাদি ৩৭৯
ব্যবসাই ছিল উপার্জনের মাধ্যম ৩৮০
বাইতুল্লাহর কারণে আরেকটি ফায়দা ৩৮০
শুকরিয়া স্বরূপ বাইতুল্লাহর রবের ইবাদত করো ৩৮১
আরববাসী আমাদের শত্রু হয়ে যাবে ৩৮১
তাওহিদের পর কি তিনি তোমাদেরকে একা ছেড়ে দিবেন ৩৮২
দ্বীনের কারণেও নেয়ামত লাভকারীদের শিক্ষা ৩৮২
আলেমের গুনাহ-এ লিপ্ত হওয়া ৩৮২
আলেমের মাধ্যমে জাহান্নাম প্রজ্বলিত করা হবে ৩৮৩
ইসলামের নামের উপর পাকিস্তান অস্তিত্ব লাভ করেছে ৩৮৩
পাকিস্তান আল্লাহর মহান নেয়ামত ৩৮৪
বড় আশংকাজনক অবস্থা ৩৮৫
মৌলিক শিক্ষা ৩৮৫

বিষয় পৃষ্ঠা
গোটা সমাজ বদদ্বীনির শিকার.....৩৮৫
শাসক তোমাদের আমলের আয়নাস্বরূপ.....৩৮৬

গীবত করা হারাম
সূরা হুমাযার তাফসীর

সূরার শানে নুযূল.....৩৮৭
কাফের এবং মুশরিকদের হাসি-ঠাট্টা.....৩৮৮
সূরার তরজমা.....৩৮৮
মর্মগ্রাসী আগুন.....৩৮৯
আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন.....৩৮৯
তাপ তিন প্রকার.....৩৮৯
চতুর্থ প্রকার তাপ.....৩৯০
এই তাপ থেকে বের হওয়ার কোন রাস্তা থাকবে না.....৩৯০
কাফেরদের গুণ বর্ণনা.....৩৯১
তিনটি দোষ থেকে বেঁচে থাকুন.....৩৯১
নিন্দার ব্যাপারে কঠোরতা.....৩৯১
গীবত যিনা থেকেও নিকৃষ্ট.....৩৯২
গীবতের সংজ্ঞা.....৩৯২
গীবত এবং অপবাদ.....৩৯২
এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়.....৩৯৩
গীবত থেকে বাঁচা সম্ভব.....৩৯৩
শয়তান কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়.....৩৯৪
তখন আপনার কেমন লাগবে.....৩৯৪
দুটি মানদণ্ড.....৩৯৪

রিসালাতের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখুন
সূরা হুমাযার তাফসীর (২)

হুমাযার অর্থ.....৩৯৬
لُمَزَةٍ লুমাযার অর্থ.....৩৯৭
এমন ব্যক্তির পরিণতি.....৩৯৭
সূরার শানে নুযুল.....৩৯৭
মুহাম্মদ-এর পরিবর্তে-মুযাম্মাম বলে ডাকা.....৩৯৭
আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়েছেন.....৩৯৮

বিষয় পৃষ্ঠা
ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ৩৯৮
পরাজিত বিড়াল ৩৯৯
আধুনিক সভ্যতার পতাকাবাহীদের অবস্থা ৩৯৯
নিচুমনাদের হীন ষড়যন্ত্র ৪০০
যুক্তিতর্কের ময়দানে পরাজয় ৪০০
মুসলমানদের আত্মসম্ভ্রমবোধকে চ্যালেঞ্জ ৪০০
হুজুর (সা.) এর ভালবাসা কোন্ স্তরের হবে? ৪০০
হুজুর (সা.) এর মুহাব্বতের নমুনা ৪০১
আজ মুসলমানদের পরীক্ষা ৪০১
ফেসবুক বয়কট করুন ৪০২
টাকার মার মারো ৪০২
তার লাভ হতে দিবেন না ৪০২
হুজুর (সাঃ)-এর মর্যাদা সমুন্নত ৪০২
জন্মলগ্ন থেকেই প্রশংসা ৪০৩
ঈমানী গায়রত থাকলে এ কাজ ছেড়ে দিন ৪০৩
আখেরাতে এরা ধ্বংস হবে ৪০৪

সূরা 'শামছ, বিপদ থেকে রক্ষার উপায়

ভূমিকা ৪০৫
মৃত ব্যক্তিদের জন্য দো'আ করা ৪০৬
নিজ দেশে ভীনদেশী ৪০৭
এক মহিলার হুজুর (সা.)-কে স্বপ্নে দেখা ৪০৭
স্বপ্ন শরীয়তের আলোকে দলীল নয় ৪০৭
স্বপ্নে হুজুর (স.) -এর যেয়ারত এবং তার হুকুম ৪০৮
এই সূরায় এগারোটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে ৪০৮
সূরা শামছের তরজমা ৪০৯
এগারোটি শপথের উত্তরে একটি বাক্য ৪০৯
কেন এসকল বিষয়ে শপথ করেছেন ৪০৯
এই শপথ সমূহে দুনিয়ার আবর্তনের প্রতি ইঙ্গিত ৪১০
একটি কষ্ট আর দুটি স্বস্তি ৪১০
তিনটি জগত ৪১১
এই দুনিয়ায় তোমার করণীয় কী? ৪১১
ফিরিশতাদের বৈশিষ্ট্য ৪১২

বিষয় পৃষ্ঠা
হযরত ইউসুফ আঃ ৪১২
ঈমানের হালত ৪১৩
নফস তো ভাঙ্গার জন্য ৪১৩
আরেকটি কবিতা ৪১৪
আল্লাহ ভগ্ন হৃদয়ের পাশে আছেন ৪১৫
আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পয়গাম ৪১৫
কওমে ছামুদ থেকে শিক্ষা লাভ করুন ৪১৫
আপনি কি নিজেকে যাচাই করেছেন ৪১৬
মশাল থেকে মশাল জ্বলে ৪১৭

রমযান বিদায় নিচ্ছে

সূচনা ৪১৮
রমযানুল মোবারকের সর্বশেষ জুমা ৪১৯
আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত ৪১৯
এগুলো সব আল্লাহর তাওফিকে হয়েছে ৪১৯
তাওবা ইস্তেগফার করা উচিত ৪২০
হক আদায় করতে না পারার কারণে ইস্তেগফার ৪২০
প্রত্যেক ইবাদতের পর আল্‌হামদুলিল্লাহ! এবং আস্‌তাগফিরুল্লাহ ৪২০
বড় কঠিন হুমকি ৪২১
আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকে ৪২১
গোটা দেশ বিপদের শিকার ৪২২
আমল যেমন হবে শাসক তেমনি হবে ৪২২
একজন নামাযীও নেই ৪২২
প্রাণ ক্যাম্পে আগমনকারীদের চিত্র ৪২৩
নামাজিদের অবস্থা এই ৪২৩
তাওবা ইস্তেগফার করো ৪২৩
ঘুষ জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে ৪২৪
আল্লাহমুখী হোন ৪২৪

রমযান পরবর্তী জীবন

সূচনা ৪২৫
এই ফযিলত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে ৪২৬
তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করো ৪২৬
'লাইলাতুল জায়েযা, পুরস্কারের রাত ৪২৭

বিষয় পৃষ্ঠা
আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করুন ৪২৭
শ্রমিকের পারিশ্রমিক পূর্ণরূপে প্রদান কর ৪২৭
আমার কথামত সংখ্যা পূর্ণ করো ৪২৮
ক্ষমার ঘোষণা ৪২৮
কবীরা গুনাহের জন্য তাওবা আবশ্যক ৪২৯
আমি তোমাদের ভিতরকেও পরিষ্কার করে দিব ৪২৯
ঈদগাহ থেকে বের হয়ে কী করবো? ৪২৯
কোনো মুসলমানের কাজ এটা নয় ৪৩০
দ্বিতীয়বার গুনাহের কালেমা লেপন করবেন না ৪৩০
চোখকে গুনাহ থেকে হেফাজত করুন ৪৩০
আমি গীবত করবো না ৪৩১
আমি ঘুষ নিব না ৪৩১
আল্লাহ তাআলার কাছে তাওফিক তলব করুন ৪৩২
আমাদের দেশের উপর আযাব ঝুলে আছে ৪৩২

যিলক্বদ মাসের ফযিলত

ভূমিকা ৪৩৩
হজ্বের আড়াই মাস ৪৩৩
তার উপরও হজ্ব ফরজ হয়ে যাবে ৪৩৪
যিলক্বদ সম্মানিত মাস ৪৩৪
যিলক্বদ মাস সম্পর্কে ভুল ধারণা ৪৩৫
যিলক্বদ মাসের ফযিলত ৪৩৫
মক্কাবাসীর সাথে সন্ধি ৪৩৫
সন্ধির মাঝে অনেক হিকমত নিহিত ছিল ৪৩৬
যিলক্বদ মাসে নবী (স.) ওমরাতুল কাযা করেছেন ৪৩৭
নবী (স.) যিলক্বদ মাসেই সকল ওমরা আদায় করেছেন ৪৩৭
কোনো দিনই অশুভ নয় ৪৩৭
মন্দ আমলের কারণেই অমঙ্গল হয় ৪৩৮
প্রতিরাতেই শবে ক্বদর হতে পারে ৪৩৮
যিলহজ্বের প্রথম দশদিন ৪৩৮
সারকথা ৪৩৯

হজ্ব এবং কোরবানি আমাদেরকে কী শিক্ষা দেয়?

ভূমিকা ৪৪০
হজ্ব এবং কোরবানির জন্য নির্দিষ্ট সময় ৪৪০

বিষয় পৃষ্ঠা
হজ্ব শুধু ৮ই থেকে ১২ই যিলহজ্ব পর্যন্ত ৪৪১
কোন আমলের সত্তাগত কোন মর্যাদা নেই ৪৪১
কোরবানি শুধু ১০ থেকে ১২ যিলহজ্ব পর্যন্ত ৪৪২
হাজীদের কালিমা ৪৪২
এই কালেমার অর্থ ৪৪৩
হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ঘোষণা ৪৪৩
আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশে লাব্বাইক বলো ৪৪৪
কোরবানির সময়ে দো'আ ৪৪৪
আল্লাহর প্রতিটি আদেশের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান ৪৪৫
আমি প্রতিটি কাজ আল্লাহর জন্য করবো ৪৪৫
হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর হুকুম পালন করেছেন ৪৪৬
জিহাদেও শিশু হত্যা না করার নির্দেশ ৪৪৬
খলীলুল্লাহর পুত্রের উত্তর ৪৪৬
আল্লাহ তা'আলা কেয়ামত পর্যন্ত এ সুন্নত জারি করে দিয়েছেন ৪৪৭
আল্লাহর আদেশের সামনে মাথা নত করুন ৪৪৮
এই প্রতিশ্রুতির নবায়ন ৪৪৮
এই প্রতিজ্ঞার উপর অটল থাকুন ৪৪৮

রবীউল আওয়াল মাসের তাৎপর্য

ভূমিকা ৪৫০
দিনটি ছিল বড় বরকতময় ৪৫১
জন্মবার্ষিকী পালনের কোন ভিত্তি নেই ৪৫১
ইসলাম প্রথামুক্ত একটি ধর্ম ৪৫১
ক্রিসমাসের অলীককাহিনী ৪৫১
ইসলামে ঈদ দু'টি ৪৫২
সাহাবায়ে কেরাম এবং ১২ই রবিউল আওয়াল ৪৫২
তাদের প্রতিটি দিনই ছিল সীরাতে তায়্যেবা ৪৫৩
এটা ইসলামী ত্বরীকা নয় ৪৫৩
১২-ই রবিউল আওয়ালের ১২ তারিখ নিশ্চিত নয় ৪৫৪
সীরাতুন নবী মাহফিল এবং বেয়াদবীমূলক কর্মকাণ্ড ৪৫৪
সীরাতুন নবী মাহফিল উপলক্ষে নামাজ ছেড়ে দেয়া ৪৫৫
সীরাতুন্ নবী মাহফিলে গান ও বাজনা ৪৫৫
সুন্নতে নববীর আদর্শকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করুন ৪৫৫

বিষয় পৃষ্ঠা
কয়টি সুন্নতের উপর আমল শুরু করা হয়েছে? ৪৫৬
হুজুর (সা.) কীভাবে রেনেসাঁর সূচনা করেছেন? ৪৫৬
শত্রুকে তোমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন ৪৫৬
এটা বদ আমলের ফল ৪৫৭
মুক্তির পথ শুধু এটাই ৪৫৭

ভোট কাকে দিব?

ভূমিকা ৪৫৯
নির্বাচনের ব্যাপারে বিভিন্ন খেয়াল ৪৫৯
নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার প্রথম খারাবি ৪৬০
নিজ থেকে দায়িত্ব চায় না ৪৬০
সম্পর্কের কারণে ভোট দেয়া হয় ৪৬০
নির্বাচন হলো পুঁজি বিনিয়োগ ৪৬১
আমাদের কর্মপন্থা ৪৬১
নির্বাচন বয়কট করার ফল ৪৬১
নির্বাচনে অংশ নেয়া উচিৎ ৪৬২
ভোটের শরয়ী অবস্থান ৪৬২
এই প্রেক্ষিতে সাক্ষ্য গোপন করা জায়েয নাই ৪৬৩
এমন ব্যক্তিকে ভোট দেয়া নাযায়েয ৪৬৩
এমন ব্যক্তিকে ভোট দেয়া যায় ৪৬৪
এই প্রেক্ষিতে না দেয়ার অবকাশ আছে ৪৬৪
শরীয়তের বিধান ৪৬৪
ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি বানানো ৪৬৫
আপনি তো তাকে ভোট দিয়েছেন ৪৬৫
এমন লোকদের সঙ্গ দেয়া ৪৬৫

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শ আপন জীবনে বাস্তবায়ন করুন

ভূমিকা ৪৬৭
একটি মিশন নিয়ে হুজুরের দুনিয়ায় আগমন ৪৬৮
নবীজীর আগমনের সময় আরবের পরিস্থিতি ৪৬৯
১৩ বছরে মহান ইনকিলাব ৪৬৯
জাহেলী যুগের একটা যুদ্ধ ৪৭০
হযরত আলী (রা) এর এক ঘটনা ৪৭০

বিষয় পৃষ্ঠা

সাহাবায়ে কেরামের উচ্চ মর্যাদা ৪৭০
আজও সীরাত বিদ্যমান ৪৭১
জাগরণ না হওয়ার কারণ ৪৭১
২৪ ঘণ্টা থেকে কিছু সময় বের করুন ৪৭১
রাসূল আকরাম (সা.)-এর আদর্শ অধ্যয়ন করুন ৪৭২
একটি সুন্নত যিন্দা করার সাওয়াব ৪৭৩

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলি

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিনটি বৈশিষ্ট্য ৪৭৪
হুযুর ছিলেন সকল সৌন্দর্যের আধার ৪৭৪
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সৌন্দর্য
এবং হযরত ইউসুফ (আ) এর সৌন্দর্য ৪৭৫
সবচেয়ে বেশি দানশীল ৪৭৫
হুযুরের বীরত্বের ঘটনা ৪৭৬
তিনি ছিলেন আশ্রয়স্থল ৪৭৬
হুযুরের বাহাদুরির দ্বিতীয় ঘটনা ৪৭৬
মুমিনের আকীদা বিশ্বাস ৪৭৭
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া উচিত ৪৭৮
মুমিনের সাহসের ঘটনা ৪৭৮
ইহুদিদের হিংসা ৪৭৯
ইহুদিদের হিংসার দ্বিতীয় কারণ ৪৮০
নম্র আচরণের প্রতি হুযুরের উপদেশ ৪৮১
আমাদের জন্য শিক্ষা ৪৮২
ফেরআউনের সাথে নম্রতার নির্দেশ ৪৮২
ফেরআউন থেকে বড় গোমরাহ কেউ নেই ৪৮৩
হযরত হুদ (আ) এর উত্তর প্রদানে নম্রতা ৪৮৩
আল্লাহ পাক হুযুর (সা.)-কে কোমল বানিয়েছেন ৪৮৪
এক বুযুর্গের কোমলতার ঘটনা ৪৮৪

সৃষ্টির প্রতি দয়া করো

হযরত আনাস (রা) এর বৈশিষ্ট্য ৪৮৬
দশ বছরে একবারও ধমকাননি ৪৮৬
তাঁর জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোআ ৪৮৭

বিষয় পৃষ্ঠা
হুযুর (সা.)-এর ঘরওয়ালাদের প্রতি স্নেহ ৪৮৭
ছেলের সাথে সাক্ষাতের জন্য গমন ৪৮৭
পুরো উম্মতের বোঝা নিয়ে সন্তানের সাক্ষাৎ ৪৮৮
বাচ্চাদের উপর দয়া করা দ্বীনের তাকাযা ৪৮৮
সুন্নতের অনুসরণের নিয়ত করুন ৪৮৯
বুযুর্গদের দৃষ্টি জীবন বদলে দেয় ৪৯০
এটা কোন বাড়াবাড়ি নয়, বাস্তবতা ৪৯০
প্রাণীদের ওপর রহম করো ৪৯১
কঠিন পিপাসার মুহূর্ত ৪৯১
তৃষ্ণার্ত কুকুর ৪৯১
একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নাম ৪৯২
এখলাসের সাথে অল্প আমলই নাজাতের জন্য যথেষ্ট ৪৯২
আল্লাহর বিধান এবং রহমত দুই জিনিস ৪৯৩
গালির কারণে ভাতা প্রদান ৪৯৪
আপনি গালি দিলে জেলে যাবেন ৪৯৪
ছোট গুনাহের কারণে পাকড়াও ৪৯৫
ছগীরা গুনাহ এবং কবীরা গুনাহর ধোঁকা ৪৯৫
জবেহ করার সময় প্রাণীর প্রতি লক্ষ রাখা ৪৯৬
পশু-পাখি পালনের হুকুম ৪৯৬
পাখির ডিমের ঘটনা ৪৯৭

কোরআনুল কারীম হেফাজতের দায়িত্ব

হুযুর আকরাম (সা.)-এর নবুয়াত কেয়ামত পর্যন্ত ৪৯৯
বাইবেলের বর্তমান অবস্থা ৪৯৯
ইঞ্জিল বিশুদ্ধ ও ভুল হওয়ার অদ্ভুত মীমাংসা ৪৯৯
শব্দ এবং মর্ম উভয়টাই সংরক্ষিত ৫০০
হুযুর (সা) এর প্রতিটি হাদীস সংরক্ষিত আছে ৫০০
আলফাজ এবং মা'আনি হেফাজতের পন্থা ৫০১
ওলামা ও তালাবাদের মাধ্যমে দায়িত্ব পূর্ণকরণ ৫০১
দ্বীনি মাদ্রাসা বন্ধ করতে পারবে না ৫০১
আল্লাহর নূর নিভাতে পারবে না ৫০২
সাধারণ মুসলমানকে পায়গাম ৫০২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আরোগ্যদানকারী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَآ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ○صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ ○ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! সূরা ফাতিহার চতুর্থ আয়াতের বর্ণনা গত কয়েক সপ্তাহ ধরে চলছে। যেখানে আলাহ্ তা'আলা স্বীয় গুণ বর্ণনার পর এই শিক্ষা দিচ্ছেন যে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (আর আমরা আপনারই ইবাদত করি ও আপনারই সাহায্য চাই)। আমি বলেছিলাম, এই আয়াতটি ছোট হলেও এর মধ্যে কায়েনাতের সব বিষয় লুকায়িত আছে। এর দু'টি দিক নিয়ে এর আগে আমি আলোচনা করেছি।

এই আয়াতের তৃতীয় দিক হলো, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা শিক্ষা দিচ্ছেন যে, ইবাদতের যোগ্য তিনি ছাড়া অন্য কেউ নন। আর لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه এর অর্থ এটাই। যখন আমরা পড়েছি اَشْهَدُ اَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه তখন এর অর্থ হলো, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আমরা উপাস্য মানবো না। এ সংক্রান্ত যত কাজ

আছে সব কিছু আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য নয়। যেমন– সেজদা। এই সেজদা এক ইবাদত, যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে করা যাবে না। নামায আল্লাহ্রই জন্য, সেজদাও তাই আল্লাহ্র জন্যই হবে। আল্লাহ্ এ জন্য এই আয়াতের মাধ্যমে সতর্ক করছেন যে, কোনও ব্যক্তি বা কোন সত্তা যতই সম্মানিত ও মহান হোক না কেন তাকে ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা যাবে না। ইবাদত শুধু আল্লাহ্রই জন্য।

এটা শিরকের অন্তর্ভুক্ত

আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে, কবরে সেজদা করা। এটা এ জন্য যে সেখানে একজন বড় আল্লাহ্র ওয়ালি শুয়ে আছেন। এ কাজ إِيَّاكَ نَعْبُدُ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও সেজদা করা এই আয়াতে কারিমা অনুযায়ী সম্পূর্ণ শেরক। যত বড় সম্মানিত ব্যক্তি হোক তার সম্মান, তা'যীম-তাকরীম তার জায়গায়। হ্যাঁ মানুষকে সম্মান করা চাই। কিন্তুআল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করা যাবে না। এই আয়াতে এই বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

সাহায্যও আল্লাহ্র কাছেই চাইতে হবে

এই আয়াতের দ্বিতীয় নির্দেশ হলো, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আর আমরা সাহায্যও আপনার (আল্লাহ্) কাছে চাই। তাই শুধু ইবাদতই নয় সাহায্যও আল্লাহ্র কাছে চাইতে হবে সব ক্ষেত্রে। দেখা যায় কেউ অসুস্থ হলে চিকিৎসকের কাছে যান এই কথা বলতে যে, বল কী ওষুধ খাব। কেউ বাড়ি করবেন তো ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যান তার সাহায্য নিতে। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই কথাই বোঝাতে চাচ্ছেন যে, যে সব উপকরণ আমরা অন্যের কাছ থেকে যেমন- ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ, ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে বাড়ি তৈরির নকশা গ্রহণ করছি তাতে কোনও গুনাহ নেই।

আরোগ্য দানকারীও আল্লাহ্

অসুস্থ হয়েছেন তো চিকিৎসকের কাছে গেলেন। তিনি ওষুধ দিয়েছেন, আপনি শুধু সেবন করেছেন। এটা আপনার জন্য যায়েজ। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এটাই নিয়ম করেছেন। কিন্তু এর পাশাপাশি এটা মনে রাখতে হবে যে, আরোগ্যদানকারী সত্তা নয় ডাক্তার। আরোগ্যদানকারী সত্তা একজনই। একই ওষুধ, একই রোগ। এক জনের আরোগ্য লাভ হয়, আরেক জনের হয় না।

একই ওষুধ এক জনের জন্য নিরাময়কারী, অন্য জনের জন্য নয়। কেন হয় না? এ জন্য যে, ওষুধ একটি মাধ্যম মাত্র। কিন্তু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার ক্ষমতা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও পক্ষে সম্ভব না।

ওষুধ আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করে

আমার একজন বুযুর্গ বন্ধু ছিলেন। তার গোটা জীবন কেটেছে চিকিৎসা সেবায়। তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। বিভিন্ন হাসপাতালেও চাকরি করতেন। নিজস্ব চেম্বারেও ভিড় লেগেই থাকতো। তিনি আমাকে বলেন, তার গোটা জীবনের অভিজ্ঞতা হলো যে, একই রোগ, একই সমস্যা। ওষুধও একই। এক জনের আরোগ্য লাভ হয় তো আরেক জনের কোনও কাজে আসে না। উল্টো এমন হয়েছে যে, ছয়মাস আগে এক রোগী এসেছিলেন। তাকে ওষুধ দিলাম, সুস্থ হয়ে গেলেন। কিন্তু ছয় মাস পর যখন একই রোগ নিয়ে এলেন আগের ওষুধই দিলাম। কিন্তু এবারের ওষুধে কোনও কাজ হলো না।

আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর মাধ্যমে এ কথাই বলছেন যে, দুনিয়াতে তোমরা বাহ্যত যার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো, এটা বুঝে নাও যে, প্রকৃত সাহায্যকারী আমি-ই। আমার সাহায্যেই তোমাদের কাজ সম্পন্ন হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ইচ্ছা হবে না, হুকুম হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ওষুধ কিংবা চিকিৎসক কিছুই করতে পারবে না।

সুতরাং وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর একটা দিক হলো এই যে, কোনও কাজ করতে বের হচ্ছেন, কিংবা কারও সাহায্য দরকার খেয়াল রাখবেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু ছাড়া আর কারও পক্ষ থেকে আসে না।

ক্রেতা-গ্রাহক কে পাঠাচ্ছেন

আপনি দোকান দিয়েছেন, অনেক মাল উঠিয়েছেন। অনেক আশায় দোকানে গিয়ে বসেছেন। ক্রেতা নেই। কিন্তু ক্রেতা পাঠাবেন কে? আপনার কোনও ক্ষমতা নেই ক্রেতাকে জোর করে দোকানে নিয়ে আসার। ক্রেতা-গ্রাহক প্রেরণকারী তো অন্য কেউ। তিনি তার ইচ্ছা ও ক্ষমতার মাধ্যমে ক্রেতার মনে আপনার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করলে তবেই দোকানে ক্রেতা পাবেন। তাঁর (আল্লাহ্) ইচ্ছা, মর্জি ও হুকুম হলেই খরিদ্দার আপনার দোকানে মাল কিনতে যাবেন। তাঁর ইচ্ছা ও হুকুম না হলে, দোকান খুলে বসে থাকলেও কেউ উঁকি মারবে না।

সব কাজে আল্লাহ্‌র সাহায্য চান

সব কাজেই আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চান। তাকে বলুন, আয় আল্লাহ্! আমার যতটুকু চেষ্টা করার করেছি। কিন্তু কোনও চেষ্টাই কাজে আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার হুকুম না হবে। আপনার কাছে সাহায্য চাই। আপনি সহায়তা করুন।

ইনশাআল্লাহ্ বলার অভ্যাস করুন

কাজ শেষ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলুন ইনশাআল্লাহ্। কোরআন আমাদের শিক্ষা দিয়েছে–

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ○ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ○ (سورة الكهف ٢٣-٢٤)

অর্থাৎ, কখনো এটা বলবেন না যে, কাল এই কাজ করবো। বলুন, যদি আল্লাহ্ চান তো এটা করবো। অর্থাৎ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ। এটা এজন্য বলবেন যে, আমি তো আমার পক্ষ থেকে সব ধরনের চেষ্টা করেছি। আগামীকাল এ কাজ শেষ হতেও পারে নাও পারে। যেহেতু এটা আপনার নিয়ন্ত্রণে নেই। সেজন্য ইনশাআল্লাহ বলুন। অর্থাৎ, যদি আল্লাহ্ চান তাহলে এ কাজ হবে। অনেক ডাক্তার ওষুধ দিয়ে বলেন এতেই ঠিক হয়ে যাবেন। ইনশাআল্লাহ্ বলেন না। এটা খারাপ কথা। বরং তার বলা উচিত ইনশাল্লাহ, এ ওষুধ খেলে ভালো হয়ে যাবেন। এই ওষুধে আছে লতা-পাতা, নানা কেমিক্যালের ক্ষমতা। কিন্তু এই ক্ষমতা কে সৃষ্টি করেছে? আল্লাহ্। সব জিনিসের প্রতিক্রিয়া তিনিই তৈরি করেন। তিনিই যখন চান বাধা দেন।

আগুনকে পুষ্পোদ্যান বানিয়েছেন

আল্লাহ্ চান তো আগুনকে বাগান বানিয়ে দেন। তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর জন্য আগুনকে হুকুম দিয়েছিলেন।

قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلَامًا ○ (سورة الأنبياء ٦٩)

অর্থাৎ 'হে আগুন, তুমি ইব্রাহীমের জন্য ঠাণ্ডা ও নিরাপদ হয়ে যাও'। আগুনকে আল্লাহ্ তা'আলা নিরাপত্তার মাধ্যম বানিয়ে দিলেন। আগুন বাগানে পরিণত হয়ে গেল। এ থেকে প্রমাণ হলো, তিনি চাইলে বাগানকে আগুন বানিয়ে দিতে পারেন। তাই সব কাজে ভরসা করুন আল্লাহ্‌র উপর। ব্যবসার জন্য বের হয়েছেন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। বলুন আয় আল্লাহ্! আমার পক্ষ থেকে যা কিছু করার ছিল করেছি। শেষ করার ক্ষমতা আপনারই।

সব কাজে বলুন, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আয় আল্লাহ্! আমরা আপনারাই ইবাদত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য চাই। সুতরাং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে প্রকৃত কর্মসম্পাদক মনে করবেন না। এটা মনে রাখবেন যে, তাঁর ইচ্ছার বাইরে কোনও কাজ হয় না। আর সূরা ফাতেহার এই আয়াতের মাধ্যমে এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ আমাদের এ শিক্ষা অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করুন। আমিন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সেজদা অন্য কারো জন্য জায়েয নাই

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ إِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَآ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ ○ آمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ للّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

ভূমিকা

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! এর আগে সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যা চলছিল এবং সূরা ফাতিহার চতুর্থ আয়াতের উপর কিছু আলোচনা হয়েছিল। আজকে এই আলোচনার পরিসমাপ্তি করবো ইনশা'আল্লাহ।

মনে করিয়ে দিতে প্রথম চার আয়াতের তরজমা করছি। "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। তিনি সবার উপর দয়ালু এবং অত্যন্ত দয়াময়। যিনি শাস্তি ও প্রতিদান দিবসের মালিক। এটা তো ছিল আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর গুণের বর্ণনা। এরপর আমাকে আপনাকে এই কথার শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুকে বলবো, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ,

আয় আল্লাহ্ আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য চাই। এই চতুর্থ আয়াত যার উপর ধারাবাহিকভাবে এর আগের তিন জুমায় বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে আলোচনা করেছি। এর সমাপ্তি আজ।

একত্ববাদে বিশ্বাস

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এর মধ্যে দুটি বাক্য। প্রথম বাক্য হলো إِيَّاكَ نَعْبُدُ 'আয় আল্লাহ্ আমরা আপনারই ইবাদত করি'। আর দ্বিতীয় বাক্য হলো, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 'এবং আপনারই কাছে সাহায্য চাই'। যখনই পড়লেন إِيَّاكَ نَعْبُدُ তাওহীদের আবশ্যকীয় দাবি হলো যখন আপনি এই কালেমা পড়েছেন أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ অর্থাৎ জগতে আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তো এরপর ইবাদত শুধু আল্লাহ্রই হবে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নয়। অন্যথায় সেটা শিরক। এছাড়া ওই সব কাজ যার মধ্যে ইবাদতের কোন দিক আছে, অথবা ইবাদতের কোন পন্থা থাকে, অথবা ইবাদতের সদৃশ কোন কাজ থাকে, তাও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য জায়েয নাই।

সেজদা অন্য কারো জন্য জায়েয নেই

সেজদা ইবাদতের একটা পদ্ধতি। তো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য সেজদাকরা জায়েয নাই। চাই তিনি যতবড় পয়গাম্বরই হোন না। এবং যতবড় ওলী বা বুযুর্গ হোন না কেন। তার সামনে সেজদা হতে পারে না। সেজদা তো শুধু আল্লাহ্রই জন্য। কপাল ঝুঁকবে শুধু আল্লাহ্র সামনে। তিনি ছাড়া অন্য কারো সামনে নয়।

সম্মানের জন্য কাউকে সেজদার অনুমতি নেই

একটা সময় সেজদা শুধু ইবাদতের নিদর্শন ছিল না। বরং কখনো সম্মানের জন্যও করা হত। যেমন আপনি শুনেছেন যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন তখন ফেরেশতাদের আদেশ করেছিলেন তাঁকে সেজদা করার। এই সেজদা ছিল সম্মানের। যা কোন কোন উম্মতের জন্য বৈধ ছিল, কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদীর উদ্দেশ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, সম্মানের জন্য কাউকে সেজদা করা জায়েয নেই। সে যত বড় বুযুর্গই হোক না কেন, বা আল্লাহ্র যত প্রিয় বান্দাই হোক না কেন।

কবরের উপর সেজদা করা শিরক

কবর সেজদাকরা إِيَّاكَ نَعْبُدُ আয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কাউকে সেজদা করার মত শিরকি কাজ থেকে আল্লাহ্ আমাদের হেফাজত করুন। আমাদের এখানে অনেক ওলী আল্লাহ্র মাজার আছে। ওখানে গিয়ে মানুষ সেজদা করে। একবার আমি এই ধরনের এক মাজারে ছিলাম। দেখলাম এক লোক সেখানে সেজদা করছে। এটা দেখে আমার মাঝে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায়। একজন মুসলমান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সামনে সেজদা করছে। তখন আমি তাকে বললাম, আপনি মাজারে সেজদা করছেন। অথচ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সামনে সেজদা করা শিরক। তখন সে বলল, আমি তো তার মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে পৌছতে চাচ্ছি।

এটা ছিল মুশরিকদের বিশ্বাস

মক্কার মুশরেকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনে কারীমে উল্লেখ করেছেন যে, যখন তারা মূর্তির সামনে সেজদা করত, তখন যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হত, এমন কেন করছ? তখন তারা বলত–

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ○ (سورة الزمر ٣)

"আমরা তাদের উপাসনা করছি এজন্য যে, যাতে তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকট সান্নিধ্য এনে দেয়"। এ কথাই আজ অনেক মুসলমান বলছেন। আল্লাহ্ সব মুসলমানকে হেফাজত করুন। আমীন।

এই কপাল আল্লাহ্ তা'আলা শুধু তার জন্য বানিয়েছেন। এটা অন্য কারো সামনে নত হতে পারে না। এটা একমাত্র আল্লাহ্র সামনেই নত হতে পারে। অন্য কারো সামনে নয়।

তাওয়াফ

তাওয়াফ, আল্লাহ্র ঘর ছাড়া অন্য কোন জায়গা তাওয়াফ করা জায়েয নেই। এমন কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজাপাকের তাওয়াফ ও জায়েয নেই। আল্লাহ্র ঘরের তাওয়াফের হুকুম আল্লাহ্ই দিয়েছেন। কোনও কবর, কোনও মাজার, এবং কোনও বস্তুর তাওয়াফ জায়েয নাই। কারণ তাওয়াফ হলো আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত। তাই আল্লাহ্ ব্যতীত গাইরুল্লাহর ইবাদত জায়েয নেই।

কারো সামনে ঝুঁকা জায়েয নেই

কিছু কিছু ব্যাপারে শরীয়তে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন কোনও মানুষকে সম্মান করতে অথবা তার হাতে চুমু খাওয়ার উদ্দেশ্যে রুকুর কাছাকাছি হয়ে যায় এতটা ঝোঁকাও জায়েয নেই। এ কারণে যে, এ ঝোঁকার সঙ্গে গাইরুল্লাহর ইবাদতের সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং এত ঝুঁকবেন না যে, গাইরুল্লাহর সামনে রুকু করার মত হয়ে যায়।

অন্যের সামনে হাত বেঁধে দাঁড়ানো

রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন কেউ বসে আছে, আর তার সামনে লোকজন হাত বেধে দাঁড়িয়ে এমন করা যাবে না, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটা করতে নিষেধ করেছেন। এটা কায়সার, কিসরা ও অন্যান্য রাজা-বাদশাদের প্রথা ছিল। যখন তারা সিংহাসনে বসত তখন লোকজন তাদের সারিবদ্ধ হয়ে হাত বেধে দাঁড়িয়ে থাকতো। এভাবে হাত বেধে দাঁড়ানো এটা ইবাদতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ সব কাজ থেকে বারণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা চাই। তবে আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের সম্মান করা, যেমন ওলীআল্লাহ, বুযুর্গ, তাদের সম্মান করা ভাল কাজ। কিন্তু সম্মান করা যেন সীমা ছাড়িয়ে ইবাদতের পর্যায়ে না পৌঁছে যায়। এ ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ আয় আল্লাহ্! আমরা আপনারই ইবাদত করি। অন্য কারো নয়।

হাজারো সেজদার দ্বারা মানুষকে দেয়া হয় জান্নাত

অনেকের কাছেই নামাজ পড়া সেজদা করা কষ্টসাধ্য মনে হয়। এ ব্যাপারে কবি আল্লামা ইকবাল বলেন,

وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

(আল্লাহর উদ্দেশ্যে) একটি সেজদা যাকে তুমি ভারী মনে করছ
অথচ তা হাজারো (গাইরুল্লাহর) সেজদা থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়

যখন আল্লাহ্‌র সামনে সেজদায় অভ্যস্ত হয়েছেন তখন অন্য কাউকে সেজদা করার প্রয়োজন নেই। আর যে আল্লাহ্‌র সামনে কপাল ঠেকায় না। আল্লাহ্‌র সামনে সেজদা করে না, তার জানার কথা নয় কোথায় কোথায় সেজদা করতে হয়। তার জানা নেই কার কার সামনে হাত বাড়াতে হয়। কার কার সামনে নিজেকে সঁপে দিতে হয়।

আমরা তো সকাল সন্ধ্যা অন্যের কাছে চাই

ওই আয়াতের দ্বিতীয় বাক্য হলো– وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ 'আয় আল্লাহ্! আমরা আপনারই কাছে সাহায্য চাই'। অর্থাৎ আপনি ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাই না। এখানে একটি প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, আমরা বিভিন্ন কাজে অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করি ।যেমন অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তারের কাছে সাহায্য চাই, ভাই আমার চিকিৎসা করো, বেকার বসে আছি, আমায় একটা কাজ দাও, একটা জিনিস কিনতে হবে আমাকে সাহায্য করো, পথ হারিয়ে ফেলেছি, ভাই আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দাও। এমন অসংখ্য প্রয়োজনে আমরা অন্যের সাহায্যপ্রার্থী হই। তো এটা কেমন কথা, আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে আল্লাহ্র সামনে দাঁড়িয়ে বলি وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ "আমরা আপনারই কাছে সাহায্য চাই"। অথচ আমরা সাহায্য চাচ্ছি অন্যের কাছে? মূলতঃ বাস্তবিক সাহায্য তাঁর কাছেই চাওয়া হয়, যার রয়েছে সাহায্য করার ক্ষমতা। আর এখানে এই সাহায্যই উদ্দেশ্য। আমরা দুনিয়াতে যে সাহায্য প্রার্থনা করি, উদাহরণস্বরূপ কেউ অসুস্থ হয়েছে, ডাক্তারের কাছে চলে গিয়েছে। এটা মূলত একটা মাধ্যম গ্রহণ করা। স্বয়ং আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা এই ধরনের সাহায্য নেয়ার হুকুম দিয়েছেন। অসুস্থ হয়েছেন চিকিৎসা করুন। কিন্তু এই বিশ্বাস প্রতিটি মুহূর্তে থাকা চাই যে, ডাক্তারের কাছে এই জন্য যাচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন চিকিৎসা নিতে। তবে রোগ ভাল করা ডাক্তারের কাজ নয়। আরোগ্য দান করার শক্তি ও ক্ষমতা তার নেই। আমরা ডাক্তারের কাছে গিয়ে সাহায্য চাই এই জন্য যে, আল্লাহ্ তাকে উসিলা বানিয়েছেন।

রোগমুক্তি কি ডাক্তারের ক্ষমতায়?

প্রশ্ন জাগে, ডাক্তারের কাছে ওই ক্ষমতা কোত্থেকে আসে যে,তিনি আপনাকে সুস্থ করবে? ডাক্তারের ওই জ্ঞান কোত্থেকে অর্জিত হলো যার মাধ্যমে তিনি আপনার রোগ ধরতে পারবেন? রোগীর কী চিকিৎসা দরকার বুঝতে পারেন?

তার ওই জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞান দান না করলে তার ক্ষমতা নেই যে সে আপনার রোগ ধরতে ও চিকিৎসা করতে পারবে। আর যে ওষুধ ডাক্তার প্রেসক্রিপশনে লেখেন, এবং তা খেলে আপনার ভাল লাগে, ওষুধের মধ্যে ভাল লাগার প্রতিক্রিয়া কে সৃষ্টি করেছেন? সব প্রভাব, প্রতিপত্তি, শক্তি ও ক্ষমতা আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুর। আমরা ডাক্তারের কাছে যাবো, ওষুধ খাবো, তবে যাহায্য চাইবো আল্লাহ্র কাছে। আয় আল্লাহ্! আপনি এর মধ্যে প্রতিক্রিয়া (কার্যকারিতা) দান করুন।

সাহায্য আল্লাহ্‌র কাছেই চান

যাই হোক, যে উপকরণই আমরা অন্যের কাছ থেকে নেই না কেন, প্রকৃত সাহায্য আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাওয়া যাবে না। এর মাধ্যমে এই সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলা হচ্ছে যে, আপনারা ধৈর্য ধরুণ ও একই সঙ্গে মনে রাখুন যে, আপনার ওই ধৈর্য ধরা কোন কাজে আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেন। এজন্য সাহায্য তাঁরই কাছে প্রার্থনা করুন। আয় আল্লাহ্! আপনি আপন অনুগ্রহে এর মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করে দেন। আয় আল্লাহ্! জীবিকার খোঁজে বের হচ্ছি, আয় আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে উপকারী রিযিক দান করুন। আয় আল্লাহ্! ব্যবসার জন্য দোকান খুলে বসেছি। কিন্তু গ্রাহক পাঠানো, এবং লাভ-দান করা আপনার ক্ষমতায়। এজন্য আপনিই দান করুন।

প্রকৃত কার্যক্ষমতা আল্লাহ্‌র

বাহ্যত দুনিয়াতে আমরা যত সাহায্য প্রার্থনা করি, এটা আসবাব মাত্র। কিন্তু হাকীকী সাহায্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা যাবে না। কখনো এই বিশ্বাস না রাখা যে, এই ঔষধের ক্ষমতা আছে। এই আসবাবে কার্যকারিতা রয়েছে। কার্যক্ষমতা আল্লাহ্ প্রদত্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা এই কার্যক্ষমতা দান না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রভাব বিস্তার করবে না। জাহেলী যুগে মানুষের এই বিশ্বাস ছিল যে, অমুক বস্তুর এই ক্ষমতা রয়েছে। যেমন : অমুক তারার উদয় হলে বৃষ্টি হবে। আর বৃষ্টি নামা এই তারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই তারাই বৃষ্টি বর্ষণ করে।

আল্লাহ্ তা'আলাই বৃষ্টি দান করেন

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধের সময় একবার ফজরের নামাজের পর দেখলেন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। নামাজের পর সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, আজকের বৃষ্টির কারণে মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল বলবে, অমুক তারার দ্বারা আমাদেরকে বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছে। আরেক দল বলবে, আল্লাহ্ তা'আলা আপন অনুগ্রহে আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেছেন। বৃষ্টির মাধ্যমে উভয় দলই আলাদা ফায়দা হাসিল করছে। প্রথম দল ঐ বৃষ্টির কারণে কুফুরি এবং শিরকে লিপ্ত হয়েছে। কেননা তারা বলছে বৃষ্টি আমাদেরকে অমুক তারকা দান করছে। আর দ্বিতীয় দল আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত এবং রহমতের উপর ঈমান আনছে এবং এই বৃষ্টির কারণে তাদের আমল নামায় নেকী যুক্ত হচ্ছে। যাই হোক, যে কোন সমস্যায় আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে বল, আয় আল্লাহ্ আপনি দান করুন। যাহেরী সাবাব অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। তবে দেনে ওয়ালা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ নেই।

বাহ্যিক আসবাব শুধু জীবিতদের কাছ থেকে

এই বিষয়টি লক্ষণীয় যে,বাহ্যিক যত আসবাব আছে এগুলো শুধু জীবিতদের থেকে নেয়া যায়। অসুস্থ হয়েছেন, ডাক্তারের কাছে গেলেন। তার থেকে সাহায্য নিলেন এবং সাবাব ইখতিয়ার করলেন। কিন্তু যিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। যেমন ধরেন, কোন ডাক্তার মারা গেলেন। তিনি বড় দক্ষ ও বিচক্ষণ ছিলেন এবং তার থেকে হাজারো মানুষ উপকৃত হয়েছে। এখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর আপনি তার কাছে সাহায্য চান। এটা হতে পারে না। তিনি তো মারা গিয়েছেন। যখন দুনিয়াতে ছিলেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সাহায্যের মাধ্যম বানিয়েছেন। এবং তার কাছ থেকে আপনি এই অর্থে সাহায্য চাচ্ছিলেন যে সে একটা যাহেরী সাবাব। যদিও ফলাফল আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। কিন্তু দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেয়ার পর, দুনিয়া ত্যাগ করার পর, পৃথিবীতে তার বড় ধরনের কোন ভূমিকা অবশিষ্ট থাকে না। এজন্য তার কাছে সাহায্যও চাওয়া যায় না।

কবরবাসীর সাহায্য চাওয়া

একই কথা আল্লাহ্র নেক বান্দা, ওয়ালী আল্লাহ্ এবং বুযুর্গদের ক্ষেত্রে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা জীবিত আছেন আপনি তাদের কাছে গিয়ে দু'আ নিতে পারবেন, যে আমার জন্য দু'আ করবেন যেন আল্লাহ্ আমাকে অমুক রোগ থেকে মুক্তি দান করেন, আমার ঋণ পরিশোধ করেন। যদি তিনি জীবিত থাকেন দু'আর আবেদন ঠিক আছে। কিন্তু যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন, তখন আপনি তার মাজারে গিয়ে বললেন, আমাকে সন্তান দান করেন। আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করেন। আমাকে রোগ মুক্ত করেন। দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর এসব ইচ্ছা করা অসম্ভব। এজন্য যে সব লোকেরা মাজারে গিয়ে কবরওয়ালার কাছে সাহায্য চান এই বলে, হে দাতা! আমাকে সন্তান দান করেন, কামাই রোজগার দান করেন। এগুলো সব শিরকেরই শামিল। এবং إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর পরিপন্থী কাজ। তাই বুযুর্গানে দ্বীন যতদিন জীবিত থাকেন তাদের মাধ্যমে দু'আ করিয়ে নেন। এবং তাদের পথ নির্দেশনা লাভ করুন। তাদের ইন্তেকালের পর তাদের ডাকা, যেমন হে আব্দুল কাদের জিলানী আমাকে আরোগ্য দান করেন, সন্তান দেন, কামাইয়ের ব্যবস্থা করেন। এটা হতে পারে না। যতক্ষণ তিনি জীবিত ছিলেন ততক্ষণ তার খেদমতে গিয়ে দু'আ করিয়ে নিতে পারতেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বড় প্রিয় বান্দা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বড় মুসতাজাবুদ্ দাওয়াত (যার দু'আ কবুল হয়) বানিয়ে

ছিলেন। তার কাছে দু'আ করার আবেদন করতে পারতেন। কিন্তু যখন তিনি দুনিয়া থেকে চলে গেলেন, তখন যাহেরী সাবাবের ভিত্তিতে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা একত্ববাদের বিশ্বাসের খেলাফ।

প্রার্থনা শুধু আল্লাহ্‌র কাছে

প্রার্থনা করতে হবে তো আল্লাহ্‌র কাছে করেন যে, 'আপনি আমার প্রতি রহম করেন'। আরে ভাই! যখন আল্লাহ্ তা'আলা রহমতের দরজা খুলে রেখেছেন, এবং বলেছেন যে, 'আমার বান্দা যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে তখন বলে দাও আমি তার সন্নিকটে'।' আর যখন প্রার্থনাকারী আমার কাছে প্রার্থনা করে আমাকে ডাকে তখন আমি তার ডাকে সাড়া দেই'। এবং তার প্রার্থনা কবুল করি। যখন এত ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন তখন অন্যের কাছে চাওয়ার কী প্রয়োজন? আল্লাহ্‌র কাছেই চান, তাঁর কাছে মুনাজাত করেন। তিনি ছাড়া কেউ নেই যে দিতে পারে।

আর এটাই হলো إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর অর্থ যে, আয় আল্লাহ্! 'আমরা আপনার ইবাদতকরি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি'। আল্লাহ্ তা'আলা তার ফযলে করমে আমাদেরকে এই আয়াতের দাবির উপর আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্বাত্মক চেষ্টা করো

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَآ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ ○ آمَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

সূচনা,

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! বিগত জুমাগুলোয় সূরা ফাতিহার বয়ান চলছিল। সূরা ফাতিহার আয়াত সাতটি। এর আগে প্রথম চার আয়াতের আলোচনা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাই কে সে সব আলোচনার উপর আমল করার তাওফিক দান করুন। পাঁচ নাম্বার হলো, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ আজ এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। এর আগের আয়াত ছিল إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আপনাকে এই কথা বলা শিখিয়েছেন যে, আয় আল্লাহ্! 'আমরা আপনারই ইবাদত করি, এবং আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি'। প্রশ্ন হলো আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কী সাহায্য চাবো। পরের আয়াতে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে যে, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এই

দু'আ করতে ,"আয় আল্লাহ্! আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দান করুন। এই ছোট একটি বাক্য যাতে তিনটি মাত্র শব্দ রয়েছে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ।

এই দু'আ এত ব্যাপক অর্থবোধক যে, যদি আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা কবুল করে নেন তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আয় আল্লাহ্ সিরাতে মুসতাকীম দান করুন। অর্থাৎ সঠিক পথ।

সোজা পথ কী?

সোজা পথ হলো ঐ পথ যাতে কোন প্যাঁচ নেই, অলিগলি নেই। বাঁক নেই। পথচারী সোজা মানযিলে পৌছে যাবে। তাকে বলে সিরাতে মুসতাকীম, সোজা পথ। কোন বাঁক নেই। কোন অলিগলি নেই। সোজা চলতে চলতে মানজিলে পৌছে দেয়। সিরাতে মুস্তাকীম আমাদের সবক্ষেত্রে প্রয়োজন। দুনিয়া ও আখেরাতের এমন কোন কাজ নাই যেখানে মানুষের সিরাতে মুসতাকীম প্রয়োজন নেই। আখেরাতের জন্য এমন পথ চাই যা আমাদেরকে সোজা জান্নাতে পৌছে দিবে। কেননা আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর সন্তুষ্টি হলো আখেরাতের উদ্দেশ্য। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির প্রকাশ স্থল হল জান্নাত। এমন সোজা পথ যা মানুষকে জান্নাত পর্যন্ত পৌছে দেবে। দুনিয়ার প্রত্যেক কাজে মানুষের সোজা রাস্তা অর্থাৎ সঠিক পথও পদ্ধতির প্রয়োজন। কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য আপনি ঘর থেকে বের হয়েছেন, আপনার এমন একটি সোজা পথ চাই যা আপনাকে সরাসরি কর্মস্থলে পৌছে দিবে। আপনি চাকরি, ব্যবসা, কিংবা কৃষিকাজে যাচ্ছেন। অথবা উপার্জনের কোন অবলম্বন খুঁজে পেয়েছেন। আপনার প্রয়োজন এমন একটি পথ ধরা যা আপনাকে সোজা গন্তব্যে পৌছে দেবে।

দুনিয়ার প্রতিটি কাজে সঠিক পন্থা অবলম্বন করা প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন। সঠিক নিয়মে খাওয়া দাওয়া করা, লেনদেন করা,ওপরিবারের সঙ্গে ওঠাবসা করার ক্ষেত্রে সহজ উপায় গ্রহণ করা। মোট কথা এমন কোন কাজ নেই সরল পথ যেখানে উদ্দেশ্য নয়। যদি প্রতিটি কাজ সিরাতে মুসতাকীমের সঙ্গে করা যায় তাহলে দুনিয়ার ও আখেরাতের সব কাজ সহজ হয়ে যাবে।

সিরাত (পথ) এই শব্দ গ্রহণ করার কারণ

কোরআনুল কারীমে সিরাত শব্দটির ব্যবহার একটা চিন্তার বিষয়। কোরআনে বলা হয়েছে "আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন"। কিন্তু একথা বলা হয়নি ওই পথ কোথায় নিয়ে যাবে? গন্তব্য কোথায়? পথও মূলত একটি মাধ্যম। আসল উদ্দেশ্য হলো পথ চলে কোনও গন্তব্যে পৌছা, কোরআন এটা বলেনি,

কোথাকার রাস্তা? জান্নাতের রাস্তা, দুনিয়ার কোন অবস্থার রাস্তা, আরাম আয়েশের রাস্তা? নির্দিষ্ট করে কোন কিছুর উল্লেখ নাই। মুফাস্‌সীরিনে কেরাম বলেন যে, এই দু'আর উদ্দেশ্য হলো, আয় আল্লাহ্ সব ক্ষেত্রে সব কাজে চাই তা দুনিয়াবী হোক বা আখেরাতের, আমাদের সরল পথ দান করুন। সরল পথ বাতলে দিন। এই দু'আয় দুনিয়া ও আখেরাতের সব উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। এজন্যই বলা হয়েছে যে, কোরআনে কারীমের সারমর্ম সূরা ফাতিহা।

অন্যদিকে গোটা কোরআন হলো সীরাতে মুসতাকীমের ব্যাখ্যা। এই সীরাতে মুসতাকীম কী? সরল পথ কী? আকীদার মধ্যে সঠিক পথ কোনটা? ইবাদতের মধ্যে সঠিক পথ কোনটা? মু'আশারাতের মধ্যে কী, মু'আমালতের মধ্যে কী? আখলাকের মধ্যে কী? এই সব ব্যাখ্যা কোরআন صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর মধ্যে করেছেন। তো গোটা কুরআনের সারাংশ হলো اِهْدِنَا ।

হিদায়াত দুই প্রকার

হেদায়াত অর্থ পথ দেখানো। হেদায়াত দুই প্রকার, প্রথম প্রকার হলো এই যে, মানুষ মুখে বলবে, দেখো ভাই! সোজা রাস্তা এটা, যেমন কারো কোথাও যাওয়ার কথা। এখন একটা পন্থা হলো এটা যে, তাকে পথপ্রদর্শক বলে দিবে, মসজিদ থেকে বের হয়ে প্রথম ডানদিকে যাবে, তারপর বাম দিকে। এরপর একটা রাস্তা পাবেন, ঐ রাস্তা ধরে গেলে আপনি আপনার গন্তব্যে পৌঁছে যাবেন। এখন পথিকের কাজ হলো, তাকে যেভাবে বলা হয়েছে ঐভাবে যাওয়া।

দ্বিতীয় তরীকা হলো, যখন পথিক বলল ভাই আমাকে প্রধান সড়কটা বলে দাও কীভাবে যাবো? তখন ঐ ব্যক্তি তাকে ধরে বলে চলো আমার সঙ্গে। এবং তাকে নিয়ে চলতে শুরু করে। মুখে কিছুই বলল না। কিন্তু হাত ধরে নিয়ে গিয়ে তার গন্তব্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং বলে দেখ এটা তোমার গন্তব্য। তো এটা হলো হেদায়াতের দ্বিতীয় প্রকার।

প্রথম হেদায়াত আ'ম আর দ্বিতীয় হেদায়াত হলো খাস

আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা হেদায়াতের প্রথম প্রকার তো সব মানুষের জন্য উন্মোচিত করে দিয়েছেন। কোরআনের মাধ্যমে পথ বাতলে দিয়েছেন যে, দেখ হেদায়াতের রাস্তা এটা যে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনো। আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রতি ঈমান আনো। সরকারে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের প্রতি ঈমান আনো। আখেরাতের উপর ঈমান আনো এবং যে সব ফরয ওয়াজিব তোমাদের উপর অর্পিত করা হয়েছে তা আদায়

করো, যা হারাম এবং নাজায়েয তা থেকে বাঁচো। আর এই হেদায়াতের রাস্তা আল্লাহ্ তা'আলা সব মানুষের জন্য চান। চাই সে মুসলমান হোক, কাফের হোক। অথবা অন্য কিছু হোক। সবাইকে এই হেদায়েত কোরআন ও নবী করীম সারকারে দোআলমের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি রাস্তা শিখতে চায়, বুঝতে চায়, কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। নবী কারীম সারকারে দো'আলমের হাদীস শরীফেও সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রকারের হেদায়াত প্রত্যেককে দেয়া হয়েছে। কিন্তু যে দু'আ করা হয়েছে এখানে প্রথম প্রকার হেদায়াত উদ্দেশ্য নয়। বরং দ্বিতীয় প্রকার হেদায়াত উদ্দেশ্য আয় আল্লাহ্ "আমাদেরকে সীরাতে মুসতাকীমে পরিচালিত করুন"। আপনি তো বলে দিয়েছেন, সীরাতে মুসতাকীম কী? কিন্তু এই সীরাতে মুসতাকীমের উপর চলা আপনার তাওফিক ছাড়া অসম্ভব। আয় আল্লাহ্! আপনি আপনার দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে সীরাতে মুসতাকীমের উপর দাঁড় করিয়ে দিন। এই অর্থ হলো اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ আমাদেরকে সীরাতে মুসতাকীমের উপর দাঁড় করিয়ে দিন। আর এটা সেই দু'আ, যা স্বয়ং সারকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হালতে করেছেন।

ব্যাপক অর্থবহ একটি দু'আ

একটি দু'আ সারওয়ারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

اَللّٰهُمَّ اِنَّ قُلُوْبَنَا وَنَوَاصِيَنَا وَجَوَارِحَنَا بِيَدِكَ لَمْ تُمَلِّكْنَا مِنْهَا شَيْئًا، فَإِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ فَكُنْ اَنْتَ وَلِيُّنَا وَاهْدِنَا اِلٰى سَوَاءِ السَّبِيْلِ ـ

আয় আল্লাহ্! আমাদের কলবসমূহ, আমাদের ললাটসমূহ, আমাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গ, এবং আমাদের অন্তর সব আপনার আয়ত্তে। আমরা এগুলোর কোনটারই মালিক নই। মালিক আপনিই। আমাদের হাতেরও মালিক আপনি। আমাদের কপালেরও মালিক আপনি। আমাদের পায়েরও মালিক আপনি। আমাদের দিলেরও মালিক আপনি। সবকিছু আপনার কুদরতি কবযায় রয়েছে। যখন সবকিছু আপনার কুদরতি কব্জায়, আপনার মালিকানায় তখন আপনি আমাদের কার্যসম্পাদনকারী হয়ে যান, এবং আপনি আমাদেরকে সঠিক রাস্তায় পরিচালিত করুন। মুমিন, কাফের, ফাজের প্রত্যেকের জন্য পথ খোলা আছে। যা কোরআন বলে দিয়েছে এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন।

কিন্তু হে মুসলমান! এখন আমার কাছে প্রার্থনা করো। আয় আল্লাহ্ আপনার ফজল ও করম দ্বারা আমাদের হাত ধরে সোজা দাঁড় করিয়ে দেন। যাতে আমরা মঞ্জিলে পৌঁছে যাই।

তিন কাজ করো

মানুষের কাজ তিনটি। এক তো হলো এই যে, সে দৃঢ় সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা করবে যে, আয় আল্লাহ্! আমি আপনার আনুগত্য করবো। এবং দ্বীনি কাজে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের পূর্ণ অনুসরণ করবো। এবং বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করবো। গুনাহের কাছেও যাবো না। ওয়াজিব ও ফরয সহীহ পদ্ধতিতে আদায় করবো। গুনাহ থেকে বাঁচার এবং ফরয ওয়াজিব আদায় করার ব্যাপারে পূর্ণ সচেষ্ট থাকবো। এই সংকল্প করুন।

দ্বিতীয়ত হলো আপন সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করবে। তৃতীয়ত তাকে ডাকবে, আয় আল্লাহ্! আমার সাধ্যে ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি। আমার সাধ্য ছিল চেষ্টা করা আমি করেছি, এখন আপনাকে ডাকছি যে, আপনি স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে সীরাতে মুসতাকীমের উপর চলার তাওফিক দান করুন। এই তিন কাজ যদি কোন ব্যক্তি করে তো সে কামিয়াব। প্রথমে দৃঢ় সংকল্প, দ্বিতীয়ত যথাসাধ্য চেষ্টা, তৃতীয়ত প্রতিজ্ঞা করে আল্লাহ্র কাছে চাওয়া।

হযরত ইউসুফ (আঃ) এর কর্মপদ্ধতি

হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ঘটনা কোরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে। কোরআন কারীমে যত ঘটনা এসেছে শুধু কাহিনী বর্ণনা করার জন্য আসেনি। বরং এর মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা কম বেশি সব মুসলমানই জানে যে, যুলাইখা তাকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিল। এবং তিনি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। একে তো সুন্দরী রমণী, তারপর আবার মনিবের স্ত্রী। চতুর্দিকের দরজা বন্ধ করে তালা মেরে দিয়েছিল। বের হওয়ারও কোনও পথ নেই। ভিতরে ঢোকারও কোনও পথ নেই। তখন যুলাইখা কোন অনুরোধ করেনি বরং সরাসরি আদেশ করেছে, আস! ব্যভিচারের প্রতি আহ্বান করছিল। হযরত ইউসুফ (আঃ) প্রথমেই অস্বীকার করেছেন। কিন্তু ঐ নারী এক পর্যায়ে নিজের দিকে ইউসুফ (আ.)-কে আকর্ষণ করতে লাগল। তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) তার থেকে ছুটে দরজার দিকে দৌড় দেন। অবস্থা ছিল এই যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) দেখতে পাচ্ছিলেন দরজা বন্ধ। দরজায় তালা লাগানো। বের হওয়ার কোন পথ নেই। কিন্তু তিনি চিন্তা করলেন যে,

আমার কাজ হলো দৌড়ে দরজা পর্যন্ত পৌছা। তাঁর চূড়ান্ত চেষ্টা তিনি করলেন এবং ঐ নারীর কবল থেকে মুক্ত হয়ে দরজা পর্যন্ত পৌছলেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ্‌র কাছে বললেন, আয় আল্লাহ্! আমার সাধ্য এতটুকুই ছিল যে, তার থেকে মুক্ত হয়ে দরজা পর্যন্ত পৌছা। এখন আপনার কাজ হলো দরজা খোলা এবং আমাকে তার কবল থেকে মুক্ত করা। আপনি দুয়ার খুলে দিন। অতএব তিনি দুইটা কাজ করেছেন। প্রথমত যে তিনি আ'যম করেছেন যে এই কাজ আমি করবো না। এবং দ্বিতীয়ত হলো তিনি চেষ্টা করেছেন। আমার সাধ্য হলো দরজা পর্যন্ত পৌছা। এ ব্যাপারে অলসতা করেননি। দরজা পর্যন্ত পৌছলেন, অতঃপর আল্লাহ্‌কে ডাকলেন? আয় আল্লাহ্ উদ্ধার করুন। আর যখন দরজার কাছে গেলেন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে তালা খুলে গেল। এবং দেখলেন, যুলাইখার স্বামী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

তুমিও এই দুই কাজ কর

আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা এই ঘটনা এ জন্য বর্ণনা করেছেন যে, শোন! যখন তোমরাও এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবে। তোমাদেরকে গুনাহের প্রতি আহ্বান করা হচ্ছে প্ররোচিত করা হচ্ছে। সীরাতে মুসতাকীম থেকে দূরে সরে যাওয়ার আহ্বান করছে। তখন দুটি কাজ করো। এক. দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করো যে, আমি সীরাতে মুসতাকীমকে কিছুতেই ছাড়বো না। এবং দুই , তোমার যতটুকু সামর্থ আছে ঐ অনুযায়ী চেষ্টা করো। এরপর যখন আল্লাহ্ তা'আলাকে ডাকবে অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবেন। এবং সীরাতে মুসতাকীমে পৌছে দেবেন। মাওলান রুমী (রহ:) মসনবীতে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ঘটনা সম্পর্কে বলেন,

گرچہ رخنہ نیست عالم راپدید

خیرہ یوسف واری باید دوید

আজ আমাদের চারপাশে কোন সঠিক রাস্তা দৃষ্টিগোচর হয় না। চারদিকে পাপ-পঙ্কিলতার আগুন জ্বলছে। কুফুর শিরকের দৌড় ঝাঁপ চলছে। আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতার আঁধার ছেঁয়ে গেছে। যেভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ) দরজা পর্যন্ত পালিয়ে গেলেন তুমিও পালাও। যতদূর পার। অতঃপর আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলাকে ডাকো। তোমাকে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ্ তা'আলা নাজাত দেবেন।

এই আয়াতের শিক্ষা

এই দু'আ আমরা সূরা ফাতিহার মধ্যে পড়ি। অন্যদিকে আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত প্রত্যেক নামাজে বরং প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ হলো তার একটি আবশ্যকীয় অংশ।

আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা চাচ্ছেন যে, তাঁর বান্দা যেন সবসময় তাঁর দিকে রুজু হয়ে সিরাতে মুসতাকীম প্রার্থনা করে। এজন্য পাঁচ ওয়াক্তের প্রত্যেক নামাজের প্রত্যেক রাকাতে আমাদেরকে দিয়ে এই কালেমা বলাচ্ছেন। কিন্তু বলালে কী হবে, আমরা গতানুগতিকভাবে পড়ে যাচ্ছি। প্রতিদিন পড়ছি, প্রত্যেক রাকাতে পড়ছি। কিন্তু উদাসভাবে, বেখেয়ালে পড়ছি। অধিকাংশ সময় আমাদের জানাই থাকে না যে কী পড়ছি। এবং কী পড়ছিনা। ফলাফল এটাই হচ্ছে যে, এই দু'আর যা আসল স্বাদ এবং তার যা সঠিক ফলাফল তা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হচ্ছে না। কেউ যদি ফিকির করে পড়ে এবং মন থেকে আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলাকে বলে যে, আয় আল্লাহ্! আমাকে সীরাতে মুসতাকীমের উপর দাঁড় করিয়ে দেন। তো যখন মন থেকে , মনোযোগের সঙ্গে চাইবে। এবং গুরুত্বের সঙ্গে চাইবে এবং দিনে পাঁচ ওয়াক্ত বারবার আল্লাহ্র কাছে চাইবে, তখন অমুখাপেক্ষী মনিব কি তোমাকে ফিরিয়ে দিবেন? বিমুখ করবেন, শয়তানের হাতে ন্যাস্ত করবেন। না, কক্ষনো না। অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করবেন। শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচাবেন। এই আয়াতে কারীমা থেকে আমরা এই শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, সব সময় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সীরাতে মুসতাকীম কামনা করা। আয় আল্লাহ্ আমাকে হাত ধরে সীরাতে মুসতাকীমের উপর দাঁড় করিয়ে দিন।তাই যখন নামাজ পড়বেন তখন এজন্য পড়ুন যে, যেন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করছেন।

এর আগে দুইটি কাজ

কিন্তু দুটি বিষয় এর আগে করা চাই। এক. মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করা যে, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করছি। আল্লা তাবারকা ওয়া তা'আলার কাছে সীরাতে মুসতাকীম চাইছি, প্রথমে অন্তরে খায়েশ তৈরি করুন। ব্যাকুলতা সৃষ্টি করুন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন।আর দ্বিতীয় হলো, কম বেশি যতটুকু চেষ্টা করা সম্ভব তা করা। এরপর অবশ্যই দু'আ কবুল হবে।

কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি মনে করে যে, মনে কোন নিয়ত নেই। ইচ্ছাও নেই। কোন আগ্রহও নেই। এবং কোন চাহিদাও নেই। আমলেরও কোন চেষ্টা

নেই। এরপর প্রার্থনা করছে যে, সীরাতে মুসতাকীম দিয়ে দাও।তার দৃষ্টান্ত এমন, কোন ব্যক্তি জেনে বুঝে পূর্ব দিকে যাচ্ছে অথচ এই দু'আ করছে আয় আল্লাহ্! আমাকে পশ্চিমে পৌঁছে দিন। তো এটা তো দু'আ না বরং ফাজলামি। এ জন্য যে আপনি ইচ্ছা করেছেন পূর্ব দিকে যাওয়ার। প্রস্তুতিও নিচ্ছেন পূর্ব দিকে যাওয়ার এবং পাও বাড়িয়েছেন সেদিকে। আর মুখে বলছেন আয় আল্লাহ্ আমাকে পশ্চিমে পৌঁছে দেন। এটা মস্করা ছাড়া কিছু নয়।

যদি মনে করেন, আমরা ইংরেজদের মত হয়ে যাব। পাশ্চাত্য সাজে সজ্জিত হবো এবং সব কাজ তাদের রীতিতে করবো। আবার আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলার কাছে বলছেন যে, আয় আল্লাহ্ আপনি আমাকে সীরাতে মুসতাকীম দান করুন। তো এটা দু'আ না করার নামান্তর। হ্যাঁ অন্তরে একবার মজবুত করে নিয়ত করুন যে, আমার জন্য ও দুনিয়ার সফলতার সে রাস্তা। যা আল্লাহ্ বলেছেন, আল্লাহ্র রাসূল যা বলেছেন, আমি সেই পথের উপর চলতে চাই। এবং সেদিকে অগ্রসর হচ্ছি। হ্যাঁ সমস্যা হচ্ছে। তো আল্লাহ্র কাছে বলুন যে আয় আল্লাহ্ সমস্যা দূর করে দাও। এরপর ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাওফীক হবে। সাহায্য আসবে। জীবনে পরিবর্তন ঘটবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এই প্রার্থনা করা এবং সঠিকভাবে করার তাওফিক দান করুন। এবং দ্বীনের জন্য কবুল করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহ্‌র দিকে রুজু করা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَآ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ ○ آمَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

সূচনা,

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! গত জুমায় সূরা ফাতিহার পঞ্চম আয়াত اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা প্রদান করেছি আপনাদের খেদমতে। এবং এও বলেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব মুসলমানকে সব নামাজে সব রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এর আগে তিনটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার কিছু গুণের বর্ণনা আছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে শিখিয়েছেন যে তাঁর কাছে পেশ করে বলুন। إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আয় আল্লাহ্ আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।

আল্লাহ্‌র কাছে সীরাতে মুসতাকীম চান

অতঃপর পাঁচ নাম্বার আয়াত اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, প্রত্যেক মুসলমানকে তাঁর কাছে এইভাবে দু'আ করা চাই যে, আয় আল্লাহ্ আমাদেরকে সীরাতে মুসতাকীম পর্যন্ত পৌঁছে দিন। আমাদের হাত ধরে সীরাতে মুসতাকীম পর্যন্ত নিয়ে যান। এই দু'আ শিখিয়ে আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে এই কথার প্রতি ইশারা করেছেন যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর দিকে রুজু করার অভ্যাস করুন। সীরাতে মুসতাকীম এমন এক পথ, যা মানুষের দুনিয়াও আখেরাতের প্রতিটি মাকসাদের জন্য প্রয়োজন। যখন আপনার কোন বিষয়ে খটকা লেগেছে অথবা কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সামনে দুটি পথ, তখন আল্লাহ্‌কে ডেকে বলুন। اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ আয় আল্লাহ্! আমাকে সীরাতে মুসতাকীমের তাওফিক দান করুন। এই দু'আ আমাকে আপনাকে আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা শিখিয়েছেন। আমি গত জুমায় আলোচনা করেছিলাম যে, সর্বক্ষেত্রে সীরাতে মুসতাকীমের প্রয়োজন। মানুষের দুনিয়াবী কাজে যেমন সোজা-সরল পথ প্রয়োজন ঠিক তেমন আখেরাতের কাজেও।

বাঁকা সিঁথির জন্য তাবীয

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহ.) অনেক বড় মাপের ওলী আল্লাহ্ ছিলেন। এক মহিলা তার কাছে এসে বলতে লাগল যে, হযরত আমার সমস্যা হলো যে, যখন আমি চুল আঁচড়াই তখন আমার সিঁথি বাঁকা হয়ে যায়। সোজা হয় না। অনেক চেষ্টা করেছি যাতে সিঁথি সোজা হয়। কিন্তু সিঁথি সোজা হয় না। অনেক মহিলা আছে, যাদের মনে এটা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, সব কাজের জন্য তাবীয লাগে। সে হযরতের কাছে আবেদন করল যে আপনি আমার জন্য কোন তাবীয বানিয়ে দিন। হযরত বললেন, সিঁথি সোজা করার কোন তাবীয। আমার তো জানা নাই। কিন্তু মহিলা নাছোড় বান্দা। এমন কোন তাবীয লিখে দিন যার মাধ্যমে আমার সমস্যার সমাধান হয়। এবং আমার সিঁথি সোজা হয়ে যায়। হযরত গাংগুহী (রহ.) বলেন, মহিলা তো নাছোড় বান্দী, এবং এ কারণে সে পেরাশান। আমার কিছুই বুঝে আসছিল না। আমি একটি কাগজে কোরআনের আয়াত اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ লিখে দিয়েছি। এবং বললাম এটা তুমি মাথায় লাগিয়ে রাখো। আল্লাহ্‌র এমনই মর্জি ঐ মহিলার সিঁথি সোজা হতে লাগল। এব্যাপারে হযরত বলেন যে, সূরা ফাতিহায় আল্লাহ্ তা'আলা

আমাদেরকে এই দোআ শিক্ষা দিয়েছেন যে, সব কাজে সীরাতে মুসতাকীম চাই, সঠিক রাস্তা চাই। হযরতের ইখলাস ছিল, এবং আয়াতে কারীমার অন্তর্নিহিত জ্ঞানও ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এই মহিলার এরই মাধ্যমে কার্য সমাধান করে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য হলো যে দুনিয়ার এমন কোন কাজ নেই যেখানে সোজা রাস্তার প্রয়োজন নাই। এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লহ্ শিক্ষা দিচ্ছেন যে সব কিছু তাঁর কাছে চান। তাঁর কাছে সীরাতে মুসতাকীম প্রার্থনা করুন। আর যখন কোন পেরেশানী আসে তখন তাঁর অভিমুখী হয়ে বলুন।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ

এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ দু'আ যা আল্লাহ্ আমাদের শিখিয়েছেন।

এই যুগে আমরা কীভাবে আমল করবো

আমরা এমন এককালে জন্মগ্রহণ করেছি যখন চারদিকে পাপাচারের জয়জয়াকার। বাইরে বের হলেও চোখের হেফাজত হয় না। অবস্থা শোচনীয়, দ্বীনের উপর চলতে চাইলে তখন পদে পদে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। আজ সমাজ ব্যবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে, কেউ যদি দ্বীনদারি ও আমানতদারির সঙ্গে কোন কাজ করতে চায়, তখন বিভিন্ন সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। প্রতিবন্ধকতার কারণে মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য হয়। কেউ সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যবসা করতে চাইলে সুদ, ধোঁকাবাজি ও মিথ্যাচরের প্রতাপ দেখতে পায়।

কত ব্যবসায়ী যে আমার কাছে আসে। এসে বলে যদি আমরা ঠিকভাবে বলি মালটা এত টাকার কেনা। তাহলে আমরা ব্যবসা করতে পারবো না। এজন্য আমাদেরকে দাম বলার সময় মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। মোটকথা চতুর্দিকে পাপের আগুন জ্বলছে। কখনো কখনো আমাদের মনে এমনকি সবার মনে একই প্রশ্ন জাগে আমরা এমন যুগে জন্মেছি আমরা কী করতে পারি?

কীভাবে আল্লাহ্র বাতলানো পথে চলবো, পারিপার্শ্বিকতা দেখে চিন্তা করি এই যুগে আমাদের জন্য দ্বীনের উপর চলা সম্ভব নয়। এজন্য নিরাশ হয়ে বসে যাই।

আল্লাহ্র দরবারে সওয়াল জাওয়াব

আমার শায়েখ হযরত আরেফী (আল্লাহ্ তার মর্যাদা বুলন্দ করুন) বলতেন, এই যে তোমরা ওযর পেশ করছো যে পরিবেশ ভাল না। পদে পদে প্রতিবন্ধকতা, চারদিকে অন্যায় অনাচার পাপ ও পাপাচারে ভরে গেছে। তো একটু কল্পনা করো যে, আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দাঁড়িয়ে আছ। তিনি তোমার

হিসাব নিকাশ নিচ্ছেন আর তোমাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে তুমি কেন দ্বীনের উপর আমল করনি? কেন মিথ্যা বলেছ? কেন গীবত করেছ? ধোঁকা দিয়েছ? মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছ? চোখের হেফাজত কেন করনি? কেন কানের হেফাজত করনি? কেন যবানের হেফাজত করনি? একথা বলে উত্তর দিচ্ছো যে, আয় আল্লাহ্! আমার কী করার ছিল? আপনি আমাকে এমন যুগে সৃষ্টি করেছেন যখন চারদিকে পাপাচার, অন্যায়-অনাচার, ধোঁকাবাজি ও ঘুষের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। যদি আপনি আমাকে সাহাবায়ে কেরামের যামানায় সৃষ্টি করতেন তাহলে আমিও ভাল মানুষ হতাম। কিন্তু আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এমন যামানায় যখন চারদিকে বদ দ্বীনির সয়লাব। আমি কালের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছি। আমি দুর্বল ও কমজোর ইনসান। আমার কিছুই করার ছিল না।

আমার অভিমুখী কেন হওনি?

যদি এইসব প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা বলেন, দ্বীনের উপর চলার ক্ষেত্রে তুমি বাধাগ্রস্ত হচ্ছিলে, সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলে, তাহলে কেন তুমি আমার দিকে রুজু হওনি? আমার কাছে প্রার্থনা করতে যে, আয় আল্লাহ্! এটা কষ্ট সাধ্য। আপনার হুকুম পালনে অসাধ্যকে আপনি আমার সাধ্যে এনে দিন। তুমি আমার কাছে প্রার্থনা করতে এবং বলতে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ আমার কাছে প্রার্থনা করতে। কোরআন মাজীদে অসংখ্যবার এসেছে إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ । "নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান"। আমি আরো বলেছিলাম اُدْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। তুমি কেন এসব অবস্থা আমার কাছে তুলে ধরলে না এবং কেন আমার কাছে জিজ্ঞাসা করলে না যে আমি কীভাবে এর উপর আমল করবো? আপন অনুগ্রহে আমাকে সঠিক পথ দেখান। এখন বলো এর উত্তর কী?

আল্লাহ্ তা'আলা বলতে শিখিয়েছেন যে, বলো ইয়া আল্লাহ্! "আমি আপনার বান্দা, আপনারই ইবাদত করি। আপনারই কাছে সাহায্য চাই"। আমি অপারগ। আমার অবস্থা শোচনীয়। আপনি আপনার করমে আমাকে রক্ষা করুন। আমার পথের কাঁটা দূর করে দিন। আমার শায়েখ এমন বলতেন, আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা হয়ে বলো, আয় আল্লাহ্! প্রতিবন্ধকতা দূর করে দিন। অন্যথায় আমাকে পাকড়াও করবেন না। আমাকে আটক করবেন না। সমস্যার সমাধান করে দিন। যদি কোন বান্দা এমনভাবে প্রার্থনা করে বলে তাহলে কোন সন্দেহ নাই আল্লাহ্

তা'আলা তার প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেবেন অথবা তাকে "মাযুর"অক্ষম স্বীকৃতি দিবেন। এজন্য সূরা ফাতিহায় এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, যখনই কোন কাজ কষ্টসাধ্য মনে হবে তখনই আমাকে জানাও।

হযরত ইউনুস (আঃ) কীভাবে রুজু করেছেন

হযরত ইউনুস (আঃ) এর ঘটনা কুরআনে উল্লেখ আছে। আর প্রায় সব মুসলমানই জানে হযরত ইউনুস (আঃ) পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। একটা মাছ তাকে গিলে ফেলেছিল। তিনি মাছের পেটে চলে গিয়েছিলেন। একটু ভাবেন যে, একজন আস্ত জ্যান্ত মানুষ মাছের পেটে চলে গিয়েছে। আর মাছের পেটে যা হওয়ার তা তো হয়েছেই। ঘোর অন্ধকার। সে সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে–

فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ۔

"এই অন্ধকারের মধ্যে ইউনুস আলাইহিসসালাম আমাকে ডেকেছেন। আয় আল্লাহ্ আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। আপনি সব দোষ থেকে মুক্ত। ৬ আমি নিজের প্রতি অন্যায় করেছি। তার শাস্তি ভোগ করছি"।

তিনি নিজ মুখে তার ভুল এবং অন্যায়ের কথা স্বীকার করেছেন এবং ডে বলেছেন আপনিই মা'বুদ। আপনি ছাড়া কেউ নয়। যদি আমি মাছের পেটে গিয়ে থাকি তাহলে আপনার ইচ্ছায় গিয়েছি। বের হব তাও আপনার ইচ্ছায়। বাইরে আসার কোন অবস্থাই ছিল না। কেউ তাকে সাহায্য করতে চাইলেও তার ক্ষমতা ছিল না যে সে তাকে সাহায্য করবে।

হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহ্কে ডাকলেন, এবং বললেন– لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ এবং আল্লাহ্ তা'আলা বললেন : فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। কোন কোন রেওয়াতে আছে যে, তিনি তিনদিন মাছের পেটে ছিলেন। তিনি আল্লাহ্কে ডেকেই গেছেন নিরাশ হননি। সাহস হারাননি। আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলার "সত্তার" প্রতি আশা রেখেছেন। বাহ্যত ঐ অবস্থায় তিনি শুরু থেকেই ডেকেছেন। কিন্তু সাহায্য এসেছে কিছু দিন পর। কোরআন কারীমে বলা হয়েছে, আমি মাছকে হুকুম দিয়েছি তীরে তাকে উগড়ে ফেলতে। وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ আমি তাকে মাছের পেটের ঘোর অমানিশা থেকে মুক্তি দিয়েছি। মাছের পেটে যে বদ্ধ অবস্থায় তিনি পতিত হয়েছিলেন তা থেকে আমি তাকে মুক্তি দিয়েছি।

এভাবে মুমিনকে নাজাত দেন

কোরআনুল কারীমে এরপর বলা হয়েছে, وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ "আর এভাবেই আমি মুমিনকে মুক্ত করি"। এর উদ্দেশ্যএই যে,মুমিন মাছের পেটে চলে যাবে আর তিনি তাকে মুক্ত করবেন? বরং এর উদ্দেশ্য হলো যে, যখন তোমরা কোন অন্ধকারে পরিবেষ্টিত হয়ে যাও চারদিক থেকে অন্ধকার তোমাদিগকে ঘিরে ফেলে। নৈরাশ্য তোমাকে পেয়ে বসে, সেই সময় আমাকে ডাকো আমি তোমাকে মুক্ত করব। আমি তোমাকে মুক্তির পথে নিয়ে যাবো।

নিরাশ হয়ো না

আমার ভাইয়েরা! এই আয়াতে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ আমার বান্দা! ঘাবড়িও না। অস্থির হয়ো না, নিরাশ হয়ো না। কোন দুরবস্থা দেখে নিরাশ হয়ে বসে পড়। গালের উপর হাত রেখে চিন্তা কর যে কোন আশা নেই। কোন পথ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা রাস্তা তৈরি করেন। ঐ রাস্তা হলো اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আমাকে ডাকো আমার কাছে প্রার্থনা করো।

চল্লিশ দিন পর্যন্ত এই দু'আ করুন

বুযুর্গরা বলেন, মানুষের উচিৎ, প্রতিদিন বিরতিহীন ভাবে কোন দিন বাদ না দিয়ে আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলার কাছে দু'আ করা। আয় আল্লাহ্ সীরাতে মুসতাকীমের উপর চলতে চাই। কিন্তু বাধা আসে। পরিবেশ পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে নিয়ে যায়। আয় আল্লাহ্ আপনার দয়া ও অনুগ্রহে এবং আপন অনুগ্রহে পারিপার্শ্বিক খারাবি থেকে রক্ষা করুন। আপনার নির্দেশিত পথ অনুযায়ী জীবন-যাপন করার তাওফিক দান করুন। হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রা.) বলেন, কোন মানুষ যদি এভাবে চল্লিশদিন আমল করে। মনে প্রাণে, বিনয়ের সঙ্গে, চাওয়ার মতো চায়। তিনি বলেন : যে চল্লিশ দিন আমল করে দেখ, ইনশাআল্লাহ্ চল্লিশ দিন পর তার দরজা খোলা দেখতে পাবে। আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহে তার তাওফিক হবে। তার জীবনে এমন পরিবর্তন ঘটবে। যা হবে আনন্দদায়ক ও প্রশান্তিমূলক।

দুনিয়ার চিন্তায় বিভোর

আমরা উদাসীনভাবে জীবনযাপন করছি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চেষ্টা সাধনা, একই চিন্তা ভাবনা যে কীভাবে পয়সা বেশি কামানো যায়। কীভাবে আমাদের ব্যাংকব্যালেন্স বেশি হয়। কীভাবে আমাদের বাড়ি ঘর চাকচিক্যময় হয়। কীভাবে আমাদের একটি ভাল গাড়ি হয়। সব চিন্তা-চেতনা-চেষ্টা সাধনার কেন্দ্র একটাই। কিন্তু মৃত্যুর পর কী হবে? পরকালে কী হাশর হবে? এই ফিকির একেবারেই কম। যার কারণে বাহানা খুঁজে, পরিবেশ ভাল না। এজন্য গালে হাত দিয়ে বসে রইলেন কিছু করলেন না। কালের স্রোত যেভাবে বয়ে চলেছে আপনিও সেভাবে বয়ে চললেন। মানুষ মিথ্যা বলছে আপনিও বলছেন। মানুষ ঘুষ খাচ্ছে আপনিও খাচ্ছেন। কালের স্রোতধারায় নিজেকে ভাসিয়ে দিতে দিতে একসময় আপনার জীবন তরঙ্গ থেমে যাবে।

প্রতিদিন আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন

কোরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সামান্য সময় চিন্তা ভাবনা করো। আর কিছু কাজ করো। এজন্য বড় কোন মেহনতের প্রয়োজন নাই। আর তা হলো আল্লাহ্‌র দরবারে কেঁদে কেঁদে কিছু সময় দু'আ করো। এরপর দেখ কী হয়। কীভাবে রাস্তা খুলে যায়। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। আমি নিজে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। কত রকমের মানুষ এসে অভিযোগ করে আমাদের উপর রহমতের দরজা বন্ধ। ইনসাফের দরজা বন্ধ। দীনের উপর চলার দরজা বন্ধ।আমি তাদেরকে পথ বাতলে দিয়েছি। তারা আমল করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য দরজা খুলে দিয়েছেন। সামান্য ত্যাগ প্রয়োজন। ত্যাগের পর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য দরজা খুলে দেন। তাদেরকে দুনিয়াতে আগের চেয়ে আরো ভালো অবস্থা দান করেছেন।

মনোযোগের সঙ্গে এই শব্দগুলো পড়ুন

যখন আমরা নামাজে দাঁড়াই তখন এই শব্দগুলো পড়ি–

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ পড়ার সময় খেয়াল করে পড়বেন যে নিশ্চয়ই, আমরা আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলার কাছে প্রার্থনা করছি। প্রকৃত হেদায়াত চাচ্ছি। তাঁর কাছে সরল সহজ পথ প্রার্থনা করছি। এই ধ্যান করে, নির্জনে, একাগ্রতার সঙ্গে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করুন। আর এটাকে দৈনন্দিন আমল বানিয়ে নিন। তাহলে দেখবেন কীভাবে আল্লাহ্

তাবারকা ওয়া তা'আলা দরজা খুলে দেন। আল্লাহ্ তা'আলার রহমত এত প্রশস্ত, গোটা দুনিয়ায় যে শয়তানি ও তাগুতি শক্তির দৌরাত্ম্য চলছে, সব এই শক্তিকে খর্ব করার ক্ষমতা আল্লাহ্ রাখেন। তার বান্দা প্রার্থনা করলে তিনি কি রাস্তা খুলবেন না? আল্লাহ্ তা'আলা তো প্রথমেই বলে দিয়েছেন যে, বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আমিই। রহমান ও রহীম আমিই। আমিই রোজ হাশরের মালিক? আমিই সবকিছু। এরপরও তুমি কোথায় ঘুরে ফিরছ। ডাকো তো আমাকেই ডাকো। আমারই কাছে প্রার্থনা করো। সমস্ত সমস্যা চাওয়া পাওয়া আমার কাছে পেশ করো। ইনশাআল্লাহ অবশ্যই রাস্তা খুলে যাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সীরাতে মুসতাকীম হাসীলের তরীকা

তাফসীরে সূরা ফাতিহা (১৩)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ إِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَآ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ○صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ ○ آمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

সূচনা

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভায়েরা!

এর আগে সূরা ফাতিহার আলোচনা চলছিল। এরই ধারাবাহিকতায় যেহেন তাজা করার জন্য আমি প্রথমে সূরা ফাতিহার তরজমা করছি। এ সূরার শেষ আয়াত সম্পর্কে কিছু কথা আপনাদের খেদমতে পেশ করবো। সূরা ফাতিহা সব নামাজে সব রাকাতে পড়া হয়। এজন্য সূরা ফাতিহার অর্থ ও মর্ম আমাদের সকলের জানা থাকা উচিৎ যেন নামাজে সূরা ফাতিহা পড়ার সময় এর অর্থ ও মর্মের দিকে যেহেন ধাবিত হয়। সূরা ফাতিহার আয়াত সংখ্যা সাত। প্রথম আয়াত : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তিনি সকলের প্রতি দয়াশীল, অত্যন্ত দয়াময়।

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ যিনি প্রতিদান দিবসের অধিপতি। ওই দিনের যেদিন সব মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার সামনে দাঁড়াবে। এবং দুনিয়াতে যত আমল করেছে তার হিসাব কিতাব হবে। ভাল কাজের উত্তম বিনিময় দেয়া হবে। এবং মন্দ কাজের খারাপ বদলা দেয়া হবে। তিনি ওই দিনের বাদশা।

সব ক্ষমতার পরিসমাপ্তি ঘটবে

এর আগে আমি আলোচনা করেছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব সময় সব কিছুর মালিক। যদিও বাহ্যত মানুষকে কোন কোন বস্তুর মালিকানা দিয়ে রেখেছেন। যেমন : আমি কাপড় পরিধান করি। আমি কাপড়ের মালিক। আমার পকেটে পয়সা আছে, তো আমি পয়সার মালিক। বাড়ি আমার, তো আমি বাড়িওয়ালা। কিন্তু আখেরাতে তো কোন মালিক থাকবে না। ঐ দিন কোন কিছুই কারো মালিকানাধীন হবে না। কেয়ামত দিবসের মালিক একজনই। আর তিনি হলেন আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা। এরপর এটাও বলে দিয়েছেন যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে চাইবে। এ কারণে চতুর্থ আয়াতে বলেছেন :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

"আয় আল্লাহ্! আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য চাই"। অতঃপর এই আয়াত এসেছে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য চাই। তো "আয় আল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে সীরাতে মুসতাকীম অর্থাৎ সঠিক পথের দিশা দিন"। এরপর সীরাতে মুসতাকীমের ব্যাখ্যা করেছেন যে সীরাতে মুসতাকীম কী? বলেন, صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ আয় আল্লাহ্! ঐ সব লোকদের পথ যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ ঐ সব লোকদের পথ না যাদের উপর আপনার ক্রোধ পতিত হয়েছে। وَلَا الضَّالِّيْنَ এবং না ঐ লোকদের পথ যারা পথভ্রষ্ট। আপনার কাছে আমরা তাদের পথ প্রার্থনা করি যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন। এটা সূরা ফাতিহার তরজমা। এর মধ্য থেকে চার আয়াতের বর্ণনা গত জুমায় হয়েছে। এখন পঞ্চম আয়াতের বর্ণনা হলো, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ আয় আল্লাহ্! আপনি সরল পথের দিশা দিন।

সবক্ষেত্রে সীরাতে মুস্তাকীমের প্রয়োজন

আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা এই দু'আ শিখিয়েছেন। শুধু শিক্ষাই দেননি বরং আবশ্যক করে দিয়েছেন। সব নামাজের সব রাকাতে আমাদের থেকে এই প্রার্থনা চাওয়া হচ্ছে যে, আয় আল্লাহ্! আমাদেরকে সীরাতে মুসতাকীম দান করুন। এ দু'আর মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কেননা আমরা সর্বত্র সীরাতে মুসতাকীমের মুখাপেক্ষী। আমাদের কর্ম সাধনে ও লক্ষ্য অর্জনে সরল পথের দিশা দিন। এমন সরল পথ যা আমাদেরকে লক্ষ্যে পৌছে দিবে। পথ যদি আঁকাবাঁকা হয় তাহলে তা আমাদের লক্ষ্যে পৌছাবে না। আর যদি পৌছায়ও তাহলে তা হবে অনেক কষ্ট ক্লেশের পর। এজন্য আমাদের প্রতিটি কাজে সীরাতে মুস্তাকীম প্রয়োজন।

চিকিৎসাতেও সীরাতে মুস্তাকীম প্রয়োজন

ধরুন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। চিকিৎসা করতে হবে। তাহলে ভাল ডাক্তারের সন্ধান পেয়ে চিকিৎসার জন্যও সীরাতে মুস্তাকীমের প্রয়োজন। আর ডাক্তারের সীরাতে মুস্তাকীমের প্রয়োজন যাতে সে বুঝতে পারে যে কী রোগ এবং এই রোগীর জন্য কোন ওষুধ উপকারী। উপার্জনের জন্য যাচ্ছেন সেখানেও সীরাতে মুসতাকীমের প্রয়োজন। কোন উপার্জন হালাল এবং কোনটা হারাম। মোট কথা দুনিয়ার এমন কোন কাজ নাই যেখানে সীরাতে মুসতাকীমের প্রয়োজন নাই। এজন্য বড় অর্থবহ দু'আ আল্লাহ্ তা'আলা শিখিয়েছেন।

আমাদের হালত

কিন্তু আমরা যখন সূরা ফাতিহা পড়ি, তখন এর অর্থ ও উদ্দেশ্যের প্রতি খেয়াল না করে রচিত বাক্যের ন্যায় আওড়াতে থাকি। যখন আল্লাহু আকবার বলে নিয়ত বাঁধি তখন মনে হয় একটি সুইচ অন করে দেয়া হয়েছে। এরপর ক্যাসেট চলতে শুরু করে। অর্থ ও মর্ম কী তার তো খবর থাকেই না এবং কী পড়ছেন তাও জানেন না। ফলও তাই হচ্ছে এই দু'আর যে ফায়দা অর্জন হওয়ার কথা তা হচ্ছে না।

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে উত্তর

হুযুর আকদাস নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছন বান্দা যখন নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ে এবং বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ "আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে"।

এরপর যখন বলে الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন اَثْنٰى عَلَيَّ عَبْدِيْ "আমার বান্দা আমার গুণকীর্তন করেছে"। এরপর যখন বলে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তখন আল্লাহ্ বলেন যে, مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ "আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে"। এরপর বান্দা যখন বলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : هٰذَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ তিনি এই কথা বলেন যে, "অর্ধেক আমার এবং অর্ধেক তার"। অর্থাৎ বান্দা যখন বলছে اِيَّاكَ نَعْبُدُ "ইয়া আল্লাহ্ আমরা আপনার ইবাদত করি"। তো এই কথা আল্লাহ্র জন্য। আর যখন বান্দা বলে وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আমরা আপনারই কাছে সাহায্য চাই। তো এই যে সাহায্য প্রার্থনা এটা নিজের জন্যই প্রার্থনা করছে।আল্লাহ বলছেন আমার বান্দা যা প্রার্থনা করছে আমি তাকে তা দেব। যখন বান্দা বলে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ তখন আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা করেন যে, তুমি যা চাচ্ছো আমি তোমাকে তা দেব। সীরাতে মুস্তাকীম দেয়ার অঙ্গীকার করলেন। আমরা এভাবে বুঝে পড়ি না, বে-খেয়ালে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলি। না আল্লাহ্ তা'আলার জবাব শুনি, না জবাবের সুযোগ দেই। যখন আমাদের অবস্থা এই তখন আল্লাহ্র জবাব দেয়ার কী প্রয়োজন?

এক বুযুর্গের ঘটনা

হযরত শায়েখ ইবনে আকবর ইবনে আরাবী (রহঃ) বড় মাপের একজন ওয়ালী আল্লাহ ও সূফি সাধক ছিলেন। তিনি বলেন, যখন আমি নামাজে সূরা ফাতিহা পড়ি এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ বলি, ঐ সময় পর্যন্ত আগে বাড়াই না যখন পর্যন্ত আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুর উত্তর না শুনি। এমনই হল আল্লাহ্র বান্দা। আল্লাহ্ তা'আলার জাতের উপর তার এত ভরসা যে তিনি বলেন, আমি আগে বাড়বো না যতক্ষণ না তার উত্তর শুনবো। এরপর বলি الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ উত্তর শুনে তারপর অগ্রসর হই। এজন্য সূরা ফাতিহার আদাব হল এই যে মানুষ প্রত্যেক আয়াতের পর থামবে। যখন খেয়াল করে মনোযোগ সহ পড়বে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ। তখন আল্লাহ্ অবশ্যই দিবেন। কেননা স্বয়ং আল্লাহ্ বলছেন,

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ○ (سورة البقرة ١٨٦)

"আমার বান্দা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে আমি কোথায়। আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই যখন সে আহ্বান করে"। মানুষ যখন এভাবে সূরা ফাতিহা পড়বে তখন ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই সে সরল পথের দিশা পাবে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। কোরআনুল কারীমের এক জায়গায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে,

أَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُوْنَ-

অর্থাৎ "আমি কি জোরপূর্বক হিদায়াত দেই, যখন তোমাদের হেদায়াত প্রার্থনার কামনাই না থাকে"। আর তোমাদের পছন্দ নয় হেদায়াত। আমার ভাইয়েরা! যখন আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দাঁড়িয়ে বলবেন– اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ তখন খেয়াল করে প্রার্থনা করুন। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ভিখারী হয়ে বলুন। আয় আল্লাহ্ ভিখারী হয়ে এসেছি। আমরা সীরাতে মুসতাকীমের নির্দেশনা চাই। আপনার অনুগ্রহে দিয়ে দিন।

সীরাতে মুসতাকীম অর্জনের পদ্ধতি

যেখানেই এবং যে সূরাতেই আল্লাহ্ তা'আলা সীরাতে মুসতাকীম প্রার্থনার আদেশ করেছেন সেখানেই অর্জনের পথ বাতলে দিয়েছেন। صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ আমি ঐ লোকদের পথ চাচ্ছি যাদের উপর আপনার অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে। তারা কারা? সূরা নিসাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কথা উল্লেখ করেছেন।

فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ-

যাদের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে তাদের প্রথম শ্রেণী হলেন, হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম। দ্বিতীয় শ্রেণী হলো সিদ্দিকগণ, যারা সত্যের পূর্ণ অনুসারী এবং সঠিক আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নিজের ভেতর ও বাহির পরিশুদ্ধ করেছেন। তৃতীয় শ্রেণী হলো শহীদগণ, যারা আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর দ্বীনের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন। চতুর্থ শ্রেণী হলো নেককারগণ, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ভাল কাজ করার তাওফিক দান করেছেন। এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো যদি সীরাতে মুসতাকীম চান। এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনাও করছেন তাহলে এই চার শ্রেণীর লোকদের সাহচর্য লাভ হবে। অর্থাৎ তাদের তরীকা ও কর্মপদ্ধতি লাভ হবে। এজন্য নবীদের তরীকা কী ছিল? সেটা

গ্রহণ করেন। দেখুন! সিদ্দিকগণের তরীকা কী ছিল? সেটা গ্রহণ করুন। শহীদের তরীকা কী ছিল? সেটা গ্রহণ করুন। সালেহীন নেকলোকদের কর্ম পদ্ধতি কী ছিল? সেটা গ্রহণ করুন। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, শুধু কিতাব পড়ার কারণে বুঝতে পারলেন সীরাতে মুসতাকীম কী। না বরং আপনার সাহচর্য ঠিক করুন। ওঠা-বসা, চলাফেরা করুন এমন সব লোকদের সঙ্গে যাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন। এরপর আপনার দ্বীন বুঝে আসবে এবং এর উপর চলার আগ্রহ বাড়বে।

ভুল সংশোধন

অনেকে মনে করেন আল্লাহ্র কিতাব কোরআন মাজিদ আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমাদের কোন মানুষের দিকে লক্ষ্য করার প্রয়োজন নেই। অনুবাদের মাধ্যমে কোরআন পড়বো। যা বুঝে আসে তার উপর আমল করবো। সুতরাং নেক লোকেরা কী করছে এবং কীভাবে আমল করার আদেশ করছেন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নাই। তবে কোরআন বলছে ভিন্ন কথা। হ্যাঁ, যদিও পুরো কোরআনই সীরাতে মুসতাকীম। এই সীরাতে মুসতাকীম বোঝা ও এর নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য ঐ সব লোকদের অনুসরণ অত্যাবশ্যক যাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন। তারাই আপনাদেরকে বলেন যে, আল্লাহ্র নাযিলকৃত কিতাবের উদ্দেশ্য কী এবং এসবের উপর কীভাবে আমল করবে। আল্লাহ্ তা'আলা সূচনা থেকেই এর ধারা অব্যাহত রেখেছেন।

দুটি জিনিস একই সঙ্গে অবতরণ

দুটি জিনিস একই সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এক আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল এবং সবশেষে কোরআন মাজিদ। দ্বিতীয় নবী রাসূল। কোন কিতাব পয়গাম্বর ব্যতিরেকে নাযিল হয়নি। কেন? এজন্য যে নবী-রাসূল বলে দেন কিতাবের উদ্দেশ্য কী? এবং এর উপর আমলের পদ্ধতি কী? আর মানুষকে বলা হয়েছে এই নবীর অনুসরণ করতে। তার উপর ঈমান আনতে এবং তার তরীকায় আমল করতে।

কিতাবুল্লাহ, 'রিজালুল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ্র কিতাব এবং আল্লাহ্র লোক। উভয়ের মিশ্রণে দ্বীনের সঠিক বুঝ তৈরি হয়। কিন্তু আল্লাহ্ যে নবী পাঠিয়েছেন এবং তাদের মাধ্যমে হিদায়াত ও ছোহবতের যে সামান দিয়েছিলেন তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে আমরা শুধু আল্লাহ্র কিতাব পড়বো। আদর্শের কী প্রয়োজন? আরে যদি আদর্শের প্রয়োজনই না থাকে তাহলে নবী পাঠানোর কী প্রয়োজন ছিল। মক্কার কাফেররা বলত, আমাদের উপর সত্য কোরআন কেন নাযিল

হয়নি। আল্লাহ্ এমনটা করেননি। কেননা মানুষের হেদায়াতের জন্য শুধু কিতাবই যথেষ্ট না, যতক্ষণ না তার একজন শিক্ষক বা মুরুব্বি নির্ধারিত থাকে। এটা মানুষের স্বভাব। দুনিয়ার কোন জ্ঞান এবং কোন শাস্ত্র মানুষ শুধু কিতাব অধ্যয়ন করে অর্জন করতে পারে না যতক্ষণ না এর কোন মুরুব্বি নির্দিষ্ট থাকে।

যেমন কেউ যদি ডাক্তারি বই পড়ে চিকিৎসা শুরু করে তবে গোরস্তান ভরে যাবে মানুষে। আমার কথা হলো রান্নার কলাকৌশল সম্পর্কে বইয়ে লেখা হয়েছে বিরিয়ানী এভাবে রান্না করে, কোরমা এভাবে বানায়, কাবাব সেভাবে, তাহলে বইটা সামনে রেখে রান্না শুরু করে দিন না? আল্লাহ্ই জানেন তা কী বস্তু হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন দক্ষ বাবুর্চির কাছে রান্না না শিখে বই দেখে রান্না করবেন। ততক্ষণ ভাল রাঁধুনী হতে পারবেন না।

রাসূলদের দিক-নির্দেশনা

আল্লাহ্র কিতাব হেদায়াতের বড় অবলম্বন। কিন্তু কীভাবে ঐ কিতাবের উপর আমল করে জীবন কাটাবেন? রাসূল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিক নির্দেশনা এবং জীবনের বিভিন্ন অবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত না শিখবে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ঐ কিতাব বুঝতে পারবে না। যেভাবে আল্লাহ্র কিতাবের উপর ঈমান আনা আবশ্যক ঠিক তেমনি আল্লাহ্র রাসূলদের উপর ঈমান আনা আবশ্যক। তাই কোরআনে বলা হয়েছে, যদি সীরাতের মুস্তাকিম চান তাহলে ঐ সব লোকদের পথ অনুসরণ করুন যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন। ভাল মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখুন। এরপর লক্ষ করুন আল্লাহ্ তা'আলা কীভাবে আপনার মাঝে ঐ সব পুণ্যের সমাবেশ ঘটান।

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ ঐ লোকদের পথ না যাদের উপর আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং যারা ভ্রষ্ট। অর্থাৎ সৎসঙ্গ গ্রহণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং অসৎ সঙ্গ থেকে বাঁচারও জোর তাকীদ দেয়া হয়েছে। তাই এমন না হয়ে যায় যে আপনি ঐ সব লোকদের অনুসরণ করছেন যাদের উপর আল্লাহ্র ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে। এই সূরার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, সীরাতে মুসতাকীম হাসিলের পদ্ধতি এটাই যে, আল্লাহর্ সম্মানিত বান্দাদের পথে চলা এবং তাদের সান্নিধ্য লাভ করা। আল্লাহ্ তা'আলা আপন ফযল ও করমে এবং স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের সকলকে সীরাতে মুস্তাকীম দান করুন, এবং দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

باسم تعالى

সূরা নাস (১)
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যাদুর প্রভাব এবং তা কর্তন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَآ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○ مٰلِكِ النَّاسِ ○ إِلٰهِ النَّاسِ ○ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ○ الَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُوْرِ النَّاسِ ○ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ○ آمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

অবতরণিকা

সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা!

কিছুদিন আগে আমি এই ধারাবাহিকতা শুরু করেছিলাম যে, পবিত্র কোনআন শরীফের যে সমস্ত সূরা আমরা নামাযে তেলাওয়াত করি এবং অধিকাংশ মানুষের তা মুখস্থও আছে তার কিছু ব্যাখ্যা ও তাফছীর আপনাদের খেদমতে পেশ করবো। এরই ধারাবাহিকতায় সূরা ফাতিহার তাফছীর কয়েক সপ্তাহ ধরে চলে আসছিল। আলহামদুলিল্লাহ প্রয়োজনীয় বয়ান সম্পূর্ণ হয়েছে। মাঝখানে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা চলছিল। ফের আমি আগের ধারাবাহিকতায় ফিরে আসছি। এজন্য আমি এখন আপনাদের সামনে সূরা ফালাক ও সূরা নাস তেলাওয়াত করেছি।

সূরা ফালাক ও সূরা নাসের শানে নুযূল

এই দুইটি সূরা (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) কোরআন শরীফের শেষ সূরা। আর দু'টোকে মুয়াওযাতাইনও বলা হয়। এই দুইটি সূরার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাওয়া হয়। আর এ দুই সূরা একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়। হাদীস শরীফে এর ব্যাখ্যা এই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলা নবী (পয়গাম্বর) বানিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় তের বছর অতিবাহিত করার পর যখন মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করলেন, তখন সেখানে এক ইহুদী গণক ছিল। যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রচণ্ড হিংসা করত। তার হিংসার কারণ ছিল এটাই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইসমাঈল আলাইহিসসালাম এর বংশধর। আর পূর্ববর্তী সব নবী হযরত ইয়াকুব আলাইহিসালাম এর বংশ থেকে এসেছিলেন। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম এর দুইপুত্র, হযরত ইসমাঈল আলাইহিসসালাম ও হযরত ইসহাক আলাইহিসসালাম। হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামের ছেলে হযরত ইয়াকুব আলাইহিসালাম।আর হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর আরেকটি নাম ছিল ইসরাঈল। পূর্ববর্তী যত নবী (আঃ) এসেছিলেন সকলেই হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর বংশধর, অর্থাৎ সব নবীর আগমন ঘটেছিল বনী ইসরাঈল থেকে।

আর এই ইহুদীরও বংশীয় সম্পর্ক ছিল বনী ইসরাঈলের সঙ্গে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল যে, আখিরী নবী হবেন সর্বোত্তম নবী। অর্থাৎ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর বংশে প্রেরিত হবেন। আর এটাই ছিল ইহুদী গণকের হিংসার একমাত্র কারণ আগের সব কিতাবে (তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন যে, সর্বশেষ আমি এমন একজন নবী পাঠাবো যিনি হবেন খাতামুল আম্বীয়া। যার নবুওয়াত হবে গোটা দুনিয়াবাসীর জন্য। এবং তার উম্মত থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত। তাওরাত এবং ইঞ্জিলের প্রথম দিকে এ কথার উল্লেখ রয়েছে। আর ঐ ইহুদীদের এই ধারণা ছিল যে, যেভাবে আজ পর্যন্ত সব আম্বীয়া (আঃ) বনী ইসরাঈল থেকে আগমন করেছেন। এবং হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর সন্তানদের মাঝে প্রেরিত হয়েছেন। ঠিক তেমনিভাবে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বংশেই আগমন করবেন। কিন্তু যখন তাঁর আগমন ঘটল হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর গোত্রে, তখনই ইহুদীদের মনে হিংসা

জন্ম নিল। সেই হিংসার বশবর্তী হয়ে ইহুদীরা একের পর এক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতে শুরু করল। অথচ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় গমন করার পর চেয়েছিলেন যে, ইহুদীদের সঙ্গে তার কোন প্রকার দুশমনী না হোক। সুতরাং একটি চুক্তি করা হল যে, আমরা পরস্পরে শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে থাকবো এবং একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসবো।

দুজাহানের বাদশা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বড় ধরনের চুক্তি করলেন ইহুদীদের সঙ্গে। বাহ্যিকভাবে ইহুদিরা যদিও চুক্তি করেছে। কিন্তু তারা ভিতরে ভিতরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে একের পর এক চক্রান্তও করে চলেছে। কোরআনে কারীমের বিভিন্ন স্থানে সেই চক্রান্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইহুদীদের জাদু

হিংসার বশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এক ইহুদী জাদু করেছিল। এই জাদুর ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কোন কোন সময় হুজুরের অবস্থা এমন হত যে, তিনি কোন কাজ করেছেন, কিন্তু তাঁর মনে হত তিনি করেননি। এই অবস্থার কারণে এক ধরনের ভাব বিরাজ করত এবং এই কষ্ট কয়েক দিন অব্যাহত থাকতো। একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাঃ) কে বললেন যে, আমার যে কষ্ট হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা স্বপ্ন যোগে আমাকে তার প্রকৃত কারণ জানিয়েছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্ন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখেছি যে, দু'জন ফিরিস্তা আমার নিকট এসে বসলেন, তারা পরস্পর কথা বলছেন। একজন বললেন, এই লোকের কী হয়েছে? তাকে কী কেউ কষ্ট দিয়েছে? দ্বিতীয় ফিরিস্তা উত্তরে বললেন যে, কোন এক ব্যক্তি তাঁর উপর যাদু করেছে। প্রথম ফিরিস্তা বললেন কে তাকে যাদু করেছে? উত্তরে দ্বিতীয়জন বললেন, লাবীদ ইবনে আসেম নামে এক ইয়াহুদী আছে যে, তাঁকে যাদু করেছে। অতঃপর প্রথম ফিরিস্তা আবার প্রশ্ন করলেন, কোন জিনিস দ্বারা যাদু করেছে? এবং কোথায় করেছে? উত্তরে দ্বিতীয় ফিরিস্তা বললেন যে, চিরুনীর মাধ্যমে যাদু করেছে। চিরুনী করার সময় চিরুনীতে যে চুল ওঠে এসেছে যাদুতে সেগুলো ব্যবহার করেছে। ফের প্রথমজন জিজ্ঞাসা করলেন কোথায়, দ্বিতীয়জন উত্তর দিলেন

কোন এক কূপের নিকট, প্রত্যেক দ্বার রক্ষকের নাম নিয়ে মন্ত্র পড়ে পড়ে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফিরিস্তাদের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

অতঃপর হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কূপের নিকট গিয়ে দেখলেন যে, কূপের সমস্ত পানি হলুদ হয়ে গেছে।

ওইখান থেকে চিরুনী সহ চুলগুলো ওঠে এলো। এর প্রেক্ষাপটে সূরা দুটি অবতীর্ণ হল।

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ এবং قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔

সূরা ফালাকের তরজমা

কুল (قُلْ) অর্থঃ বল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলা শিক্ষা দিয়েছেন যে, বল। এই শব্দগুলো দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। আমি আশ্রয় চাচ্ছি ঐ সত্তার যিনি উষার স্রষ্টা। যার আদেশে প্রভাত আলো উদ্ভাসিত হয়। আর আমি তাঁর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি ঐ সব বস্তুর অনিষ্ট থেকে, যা আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। আমি আশ্রয় চাচ্ছি রাতের অন্ধকার থেকে যখন তা ছড়িয়ে পড়ে। এবং ঐ সব মানুষের অনিষ্ট থেকে যারা (মন্ত্র) পড়ে পড়ে গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়। আমি আশ্রয় চাচ্ছি ঐ ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে, যে হিংসা করে। অর্থাৎ হিংসা করে এবং হিংসার পরিণামে কষ্ট দেয়। আমি এই অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

আপনি শুনে থাকবেন যে যাদু করে যাদু করার সময় সে কিছু মন্ত্র পড়ে একটা গিঁট দেয়। এরপর কিছু মন্ত্র পড়ে এবং একটা গিঁট দেয়।

এরপর আবার মন্ত্র পড়ে একটা গিঁট দেয়। এদের অনিষ্ট থেকে আমি আশ্রয় চাচ্ছি। কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদী লাবীদ ইবনে আসেম" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাদু করেছিলো। সে নিজের মেয়েদের যাদু শিখিয়েছিল। তারপর তার মেয়েরা আঁশের সূতায় গিঁট দিয়েছিল এবং ঐ আঁশের সুতা চিরুনীর ভেতর লাগিয়ে দিয়েছিল।

একেকটি আয়াতে একেকটি গিঁট খুলে গেল

সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস, এই দুইটি সূরার মধ্যে এগারটি আয়াত আছে, এবং সেই আঁশের সুতায়ও এগারটি গিঁট ছিল। কোন কোন রেওয়াতে বর্ণিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আয়াত পাঠ করলেন, আর একটি গিঁট খুলে গেল। হুজুর আবার দ্বিতীয় আয়াত পাঠ করলেন তখন

দ্বিতীয় গিট খুলে গেল। হুজুর আবার তৃতীয় আয়াত পাঠ করলেন তখন তৃতীয় গিট খুলে গেল। এমনিভাবে এগারটি আয়াত পাঠ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এগারটি গিট খুলে গেল।

যখন ঐ গিটগুলো খুলে গেল, তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাঃ) এর নিকট বললেন যে,

ایسالگ رہاہے کہ جیسے میں کچہ بندہاہوا تہااوراب کہل گیاہوں

অর্থ : এমন লাগছিল যেন কোন কিছু দিয়ে আমাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল এখন (বন্ধন) খুলে গেছে।

আমার উপর থেকে যাদুর প্রভাব আল্লাহ তা'আলা এভাবে দূর করে দিয়েছেন।

নবুওয়াতের আবশ্যকীয় বিষয়ে বাধা দেয়া অসম্ভব

এখানে আমি এই কথাও উল্লেখ করবো যে, আম্বিয়া কেরাম (আঃ) বিশেষ করে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী দু'জাহানের বাদশা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোন মানুষ, কোন শয়তান বা কোন জিনের এমন যাদুকরি শক্তি নেই যার দ্বারা রিসালাতের দায়িত্ব পালনে বাধা দিতে পারে, এবং তাঁর নবুওয়াতের কাজ আঞ্জাম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা হযরাতে আম্বিয়া (আঃ) কে হিফাযতে রাখেন। পৃথিবীর সব পরাশক্তি একত্র করেও কোন নবীর ক্ষতি সাধন করা অসম্ভব। চাই সেটা যাদুর মাধ্যমে হোক কিংবা অন্য কোন ভাবেই হোক, যার মাধ্যমে রিসালাতের দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে।

আম্বিয়া (আঃ) যাদুগ্রস্ত হতে পারেন

নবীদের সবাই মানুষ ছিলেন। যদিও তাঁরা ছিলেন সব মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাঁরা মানুষ ছিলেন। আর মানুষ হওয়ার কারণেই তাদের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি হত। সর্দি কাশি হত, জ্বর হত। এছাড়াও আরো নানা রোগে আক্রান্ত হতেন। আম্বিয়া (আঃ)দেরও এমন হত। যেমন কোন মানুষ যদি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে অসতর্ক থাকে। তখন সে অসুস্থ হয়ে যায়। নবীদের বেলাও অনুরূপ হত।

আর যাদুর কারণে যদিও কোন প্রকার রোগাক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু এটা আম্বিয়া (আঃ) এর নবুওয়াতের পরিপন্থী নয়। যেমন সাধারণ মানুষের ঠাণ্ডা কাশি হয়, জ্বর হয়। তেমনিভাবে আম্বিয়া (আঃ) এর যাদুর কারণে কোন ধরনের

শারীরিক সমস্যা হয়ে যাওয়া তো একটি স্বাভাবিক বিষয়, কারণ তারাও তো মানুষ, আর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গেও এমনটি হয়েছিল। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর সব মানুষের পথপ্রদর্শকরূপে প্রেরণ করা হয়েছিল। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সাঃ) কে সব অবস্থার সম্মুখীন করে দেখিয়েছেন যে, এই অবস্থায় যদি পতিত হয় তাহলে মানুষের কী করা উচিৎ?

রাসূলের সুন্নত কী হবে? এ অবস্থায় একজন মুসলমানের কর্ম পদ্ধতি কী হওয়া উচিৎ? এ সব কাজ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত এবং নবীজির পবিত্র জীবন চরিতে আল্লাহ্ তা'আলা একটি উত্তম দৃষ্টান্ত বলে দিয়েছেন। এটাও (হাকীকত) বাস্তব অবস্থা যে, লোকেরা হিংসা বশবর্তী হয়ে কিংবা কোন খারাবীর কারণে অন্যকে যাদু করে থাকে। যাদু অসুস্থতার মত। এটাও এক প্রকার কষ্ট দেওয়ার মাধ্যম এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরও যাদুর প্রভাব প্রকাশ করেছেন। এর একটা উদ্দেশ্য হল, যাদুকর তার সর্বশক্তি ব্যয় করেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের দায়িত্ব আঞ্জাম দানে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে পারেনা। এর মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদীয়াকে এই শিক্ষাই দেওয়া হচ্ছে যে, যদি কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটে, তাহলে তার কী করা উচিৎ? সুতরাং এদুটি সূরা অবতীর্ণ করে এটাই বলা হয়েছে যে, যদি কেউ যাদুগ্রস্ত হয়, তার জন্য উচিৎ হল এই দুটি সূরার আমল করা। এবং এই সূরা পড়ার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে যাদুর প্রভাব উঠিয়ে নিবেন। এবং যদি কারো উপর যাদুর প্রভাব নাও থাকে। তখনও এই সূরার আমল অভ্যাস করা। সবসময় পড়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হেফাযত করবেন। ইনশাআল্লাহ্।

সকাল-সন্ধ্যা এই দুই সূরার আমল

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে বললেন যে, আমার উপর এমন দুটি সূরা এভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। যা ইতোপূর্বে কোন নবীর উপর অবতীর্ণ হয়নি। এজন্য আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি সকাল-সন্ধ্যা ঐ সূরা দুটি পড়তে থাকে। সকালেও পড়বে এবং বিকালেও পড়বে। তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সব প্রকার খারাবী এবং বালা-মুছিবত থেকে হিফাযত করবেন।

এমন কি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর এই দুই সূরার আমল করতেন অর্থাৎ সূরায়ে ফাতেহা, আয়াতুল কুরছী এবং সূরা বাক্বারার কিছু আয়াত ও চার কুল পড়তেন। রাতে ঘুমের আগে "সূরা ফালাক ও সূরা নাছ" পড়ে হুজুর স্বীয় হাতের তালুতে দম করতেন এবং সারা শরীরে দু'হাত বুলিয়ে নিতেন। এটা ছিল হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবনের আমল।

মৃত্যুশয্যায় রাসূল (সাঃ) এর অবস্থা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত্যুশয্যার কঠিন সময় অতিক্রম করছিলেন, তখন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) তাঁর সম্পর্কে বললেন, আমি সারা জীবন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, শয়নকালে হুজুর সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে দুই হাতে দম করে সারা শরীরে হাত ফিরাতেন। কিন্তু এই সময় অবস্থা এমন হয়ে গেল যে, মারাত্মক অসুস্থতার কারণে না শুদ্ধ করে পড়তে পারতেন, আর না হাতে এ পরিমাণ শক্তি পেতেন যে, নিজে হাত উঠিয়ে শরীরে ফেরাবেন। অতঃপর হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন যে, স্বয়ং আমি সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পড়েছি এবং নিজের হাতে দম না করে হুজুরের হাতে দম করেছি এবং আমার নিজের হাত দ্বারা হুজুরের হাত মুবারক উঠিয়ে সারা শরীরে ফিরিয়ে দিতাম। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন যে, সারাজীবন হুজুরের এই আমল ছিল এবং ঘুমের আগে এ দুইটা সূরা হুজুর পড়তেন। উম্মতকে এটাও শিক্ষা দিতেন যে, সকাল-বিকাল এই দুই সূরার আমল করো।

انشاءالله আল্লাহ্ তা'আলা বালা-মুছিবত থেকে হিফাযত করবেন।

দুশমনের অনিষ্ট থেকে বাঁচার উত্তম মাধ্যম

এতক্ষণ যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে তা হলো এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট, তার শানে নুযুল।

আল্লাহ্ তা'আলা একথা বলে দিয়েছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি এ অবস্থার সম্মুখীন হয় অথবা সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা করে, তখন সে ব্যক্তির জন্য এ দুটি সূরা পড়া উচিৎ। এবং قل বলে বললেন এই সূরাটি পাঠ করুন।

আল্লাহ্ তা'আলা এর মধ্যে কী ক্ষমতা দিয়েছেন তিনিই ভাল জানেন। কিন্তুমানুষের বিপদ আপদ বালা মুসিবত অথবা যে কোন প্রকারের যাদু বা দুশমনের দুশমনি কিংবা হিংসুকের হিংসা থেকে বাঁচার জন্য এই দুই সূরা অধিক কার্যকরী। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এই বিরাট নেয়ামত দান করেছেন।

অন্যায়ের প্রতিশোধ নিও না ক্ষমা করে দাও

আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'জন ফিরিশতার মাধ্যমে ঐ ইহুদি যাদুকরের নামও বলে দিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, ঐ ব্যক্তির নাম ছিল লাবীদ বিন আসেম। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার কষ্ট দূর করে দিয়েছেন। আল-হামদুলিল্লাহ আমি সুস্থ হয়ে গেছি। আমি এখন চাইনা যে লোকেরা তাকে কষ্ট দিক। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ঐ লোকের নাম ঘোষণা করে দিতেন, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম যাদের সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মার বন্ধন ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিন্দু পরিমাণ ঘামের জন্য যারা রক্ত ঝরাতে প্রস্তুত ছিলেন তারা ঐ ইহুদিকে শেষ করে দিতেন। রাসূল বলেন, আমি এ জাতীয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাই না। আল্লাহ্ আমার কষ্ট লাঘব করেছেন এটাই যথেষ্ট।

রাসূলের সেই কাজ থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে, যদি কোন মানুষ কোন মানুষকে কষ্ট দেয়, তার সঙ্গে শত্রুতা করে কিংবা তার প্রতি অন্যায়-অবিচার করে, সেক্ষেত্রে যদিও শরীয়ত সমর্থন করে যে তার প্রতিশোধ নেয়া বা তাকে কষ্ট দেয়া। কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণ না করাটাই আম্বিয়া (আঃ)দের নীতি। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত হলো শত্রুতার প্রতিউত্তরে শত্রুতা না করা। তিনি উম্মতকে এক মহান শিক্ষা দিয়েছেন যে, যদি কেউ তোমার সঙ্গে বৈরী আচরণ করে শত্রুতা করে। কিন্তু তুমি নিজেকে তার শত্রুতা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছ। প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ নাওনি। আল্লাহ্ চাহে তোমার ছাওয়াবের ভাণ্ডার বিশাল হয়ে যাবে। আল্লাহ্ কোরআনে বহু জায়গায় এমন কথা বলেছন। নবীজীর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উম্মতকে এক মহান শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে রাসূলের সব সুন্নত মেনে চলার তাওফিক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

হিংসুকের হিংসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

সূরা ফালাক (২)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ إِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَآ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ○ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ○ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ○ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ○ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ○ آمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

প্রিয় ভাইয়েরা! আগের জুমআয় আমি বলেছিলাম যে, সূরা ফালাক ও সূরা নাস উভয় এক সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই প্রেক্ষিতে যে, যখন নবী করীম (সাঃ) এর উপর এক ইহুদী যাদু করেছিল। বিস্তারিত ঘটনা পূর্বের জুমআয় আলোচনা করা হয়েছে।

নবী করীম (সাঃ) কে এই দিক নির্দেশনা দেয়া হল যে, আপনি এই সূরা দু'টি তেলাওয়াত করুন। এই দুই সূরার মধ্যে এগারটি আয়াত রয়েছে, এবং যে সুতার উপর যাদুকর যাদু করেছিল, তার মধ্যেও এগারটি গিঁট ছিল। হুজুর (সাঃ) একটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন তো একটি গিঁট খুলে গেল। এভাবে একে একে এগারটি আয়াত যখন পড়া শেষ হল তখন এগারটি গিঁট খুলে গেল। পরে হুজুর (সাঃ) বললেন, আমার এমন লাগলো যে, আমি কোন বন্ধন থেকে মুক্ত হলাম। আর এই সূরাগুলো হলো উম্মতের জন্য হেদায়াতের মাধ্যম। অর্থাৎ উম্মতের জন্য মহান পথপ্রদর্শক।

প্রথম আয়াতের উদ্দেশ্য

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে–

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ -

আপনি বলুন। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ঐ সত্তার যিনি, ঊষার প্রতিপালক। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জাল্লা-শানুহুর আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহর এই গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তিনি প্রভাত রবির প্রতিপালক, যা মানুষ প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করে। রাত আসে, সন্ধ্যা হয়, অন্ধকার ছেয়ে যায়। এত গাঢ় অন্ধকার হয় যে, কোন কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এই অন্ধকারকে এমনভাবে দূর করে দেন যে, আঁধার ফুটে আলো উদ্ভাসিত হয়ে আলোকোজ্জ্বল পৃথিবী দেখা যায়। এটা মানুষের প্রতিদিনের দৃশ্য। অন্ধকার গোটা পৃথিবীকে গ্রাস করে নেয় কিন্তু সাময়িকভাবে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আপন অনুগ্রহে অসীম করুণায় এই অন্ধকার বিদূরিত করেন। ঊষার উন্মেষ ঘটান। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ○ (سورة القصص ٧١)

একটু চিন্তা কর, এই অন্ধকার যা রাতকে বেষ্টন করে ফেলে। এটা যদি স্থায়ী হয়ে যায় অর্থাৎ সর্বদাই শুধু অন্ধকার। তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কে আছে যে, তোমাদের নিকট আলো নিয়ে আসবে। আল্লাহ্ তা'আলা সূর্যকে বানিয়েছেন আলোর আঁধার সূর্যের আলো আমাদের কাছে আসে তার মাধ্যমে দিন হয়। এর মাধ্যমে আলো ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবী আলোকোদ্ভাসিত হয়। এরপর আবার একে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নিয়ম অনুযায়ী ডুবিয়ে দেন। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এবং সূর্য ডুবে যায়। মূলত পৃথিবী অন্ধকার, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সূর্যের আলোকে এমনভাবে নিযুক্ত করে দিয়েছেন যে, এই অন্ধকারেই আলো সৃষ্টি হয়ে যায়। যদি ঘটনাক্রমে আল্লাহ্ তা'আলা সূর্যকে থামিয়ে দেন। তাহলে রাত আর রাত অন্ধকার আর অন্ধকার। আঁধার আর আঁধারে পূর্ণ হয়ে যাবে পৃথিবী।

ছয় মাস রাত

এমন দৃশ্য দেখা যায় একেবারে উত্তর মেরুতে। যেখানে ছয় মাস রাত এবং ছয়মাস দিন হয়। উত্তর মেরুর কাছের দেশ হলো নরওয়ে। সেখানে আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। আমরা নরওয়ের এমন এক জায়গায় ছিলাম যে, একাধারে তিনদিন অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু সূর্যের দেখা মেলেনি। নিরবচ্ছিন্ন

রাত। তখন আমার মনে পড়েছে কোরআনে আল্লাহ্ তা'আলা, ইরশাদ করেছেন–

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ○ (سورة القصص ٧١)

যদি আল্লাহ্ তা'আলা, এই রাতকে স্থির ও স্থায়ী করে দেন অন্ধকারই বেষ্টন করে রাখে। তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কে আছে যে, তোমাদের কাছে আলো নিয়ে আসবে। أَفَلَا تَسْمَعُونَ তোমরা কি এ কথা শোন না, আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ ও করুণায় অন্ধকার ছেয়ে যায়। প্রতিদিন আঁধার আসে ও যায়। তা সর্বদা স্থির থাকে না বরং আল্লাহ্ তা'আলা এই অন্ধকারেই আলো সৃষ্টি করেছেন এবং এর থেকে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটান।

ইনিই রাব্বুল ফালাক। ঊষার অধিপতি, এর মাধ্যমে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, অন্ধকার এই অর্থে ক্ষতিকর যে, মানুষ তাতে পথ হারিয়ে ফেলে। আর এই অন্ধকারই মানুষকে পথভ্রষ্ট করে আর শিরকি শক্তি রাতেই বেশি কার্যকর হয়। যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা অন্ধকার অপসারণ করেন এবং আঁধার বিদূরিত করেন সেভাবে ঊষার আলোও বিকশিত করেন।

কষ্ট লাঘবকারী সত্তা তিনি

তিনিই এ সত্তা যিনি এ বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান যে, যদি আপনার কোন কষ্ট হয় বা কেউ কোন ক্ষতি করে। কিংবা কোন বিপদ দেখা দেয়, তো আল্লাহ্ তা'আলাই তোমার কষ্ট লাঘব করবেন। আপনার ব্যথা উপশম করবেন ও দুঃখকে সুখে রূপান্তরিত করবেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা এজন্য বলেছেন, বলো আমি পানাহ চাই قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ওই সত্তার যিনি ঊষার রব।

কোন বস্তুর পানাহ চাচ্ছি

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ আমি পানাহ চাচ্ছি ওই সবের অনিষ্ট থেকে যা আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষেরও স্রষ্টা ফেরেশতাদেরও স্রষ্টা, নবীদেরও স্রষ্টা, এমনকি শয়তানেরও স্রষ্টা, কাফেরের স্রষ্টা। সব কিছুর স্রষ্টা। আর এসব সৃষ্টির কিছু এমন আছে যেগুলো অনিষ্ট ছড়ায় বা যার মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি সাধিত হয়। এক কথায় বলতে গেলে مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ অর্থাৎ গোটা জগতে যত মাখলুক আছে এ সবের অনিষ্ট থেকে আমি 'রাব্বুল ফালাকে'র ঊষার অধিপতির আশ্রয় প্রার্থনা করি।

কষ্টমুক্ত কোন মানুষ নেই

এই দুই আয়াতে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, এ জগতে মানুষ অবশ্যই ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যত বিত্তশালী সম্পদশালী হোক, হাকিম হোক কিংবা উত্তম থেকে উত্তমতর মানুষ হোক। পয়গাম্বর নবী ওলী যেই হোক কেউই কষ্ট মুক্ত নয়। এই দুনিয়ায় কোন না কোন কারণে মানুষের কষ্ট হয়ই। সে যতই প্রভাবশালী হোক দাপটের অধিকারী হোক কিন্তু কখনো না কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। সারা দুনিয়ায় এমন কোন মানুষ নেই যে, তিনি দাবি করতে পারেন যে গোটা জীবনে তার কোন কষ্ট হয়নি।

তিনটি জগত

আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি জগত সৃষ্টি করেছেন। একটা জগত এমন যে, সেখানে শুধু শান্তি আর শান্তি। আরাম আর আরাম, আনন্দ আর আনন্দ। সেটা হলো জান্নাত আরেকটা জগত যেখানে শুধু ক্রোধ আর ক্রোধ, দুঃখ কষ্ট যাতনায় ভরপুর। আল্লাহ্ তা'আলা মাফ করুন সেটা হলো জাহান্নাম। আরেকটা জগত এমন আছে যেখানে উভয়ের সংমিশ্রণ, সুখ-শান্তি, দুঃখ-কষ্ট। হাসি আনন্দ সবই আছে, সেটা হলো দুনিয়া। এটা এমন একটা জগত যেখানে না পূর্ণ আনন্দ, না পূর্ণ কষ্ট। উভয়টাই এক সঙ্গে থাকে এ জন্য কষ্টও হয় ক্ষতিও হয়।

আল্লাহর দিকে রুজু করুন

কিন্তু যে বিপদ আসে সে বিপদ আসার পর তোমার কাজ হওয়া উচিত ঐ বিপদকে খালিকের দিকে রুজু করো। বলুন, আয় আল্লাহ্ আমি আপনার আশ্রয় চাই এই বিপদ থেকে قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ـ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ আয় আল্লাহ্ আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। প্রত্যেক ওই বস্তুর অনিষ্ট থেকে যা আপনি সৃষ্টি করেছেন। তাহলে আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা আশ্রয় দেবেন। কেননা বিপদ তারই সৃষ্টি এবং বিপদের কারণও তিনি সৃষ্টি করেছেন। তখন আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা যখন দয়া করবেন বিপদ দূর হয়ে যাবে। অথবা ঐ কষ্ট আপনার জন্য নেয়ামত এবং রহমতস্বরূপ হয়ে যাবে। এই অর্থে যে এই কষ্ট ও মুসিবতের মাধ্যমে, আপনার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আপনি পুরস্কৃত হবেন, বিনিময় লাভ করবেন, সুতরাং আপনারা বিপদে ধৈর্য ধরুন। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উপর তুষ্ট থাকুন। আল্লাহ্র ফায়সালা মেনে নিন। ধৈর্যের প্রতিদান মিলবে–

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ○ (سورة الزمر ١٠)

ধৈর্যশীলদের অফুরন্ত প্রতিদান দেয়া হবে। এমনকি হাদীস শরীফে এসেছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যখন আখেরাতে ধৈর্যশীলদের ধৈর্যের প্রতিদান দেয়া

হবে। ছবরের বিনিময় দেয়া হবে তখন মানুষ কামনা করবে। হায়, দুনিয়ায় যদি আমাদের শরীরের চামড়া কাঁচি দিয়ে কাটা হত আর আমরা ধৈর্য ধরতাম। তাহলে আজ ধৈর্যশীলদের যে অফুরন্ত প্রতিদান দেয়া হচ্ছে। তা আমাদেরও দেয়া হত।

মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য

মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য এটাই যে, কাফের আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান আনে না। আল্লাহ্ জাল্লাজালালুহুর কুদরত, তাঁর রহমত, তাঁর হিকমতের উপর ঈমান আনে না। তারও বিপদ আসে এবং একজন মুমিনেরও আসে। কিন্তু বিপদের সময় কাফের অভিযোগ করে বলে, এই বিপদ কেন আমাকেই পেল? সে বিপদের কারণে অভিযোগ করতে থাকে। আল্লাহর ইচ্ছার এবং তার কুদরতের শেকায়াত করে। তখন তার জন্য কষ্ট আর কষ্ট, বিপদ আর বিপদ خسر الدنيا الآخرة তার দুনিয়াও বরবাদ আখেরাতও বরবাদ। কষ্ট যাতনা ভোগ করা ছাড়া তার কোন নিস্তার নেই। পক্ষান্তরে একজন মুমিন যখন বিপদে পড়ে, তখন সে ঐ বিপদ থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অসুস্থ হয় তো চিকিৎসা নেয়। কিন্তু আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকে কোন অভিযোগ করে না বরং আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে। আয় আল্লাহ্! আমি দুর্বল আমি এই বিপদ সহ্য করতে পারছিনা। আমার দুর্বলতার উপর দয়া করে আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করুন। তখন দুঃখ কষ্ট বিপদ তার জন্য হয়ে যায় রহমত।

কষ্ট ও কল্পনার সময় বলো

এজন্য এই ছোট একটি বাক্যে শেখানো হচ্ছে যখন কোন বিপদে পড়েন, কিংবা পড়ার আশংকা থাকে উভয় অবস্থায় বলুন, قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ আমি তো রাব্বুল ফালাকের আশ্রয় চাচ্ছি। مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ওই সব অনিষ্ট থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলার দিকে রুজু হওয়ার শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। আর যখন বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার দিকে রুজু করে তখন কষ্ট শান্তিতে রূপান্তরিত হবে কিংবা যতক্ষণ এ কষ্ট থাকবে ততক্ষণ তার জন্য শুধু রহমত হতে থাকবে। এটা আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলার ওয়াদা। এটা কোন মিথ্যে কথা নয়। এ জন্য যখন কোন বিপদ দেখা যায়। কিংবা ভবিষ্যতে ঘটার আশংকা থাকে, বলুন, قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ আমি আপন প্রতিপালকের পানাহ চাচ্ছি। ওই বিপদ চাই মানুষের দিক থেকে আসুক কিংবা কোন শত্রুর পক্ষ থেকে আসুক। কিংবা জিন বা শয়তান ক্ষতিসাধন করুক অসুস্থ হও বা দরিদ্র

হও। কিংবা নিঃস্ব বা তোমার স্বজন তোমাকে বিপদে ফেলেছে সর্বাবস্থায় আল্লাহর পানাহ চাও। مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ এর মধ্যে সব মাখলুক অন্তর্ভুক্ত।

আউযুবিল্লাহ্ পড়া

কোরআনে বর্ণিত হয়েছে–

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ○ (سورة حم السجدة ٣٦)

অর্থাৎ যখন শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়, তখন আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন বিতাড়িত শয়তান থেকে। কু-মন্ত্রণার উদ্দেশ্য হলো, মনে গুনাহের ইচ্ছা সৃষ্টি করা। মনে গুনাহের প্রতি আগ্রহ জন্মানো যে, অমুক গুনাহ করবো। এটা শয়তানের প্ররোচনা। এমন অবস্থায় আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন। أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়ুন, আয় আল্লাহ্! আমি আপনার আশ্রয় চাই বিতাড়িত শয়তান থেকে। উদাহরণস্বরূপ ক্রোধ এল এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাথায় রক্ত চড়ে গেল। এই অবস্থায় বড় ভয় হয় যে, মানুষ বাড়াবাড়ি করে ফেলে। কিংবা কোন খারাপ কথা বলে ফেলে। যার ফলে মন ভেঙ্গে যায়। অথবা গালি দেয়, কাউকে মারধর করে। এইজন্য ক্রোধ খারাপ জিনিস। যা মানুষকে অসংখ্য গুনাহে লিপ্ত করে। রাসূল (সাঃ) এর কাছে এক সাহাবী এসে বললেন যে, আমাকে কিছু নসীহত করুন। তখন হুজুর (সাঃ) বললেন, لاتغضب রেগো না। কারণ রাগ খুব খারাপ কাজ। সুতরাং যখন রাগ আসবে এবং আশংকা হবে, রেগে গেলে আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকবে না এবং কোন অঘটন ঘটিয়ে ফেলবো। তখন আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়ে পড়ুন– أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ কেননা শয়তান আমাকে রাগতে প্ররোচিত করছে। তখন আল্লাহর পানাহ চেয়ে বলুন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি বিতাড়িত শয়তান থেকে। মোটকথা কোন খারাবি সামনে এসে পড়ছে আল্লাহর কাছে পানাহ চান। মোটকথা এটাই উদ্দেশ্য قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ـ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ আয় আল্লাহ্! আমি পানাহ চাচ্ছি ঊষার রবের ওই সব অনিষ্ট থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। এটা মুমিনের রাতদিনের ওযীফা। অর্থাৎ সকাল বিকেলের আমল। এই দুই সময়ে সম্ভব না হলে যে কোন নির্দিষ্ট এক সময়ে পড়বেন। যখন কোন বিপদের মুখোমুখি হন তখন তো আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তার অভিমুখী হোন। আল্লাহ্ তা'আলার দিকে রুজু হয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করুন। দু'আ এমন বিষয় যা মানুষের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক সুদৃঢ় করে ওসব সফলতার একমাত্র মাপকাঠি। আল্লাহ্ তা'আলা তার ফযলে ও আপন অনুগ্রহে আমাদের সবাইকে এ সফলতা দান করুন, আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

হিংসুকের হিংসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো

সূরা ফালাক (৩)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ○ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ○ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ○ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ○ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ○ آمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

সূচনা

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! আগের দুই জুমায় সূরা ফালাকের কিছু অংশের তাফসীর করা হয়েছিল। লক্ষ এটাই ছিল যে, যেহেতু এই সূরা আমরা নামাযে পড়ি তাই তার উদ্দেশ্য যেন আমাদের যেহেনে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এই সূরায় যে হেদায়াত রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর আমাদেরকে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

আমি বলেছিলাম যে এই দুই সূরা-সূরা ফালাক, এবং সূরা নাসকে معوذتين মু'আওত্তযাতাইন বলে। এই দুই সূরা এই প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছিল যখন এক ইহুদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাদু করেছিল। তখন আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা এই দুই সূরা নাযিল করেন এবং এই দুই সূরা পড়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাদু দূর করার হুকুম দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে এই সূরাদ্বয়ের বরকতে ঐ যাদুর প্রভাব

বিনষ্ট করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেছেন, বলুন, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি এ সত্তার যিনি উষার মালিক। مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ এবং প্রত্যেক ওই বস্তু থেকে 'পানাহ, চাচ্ছি যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ গোটা জগতে যত বস্তু আছে সব আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুর সৃষ্টি। যদি তার মাঝে কোন অনিষ্ট থাকে তাহলে ঐ অনিষ্টকে দূর করার ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ন্ত্রণে। এজন্য আমি তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এই আয়াতে সব অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে

এখানে প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, প্রত্যেক ওই বস্তু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো যা আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার সব প্রকার মাখলুকের অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে থেকে আশ্রয় চান। এর মধ্যে সব কিছু অন্তর্ভুক্ত। সৃষ্টিজীবের সমস্ত অনিষ্ট তার মাঝে ঢুকে পড়েছে। চাই সে ক্ষতিটা মানুষের পক্ষ থেকে হোক, অথবা জ্বীনদের পক্ষ থেকে হোক। শয়তানের পক্ষ থেকে, অথবা প্রাণীদের থেকে। অথবা পক্ষীকূল থেকে, বা যমীনের কীটপতঙ্গ থেকে যে কোন ধরনের ক্ষতি। তার অনিষ্ট থেকে এই আয়াতে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি বস্তুর কথা খুব ভালভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রথম বস্তু হলো যে, وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায়। কেননা সাধারণত যে সব লোকেরা যাদুকর হয় অথবা নিচু শ্রেণীর কাজ করে তারা গভীর রাতকে বেছে নেয়। অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়কে নির্ধারণ করে, এবং অন্ধকারে শয়তানের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করে। শয়তানের সাহায্য চায় এবং রাতের আঁধারেই যাদুমন্ত্র করে। এজন্য বিশেষভাবে বলেছেন যে, অন্ধকার যখন ছেয়ে যায় তখন বলুন, আমি তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কেননা অধিকাংশ সময় যাদুর কাজ হয় রাতের আঁধারেই।

অন্ধকার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, অন্ধকার এমন একটা বস্তু যার থেকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা আবশ্যক। আমরা তো অন্ধকার বলতে বুঝি যে, সূর্য ডুবে গেছে, অন্ধকার হয়ে গেছে। কিন্তু আসল অন্ধকার হলো আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা, খারাপ কাজ, গুনাহ, এগুলোই হলো অন্ধকার। সঙ্গে সঙ্গে এও বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তোমরা অন্ধকারে যাও চাই ঐ অন্ধকার অনুভূত হোক। যেমন বাহ্যিক অন্ধকার, কিংবা আমলের অন্ধকার,

আকীদাগত অন্ধকার অথবা চিন্তা-চেতনার অন্ধকার। এই সব অন্ধকার থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো।

যখন আমরা কোন খারাপ কাজে লিপ্ত হই কিংবা আমাদের কোন ক্ষতি হয় তখন বসে বসে আলোচনা করি যে, এটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে। লোকেরা অমুক অপকর্ম করছে। মানুষের মাঝে এই কথা ছড়িয়ে পড়েছে। অমুক কথা ছড়িয়ে পড়েছে। এ ধরনের অভিযোগ করে ফিরি। কিন্তু এই অনুভূতি ও ভাবনা খুব কম মানুষেরই থাকে যে এই অন্ধকারের যদি কোন চিকিৎসা থেকে থাকে তাহলো আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুর রহমতের আঁচলে আশ্রয় নেয়া। আর আশ্রয় গ্রহণ করার তাওফিক খুব কম মানুষেরই হয়।

কুরআনে কারীমের ইরশাদ যে, যখন কোন অন্ধকারে পতিত হও তখন আমাকে ডাকো।

হযরত ইউনুস (আঃ)

কোরআনে কারীমে হযরত ইউনুস আলাহিস সালামের আলোচনা এসেছে। হযরত ইউনুস (আঃ) এর ব্যাপারে সবাই জানি যে তাকে মাছ গিলে ফেলেছিল এবং তিনি মাছের পেটে ছিলেন। এখন কল্পনা করুন যে একজন জ্যান্ত মানুষ একটা বড় মাছের পেটে চলে গেলে মানুষটার কি অবস্থা হতে পারে। মাছের পেট যেখানে আলোর লেশমাত্রও নেই। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। যখন হযরত ইউনুস (আঃ) ঐ অন্ধকারে পৌছলেন, সে অবস্থা সম্পর্কে কোরআনে করীম বলছে–

فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ○

(سورة الأنبياء ٨٧)

ওই অন্ধকারে পতিত হওয়ার পর সে আমাকে ডেকে বলল, "আয় আল্লাহ্! আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আপনার পবিত্র সত্তা সব দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। আমি যুলুমকারীদের দলভুক্ত ছিলাম"। এরই ফলস্বরূপ আমি অন্ধকারে বন্দী হয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যখন সে অন্ধকারে আবদ্ধ হয়ে আমাকে ডাকল, তখন فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে ওই ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন আবদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি দিলাম। কল্পনা করেছেন কেমন আবদ্ধ পরিবেশ। আলো বাতাস বলতে কিছু নেই। যৎসামান্য বাতাস যদিও আসে তাও মাছের শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে। যা দুর্গন্ধযুক্ত। আর এ অবস্থা একজন মানুষের জন্য কতটা অসহনীয় হতে পারে।

وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ আমি এভাবে মুমিনদের নাজাত দেই। এর কী অর্থ? যে যখন কোন মুমিন কোন অন্ধকারে আবদ্ধ হয়ে যায় অতঃপর لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ পড়ে আমাকে ডাকে তখন আমি তাকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দেই।

অন্ধকার থেকে পানাহ কেন?

তো বিশেষ করে قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۔ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ এরপর অন্ধকার থেকে এজন্যই আশ্রয় প্রার্থনা করা হচ্ছে যে, আজ যদি আমরা আমাদের আশপাশে জরিপ চালাই তাহলে দেখবো অন্ধকার ঘিরে রেখেছে। কুফুর শিরকের অন্ধকার, ফিসক ফুজুরের অন্ধকার, গুনাহ এবং বদ আমলের অন্ধকার, হারাম খোরদের অন্ধকার চারদিকে ঘিরে ফেলেছে। এর মাঝে যে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা এই যে, এ জাতীয় আঁধারে আমার আশ্রয় প্রার্থনা করো। قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۔ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۔ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۔ সর্বপ্রকার অন্ধকার থেকে যখন তা ছেয়ে যায়। আমরা আজ পরিবেশের অভিযোগ করছি। রাজনৈতিক ব্যাখ্যা প্রদান করছি। বর্তমান অবস্থার বিশ্লেষণ করছি। এর মাধ্যমে সেমিনারগুলো থাকছে জমজমাট। তাই আল্লাহ্ তা'আলার অভিমুখী হয়ে কেঁদে কেঁদে বলো, আয় আল্লাহ্! আমরা অন্ধকারে আটকা পড়েছি। আপনার রহমত দ্বারা আমাদের উদ্ধার করুন। আমাদেরকে আপনার রহমতের আঁচলে উঠিয়ে নিন, আর এই অন্ধকারের অপনোদন করুন আমাদের থেকে। তাই এই শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, কোন ফিকির করা ছাড়াই আল্লাহ্ তা'আলার দিকে রুজু হয়ে তার পথ গ্রহণ করো। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আশ্রয় দিবেন, এবং কঠিন পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফিক দান করুন। আমীন।

গ্রন্থির উপর ফুঁকদানকারীদের অনিষ্ট থেকে

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ আমি পানাহ চাই ওই লোকদের অনিষ্ট থেকে যারা (মন্ত্র) পড়ে পড়ে গিঁরার উপর ফুঁকে। এ অবস্থায় যাদুগরেরা মন্ত্র পড়ে তার উপর গিঁট দেয়। একটা গিঁট দেয় এবং তার উপর ফুঁক দেয়। দ্বিতীয় গিঁট দেয় এবং মন্ত্র পড়ে ফুঁক দেয়। তৃতীয় গিঁট দেয় এরপর মন্ত্র পড়ে ফুঁক দেয়। এ সব শয়তানি কাজ। যা শয়তানরা যাদুগরদের শিক্ষা দেয়। এরপর তারা কাউকে যাদু করে। কাউকে কষ্ট দেয়। কারো মাঝে বিদ্বেষ তৈরি করে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাই আল্লাহ বলছেন ঃ "বল আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই ঐ লোকদের অনিষ্ট থেকে যারা গিরার ফুঁক দিয়ে গিঁট বাঁধে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যাদু ও ফুঁক

এর আগে আমি বলেছিলাম যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতার মাধ্যমে যাদু সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন যে অমুক স্থানে একটা তাগা আছে। যাতে এগারোটি গিঁট মারা হয়েছে। সারওয়ারে দুআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফালাক ও সূরা নাস তেলাওয়াত করলেন। এই সূরাদ্বয়ের আয়াত সংখ্যা হলো ১১টি। ১টি আয়াত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি গিঁট খুলে যাচ্ছিল। এভাবে ১১ আয়াত পড়া হলে ১১টি গিঁট খুলে যায়। সারকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন এমন মনে হলো যেন আমি কোন বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেছি। এজন্য আল্লাহ বলেছেন যে, বল আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি সব লোকদের অনিষ্ট থেকে যারা গিঁটসমূহে (মন্ত্র) পড়ে ফুঁক দেয়।

হিংসুকের হিংসা থেকে পানাহ

সর্বশেষ বলেছেন আমি আল্লাহর পানাহ চাই হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন তারা হিংসা করে। এই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সাধারণত যারা যাদুটোনা করে তার হিংসার বশবর্তী হয়েই করে। কাউকে আল্লাহ্ তা'আলা আগে বাড়িয়ে দিয়েছেন, সে সম্পদের মালিক হয়েছে, কিংবা খ্যাতিমান হয়েছে। অথবা জনপ্রিয়তা লাভ করে বা অন্যদের তুলনায় শক্তি সামর্থের অধিকারী হয়েছে। ফলে এখন মানুষ তাকে হিংসা করতে শুরু করে। এর থেকেও পানাহ চাও যে আয় আল্লাহ্! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আপনার হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমেই বলেছেন সব সৃষ্টি জীব থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও। কিন্তু পরবর্তীতে এই তিনটি বস্তু পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে যে আর প্রথমত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এমন তিনটি গুণের কথা বলেছেন, মানুষের ক্ষতিসাধনে যে পক্ষের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

হিংসা কাকে বলে?

হিংসা অর্থ কারো নেয়ামত দেখে মনে মনে এই কামনা করা যে, তার থেকে নেয়ামত দূর হয়ে যাক, চাই তা আমার অর্জিত হোক বা না হোক।

যেমন, যদি কেউ অনেক টাকা-পয়সার মালিক হল তখন মনে মনে এই কামনা করা যে তার টাকা পয়সা কমে যাক। তার উপার্জন কমে যাক। কিংবা

এক ব্যক্তি অনেক খ্যাতি লাভ করেছে। মনে এই খেয়াল আসল যে সে অখ্যাত হয়ে যাক। চাই আমার খ্যাতি লাভ হোক বা না হোক। কিন্তু তার ঐ নেয়ামত দূর হয়ে যাক। এটাকে বলে হিংসা।

আর হিংসা এমন একটা রোগ যার কারণে হিংসুক সবসময় এই ফিকিরে থাকে, কীভাবে অন্যের ক্ষতি করা যায়।

ঈর্ষা করা জায়েয

ঈর্ষার অর্থ হলো, এক ব্যক্তি নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছেন। তখন মনে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে যে যেমন তার নেয়ামত অর্জন হয়েছে ঠিক তেমনি আমারও অর্জিত হোক। এটা জায়েয। বিশেষভাবে যদি এই ঈর্ষা দ্বীনের ব্যাপারে হয়। এক ব্যক্তি অনেক বড় আলেম। তখন আপনার মনে চায় আমিও তার মত আলেম হব। বড় ভাল কথা। এর মাঝে কোন কোন সংকীর্ণতা নেই। একজনের মেধা ভাল। কামনা করলেন আমার মেধাও যেন এমন হয়ে যায়। তো এর মাঝে মন্দ কিছু নেই। গুনাহও নেই।

হাফেজ ইবনে হাজার (রঃ)-এর ঈর্ষা

হাফেজ ইবনে হাজার (রা.) একজন বড় মাপের আলেম এবং মুহাদ্দিস ছিলেন। হাদীস শরীফে এসেছে যে, যমযমের পানি পান করার সময় মানুষ যে নিয়ত করে আল্লাহ্ তা'আলা তার সেই নিয়ত কবুল করেন।

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ -

তিনি বলেন, আমি যখন যমযমের পানি পান করি তখন পান করার সময় এই দু'আ করেছি যে, ইয়া আল্লাহ্! আমাকে সেই ধীশক্তি দান করুন যা হাফেজ যাহাবীকে দিয়েছিলেন। এটা হলো ঈর্ষা। এতে কোন গুনাহ নেই। এটা কোন নাজায়েয কাজ নয়। কিন্তু অন্যের কাছ থেকে নেয়ামত চলে যাক, আমার লাভ হোক বা না হোক। এ ধরনের মনোভাব পোষণ করাকে হাসাদ বা হিংসা বলে। আল্লাহ্ হেফাজত করুন। এটা একটা মন্দ ব্যাধি। অধিকাংশ সময় মনে এ ধরনের ইচ্ছা জাগে। আর হিংসুকের পরিণতি হলো যে সে হিংসানলে দগ্ধ হয়ে মরে। কিন্তু সে সবসময় এই চেষ্টায়রত থাকে যে কীভাবে তার ক্ষতি করা যায়। তার গিবত করবে। তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। মানুষের মাঝে বদনাম ছাড়ানোর চেষ্টা করবে। যাদু করবে, বান মারবে। যত ধরনের ক্ষতি করা যায় সে তার চেষ্টায় রত থাকবে।

অনিচ্ছাকৃত কল্পনা গুনাহ নয়

এখানে এ বিষয়টি উল্লেখ করছি যে, একটা তো এমন হয় যে অনিচ্ছাকৃত ভাবে মানুষের মনে এই কল্পনা আসে যে, অমুক এগিয়ে গেছে। এ কারণে মন ভারী হয়। এটা অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়। মানুষের এ ব্যাপারে কোন ক্ষমতা থাকে না।

অনিচ্ছাকৃতভাবে মনে খেয়াল আসল। ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলেন ঃ অনিচ্ছাকৃত খেয়ালের উপর ইনশাআল্লাহ কোন পাকড়াও হবেনা। কেননা এটা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। যদিও অনিচ্ছাকৃতভাবে এসেছে এবং গুনাহ নেই। কিন্তু খতরনাক মু'আমালা। কেননা মনে যদি এই খেয়াল বেশীক্ষণ বদ্ধমূল থাকে, তাহলে একপর্যায়ে মানুষকে গুনাহের কাজে বাধ্য করবে। কারো খারাপির কথা মনে হলো যে ঐ ব্যাটা বড় বাড় পেয়েছে। মাথায় উঠেছে। ফলে মনে ক্ষোভ জমে। রোষানলে ফেটে পড়ে, ঐ ব্যক্তির ক্ষতি সাধনে উদ্যত হয়। গীবত ও পরনিন্দা করে বেড়ায়।

অনিচ্ছাকৃত কল্পনার চিকিৎসা

হযরত ইমাম গাজ্জালী (রাঃ) বলেন, তার চিকিৎসা হলো, মনে খেয়াল চলে এসেছে তাকে মন থেকেই খারাপ ভাবা। এই খেয়াল যা আমার মনে এসেছে এটা ভাল খেয়াল নয়। বরং মন্দ খেয়াল। এ ব্যাপারে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। আয় আল্লাহ্! আমার মনে মন্দ খেয়াল আসছে, আমি এর উপর ক্ষমা চাচ্ছি।

দ্বিতীয় চিকিৎসা এই যে, যার ব্যাপারে মনে হিংসার জন্ম নিচ্ছে তার জন্য দু'আ করা যে, আয় আল্লাহ্! আপনি তাকে আরো উন্নতি দান করুন। যদি হিংসা হয় সম্পদের ব্যাপারে তাহলে আয় আল্লাহ্! আপনি তাকে আরো সম্পদশালী করুন। যদি খ্যাতির ব্যাপারে হিংসা হয় তাহলে আয় আল্লাহ্ আপনি তাকে আরো খ্যাতিমান করুন। হিংসা যদি হয় তাকওয়া ও খোদাভীতির ব্যাপারে তাহলে আয় আল্লাহ্! তাকে আরো মুত্তাকি ও ইবাদতগুজার বানান। এভাবে দু'আ করা বড় কঠিন কাজ। কারো মনে হিংসার উদ্রেক হলে তখন এই দু'আ করেন যে, আয় আল্লাহ্! তাকে আরো উন্নতি দান করুন, নিঃসন্দেহে তার মন থেকে হিংসা চলে যাবে। চিকিৎসা এটাই, চাই তিতা ঢেকুরের মত লাগুক, চাই ভাল লাগুক। তৃতীয়ত মানুষের কাছে তার প্রশংসা করবে। আর যখন এই তিনটি জিনিসের সমন্বয় ঘটবে ঐ খেয়ালকে খারাপ ভাববে, আল্লাহর কাছে এস্তেগফার করবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দু'আ করবে যে, আয় আল্লাহ্ তার সম্মান ও মর্যাদা বুলন্দ করুন এবং তাকে উন্নতি দান করুন। এবং মানুষের কাছে

প্রশংসা করবে, তো ইনশাআল্লাহ এই খেয়াল নিজেই মরে যাবে, এবং ইনশাআল্লাহ হিংসার গুনাহ এবং শাস্তি তার মাথা থেকে নেমে যাবে ও এটা হলো ঐ ব্যক্তির চিকিৎসা যার মনে হিংসার খেয়াল জন্মায়। আর এটা এমন রোগ যে কম বেশি সব মানুষের মাঝে তার অবচেতন মনেই কোন না কোন সময় জন্ম হয়ে যায়। এ ব্যাপারে বড় লক্ষ রাখা প্রয়োজন এর চিকিৎসা অত্যাবশ্যকীয়। যার সঙ্গে হিংসা করা হচ্ছে তার জন্য আয়াতে করীম হলো : وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ আয় আল্লাহ্ আমি আপনার আশ্রয় চাই আপনি আমাকে হিংসুকের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখবেন। চাই ঐ হিংসার অনিষ্ট যাদুর আকৃতিতে হোক, কর্মের মাধ্যমে হোক। যেভাবেই হোক আল্লাহ্ তাকে হেফাজত করবেন।

হিংসুক থেকে প্রতিশোধ গ্রহণীয় না, মাফ করে দাও

বলা হয়েছে হিংসুকের হিংসার উত্তর দিও না। এমন না হয় যে হিংসার কারণে আপনিও হিংসা করছেন। তার বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করেছেন। বরং আল্লাহর পানাহ চান। ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করুন। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। যখন কোন ব্যক্তি কারো কষ্ট সহ্য করে তখন আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা স্বীয় ফযলও করমে তাকে নৈকট্য দান করেন।

إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ، إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

'ধৈর্যশীলদের ধৈর্যের প্রতিদান বিনা হিসাবে দেয়া হবে।'

আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা এই শিক্ষা দিয়েছেন যে শুধু বলো।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ـ

আল্লাহ্ আমাদের আশ্রয় দিবেন ও সব ধরনের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে সব কাজ তার দিকে ফেরানোর তাওফীক দান করুন এবং তার আশ্রয় দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

হিংসার স্তর এবং তার চিকিৎসা
সূরা ফালাকের তাফসীর

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَآ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ○ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ○ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ○ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ○ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ○ آمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

সূচনা

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! বিগত ছয় সাত সপ্তাহ আমার সফরে কেটেছে। এজন্য অনুপস্থিত ছিলাম। এর আগে কোরআনের ঐ সব সূরার ধারাবাহিক ব্যাখ্যা শুরু করেছিলাম যেগুলো অধিকাংশ সময় আমরা নামাযে পড়ে থাকি। সূরা ফাতিহার পর সূরা ফালাকের বর্ণনা পেছনের কয়েক জুমায় হয়েছে। এই সূরার মধ্যে আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা 'তাকীদ, দিয়েছেন যে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো মাখলুকাতের অনিষ্ট থেকে এবং ঐ লোকদের অনিষ্ট থেকে যারা অন্যকে যাদু করার ধান্দায় থাকে এবং সর্বশেষ বলছেন, مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ 'আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি হিংসুকের হিংসা থেকে যখন সে হিংসা করে। যেন এই সূরার মধ্যে হিংসুকের হিংসা থেকে আশ্রয় চাওয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তবে এ বিষয়টা জানা অত্যাবশ্যকীয় যে, হিংসুকের অনিষ্ট কী, হিংসা কাকে বলে, হিংসার কী অনিষ্ট হয়।

হিংসার অর্থ ও তার অনুক্রম

হিংসার অর্থ হলো অন্যের ভাল দেখে মনে ব্যথা লাগা যে কীভাবে সে ভাল অবস্থায় পৌছল? কারো ধন-সম্পদ বেশি অর্জিত হয়েছে। এ কারণে মনে যন্ত্রণা শুরু হওয়া যে, তার সম্পদ এত বেশি হলো কী করে? কেউ অনেক খ্যাতিমান হলো। মানুষের মাঝে অনেক জনপ্রিয় হলো। এ কারণে মন অশান্ত হয়ে যে, এ কীভাবে এত জনপ্রিয়তা পেল। এটাকে বলা হয় হিংসা, এটা বড় ধরনের একটা রোগ। হিংসার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর হলো যে কারো ভাল অবস্থা হয়েছে, নেয়ামত অর্জিত হয়েছে, টাকাকড়ি বেড়েছে, জ্ঞান ও খ্যাতি বৃদ্ধি পেয়েছে ইত্যাদি। তো তার ভালত্বের কারণে অনিচ্ছাকৃত ভাবে মনোকষ্ট হয়। ও আমার চেয়ে আগে বেড়ে গেল। অনিচ্ছাকৃত ভাবেই কোন কোন সময় মনে এই খেয়াল আসে। হ্যাঁ এই খেয়াল যদি অনিচ্ছাকৃত হয় তাহলে আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলার কাছে কোন পাকড়াও নেই। কেননা এ খেয়াল অনিচ্ছাকৃত। لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا কিন্তু খতরনাক ও ঝুঁকিপূর্ণ। এজন্য এই খেয়ালকে ভাল মনে করা না চাই। মন্দ ভাবা উচিত। তার ব্যাখ্যা সামনে করবো ইনশাআল্লাহ।

হিংসার দ্বিতীয় স্তর

হিংসার দ্বিতীয় স্তর হলো শুধু এতটুকুই না যে মনে যন্ত্রণা হয় বরং তার চেয়ে আগে বেড়ে মনে প্রচন্ড আক্রোশ জমে যে সে ফকির হয়ে যাক। নিঃস্ব হয়ে যাক। অখ্যাত হয়ে যাক। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে কামনা বাসনার জন্ম হয় এবং তীব্রভাবেই হয়। এটা হলো হিংসার দ্বিতীয় স্তর।

হিংসার তৃতীয় স্তর

আর হিংসার তৃতীয় স্তর হলো, এই মনোবৃত্তি হওয়া যে, তার নেয়ামত চলে যাক, এবং ঐ নেয়ামত যাতে চলে যায় এজন্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করা। যেমন হিংসার কারণে মানুষের কাছে তার কুৎসা বলে বেড়ানো। গীবত করা, মিথ্যা অপবাদ দেয়া কিংবা উঠে পড়ে লাগা যে কীভাবে তাকে তার অর্জিত পদমর্যাদা থেকে হটানো যায়। তার বড় কর্মকর্তাদের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে যাতে তাকে তার পদ থেকে অপসারণ করা হয়। চোগলখোরী করা, দুর্নাম করা। তো হিংসার বশবর্তী হয়ে এ ধরনের কাজ করা কবীরা গুনাহ এবং এত বড় গুনাহ যে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মাফ নেই যতক্ষণ পর্যন্ত হকদার তাকে মাফ না করে। আর গুনাহর ব্যাপারটা তো এমন যে, যদি বান্দা সতর্ক হয়ে যায়, এবং তাওবা করে তখন তাওবার কারণে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু এর সম্পর্ক বান্দার

সঙ্গে, এ জন্য আল্লাহ্ বলেন যে শুধু তাওবা ইস্তেগফার করা দ্বারা তা মাফ হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ বান্দা যার গীবত করা হয়েছে সে মাফ না করে। এছাড়া মাফও হবে না। এজন্য তার গুনাহ বড় কঠিন। সাধারণ গুনাহ থেকেও অনেক শক্ত।

হিংসার প্রথম দুই স্তরের মূলতত্ত্ব

এর মধ্যে প্রথম শ্রেণী হলো যে, কারো ভাল অবস্থা দেখে মনে যাতনা হয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হলো যে, এই মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয় যে তার নেয়ামত দূর হয়ে যাক। এই দুই কাজ অনিচ্ছাকৃতভাবেই হয়। সচেতনভাবে এই মনোভাব হয়না। বরং অবচেতন মনেই হয়। তো শুধু এতটুকু কাজের জন্য আল্লাহ্ পাকড়াও করবেন না।

কেননা হিংসার কোন প্রভাব কাজে প্রকাশ পায়নি। কিন্তু এটা বড় ক্ষতিকর। কেননা এই খেয়াল যা অচেতনভাবে এসেছে। এটা দীর্ঘ সময় মনে অবস্থান করে এবং মানুষ সচেতন ভাবেই চিন্তা করতে শুরু করে। তো যদি ইচ্ছা করেই চিন্তা করে তাহলে গুনাহ হবে। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যদি এই ভাবনা থাকে তাহলে কোন সময় এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবে যে, যাকে হিংসা করছে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। তার বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালাবে। মানুষের কাছে গীবত করে বেড়াবে। কুৎসা রটাবে, কোটনামী করবে। তাকে তার পদমর্যাদা থেকে হটাতে উঠে পড়ে লেগে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ জাতীয় কাজ হয়ে থাকে। গীবত ইত্যাদিতে কোন কাজ না হলে কখনো কখনো যাদু করতে শুরু করে। এবং এমন যাদু করে যার দ্বারা ঐ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর সূরা ফালাক নাযিল হয়েছে এধরনের যাদু মন্ত্রের ব্যাপারে। যদি এই অনিচ্ছাকৃত খেয়াল বেশি সময় মনে থাকে, এবং মনে মনে ষড়যন্ত্র করতে থাকে তাহলে মানুষকে তা কোন কোন সময় না জায়েয এবং হারাম কাজে প্ররোচিত করে। এজন্য ধরনের খেয়াল 'খতরনাক'।

দু'ভাবে তার চিকিৎসা

এজন্য তাসাওফ ও সুলুকের শীর্ষস্থানীয় আলিমেদ্বীন ইমাম গাজ্জালী বলেন, যদি এই ধরনের অনিচ্ছাকৃত খেয়াল মনে আসতে থাকে যদিও তৎক্ষণাৎ তার উপর ধর পাকড়াও হবে না। কিন্তু তার চিকিৎসা করা অতীব জরুরী। আর ব্যবস্থাপত্রও তিনি দিয়েছেন যে, এর চিকিৎসা হবে দুভাবে। তার মনে যে খেয়াল আসছে, এবং মনোভঙ্গ হচ্ছে, আক্রোশ হচ্ছে তার নেয়ামত চলে যাক। এজাতীয় মনোভাবকে খারাপ মনে করা। ভাই! মনে যে খেয়াল আসছে এটা

ভাল খেয়াল না, এবং খারাপ মনে করে আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করবে যে আয় আল্লাহ্! আমার মনে এই খেয়াল আসছে, এটা ভাল খেয়াল না। আমাকে এর থেকে হেফাজত করুন। আমাকে উদ্ধার করুন। এক তো এই খেয়ালকে খারাপ ভাববে এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে একই মনোভাব দূর হওয়ার দু'আ করবে।

দ্বিতীয় চিকিৎসা হলো তার জন্য দু'আ করা

আর দ্বিতীয় কাজ হলো তিক্ত ঔষধের ন্যায়। আর এছাড়া এই রোগের কোন প্রতিষেধক নেই। হযরত ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন যে, যাকে হিংসা করছে তার জন্য খুব দু'আ করা। যেমন, তার ধন সম্পদের কারণে হিংসা হচ্ছে তো খুব দু'আ করবে আয় আল্লাহ্! তার ধন সম্পদে বরকত দিন। তার সম্পদে আরো উন্নতি দান করুন। যদি তার কোন চাকরি মিলে যায় তাহলে আয় আল্লাহ্ তাকে পদোন্নতি দান করুন। যদি তার খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তার কারণে হিংসা হয়, তাহলে আয় আল্লাহ্! তাকে আরো খ্যাতি দান করুন। এবং জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠান। এভাবে যখন দু'আ করবে তখন মন থেকে হিংসা চলে যাবে। মন বলছে নেয়ামত অপনোদিত হোক। কিন্তু দু'আ করছে যে ইয়া আল্লাহ্! তাকে উন্নতি দান করুন। যার ফলস্বরূপ মন থেকে হিংসা চলে যাবে। এটাই হলো হিংসার চিকিৎসা।

মানুষের সামনে তার প্রশংসা করা

একই সঙ্গে এই কাজও করবে যে মানুষের সামনে তার প্রশংসা করবে। মানুষের মাঝে তার ভালত্ব বর্ণনা করবে। তার ভাল গুণগুলো আলোচনা করবে। এখানেও চলে যাবে। মনে তো এই খেয়াল যে তার বদনাম হোক। মানুষ তার প্রশংসা না করে বদনাম করুক। কিন্তু আমি মানুষের সামনে প্রশংসা করছি। এ কারণে মন ক্ষত-বিক্ষত হবে। কিন্তু ক্ষত বিক্ষত হওয়াটাও এই রোগের চিকিৎসা। এই আমল হযরত ইমাম গাযালী ইহয়াউল উলুম এ বর্ণনা করেছেন। মনে করো যে এই চিকিৎসা এই রোগের প্রতিষেধক।

প্রত্যেকের একই অবস্থা

দেখুন! আজকের দুনিয়ায় আমাদের প্রত্যেকে চোখবন্ধ করে চিন্তা করুন দেখবেন কখনো না কখনো কারো না কারো সম্পর্কে এ জাতীয় চিন্তার উদ্রেক হয়েছে। কারো কারো অনেক বেশি। এটা অনেক বড় রোগের লক্ষণ। কিন্তু আমরা পরওয়া করিনা। ফলশ্রুতিতে এই রোগ বেড়ে যাচ্ছে। এক পর্যায়ে এমন রোগ নিরাময়ের অযোগ্য হয়ে পড়ছে।

হিংসা করা ভাগ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার নামান্তর

দেখ! চিন্তার বিষয় যে হিংসা মূলত আল্লাহ্ তা'আলার তাকদীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা। আল্লাহ্ তা'আলার তাকদীরের উপর প্রশ্ন আসে, কেন তার এই নেয়ামত মিলেছে। তার অর্থ এই যে আল্লাহ্ মিয়া! আপনি কেন আপনি তাকে এই নেয়ামত দিলেন? আয় আল্লাহ্! কেন আপনি তাকে এই নেয়ামতের জন্য নির্বাচন করলেন? এটা মূলত আল্লাহ্ তা'আলার উপর আপত্তি উত্থাপন হচ্ছে। এ কারণে হিংসা বড় ক্ষতিকর বস্তু। আর বাস্তবেও হিংসুক হিংসানলে দগ্ধ হয়। পক্ষান্তরে যাকে হিংসা করা হচ্ছে তার তো কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু হিংসুক মনোকষ্টে ভোগে। তার মনে জ্বলে, নিজের আগুনে নিজেই দগ্ধিভূত হয়। ক্ষতি তো শুধু হিংসুকেরই হয়। অন্য কারো হয় না। এজন্য এর থেকে মুক্তি লাভ করা বড় প্রয়োজন। আর মুক্তির পথ এটাই যা ইমাম গাযালী বলেছেন যে হিংসিত ব্যক্তির জন্য খুব দু'আ করা যে আয় আল্লাহ্! তার মর্যাদা আরো বুলন্দ করুন। তাকে আরো নেয়ামত দিয়ে উন্নীত করুন। এবং অন্যের সামনে তার প্রশংসা করা এবং তার ভাল আলোচনা করা তাহলে ইনশাআল্লাহ্ হিংসা দূর হয়ে যাবে।

হিংসার কারণে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে

যখন আমরা আমাদের কাজে ব্যস্ত তখন আমাদের জানা নেই যে, আমাদেরকে হিংসা করা হচ্ছে। আমাদের বিরুদ্ধে হিংসার উপর ভিত্তি করে ষড়যন্ত্র করছে। আমাদের তো কোন খবর নেই। যদি জানা যায় তাহলে তার প্রতিকারও করি। কিন্তু হিংসুকদের কর্মকাণ্ড এমন হয় যে অধিকাংশ সময় মানুষের খবর থাকে না। এজন্য এ সূরা ফালাকে বলা হয়েছে সব মাখলুক থেকে আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলার আশ্রয় চাও। এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করো। কেননা তোমার জানা নেই। কিন্তু আল্লাহ্ জানেন যে কে তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এবং কার মনে হিংসা জন্ম নিচ্ছে। আর কে আছে যে তার হিংসার কারণে তোমার বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত। কিংবা তোমার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখে। এজন্য আল্লাহ এই সূরার মাধ্যমে পানাহ চাওয়া শিক্ষা দিয়েছেন এবং স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, হিংসা বড় কুৎসিত ব্যাধি ও বড় আপদ। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এরও পানাহ চাওয়া উচিৎ যে, আয় আল্লাহ্! আমার মনে যেন কারো বিরুদ্ধে হিংসা না জন্মায়।

ঈর্ষা করা জায়েয

এখানে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, হিংসা তাকে বলে যে অন্যের নেয়ামত দেখে মনে মনে এই কামনা করা যে, তার নেয়ামত চলে যাক। আমি

পাই বা না পাই তার নেয়ামত চলে যাক। এটা হলো হিংসা। আরেকটা হলো ঈর্ষা। ঈর্ষা তাকে বলে যে কোন মানুষের নেয়ামত অর্জিত হয়েছে তো মানুষের মনে এই আকাঙ্ক্ষা হলো যে তার মত আমারও নেয়ামত লাভ হোক। আয় আল্লাহ্! আমাকেও দেন। এটা কোন গুনাহ্ না। আয় আল্লাহ্! যেমন ইলম তাকে দিয়েছেন! তেমন ইলম আমাকে দেন। যেমন খোদাভীতি আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দিয়েছে তেমন আমারও যেন হয়। যেমন সম্পদ তার মিলেছে আমারও যেন মিলে। এ ধরনের কথা শুধু একটা সীমা পর্যন্ত যে তার যে নেয়ামত মিলেছে তার কাছে তার কাছে তা থাকুক সঙ্গে সঙ্গে আমারও লাভ হোক। এটাকে হিংসা বলে না। এটা হিংসা হয়না বরং ঈর্ষা হয়। হাদীস শরীফে এটাকে বলা হয়েছে 'গীবতাহ, এটা কোন গুনাহ্ না। অবশ্য ঈর্ষা করা চাই ভাল কাজের ক্ষেত্রে। যা আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত সে ব্যাপারে ঈর্ষা করা উচিত এবং যেগুলো খারাপ কাজ সে ব্যাপারে ঈর্ষা না করা চাই। আল্লাহ্ পানাহ কোন ব্যক্তির ফিসক ও কুফর সত্ত্বেও সম্পদশালী হয়েছে। এখন তাকে দেখে ঈর্ষা হচ্ছে। এই ঈর্ষা ভাল কাজ নয়। কেননা গুনাহের ক্ষেত্রে ঈর্ষা হচ্ছে। হ্যাঁ যদি কোন জায়েয কাজ হয় তাহলে তাতে ঈর্ষা কোন খারাপ কাজ নয়। তাতে কোন গুনাহ নেই।

হাফেজ ইবনে হাজারের দু'আ

হযরত হাফেজ ইবনে হাজার যখন হজ্বের জন্য গেলেন– হাদীস শরীফে আছে–

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ۔

যখন মানুষ যমযমের পানি পান করে তো পান করার সময় যে দু'আ করে আল্লাহ্ তা'আলা তা কবুল করেন। তো হাফেজ ইবনে হাজার এই দু'আ করেছিলেন যে, আয় আল্লাহ্! আমাকে হযরত হাফেজ শামছুদ্দিন যাহাবীর যেমন ধীশক্তি ছিল সেরূপ ধীশক্তি দান করুন। অর্থাৎ তার যেমন মেধা ছিল তেমন মেধা যেন আমারও হয়ে যায়। এটা হলো ঈর্ষা। এতো কোন অসুবিধা নেই। হ্যাঁ যদি এমন হয় যে তার থেকে দূর হয়ে যাক তাহলে এটা হবে হিংসা। কিন্তু তার তো অর্জিত হয়েছে, আয় আল্লাহ্! আমাকেও দান করুন। তাহলে এতে কোন ক্ষতি নেই। এটা জায়েয। এবং এ ধরনের দু'আতেও কোন অসুবিধা নেই। আল্লাহ্ তা'আলা তার ফযলে ও করমে আমাদের সকলকে হিংসার ব্যাধি থেকে হেফাজত রাখুন। যদি এই জাতীয় চিন্তা আসে তাহলে আল্লাহ্ মাফ করে দেন, এবং দূর করার তাওফিক দান করুন আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

শয়তানের বিষের প্রতিষেধক

সূরা নাসের তাফসীর

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَآ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○ مَلِكِ النَّاسِ ○ إِلٰهِ النَّاسِ ○ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ○ الَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُوْرِ النَّاسِ ○ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ○ آمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

সূচনা

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভায়েরা! এটা কোরআনের সর্বশেষ সূরা। যাকে সূরা নাস বলে। যা এখন আমি আপনাদের সামনে পড়েছি। আর প্রায় সব মুসলমানের এটা মুখস্থ আছে। অধিকাংশ নামাযেই পড়া হয়। এর আগের সূরা ফালাক। পিছনের আলোচনাগুলোতে আপনাদের সামনে সূরা ফালাকের প্রয়োজনীয় তাফসীর পেশ করেছি। তখন আমি বলেছিলাম এই দুই সূরা قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ এক সঙ্গে ওই সময় নাযিল হয়েছিল যখন কিছুসংখ্যক ইহুদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাদু করেছিল। এ কারণে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত ক্ষতি হয়েছিল যে, কোন কাজ করেছেন তো তার মনে হতো যে করেন নাই। এরপর আল্লাহ্ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'জন ফেরেশতার মাধ্যমে অবহিত করেছেন যে আপনাকে যাদু করা হয়েছে। এরপর ওই যাদুকে নষ্ট করতে এই

দুই সূরা নাযিল করেন। যে ব্যক্তি যাদু করেছিল সে কুয়ার ভিতর চুলে গিঁট মেরে যাদু করেছিল। নবীয়ে করীম সারওয়ারে দোআলম যখন এই দুই সূরা থেকে একটি আয়াত পড়লেন তো একটি গিঁট খুলেছে। দ্বিতীয় আয়াত পড়েছেন তো দ্বিতীয় গিঁট খুলেছে। তৃতীয় আয়াত পড়েছেন তো তৃতীয় গিঁট খুলেছে। এভাবে সব গিঁট খুলে যায়। এভাবে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ঐ যাদুর প্রভাব থেকে রক্ষা করেছেন। এর মধ্যে প্রথম সূরা ফালাকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আলহামদুলিল্লাহ পিছনের কয়েক জুমায় হয়েছে।

সূরা নাসের তরজমা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ওই সত্তার যিনি সকল মানুষের প্রতিপালক। مَلِكِ النَّاسِ যিনি সব মানুষের অধিপতি। إِلٰهِ النَّاسِ যিনি সব মানুষের উপাস্য। তার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কোন বস্তু থেকে পানাহ চাচ্ছি। مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ওই শয়তানের অনিষ্ট থেকে যে মানুষের মনে কু-মন্ত্রণা দেয়। এবং পিছনে সরে যায়। الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ- مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ চাই ওই শয়তান আমলকারী জ্বিনদের মধ্য থেকে হোক কিংবা মানুষের মধ্য থেকে হোক।

দুই সূরার মাঝে সামঞ্জস্য

আপনি দুই সূরার মধ্যে একটু মিলিয়ে দেখুন! প্রথম সূরার মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, যে বলুন আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রত্যেক ঐ বস্তুর অনিষ্ট থেকে যা আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। যত মাখলুকাত আছে তার অনিষ্ট থেকে পানাহ চাচ্ছি। চাই সে মানুষ হোক। কষ্টদানকারী শত্রু হোক। চাই সে জ্বীন হোক বা হিংসা বা বিষাক্ত প্রাণী হোক। যে কোন প্রাণী হোক যা মানুষকে কষ্ট দেয়। এ সবের অনিষ্ট থেকে আয় আল্লাহ্! আমি আপনার পানাহ চাচ্ছি। এই সূরাতে এটা বলা হয়েছে।

আর এই সূরা বিশেষভাবে কু-মন্ত্রণাদানকারী শয়তানের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়ার জন্য। এ সূরার মাধ্যমে মানুষকে মূলত আশ্রয় প্রার্থনা করা শেখানো হয়েছে। যেমন কেউ শত্রুতা করল, কষ্ট দিতে চাচ্ছে। কেউ ডাকাত, কেউ চোর, এ সবের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। আশ্রয় বলতে মূলত পানাহ চাওয়া হয়েছে। ওই সব অনিষ্ট থেকে বা কষ্ট থেকে যা মানুষের শরীরে পৌঁছে। কিংবা পৌঁছতে পারে। এ সূরার মাধ্যমে ওই সব লোকদের থেকেও পানাহ চাওয়া

হয়েছে যারা দুনিয়াতে ক্ষতি না করলেও পরকালের ব্যাপারে ক্ষতি করে। কুমন্ত্রণা দিয়ে মানুষকে কুফুরিতে অভ্যস্ত করে। নাফরমান বানায়। শিরিকে লিপ্ত করে।

আল্লাহ্ আমাদের নাফরমানি থেকে হেফাজত করুন। সব ধরনের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে এ সূরার মূলকথা হলো দুনিয়ার যাবতীয় ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া। এতে ওই সব সকল ক্ষতি থেকে পানাহ চাওয়া হয়েছে যা আখেরাতে ক্ষতি করবে। আখেরাত ধ্বংস করবে। দুনিয়া ও আখেরাত দু'টোই নষ্ট করবে। কী অদ্ভুত বিন্যাস করেছেন আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তাআলা।

সূরা ফালাকে একটি গুণ ও তিনটি অবস্থা থেকে পানাহ

এখানে قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ওই সত্তার যিনি ঊষার মালিক। প্রভাতের মালিক। এর মধ্যেমে আল্লাহ্ তা"আলার একটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। যার বিশদ বিবরণ এর আগে দেয়া হয়েছে যে, যখন সকাল হয় তখন অন্ধকার চলে যায়। অমানিশা দূর হয়ে যায়। আঁধার কেটে যায়।

তো আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তাআলা ওই আঁধার বিদূরিতকারী, অন্ধকার দূরকারী, সকল অপকৌশল নস্যাৎকারী। এই আয়াতে তাঁর একটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তাআলা ঊষার রব।এরপর তিনটি অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে।

وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ - وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ - وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ -

সূরা নাসে তিনটি গুণ ও একটি বস্তু থেকে পানাহ

সূরা নাসে আল্লাহ্ তাআলা তিনটি গুণ বর্ণনা করেছেন। قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ - إِلَهِ النَّاسِ - অন্যদিকে এ সূরায় পানাহ চাওয়া হয়েছে একটি বস্তু থেকে। مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ তিনটি গুণের হাওলা দিয়ে একটি বস্তু থেকে পানাহ চাওয়া হয়েছে। এর আগে সূরা ফালাকে একটি ছিফাত বর্ণনা করে তিনটি বস্তু থেকে পানাহ চাওয়া হয়েছে।

আশ্চর্য ও অভিনব ইঙ্গিত

মনে করা হচ্ছে সূরা ফালাকে ওই সব ব্যাক্তির অনিষ্টের দিকে ঈশারা করেছেন যাদের কেউ শত্রু, কেউ ডাকাত, কেউ চোর, ইত্যাদি ইত্যাদি। এর মধ্যে আবার

যাদুকরও আছে। আল্লাহ্-ই-ভাল জানেন এ সূরায় তার ইশারা সম্পর্কে। তবে সেটা যাই হোক এই সব ব্যক্তিদের ক্ষতি দুনিয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

সূরা ফালাক সূরা নাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। ওখানে ওই সব ক্ষতির উল্লেখ করা হয়েছে যে সবের মাধ্যমে আখেরাতের ক্ষতি হবে। শয়তান মনে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা থেকে মানুষকে আল্লাহ্ রক্ষা করুন। এমনও হতে পারে যে শয়তানের কুমন্ত্রণার ফলে সে যখন কুফুর ও ইরতিদদে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তখন পুরো আখেরাতেই বরবাদ হয়ে যাবে। কুফুরি না কিন্তু গুনাহের ওয়াসওয়াসা দিল, এই গুনাহ কর। আর মানুষ ঐ ওয়াসওয়াসা অনুযায়ী গুনাহ করে ফেলে চাই পুরো আখেরাত বরবাদ না হোক কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আযাব ভোগ করতে হবে। জাহান্নামের শাস্তির সঙ্গে দুনিয়ার শান্তির তুলনা হয় না। যদি সারা জীবন মানুষ যাতনা ভোগ করে। এক মুহূর্তের জন্য যদি শান্তি না পায় তাহলেও তা হালকা। জাহান্নামের তুলনায় তা সামান্যই।

এ কারণে এসূরায় আল্লাহ্ তাআলা তিনটি গুণ বর্ণনা করেছেন। যিনি সমস্ত মানুষের প্রতিপালক ও সকল মানুষের বাদশা। যিনি সব মানুষের উপাস্য। তার কাছে আশ্রয় চান। বলুন আয় আল্লাহ্! আপনি তো আমাদের প্রতিপালক। আপনি সৃষ্টি করেছেন। আপনিই প্রতিপালন করেছেন। আপনিই প্রাণ দান করেছেন। আপনারই রাজত্ব গোটা জগতের উপর আর আপনিই আমাদের উপাস্য। আমরা আপনারই ইবাদত করি। সুতরাং আমাদেরকে ঐ শয়তান থেকে নিরাপদে রাখুন যে কুমন্ত্রণা দিয়ে দূরে সরে পড়ে।

নিরাপত্তা নির্দেশক গুণ

তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে যা নিরাপত্তা নির্দেশ করে। একটি গুণ, ওই সত্তা যে প্রতিপালন করে। লালন পালন করে। যেমন সন্তানকে মা লালন পালন করে, পিতা দেখভাল করে। তার নিরাপত্তা বিধান করে। প্রতিমুহূর্তে তাকে চোখে চোখে রাখে। যেন তার কোন ক্ষতি না হয়। একইভাবে কেউ যদি শাসক হন। সঠিক শাসক। তিনি তাঁর প্রজাদের নিরাপত্তা বিধান করেন। তাদের পর্যবেক্ষণ করেন। যেন তাদের কোন ক্ষতি না হয়। আর যখন তিনি [আল্লাহ] উপাস্য। যে বান্দা তাঁর উপাসনা করে তাকে তিনি হেফাজত করেন। যে তাঁর ইবাদত করে তাকে তিনি হেফাজত করেন। ওপরের এই তিনটি গুণ আল্লাহ্ তাআলা এমনভাবে উল্লেখ করেছেন যে তার মাঝে হেফাজতের মর্মার্থ নিহিত রয়েছে। সুতরাং হে আল্লাহ আমরা আপনারই ইবাদত কারি। আমরা আপনারই আশ্রয় চাই।

তিন ছিফাতের মধ্যে একটি আশ্চর্য সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে

আর এই তিনটি সূক্ষ্ম বিষয় বোঝাতে গিয়ে কিছু আলেম সূরা নাসের মধ্যে তিনটি সূক্ষ্ম বিষয় আলোচনা করেছেন যে, بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - إِلٰهِ النَّاسِ এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি গুণের কথা বলেছেন। যেমন মানুষ শৈশবে বেড়ে ওঠে। তাকে আল্লাহ্ প্রতিপালন করেন। بِرَبِّ النَّاسِ এর মাধ্যমে শিশু ও কিশোরের গুণের কথা বলা হয়েছে। مَلِكِ النَّاسِ এর মাধম্যে বুঝানো হয়েছে যখন সে যুবক হয়, তখন সে জানে আমি আল্লাহ্ তাআলার বাদশাহির ভিতরে আছি। আর যখন বৃদ্ধ হয়। তখন মানুষ আল্লাহ্র দিকে রুজু হয় ইবাদতে বেশি মশগুল হয়। إِلٰهِ النَّاسِ এর মাধম্যে আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু করা হয়েছে। তো মূলকথা হলো যে আল্লাহ্ তাআলা এই তিনটি গুণের মাধ্যমে শিক্ষা দিচ্ছেন যে তোমরা এটা বলো যে আমি পানাহ চাচ্ছি ঐ সত্তার যিনি সকল মানুষের প্রতিপালক। সবার বাদশা, এবং উপাস্য। কোন বস্তু থেকে পানাহ চাচ্ছি?

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ঐ শয়তানের অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা দিয়ে সরে পড়ে। এটা শয়তানের কাজ। আর হাদীস শরীফে এর বিশদ বিবরণ আছে।

শয়তানের কুমন্ত্রণা দেয়া

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে শয়তান প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে আছে। আর এমনভাবে আছে, যখনই সে সুযোগ পায় মানুষকে গুনাহে লিপ্ত করতে থাকে। এই গুনাহ কর সেই গুনাহ কর। কোন বে-গানা মহিলা সামনে এসেছে তো শয়তান মনে ওয়াসওয়াসা দেয় যে তাকে দেখে আনন্দ লাভ কর। কারও সম্পর্কে কোন কথা উঠেছে তো মন্ত্রণা দেয় যে তার গীবত কর। সুযোগ পেয়েছে তো সে মিথ্যা বলতে বলে। কোথাও যেতে হবে সে বলে চলো ভাই! নামাজ পড়তে হবে না। মোট কথা বিভিন্ন গুনাহের প্রতি প্ররোচিত করা ও কুমন্ত্রণা দেয়া শয়তানের কাজ।

সরে পড়ার কী উদ্দেশ্য যে সে ওয়াসওয়াসা দিয়ে সরে পড়ে? এর দুটা অর্থ। একটা অর্থ হলো কু-মন্ত্রণা দেয়, এবং প্ররোচিত করতে থাকে যে অমুক গুনাহ করো। কিন্তু এই মন্ত্রণা দিয়ে এবং মানুষকে ভুল পথ দেখিয়ে সে নিজে পালায়। অর্থাৎ আপনাকে পথভ্রষ্ট করার দায়িত্ব সে নিবে না। এজন্য যে সে আপনার শাস্তি ভোগ করতে চায়না। ভুল পথ দেখিয়ে সে নিজে সরে পড়ে। এবং মানুষকে এতে লিপ্ত করে দেয়। এটা তার একটা কাজ। দ্বিতীয়টা সম্পর্কে হাদীস শরীফে সারওয়ারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

যে শয়তানের আচরণ এমন হয় যে, সে মানুষের মনে খারাপ খারাপ ভাবনা এবং খারাপ ইচ্ছা বা কামনা তৈরি করে।

আল্লাহ্‌র যিকিরের কারণে শয়তান পালিয়ে যায়

কিন্তু এই সব কুমন্ত্রণার পরও যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তাআলার যিকির করে শয়তান তার ক্ষতি করতে পারেনা বরং শয়তান পিছু হটে পালিয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলা এই শব্দের মাধ্যমে এদিকে ইশারা করেছেন যে, কুমন্ত্রণার কারণে বেশি ভয় পেও না। এটা তো খতরনাক। যদি মন্ত্রণায় কাজ হয়ে যায় তাহলে বুঝবেন আপনার আখেরাত ধ্বংস করে দিয়েছে। কিন্তু ভয়ের কারণ নেই। কেননা যখন আপনি আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হবেন। আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাইবেন, আল্লাহ্‌র যিকির করবেন, তখন শয়তান পিছু হটে যাবে। এটা الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ অর্থ। এজন্য কোরআন কারীম বলা হয়েছে–

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

(سورة حم السجدة ٣٦)

তরজমা! যদি শয়তান তোমাকে কু-মন্ত্রণা দেয়। কোরআনুল কারীম نَزْغٌ শব্দ ব্যবহার করেছে যার অর্থ কু-মন্ত্রণা দেয়। কিংবা কোন খারাপ ইচ্ছা মনে জাগায়। তো তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্‌র আশ্রয় চান।বলেন, আয় আল্লাহ্ আমি আপনার আশ্রয় চাই। এই শয়তান আমার মনে কুমন্ত্রণা ঢুকিয়ে দিয়েছে। আপনার কাছে পানাহ চাই। আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হওয়ার ফলে, তাঁর যিকিরের ফলে শয়তান পিছু হটে যাবে। এরপর আপানার সামনে এসে ক্ষতি করতে পারবে না। যদি বান্দা আল্লাহ্‌র যিকির না করে। আল্লাহ্‌র দিকে রুজু না হয়। আল্লাহ্‌কে স্মরণ না করে তখন শয়তান তার মিশন বাস্তবায়নে সফল হয়। আপনাকে গুনাহে জড়িয়ে ফেলে। কিন্তু আপনি যদি ঐ অবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করেন। আল্লাহ্‌র পানাহ চান শয়তান পিছু হটবেই। এরপর যখন সুযোগ পাবে আবার আসবে। এবং কু-মন্ত্রণা দিবে। তখন আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চান। আল্লাহ্‌র যিকির করুন। শয়তান পিছু হটে যাবে।

পশ্চাদপসারণকারী

কুরআন বলেছে خَنَّاسٌ (খান্নাস) এর অর্থ পশ্চাদপসারণকারী। خَانِسٌ অর্থাৎ একবার পশ্চাদপসারণকারী। আর خَنَّاسٌ এর অর্থ বারবার পশ্চাদপসারণকারী। অথার্ৎ শয়তান বারবার হামলা করে বারবার পিছু হটে। এর সহজ চিকিৎসা হলো

এই যে আল্লাহ্‌মুখী হোন। আল্লাহ্‌র পানাহ চান। বলুন, আয় আল্লাহ্! শয়তান আমার মনে কুমন্ত্রণা দিচ্ছে। আমাকে তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। আমাকে হিম্মৎ দিন। আমাকে শক্তি দিন ঐ গুনাহ থেকে বাঁচার। এর ফলে শয়তান পিছু হটবে। এ জন্য আল্লাহ বলেছেন, إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا 'শয়তানের তদবীর বা চক্রান্ত বড়ই দুর্বল। সে মানুষের উপর সাওয়ার হবে ঠিকই। কিন্তু যেখানেই মানুষ একটু মজবুত হয়েছে সেখানেই সে পিছু হটেছে। এরপর তার কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

শয়তানের বিষের প্রতিষেধক

আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তাআলার হিকমতের পরিপন্থী যে, তিনি বিষ সৃষ্টি করবেন অথচ বিষের প্রতিষেধক তৈরি করবেন না। আল্লাহ্ তাআলা রোগ দিয়েছেন রোগের ঔষধও দিয়েছেন। বিষ তৈরি করেছেন, তার প্রতিষেধকও তৈরি করেছেন। শয়তান হলো মানুষের জন্য বিষ। আল্লাহ্‌র কুদরত, রহমত এবং তার হিকমত অনুযায়ী এটা সম্ভব নয় যে তিনি এই বিষ তৈরি করেছেন অথচ বিষের প্রতিষেধক তৈরি করেন নি। আল্লাহ্ তাআলা সব কিছুর প্রতিষেধক তৈরি করেছেন।

একটি বিষাক্ত গাছের চারা ও তার প্রতিষেধক

একবার এক সফরে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনের কাছ দিয়ে গাড়ি চড়ে যাচ্ছিলাম। এমন একটা জায়গা অতিক্রম করছিলাম যার চারপাশটা খুবই চমৎকার ও মনোরম। আমরা কিছু সময়ের জন্য সেখানে যাত্রা বিরতি করলাম। কাছেই একটা গাছ দেখতে পেলাম। ছোট্ট একটা গাছ। পাতাগুলো খুব সুন্দর। মনে হচ্ছিল যেন মখমলের পাতা। আমি সামনে হাত বাড়িয়ে পাতাটা ধরতে যাচ্ছিলাম। আমার এক সাথী দৌড়ে এসে আমাকে বাধা দিল।বললেন, মাওলানা এর কাছে যাবেন না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন ভাই? সে বলল, এটা এমন গাছ যে এটাকে ছুঁলে মনে হবে হাতে বিচ্ছু দংশন করেছে, এজন্য এতে হাত দিবেন না। আমি অনেক পেরেশান হয়ে বললাম, এতো দেখি বড় বিপজ্জনক জিনিস। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। কত মানুষ এর পাশ দিয়ে যায়। একে স্পর্শ করে আর কষ্ট পায়। তখন আমার সঙ্গী লোকটি বলল, অদ্ভুত বিষয় কি জানেন। যেখানে এই গাছ আছে সেখানে এই গাছের গোড়ায় যে চারা জন্মায় সেটাকে স্পর্শ করার সাথে সাথে আবার সব ব্যথা দূর হয়ে যায়। আমি বললাম, বিষের সাথে তার প্রতিষেধকও বিদ্যমান আছে। এটা আল্লাহ্ তাআলা পক্ষ থেকে তার রহমত ও হিকমতের নমুনা। এ দেখে আমার একটা শিক্ষা হলো যে

দেখতে কি সুন্দর, কী চমৎকার! মনে চায় তার কাছে যাই। একটু ছুঁয়ে দেখি। কিন্তু সুন্দরের মাঝে কি থাকতে পারে যা ছুঁলে যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়।

গুনাহ্ হলো দৃষ্টিনন্দন গাছের মত

তো এই দুনিয়ায় যত গুনাহ আছে তার বাস্তব একটি নমুনা ওই দৃষ্টিনন্দন গাছ। যা দেখতে বড় সুন্দর। মনে হয় যেন এতেই রয়েছে শান্তি। রয়েছে আনন্দ, আস্বাদন। কিন্তু পরিণামে এটা বিষাক্ত। বিচ্ছুর দংশনের মত। এটা একটা শিক্ষা। দ্বিতীয় শিক্ষা হলো যে আল্লাহ্ তাআলা যেখানেই কোন বিষ তৈরি করেছেন তার প্রতিষেধক ও তৈরি করেছেন। এবং তা দূর করার ব্যবস্থাও বলে দিয়েছেন। তো যখন শয়তানকে মানুষের জন্য বিষস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন। তখন তার সহজ প্রতিষেধকও বানিয়েছেন। তার প্রতিষেধক হলো যে আল্লাহ্মুখী হন, তার আশ্রয়ে থাকুন। যখন শয়তান মনে মন্ত্রণা দিতে থাকে তখন আল্লাহ্র পানাহ চান। আয় আল্লাহ্! আমার মনে এই ভাবনা আসছে। আমাকে এর থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ্ না করুন যদি শয়তানের অনিষ্ট দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে গুনাহ করে ফেলেন, তো ক্ষতিপূরণ এটাই যে তাওবা করা এবং বলা,

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ

আয় আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে মাফ চাই। তাওবা করছি। ইস্তেগফার করছি। তাওবা হলো ক্ষতিপূরণ।

কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তার থেকে আত্মরক্ষার দু'দিকেই রেখেছেন। ডানে বামে সামনে পিছনে। আগে পরে। আগে হলো আল্লাহ্র কাছে পানাহ চান। আর পরে হলে তাওবা ইস্তেগফার করুন।

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهٗ ـ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার দরবারে তাওবা করে সে এমন হয়ে যায় যেন গুনাহই করেনি। এটা مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ এর মর্মার্থ। আল্লাহ্ তাআলা তার দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে এ সব অনিষ্ট থেকে হেফাজত করুন আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ধারণা ও অনুমানের চিকিৎসা

সূরা নাস

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَآ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○ مَلِكِ النَّاسِ ○ إِلٰهِ النَّاسِ ○ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ○ الَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُوْرِ النَّاسِ ○ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ○ آمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

অবতরণিকা

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! এটা কোরআনের সর্বশেষ সূরা। যা আমি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি। অধিকাংশ মুসলমানের এই সূরা মুখস্থ। এর কিছু ব্যাখ্যা আমি গত জুমায় শুরু করেছি। এবং তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলেছিলাম যে, কিছুসংখ্যক ইহুদি হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাদু করেছিল। এই অবস্থায় দুই সূরা নাযিল হয়েছিল। قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ যাকে مُعَوِّذَتَيْنِ মুআ'ওয়াযাতাইন বলে। আর এতে নবীয়ে কারীম সারওয়ারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর আশ্রয় প্রার্থনার করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

সূরার তরজমা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন যে, বলুন اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঐ সত্তার যিনি সকল মানুষের প্রতিপালক। مَلِكِ النَّاسِ যিনি গোটা মানব জাতির বাদশা। اِلٰهِ النَّاسِ যিনি সকল মানুষের উপাস্য। তার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কোন বস্তু থেকে। مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ঐ সৃষ্টিজীবের অনিষ্ট থেকে যে কু-মন্ত্রণা দেয় এবং পিছু হটে যায়। অর্থাৎ শয়তান। শয়তান সম্পর্কে হাদীস শরীফে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ইরশাদ করেছেন সে মানুষের মনে একের পর এক কু-মন্ত্রণা দেয়ার জন্য পিছু লেগে থাকে।

ওয়াসওয়াসার প্রকার

ওয়াসওয়াসাও কয়েক ধরনের হয়ে থাকে। কোন কোন সময় ওয়াসওয়াসা হয় গুনাহের জন্য যে তুমি অমুক গুনাহ করো। অমুক নাজায়েয বস্তু দেখ। অমুক নাজায়েয কথা শোন, মুখে উচ্চারণ করো। অমুক কাজ নাজায়েয, সেটা কর। এ জাতীয় ওয়াসওয়াসা বা কু-মন্ত্রণা গুনাহে লিপ্ত করে। কোন কোন সময় ঈমানের ব্যাপারে ওয়াসওয়াসা দেয়। জানিনা আল্লাহ্ আছে না নাই। যেমন মনে সংশয় জাগে যে, আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তাআলা সম্পর্কে যা শুনি তা কতটুকু সত্য। আদৌ কি আল্লাহ্ আছেন। এধরনের কথাবার্তা এবং ওয়াসওয়াসা মনে ঢালাতে থাকে। শয়তানতো মানুষের মনে এ ধরনের কু-মন্ত্রণা দেয়ার কাজে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু হাদীছ শরীফে রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে কোন বান্দা যখন এধরনের কুমন্ত্রণার মাঝেও আল্লাহ্র যিকির করে তখন শয়তান পিছু হটে। مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ এজন্যই বলা হয়েছে যে, যদিও যে কু-মন্ত্রণাদানকারী কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল। এজন্য বান্দা যখন আল্লাহ্র কাছে পানাহ চায় এবং আল্লাহ্ যিকির করে তখন শয়তান পিছু হটে যায়। এরপর তার গুণ বর্ণনা করেছেন الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ যে মানুষের মনে কু-মন্ত্রণা দেয়। সবশেষে বলেছেন مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ এই কু-মন্ত্রণাদানকারী জ্বীনদের মধ্য থেকে হতে পারে। অর্থাৎ শয়তান ও মানুষ কু-মন্ত্রণাদানকারীর থেকেও। কিছু মানুষ তো সেই কাজই করে যে কাজ করে শয়তান স্বয়ং। তো এই সুরায় আল্লাহ বলতে বলেছেন যে, আয় আল্লাহ্! আমি উভয়ের অনিষ্ট থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই। এই সূরার সবটুকুর মধ্যে মূলত মানুষের অনিষ্ট থেকে বাঁচার তালকীন করা হয়েছে। এবং এজন্য আল্লাহ্র পানাহ চাওয়ার আহ্বান করা হয়েছে।

মন মস্তিষ্ক সর্বদা যা ভাবে

যেমন আমি বলছিলাম যে, মানুষের মন-মস্তিষ্ক সব সময় কিছু না কিছু বিষয় নিয়ে কাজ করতে থাকে। কিছু না কিছু বিষয়ে ভাবনা আসতে থাকে। মানুষের এমন কোন মুহূর্ত নাই যখন কোন না কোন খেয়াল আসে না। এই ভাবনা ভালও হয় আবার খারাপও হয়। শয়তান চায় মন্দ ভাবনাটা বাস্তবায়ন করতে। আর সবচেয়ে বড় শয়তান মানুষের নফস। সব গুনাহ শয়তানের কারণে হয় না, ইবলিসের কারণে হয় না। অনেক গুনাহ হয় মানুষের প্রবৃত্তির কারণে। মানুষের মনে যে ভাবনা আসে কু-মন্ত্রণা আসে এর চিকিৎসা ও প্রতিকার কী? কীভাবে এর অনিষ্ট থেকে বাঁচা যায়, এটাই এই সূরার আলোচ্য বিষয়।

দু'ধরনের কু-মন্ত্রণা

মানুষের মনে যে সকল কু-মন্ত্রণার উদ্রেক হয় তা দু'ধরনের। এক প্রকারের ওয়াসওয়াসা হলো (আল্লাহ্ বাঁচান) ঈমান ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়ে। এমন কোন মুসলমান নাই চাই যত বড় মুত্তাকি বা পরহেযগার হোক তার মনে কু-মন্ত্রণা আসে না। শয়তান তার মনে ওয়াসওয়াসা দেয় যে, আমরা তো ঈমান এনেছি আল্লাহ্র উপর তার একত্ববাদের উপর, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের উপর, মৃত্যুপরবর্তী জীবনের উপর। পরকালের উপর, জান্নাত–জাহান্নামের উপর। কিন্তু এসব কি সঠিক নাকি না? এ জাতীয় কুমন্ত্রণা মানুষের মনে দিতে থাকে। যদি মানুষ এই ওয়াসওয়াসায় আটকা পড়ে তাহলে তা তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।

এই ওয়াসওয়াসা ঈমানের আলামত

একবার এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বড় পেরেশানিতে আছি। আর পেরেশানীর কারণ হলো আমার মনে কখনো এমন ভাবনা ও কু-মন্ত্রণা আসে যে এটা মুখে উচ্চারণ করার চেয়ে জ্বলে কয়লা হয়ে যাওয়া আরো ভাল। ভাবনা আসে তো বারবার আসে। কিন্তু সেটা এত খারাপ যে আমার পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়াটা আরো বেশি পছন্দ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্চর্যজনক উত্তর দিলেন। বললেন, এ কারণে পেরেশান হয়ো না। ذٰلِكَ صَرِيْحُ الْاِيْمَانِ এটাই তো সুস্পষ্ট ঈমান। কারণ শয়তান ওয়াসওয়াসা দেয় তাকে, যার ঈমান আছে। যে মুমিন। যদি কোন মানুষ কাফের হয় তাহলে শয়তানের তার কাছে যাওয়ার কী প্রয়োজন। সে শুরু থেকেই তার অনুগত। তার অনুসারী, কুফুরিতে

লিপ্ত। শুরু থেকেই এ কাজে জড়িত। শয়তানের পছন্দ মতো কাজ করে যাচ্ছে। সুতরাং তার কাছে কেন যাবে? সে আসে মুমিনের কাছে। যার ঈমান আছে। শয়তান তার কাছে যায়, যাতে তাকে ঈমান থেকে বিচ্যুত করতে পারে। যখন তুমি বলছ যে, এমন ভাবনা মুখে উচ্চারণ করা থেকে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়াটা আরো ভালো। এর অর্থ যে তোমার মনে ঈমান আছে। আর যখন তোমার মনে ঈমান বিদ্যমান আছে তখন কু-মন্ত্রণা তোমার কোন ক্ষতি করবে না।

সম্পদশালীর ঘরেই চোর আসে

হযরত হাজ্বী ইমদাদুল্লাহ মুহাজের মক্কী (র.)-এর কাছে কেউ এসে বলল, হযরত আমি কী করব, আমি বড় পেরেশানিতে আছি। মনে ওয়াসওয়াসা আসে, কুফুরির, শিরকের, যার ফলে আমি বড় পেরেশান। তখন হযরত বললেন, পেরেশানীর কোন কারণ নেই। এটা তোমার মুমিন হওয়ার আলামত। দেখ, চোর ওই ঘরেই যায় যেখানে সম্পদ আছে। যে ঘরে ধন সম্পদ আছে, টাকা-পয়সা আছে চোর ডাকাত সেখানেই যায়। যেখানে টাকা-পয়সা নেই, ধন-সম্পদ নেই সেখানে কেন যাবে? তদ্রূপ শয়তানও ওই স্থানে যায় যে স্থানে ঈমানের দৌলত আছে। যদি ঈমানের দৌলত কারও কাছে থাকে তখন সেটা ছিনিয়ে নেয়ার জন্য যায়।

যে কাফের তার কাছে তো ওই সম্পদ (ঈমান) নেই। তার কাছ থেকে --- গিয়ে সে কী করবে? এটা ঈমানের আলামত। ঘাবড়িও না, পেরেশান হয়ো না। এর চিকিৎসা হলো, একে পরওয়া না করা। এর কারণে বেশী অস্থিরতা প্রকাশ না করা। কেননা কোরআন বলেছে,

إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○ (سورة المجادلة ١٠)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, এই শয়তান যে কানাঘুষা করে। نجو এর অর্থ কানাঘুষা করা। অর্থাৎ তোমাদের মনে কু-মন্ত্রণা দেয়। যাতে ঈমানদাররা চিন্তিত হন এবং ব্যথা পান। এজন্য সে এই ধরনের খেয়াল মনে ঢালতে থাকে ও কু-মন্ত্রণা দিতে থাকে। কুরআন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে, এগুলো মুমিনদের কখনোই কোন ক্ষতি করতে পারবে না। হ্যাঁ, যদি আল্লাহর হুকুম হয় তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু আল্লাহ্ যালিম নন, যিনি বিনা কারণে বান্দাকে শয়তানের হাতে পরাভূত করবেন, শয়তানের হাতে ছেড়ে দেবেন। এ কারণে শয়তান কোন ক্ষতি করতে পারে না। এজন্য বর্ণনা করেছেন যে অনেকের মনে

ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়ে দেখা দেয়। সে ঘাবড়ে যায়। কুরআন হাদীছ দ্ব্যর্থহীন ভাবে একে নাকচ করে দিয়েছে। ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই। আল্লাহর হুকুম ছাড়া সে কখনো ক্ষতি করতে পারবে না তোমার। যদি শুধু কু-মন্ত্রণার সীমা পর্যন্ত ওয়াসওয়াসা আসে তাহলে আসতে দাও। এমনিতেই দূর হয়ে যাবে।

এসব কু-মন্ত্রণার চিকিৎসা

এসব কু-মন্ত্রণার চিকিৎসা হলো, যা এই সূরার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা বলুন–

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○ مَلِكِ النَّاسِ ○ إِلٰهِ النَّاسِ ○ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ○ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ○ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ○

এই সূরা পড়ে আল্লাহর কাছে পানাহ চান। এই সূরা সব মুসলমানেরই মুখস্থ আছে। পড়ে নিন তো ভাল। অন্যথায় মুখে বলুন যে, আয় আল্লাহ্! এই শয়তান আমাকে পেরেশান করছে। আপন অনুগ্রহে আমাদেরকে আশ্রয় দেন। তাহলে ইনশাআল্লাহ নিরাপদ হয়ে যাবেন, আর এটাই অর্থ খান্নাসের। বান্দা যখন আল্লাহর যিকির করবে তখন শয়তান পিছু হটে যাবে। আর আল্লাহর যিকির করা পানাহ চাওয়ারই নামান্তর।

সুতরাং যখন পানাহ চাইবেন তখন ইনশাআল্লাহ শয়তান দূর হয়ে যাবে। ঈমানের বিভিন্ন ক্ষণে যে ওয়াসওয়াসা আসে তার সমাধান সাওয়ারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। আল্লাহও এই সূরার ভিতরে বর্ণনা করেছেন।

শুচিবায়ু এক ধরনের ওয়াসওয়াসা

এটা এক ধরনের ওয়াসওয়াসা। যেমন : মনে হয়, আমি নাপাক হয়ে গেছি। পাক-নাপাকের মাসআলা নিয়ে গবেষণা শুরু করে দেয়। শরীয়ত অযুতে তিনবার করে হাত পা ধোয়ার হুকুম দিয়েছে। হাত, পা, মুখ তিনবার করে ধুতে হবে এটাই হুকুম। কোন কোন সময় শয়তান মন্ত্রণা দেয় যে, না তোমার ওযু হয়নি। তিনবার ধোয়া যথেষ্ট নয়। পা শুকনো রয়ে গেছে। কনুই ধোয়া হয়নি। এধরনের কু-মন্ত্রণা দেয়ার মনে ইচ্ছা হলো, এক সময় তার মনে হতে পারে যে আমি তো পাক হইনি। তখন সে বারবার অযু করবে। এতে একেক নামাযে এক এক ঘন্টা লাগবে। এক সময়ে তার পক্ষে দীর্ঘ সময় নামাযে ব্যয় করা কষ্টকর বলে মনে হতে থাকবে। এভাবে সে নামাজ ছেড়ে দেবে। এই কু-মন্ত্রণা

শয়তানই দেয়। এবং অনেক লোক এতে ফেঁসে যায়। শুচিবায়ু আসলে শয়তানের কারসাজি।

শুচিবায়ুর 'এলাজ'

বুযুর্গরা বলেছেন যে, তিনবার হাত ভাল করে ধুয়েছেন। যেভাবে ধোয়ার সেভাবেই ধুয়েছেন। এরপরও মনে হচ্ছে হাত শুকনো রয়ে গেছে, দ্বিতীয়বার ধুতে হবে। এখন মনের সঙ্গে বিরোধিতা করুন। মনে মনে বলুন যে, না আমি দ্বিতীয়বার ধুবো না। মনের সঙ্গে জোর খাটিয়ে তার বিরোধিতা করুন। এরকম করতে থাকলে শয়তান এক সময় নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে। এতো আমার কথা শুনছে না। তার কাছে যাওয়ার আর প্রয়োজন নেই। এটাই তার চিকিৎসা।

হযরত গাংগুহির (রহ.) ঘটনা

হযরত গাংগুহি (রহ.) বলেছেন যে তিনি একবার অযু করছিলেন। অযু শেষে তাঁর মনে হল, কনুই শুকনো রয়ে গেছে। তিনি চিন্তা করলেন, মনে এই সন্দেহ আসছে তো একে দূর করা চাই। আমি গিয়ে কনুইর উপর পানি ঢেলে শুকনো থাকার সম্ভাবনা দূর করলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর আবার মনে হলো যে, বাম কনুই শুকনো রয়ে গেছে। যখন মনে এই ধারণা আসল তখন আমি মনে মনে বললাম, এই শোবাহ (সন্দেহ) কেন ছাড়বো। দ্বিতীয়বার গেলাম এবং গিয়ে দ্বিতীয় কনুই ধুলাম। এরপর একটু সামনে গেলাম। একথা মনে হলো, টাখনু শুকনো রয়ে গেছে। যখন তৃতীয়বার মনে একই সন্দেহ এল এবং মনে মনে বললেন, আজ আমি অযু ছাড়াই নামাজ পড়বো। তুই বলতে থাক অযু নেই। আজ আমি অযু ছাড়াই নামাজ পড়বো। তিনি বলেন, যদি আমি সে সময় এ কথা না (শয়তানের প্ররোচনা) ভাবতাম তাহলে যেটা আমার জীবনের নিয়ম হয়ে যেত। শয়তান জীবনভর এ সন্দেহ, ওয়াসওয়াসা এবং এ জাতীয় শুচিবায়ুতে জড়িয়ে রাখত এবং একটু পরপর কুমন্ত্রণা দিত। এজন্য আল-হামদুলিল্লাহ এর চিকিৎসা হয়ে গেছে। এরপর আর ওই ওয়াসওয়াসা তার জীবনে আর কখনো আসে নি। যাই হোক, এর চিকিৎসা হলো এটাই যে জোরজবরদস্তি করে ওয়াসওয়াসার বিরোধিতা করা।

নামাজে সন্দেহের ঘটনা

অনেক সময় নামাজের ভিতর এই খবর থাকেনা যে নামাজ সঠিক হলো কি হলো না। সে এত বেশি মন্ত্রণা দেয় যে মানুষ পেরেশান হয়ে যায়। এমন এক ব্যক্তি ছিলেন হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায়। তার

এমন সন্দেহ হত যে নামাজে আমার অজু ভেঙ্গে গেছে। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যখন আমি নামাজে দাঁড়াই তখনি আমার মনে হয় আমার অযু ভেঙ্গে গেছে। হুজুর বললেন, তোমার অযু ভাঙ্গবে না যতক্ষণ তুমি কোন দুর্গন্ধ না পাবে কিংবা আওয়াজ না শুনবে। উদাহরণস্বরূপ, বায়ু নির্গমন হলে অযু ভেঙ্গে যায়। কিন্তু তাকে হুজুর বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার অযু ভাঙবে না যতক্ষণ না তুমি কোন দুর্গন্ধ পাবে কিংবা আওয়াজ শুনবে।

কিছু মানুষ ভুলের মধ্যে আছে

কিছু লোক এই হাদীস দেখে বলে যে, আরে ভাই! হাদীসে নবী করীম সাওয়ারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, দুর্গন্ধ যতক্ষণ পর্যন্ত না আসে কিংবা আওয়াজ যতক্ষণ পর্যন্ত না হয়, অযু ভাঙ্গে না। আমার সঙ্গেই এক ব্যক্তির দেখা হয়েছে। সে বলে যে ভাই! আমরা মোল্লা মৌলবিদের পিছু নিই না। আমরা তো কুরআন সুন্নাহকে মাইলফলক হিসেবে দেখি। কোরআন শরীফ এবং হাদীস শরীফ পড়ে যে উদ্দেশ্য বুঝে আসে তার ওপরই আমল করবো। এটাই ছিল তার মনোভাব। যা আজ কাল অনেক লোক পোষণ করে। একবার হাদীস পড়ে বলে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত গন্ধ না আসে, আওয়াজ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অযু ভাঙ্গে না। তারা বলে হুজুর যেটা বলেছেন সেটাই আমাদের জন্য দলিল। ইমাম আবু হানীফা কিছু বলেছেন, ইমাম শাফী কিছু বলেছেন, এবং অন্যান্য ইমামরাও কিছু বলেছেন। কিন্তু হুজুরের কথাই হলো হুজ্জত। এজন্য সারাজীবন এর উপর আমল করছি যে যতক্ষণ না গন্ধ না আসে, এবং আওয়াজ না হয় মনে করি যে অযু ভাঙ্গেনি। চাই অযু ভেঙ্গে গেছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হই।

নিজের সিদ্ধান্তই গোমরাহ করে

এই গোমরাহি তো মূলত নিজের গোমরাহির কারণে তৈরি হয় যে মানুষ চিন্তা করে ভাই! কাউকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই। কোরআন এবং হাদীস পড়বো। তরজমা ছাপা হয়েছে। তার উদ্দেশ্য বুঝে নিব। বাস্তবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেছিলেন শুচিবায়ুগ্রস্ত এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে, বারবার সন্দেহে পড়ে যায় অযু ভেঙ্গে যাওয়ার। এ ধরনের ওয়াওয়াসার চিকিৎসা হলো মানুষ জোরপূর্বক তার বিরোধিতা করবে। ধারণার বিপরীত আমল করবে। এছাড়া এই রোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব না। সুতরাং এর চিকিৎসা একটাই যে, জোরপূর্বক এর বিরুদ্ধাচরণ করা।

শুচিবায়ু রোগের দ্বিতীয় চিকিৎসা

দ্বিতীয় কথা হলো সূরা নাস বেশি পড়া। এবং আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করা যে, আয় আল্লাহ্! আমি ওয়াসওয়াসা রোগে আক্রান্ত এবং বাতিকগ্রস্ত। আপনি আপন অনুগ্রহে আমার এই বাতিকগ্রস্ততা দূর করে দিন। ইনশাআল্লাহ, এরপর তার কোন ক্ষতি হবে না।

শুচিবায়ুর কারণে জীবন কষ্টসাধ্য

যদি কোন মানুষের শুচিবায়ু রোগ হয়ে যায় তাহলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। কারো কারো আপন স্ত্রীর ব্যাপারে ধারণা হয় যে জানিনা সে আমার প্রতি কতটা বিশ্বস্ত। এজন্য সে নিজেও বড় বিপদে থাকে এবং স্ত্রীকেও বিপন্ন রাখে। কারো মনে এই ধারণা হয় যে, স্ত্রীর জন্য সব সময় আমার মুখ থেকে তালাক শব্দ বের হয়। সব সময় আমার মনে হয় আমি তালাক দিচ্ছি। স্ত্রী আমার উপর হারাম হয়ে গেছে। ওয়াসওয়াস রোগ হয়ে যায়। যার ফলে মানুষ এই ওয়াসওয়াসার উপর ভরসা করে। যদি এর পরিপন্থী করে তাহলে অবশ্য অবশ্য দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা, সব মুমিনকে হেফাজত করুন। আর ভাই এই সূরা পড়তে থাকুন। ইনশাআল্লাহ আশা করি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনায় আপনি মুক্তি পারেন।

সারমর্ম

ওয়াসওয়াস দুই প্রকার। এক ঈমান আমল আকীদা সংক্রান্ত ওয়াসওয়াসা। এর চিকিৎসা হলো আল্লাহর পানাহ চাওয়া। ওয়াসওয়াসার পরওয়া না করা। এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা হলো যে, নবী করীম ﷺ যে সকল দু'আ করেছেন। اَدْعِيَةٌ مَأْثُوْرَةٌ যা বিভিন্ন কিতাবে আছে। বিশেষ করে মুনাজাতে মাকবুলে দেয়া হয়েছে। এ সব দু'আ পড়ার দ্বারাও ওয়াসওয়াসার দরজা বন্ধ হয়। এ সব অবস্থা মানুষ এই দু'আগুলো বেশি বেশি পড়বে। আল্লাহ্ তাকে নিরাপদে রাখবেন।

আর দ্বিতীয় ওয়াসওয়াসা যা কল্পনা আকৃতিতে আসে এবং মানুষকে পেরেশান করে। এর চিকিৎসা হলো আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া এবং তার বিপরীত কাজ করা।

আল্লাহ্ রক্ষা করুন– এতে প্রায় সবাই জড়িত। আর তা থেকেও আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার হুকুম দিয়েছেন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

যাদু ও দুষ্ট আত্মার প্রতিকার

সূরা নাস (৩)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَآ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○ مَلِكِ النَّاسِ ○ إِلٰهِ النَّاسِ ○ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ○ الَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُوْرِ النَّاسِ ○ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ○ آمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

সূচনা

সম্মানিত ও প্রিয় ভাইয়েরা! শয়তানের কু-মন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকা আসলেই কষ্টকর। এজন্য আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া উচিত। ওয়াসওয়াসা বা শয়তানের কয়েকটি প্রকার ও প্রতিকার সম্পর্কে এর আগে আলোচনা করেছিলাম।

কুমন্ত্রণা দাতা শয়তান ও মানুষ.

কুরআনুল কারীমের সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে কু-মন্ত্রণাদাতা সবসময় যে শয়তান ও জিন্নাতই হবে তা নয়। বরং মানুষকে কু-মন্ত্রণা দেয়– مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ এই আয়াতে জিন্নাতের উদ্দেশ্য হলো ইবলিস শয়তান। যে হযরত আদম (আঃ) কে সেজদা করতে অস্বীকার করেছিল। সারা দুনিয়ায় অসংখ্য অগণিত

শিষ্য ও অনুসারী রয়েছে তার। এরা সবাই জিন্নাত। শয়তান তাদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন মিশনে পাঠায়। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো মানুষের মনে কু-মন্ত্রণা দেয়া।

শয়তানের সমাবেশ ও কারগুযারী

হাদীস শরীফে আছে যে, শয়তানদের পক্ষ থেকে সমুদ্রের ওপর বিশাল সমাবেশের আয়োজন করা হয়। উক্ত সমাবেশে সভাপতির আসন গ্রহণ করে স্বয়ং ইবলিস। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য শিষ্য শয়তান ও তার অনুসারীরা একে একে দলে দলে যোগদান করে। হুজুর সাঃ বলেছেন, সমুদ্রের উপর একটি বড় সিংহাসন রাখা হয়। শয়তান তাতে আসন গ্রহণ করে। যারা শয়তানের শিষ্য তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বাহিনী আছে। তারা সমাবেশে অংশ নেয়। শয়তান তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে কারগুজারী শুনে যে, বলে তুমি কী কাজ করেছো। তখন একজন বলে আমি একজন মুসলমানের মনে এই কু-মন্ত্রণা দিয়েছি যে, তুমি নামাজ ছেড়ে দাও। ফলে সে নামাজ পড়তে পারে নি। তখন শয়তান বলে ঠিক আছে, তুমি ভাল কাজ করেছ। তবে বিশেষ কোন কাজ হয়নি। এরপর দ্বিতীয়জন দাঁড়ায় যে, এক ব্যক্তিকে যাকাত দিতে বাধা দিয়েছি। তাকে কু-মন্ত্রণা দিয়েছি যদি পয়সা খরচ করো তাহলে পয়সা কমে যাবে। এজন্য সে যাকাত দেয়া থেকে বিরত থেকেছে। শয়তান বলল তুমি ঠিক করেছ। কিন্তু বিশেষ কোন কাজ বা বড় কোন কাজ হয়নি। তৃতীয় ব্যক্তি দাঁড়াল এবং বলল যে, অমুক ব্যক্তি রোজা রাখতে চাচ্ছিল। তখন আমি তার মনে কু-মন্ত্রণা দিয়েছি। ফলে সে রোজা রাখা থেকে বিরত থেকেছে। যাই হোক বিভিন্নজন নিজ নিজ কাজের বর্ণনা দিচ্ছিল যে, আমি অমুককে নামাজ থেকে বাধা দিয়েছি। আমি অমুককে যিকির থেকে বাধা দিয়েছি। আমি অমুককে তিলাওয়াত থেকে বিরত রেখেছি। অমুককে রোজা রাখতে দেয়নি। অমুকের ইবাদতে গণ্ডগোল পাকিয়েছি। ইবলিস শয়তান বলে ঠিক আছে। কিন্তু তোমরা বড় ধরনের কোন কাজ করতে পারো নি।

আমি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাদ বাধিয়েছি

এক বড় শয়তান দাঁড়িয়ে বললো, স্বামী-স্ত্রী দুজন খুব সুখে দিন কাটাচ্ছিল। উভয়ের মাঝে ছিল মিল মহব্বত। সব বিষয়ে তারা ছিল ঐক্যমত। আনন্দে কাটছিল তাদের জীবন। আমি এমন এক কৌশল গ্রহণ করেছি যে, উভয়ের মাঝে তরবারির যুদ্ধ হয়ে গেছে এবং এই যুদ্ধের কারণে উভয়ের মাঝে বিবাদ

লেগে গিয়েছে। স্বামীকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে উস্কে দেই এবং স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে উস্কে দেই। অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ স্বামী-স্ত্রী একে অপরের দুশমনে পরিণত হয়েছে। তালাক হয়ে গেছে। উভয় পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন শয়তান দাঁড়িয়ে যায় এবং বলে হ্যাঁ, তুমিই কাজের কাজ করেছ। তার সঙ্গে গলা মিলায়, কোলাকুলি করে। এই হাদীসটি মিশকাত শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসে হুজুর (সা:) এর এটাই বলা উদ্দেশ্য যে, সবচেয়ে খতরনাক শয়তান হলো সে যে, একে অপরকে ভালবাসে এমন দুজন মুসলমানের মাঝে শত্রুতার বীজ রোপন করে এবং একজনকে আরেকজনের শত্রু বানিয়ে দূরে সরে পড়ে।

শয়তানের শিষ্য সংখ্যা অগণিত

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ইবলিসের অনুসারী অগণিত। যারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কোরআন কারীমে আছে ইবলিস বলেছিল যে, আমি মানুষকে ভ্রষ্ট করবো। আল্লাহ বলেছিলেন, তোমার যা খুশি তুমি করো। তোমার পুরো বাহিনী নিয়ে আসো। আমার বান্দাদের ভ্রষ্ট করার চেষ্টা করো তবে যে বান্দা আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তার ক্ষেত্রে তোমার শক্তি কোন কাজে আসবে না। একথা কোরআনে কারীমে আছে। তারা ওই সব লোক যারা মানুষের মনে কু-মন্ত্রণা দেয় শয়তানের অনুসারী অনুগামী। এ সম্পর্কে কোরআন বলেছে যে, ঘাবড়িও না। কেননা এরা তো শয়তানের দোসর।

শয়তান মানুষের শরীরে অনুপ্রবেশ করে

হাদীস শরীফে আছে যে, শয়তান মানুষের দেহে এমন ভাবে অনুপ্রবেশ করে যেমন মানুষের শিরায় উপশিরায় রক্ত প্রবেশ করে। একবার নবী করীম (সা:) এতেকাফে বসেছিলেন। উম্মুল মুমিনিন সাফিয়্যা (রাঃ) রাতের বেলা হুজুর (সা:) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মসজিদে এসে কিছু সময় অবস্থান করলেন। যখন ফিরে যাবেন, তখন হুজুর (সা:) তাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য মসজিদের চৌকাঠ পর্যন্ত গেলেন। তখন ছিলো গাঢ় অন্ধকার। হুজুরের সঙ্গে তার সহধর্মিনী ছিলেন। তখন পাশ দিয়ে দুজন সাহাবী অতিক্রম করছিলেন। হুজুর (সা:) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন দেখো আমার সঙ্গে আমার সহধর্মিনী। এ আমার স্ত্রী সাফিয়্যা। তখন উভয় সাহাবী (রাঃ) পেরেশান হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার এটা বলার কী প্রয়োজন ছিল যে, এ সাফিয়্যা। হুজুর বললেন, আমি এজন্য বলেছি যে শয়তান মানুষের দেহে এমন ভাবে প্রবেশ করে

যেমন রক্ত শিরায় উপশিরায় প্রবেশ করে। তোমাদের মনে যেন এই প্রশ্ন না আসে যে, এত রাতে হুজুরের সঙ্গে এই মহিলা কে? এর ফলে তোমাদের মনে সংশয় দেখা দিতে পারে। শয়তান তোমাদের কু-মন্ত্রণা দিতে পারে। সেই সন্দেহ সংশয় দূর করতেই আমি একথা বলেছি। এ আমার বিবি, অন্য কোন বেগানা মহিলা নয়। এই ঘটনা থেকে এটাই জানা গেল যে, নিজেকে নিজে অপবাদ থেকে বাঁচানো উচিৎ। যদি কোথাও তোহমৎ লাগার ভয় থাকে তাহলে বিষয়টা পরিষ্কার করে দেয়া উচিৎ। হুজুর স্পষ্ট করে দিয়েছেন সেই সঙ্গে একথাও বলে দিয়েছেন যে, শয়তান মানুষের দেহে এমন ভাবে চলাচল করে যেমন (তার শিরায় উপশিরায়) রক্ত চলাচল করে।

শয়তানের রণকৌশল বড় দুর্বল

বলা হয়েছে যে,

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ○ (سورة النساء ٧٦)

'শয়তানের যত কূটকৌশল কিংবা অপচক্রান্ত আছে সবই দুর্বল।' আর আল্লাহ্ তা'আলা ইবলিসকে বলে দিয়েছেন, إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ যে ব্যক্তি সঠিক অর্থে আমার বান্দা হবে তার উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব খাটবে না। তবে সান্ত্বনার জন্য বলেছেন– আমি তো তাকে তোমার পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করেছি। কিন্তু সে (শয়তান) অত্যন্ত দুর্বল। মানুষ তার মোকাবেলায় সামান্য ঘুরে দাঁড়ালেই সে তৎক্ষণাৎ প্রিয় হয়ে যায় কর্পুর হয়ে যায়। আল্লাহ্মুখী হলে তাঁর কাছে পানাহ চাইলে শয়তানের সব চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যায়। এজন্য ভয়ের কোন কারণ নেই। মানুষ চিন্তা করে, আমি তো ফেঁসে গেছি। এখন তার থেকে বাঁচা অসম্ভব। কারণ কুরআন করীমে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, তার চক্রান্ত খুব দুর্বল। হ্যাঁ, তার কর্তৃত্ব ওই ব্যক্তির উপর খাটে, যে শয়তানের অপকৌশল থেকে বাঁচতে চায় না। সে নিজেই শয়তানের থেকে এক ধাপ এগিয়ে থাকে। তার চক্রান্ত থেকে বাঁচার কোন চেষ্টাই করেনা। তখন শয়তান তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। দেখো, সৃষ্টি জীবের মধ্যে অনেক সৃষ্টিজীব এমন আছে যারা, আত্মম্ভরিতা ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে, বড় হম্বিতম্বি করে। কিন্তু সাধারণ একজন মানুষের ধমক খেয়েই বসে পড়ে। এরা সাধারণত ইতর নিচু শ্রেণীর হয়ে থাকে। শয়তানও ওদের মতই। যদি আপনি শয়তানকে ভয় পান এবং তার সামনে অস্ত্র রেখে দেন এবং বলেন যে, ভাই তুমি, যেভাবেই বলবে সেভাবেই করবো। তখন সে ঘাড়ে চড়ে বসবে এবং আপনার গোটা জীবন বরবাদ করবে।

কিন্তু যদি কেউ তার সামনে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং বলে যে, আমি তোমার কোন কথাই মানবো না। আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সূরা নাস পড়ে আল্লাহর পানাহ চায়। তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা আপন রহমতে তাকে রক্ষা করবেন।

নফসও কু-মন্ত্রণা দেয়

এভাবে বলেছেন যে কিছু কু-মন্ত্রণা দাতা রয়েছে মানুষের মধ্যে مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ। এখন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম কু-মন্ত্রণা দাতা হলো তো আমাদের নফস বা আত্মা মনে প্রবৃত্তির চাহিদা তৈরি হয়। এবং প্রবৃত্তির এই চাহিদার কারণে মানুষ পদস্খলিত হয়। মন চায় অমুক গুনাহ করি। তখন মানুষ তার প্রবৃত্তির পিছনে পড়ে যায়, এবং প্রবৃত্তির সব চাহিদা পূর্ণ করে। মানুষ যখন এই মনোভাব প্রকাশ করে। যা ইচ্ছা তাই করবো। তখন নফস তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। আল্লাহ্ হেফাজত করুন– এর কারণে মানুষ ভুল পথে চলতে থাকে।

আত্মশুদ্ধির উপায়

আর নফসের কথা আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা বলে দিয়েছেন যে যখন প্রবৃত্তি তোমাকে গুনাহের দিকে নিয়ে যায়, তখন একদম প্রবৃত্তির পিছনে পড়ো না। বরং আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করো। যে, আয় আল্লাহ্! আমার নফস আমাকে প্রতারিত করছে, ভুল পথে পরিচালিত করছে। আয় আল্লাহ্ আপনি আমাকে রক্ষা করুন। এবং আল্লাহর পানাহ চেয়ে নিজে নিজেকে সংযত করো একটু ভাবো এই যে, কাজ যার দিকে আমার নফস আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। এটা কি লাভজনক কোন কাজ, নাকি ইহকালে এবং পরকালে কোন কাজে আসবে। কোরআন করীম নেক লোকদের প্রশংসা করে বলছে :

إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ○

(سورة الأعراف ٢٠١)

এই লোকেরা চিন্তা করে যে, এটা সঠিক পথ না ভুল পথ। তো চিন্তার ফলে হঠাৎ সে সঠিক পথ দেখতে পার যখন গুনাহের খেয়াল আসবে। তখন এটা বুঝে নেয়া উচিৎ যে, এটা কু-মন্ত্রণা যা মনে ঢালা হচ্ছে এটা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো যে, আল্লাহ্ তা'আলার দিকে রুজু করা এবং ঐ গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার সাধনা করা।

হযরত ইউসুফ (আঃ) কীভাবে বেঁচেছেন

দেখো নফসী শয়তান যুলাইখাকে প্ররোচিত করেছে ফলে সে হযরত ইউসুফ (আঃ) কে তার মন্দ অভিলাষ চরিতার্থে আহ্বান করেছে। চতুর্দিকের দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়েছে যাতে তিনি কোথাও পালাতে না পারেন। এরপর সে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর দিকে অগ্রসর হয়েছে কুরআন কারীমের ভাষায়–

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ○ (سورة يوسف ٢٤)

যাই হোক হযরত ইউসুফ (আঃ) তো ইনসান ছিলেন নবী হলেও মানুষই তো ছিলেন। এ ছাড়া মানবিক সব চাহিদা কামনা বাসনা তার মাঝে বিদ্যমান এবং অবিবাহিত সুঠাম যুবক এ অবস্থায় এক যুবতী নারী রুদ্ধদ্বার গৃহে তাকে গুনাহের দিকে আহ্বান করছিল। কোরআন বলছে যে, কিছু খেয়াল তার মনে চলেও এসেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলার দিকে রুজু হয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার পানাহ চেয়েছেন যে, আয় আল্লাহ্! বিপদে পড়েছি, মনেও খায়েশ তৈরি হচ্ছে। তো তিনি তার করণীয় পালন করেছেন, এবং যতটুকু যেতে পারেন, গিয়েছেন। কিন্তু বের হওয়ার কোন পথ নেই। তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে দরজা পর্যন্ত গিয়েছেন। আর তার করণীয় এটাই ছিল যে, দরজা পর্যন্ত যাওয়া কিন্তু রক্ষা করা আল্লাহর কাজ। সুতরাং আপনি আপন দয়া ও অনুগ্রহে আমাকে উদ্ধার করুন। দৌড় দিলেন দরজা খুলে গেল। দরজা অতিক্রম করতেই যুলাইখার স্বামীর দেখা পেলেন, তো উদ্ধার করেছেন কি দু'আ করেছেন যে–

وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ الْجَاهِلِيْنَ ○ (سورة يوسف ٣٣)

ইয়া আল্লাহ্! যদি আপনি এই মহিলার চক্রান্ত আমার থেকে দূর না করেন। তাহলে আমিও তার দিকে ঝুঁকে পড়বো। আমার মনেও ঝোঁক তৈরি হবে এবং জাহেলদের কাতারে আমি শামিল হয়ে যাব। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করেছেন এবং তাকে উদ্ধার করেছেন। কোরআন করীম এই পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। যে যখন নফস প্রতারিত করে কিংবা কোন মানুষ, বাহ্যত যদিও মানুষ কিন্তু কাজ করছে শয়তানের, আহ্বান করছে গুনাহের। মনে কু-মন্ত্রণা দিচ্ছে পাপের। তখন আল্লাহর পানাহ চাও, আয় আল্লাহ্! আপনার দয়া ও অনুগ্রহে আমাকে ঐ কাজ থেকে বাঁচান।

দুটি কাজ করা উচিৎ

দুটি কাজ করা চাই, এক আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া। আল্লাহর কাছে দু'আ করা, দ্বিতীয়ত মানুষের সর্বোচ্চ সাধ্য অনুযায়ী গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা। যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ) দরজা পর্যন্ত ছুটে গিয়েছেন। কেউ কেউ উল্টা চেষ্টা করে, গুনাহের কাছে গিয়ে বলে আয় আল্লাহ্! আমাকে বাঁচান। তো এটা দু'আ না বরং উপহাস করা। তাই আগে নিজে চেষ্টা করা এরপর আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলার দিকে রুজু করা। তখন আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলার তাকে উদ্ধার করেন। আর এই সূরার সারাংশ এটাই। ঘুমানোর আগে, পড়ে দম করা।

হাদীস শরীফে এসেছে যে নবী (সাঃ) প্রতি রাতে শয়ন করার পূর্বে قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ـ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ـ এই দুই সূরা পড়তেন। পরে তাঁর হাতের তালুতে দম করতেন, এরপর সারা শরীরে ঐ হাত ফেরাতেন। এভাবে তিনবার করতেন। তিনি এই আমল করতেন। আত্মরক্ষার জন্য, শয়তান থেকে ক্ষতিসাধনকারী সব সৃষ্টি জীব থেকে, যাদুটোনা থেকে, শয়তানের হামলা থেকে, মানুষের আক্রমণ থেকে।

মরযে মওতেও দম করতেন

এমনকি যখন মরযে ওফাত হলো, অর্থাৎ যে অসুস্থতায় হুজুর (সাঃ) এর মৃত্যু হয়েছে। তখন এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, অসুস্থতার কারণে নিজের আমল করার শক্তি ছিল না। তো হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে আমি হুজুর (সাঃ) কে সারা জীবন এই আমল করতে দেখেছি। আমি চাইতাম, যে এখনো এ আমল অব্যাহত থাকুক। আমি চাচ্ছিলাম যে, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ـ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ـ পড়ে হুজুরের সারা শরীরে দম করবো। কিন্তু চিন্তা করলাম যে, আমি পড়ে যদি নিজের হাতে দম করি, তাহলে ঐ বরকত হবে না। তো আমি এই দুই সূরা পড়ে হুজুরে দস্ত মোবারক উঁচু করলাম এবং হুজুরের দস্ত মোবারকে দম করে হুজুরের দেহ মোবারকে হুজুরের হাত ফেরালাম। তো এটা এমন আমল যা মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে নিরাপদ রাখে। মানুষ আজকাল বড় যাদুটোনার শিকার হচ্ছে, এবং আমল, তাবীজ কবজ কত কিছুই করছে। পক্ষান্তরে যে আমল হুজুর (সাঃ) থেকে সাব্যস্ত, তা করছেনা সুতরাং যেই ব্যক্তি এই আমল করে এবং আল্লাহর রহমতের প্রতি আশা রাখে ইনশআল্লাহ্ সে শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। এবং যাদুকরদের

অনিষ্ট থেকে মাহ্‌ফুজ থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা তার ফযলেও করমে আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

আজ মসজিদগুলো অরক্ষিত

সর্বশেষ এ কথা আরজ করছি যে, আমাদের দেশে আজ প্রত্যেক ব্যক্তির অস্থির এবং পেরেশান। বাস্তবতা তো এটাই শত্রুর ভীড়ের কারণে সার্বভৌমত্ব আজ ঝুঁকির মুখে। প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটে চলছে। এমনকি মসজিদগুলোও আজ হামলার শিকার অরক্ষিত বিপদের স্থান। আপনি পড়ে থাকবেন জুমার দিনে মসজিদে জুমার নামাজের সময় এমন কাজ হয়েছে যে সত্তরজনের চেয়েও বেশি শহীদ হয়েছেন বিভিন্ন জায়গায়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড অহরহ হচ্ছে। লাহোরেও এ ঘটনা ঘটেছে ইসলামাবাদেও ঘটেছে। আমার প্রবল ধারণা কোন মুসলমান এমন কাজ করতে পারেনা। মসজিদে হামলা করবে, নামাজীদের উপর আক্রমণ করবে। নামাজ পড়া অবস্থায় গুলি চালাবে, এটা বহির্চক্রান্তের ধারাবাহিকতা। যার মুখোমুখি আজ আমরা। আল্লাহর কাছে দু'আ করা উচিত যে আয় আল্লাহ্! আপনার দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের বদ আমলগুলো মাফ করে দিন। এবং আমাদের এই প্রপাগান্ডা ও অপপ্রচার থেকে নিরাপদ রাখুন। দ্বিতীয় বিষয় হলো আল্লাহ্ তা'আলা তো হুকুম দিয়েছেন যে হেফাজত আল্লাহ্ তা'আলার কোন মাখলুক আল্লাহ্ তা'আলার ব্যতিরেকে কোন উপকারও করতে পারেনা। কোন ক্ষতিও করতে পারেনা। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা এবং তাঁর রাসূল এই তাকীদ দিয়েছেন যে, আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু মুনাসিব ব্যবস্থা নেয়া যায় তা নেয়া। আর এটা নবী করীম (সাঃ) এর সুন্নাত কোন কোন দুশমনের পক্ষ থেকে হামলার আশংকা হলে সাহাবায়ে কেরাম হুজুরের নিরাপত্তার জন্য আশেপাশে পাহারা দিতেন। আর যখন মদীনা মুনাওয়ারায় হামলার আশংকা ছিল। তখন সাহাবায়ে কেরাম মদীনা পাহারা দিয়েছেন, এবং এই পাহারা সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বিরাট ফযিলত বর্ণনা করেছেন। এই জন্য সাধ্য সীমা পর্যন্ত মানুষ যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে তা গ্রহণ করা উচিৎ। কেননা আজ মসজিদকে টার্গেট বানানো হচ্ছে এমনকি একের পর এক ভয়াবহ ঘটনা ঘটছে।

মসজিদে আগমনকারীদের দেহ তল্লাশী করা হবে

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের মসজিদে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যে যারা মসজিদে প্রবেশ করবে মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে তার দেহ তল্লাশি করা হবে

এর মধ্যে সকলের ফায়দা আছে সকলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা পরম সত্য হলে বাস্তব যে মসজিদে এজাতীয় ব্যবস্থা ভাল লাগে না। এটা আল্লাহর ঘর। এখানে যে আসবে যখন আসবে তাকে বাধা দেয়া যাবেনা। কিন্তু বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মসজিদ কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন যেই এখানে আসবে তাকে তল্লাশী করা হবে। এবং তল্লাশী করার পর তাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে, যাতে এতটুকু ব্যবস্থাপনা। যেমন আমি বলেছিলাম, আমাদের সাধ্য অনুযায়ী নিরাপত্তার কথা। নামাজী যারা আসেন। এরা আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর ইবাদত আঞ্জাম দেয়ার জন্য আসেন। মসজিদ এন্তে জামিয়াদের কাছে এ সব নামাজী আমানত। এদিকে লক্ষ্য করে এই বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আশা করি আপনারা এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন। আর সাহায্য করবেন বর্তমান বিরাজমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবকে হেফাযত করুন এবং ঈমানের উপর রাখুন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ঝাড় ফুঁক এবং তাবীজ তুমার

সূরা নাস (৪)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ. وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ إِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَآ شَرِيْكَ لَهُ. وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○ مَلِكِ النَّاسِ ○ إِلٰهِ النَّاسِ ○ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ○ الَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُوْرِ النَّاسِ ○ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ○ آمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

সূচনা

সম্মানিত ও প্রিয় ভায়েরা! এটা কুরআনুল কারীমের সর্বশেষ সূরা। যার আলোচনা বিগত জুমা ধরে চলছে। সার কথা হলো কোরআনুল কারীমের সর্বশেষ দুই সূরা قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۔ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۔ তখনই নাযিল হয়েছিল যখন ইহুদিরা হুজুর (সাঃ) কে যাদু করার চেষ্টা করেছিল। তখন নবী করীম (সাঃ) কে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তালকীন দেয়া হয়েছে যে, আপনি এই দুই সূরা পড়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। প্রথম সূরা ছিল সূরা ফালাক যার প্রয়োজনীয় আলোচনা বিগত হয়েছে। দ্বিতীয় সূরা হলো, قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ। যাকে সূরা নাস বলে, আর তার তরজমা হলো যে, নবী করীম (সাঃ) কে হক তা'আলা বলেছেন قُلْ আপনি বলুন, কী বলবেন? أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ আমি আশ্রয় চাচ্ছি সব মানুষের প্রতিপালকের مَلِكِ النَّاسِ সব মানুষের বাদশা। إِلٰهِ النَّاسِ সব মানুষের উপাস্য। এর দ্বারা তো উদ্দেশ্য আল্লাহ্

তা'আলা। কিন্তু এখানে তিনটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। যিনি সব মানুষের প্রতিপালক। যিনি সব মানুষের বাদ্‌শা। যিনি সব মানুষের উপাস্য مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ঐ শয়তানের যে, মানুষকে কু-মন্ত্রণা দেয়, এবং পিছু হটে যায়। مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ চাই যে মানুষের মধ্যে থেকে হোক কিংবা জ্বিনদের মধ্য থেকে।

আমার আশ্রয় প্রার্থনা করো

বিগত দুই জুমায় আমি এর ব্যাখ্যায় আরয করেছিলাম। যার সারাংশ ছিল যে, যখন কোন ওয়াসওয়াসা কোন্ খারাপ ধারণা গুনাহের ইচ্ছা, গুনাহের খায়েশ, কিংবা আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলার সম্পর্কে কোন বদ গুমানি কোন ওয়াসওয়াসা তৈরি হয় তখন আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, বান্দার উচিৎ আল্লাহ্ তা'আলার পানাহ চাওয়া, ইয়া আল্লাহ্! আমি এই ওয়াসওয়াসার অনিষ্ট থেকে আপনার পানাহ চাচ্ছি, এই দু'আর মধ্যে সব ধরনের ওয়াসওয়াসা অন্তর্ভুক্ত। আর যখন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, পানাহ চাও তাহলে নিশ্চিত যে, এই আমল করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আপন আশ্রয় দান করবেন। এটা অসম্ভব যে, এক মহান সত্ত্বা কাউকে বললেন, তুমি আমার পানাহ চাও। আর যখন সে পানাহ চাইল। তখন বলল, ভাগো এখান থেকে আমি তোমাকে পানাহ দিব না।

একজন ভদ্র মানুষও এমন করতে পারে না। আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলার সত্তা, যিনি রহমান রহীম তার থেকে এমন আচরণ তো অসম্ভব।

কুরআনে কারীমের দু'আ রদ হতে পারে না

এজন্য হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন, কোরআনে কারীমে যে সব দু'আ আছে। রদ, প্রত্যাখাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই কেননা যখন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

قُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ ○ (سورة المؤمنون ١١٨)

বলো আয় আমার রব। আমাকে মাফ করুন আমার প্রতি রহম করুন। আপনি সর্বোত্তম রহমকারী। তো যখন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, এটা বলো অর্থাৎ প্রার্থনার বিষয় বস্তু বলে দিচ্ছেন। দুনিয়ার যখন কারো সামনে আর্জি পেশ করা হয়। তখন তার একটা রূপ হলো যে, মানুষ নিজের ভাষায় পেশ করে দ্বিতীয় রূপ হলো যার সামনে উপস্থাপন করছে। তখন সে নিজ থেকেই বলে যে, অমুক ভাষায় আবেদন করো, তখন সেই আর্জি বা আবেদন কীভাবে প্রত্যাখ্যাত

হতে পারে। এজন্য যখন মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করবে, এ ধরনের সব অনিষ্ট থেকে। তখন আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা তাকে অবশ্যই আশ্রয় দান করবেন। তবে শর্ত হলো, খালেস দিলে চাইতে হবে।

হযরত ইউসুফ (আঃ) এর আশ্রয় গ্রহণ

দেখুন, হযরত ইউসুফ এর ঘটনা কোরআন করীম উল্লেখ করছে। যুলাইখা তার দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং চতুর্দিকের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, এবং গুনাহের প্রতি আহ্বান করছে। যাকে আহ্বান করা হচ্ছিল সেও ছিল একজন মানব সন্তান। তার মনে মানবিক কামনা বাসনা বিদ্যমান ছিল। তিনি ফেরেশতা ছিলেন না। কেননা কোরআন বলছে– (সূরা ইউসুফ)

নারীটি গুনাহের (পাক্কা) ইরাদা করেছিল এবং তার (ইউসুফের) মনেও কিছু, কিছু খেয়াল চলে এসেছিল যদি আল্লাহর নিদর্শন না দেখতেন।

তিনি মানুষ ছিলেন যদি খেয়ালের উন্মেষ না ঘটত, প্রবৃত্তির উদ্রেক না হত, এবং তিনি বেঁচে যেতেন তাহলে এটা কোন গৌরবের বা অলৌকিক বিষয় হতনা। পরিপূর্ণ যুবক মানবিক চাহিদা পূর্ণরূপে বিদ্যমান, শক্ত সমর্থ এবং মনে খায়েশ পয়দা হচ্ছে, এতো প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে বেঁচে থাকাটাই হলো মিরাকল বা গৌরবের বিষয়, পূর্ণতার কাজ। আর এই পূর্ণতা নবীদের পূর্ণতা। কোরআন বলছে তিনি দুটি কাজ করেছেন। এক হলো, মনে যে ভাবনার উন্মেষ ঘটেছে, তা থেকে পানাহ চেয়েছেন। আয় আল্লাহ্! আমার মনে এই ভাবনার উন্মেষ ঘটেছে। অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে। যদি আপনি রক্ষা না করেন। তাহলে আমি বাঁচতে পারবো না। অর্থাৎ আশ্রয় চেয়েছেন– আল্লাহ্ তা'আলার আর দ্বিতীয় কাজ করেছেন যে, আমার সামর্থ্য আছে, দরজা পর্যন্ত যাওয়া, এবং আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী সে চেষ্টা করেছি। আপনি চেষ্টা কবুল করুন। আল্লাহ্মুখী হয়েছেন যে, আয় আল্লাহ্! আমার সামর্থ্য ছিল যে, পালিয়ে দরজা পর্যন্ত পৌছা। জানাও ছিল যে, দরজায় তালা ঝুলছে। পালিয়ে যেতে পারব না। কিন্তু আমার সামর্থ্য ছিল দরজা পর্যন্ত পৌছা। এখন যে করেই হোক দরজা পর্যন্ত পৌছে গিয়েছি। যখন আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা দেখেছেন যে, বান্দা তার কাজ সম্পূর্ণ করেছে, এবং আমার আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। এখন তো আমার কাজ, তো আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা দরজার তালা ভেঙ্গে দিয়েছেন। মাওলানা রুমি (রহ.) বলেন ঃ

گرچہ رخنہ نیست عالم را پدید

خیرہ یوسف باید دوید

যদি তুমি গুনাহের গণ্ডি থেকে বের হওয়ার পথ না পাও, তো যেখান পর্যন্ত পালাতে পার পালিয়ে যাও। এরপর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো যে, আয় আল্লাহ্! আমার কাজ এতটুকুই ছিল, সামনে আপনার কাজ।

আযাদী আন্দোলনের একটি ঘটনা

আমি আব্বাজান (রহঃ) এর কাছে শুনেছি যে, ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলনে যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই চলছিল, তখন জায়গায় জায়গায় নিরপরাধ মানুষকে ফাঁসিতে ঝুলানো হচ্ছিল। অন্যায় অনাচারে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ আজ এই নির্মমতাকে ভাল বলে। অথচ তার ইতিহাসে বর্বরোচিত, নির্যাতন, নিপীড়নের সাক্ষ্য। যুলুমের বাজার ছিল উত্তপ্ত, সে সময় এক আল্লাহ্ওয়ালা এক ঘরে ইংরেজদের ষড়যন্ত্র থেকে গা বাঁচিয়ে অবস্থান করছিলেন। কয়েকদিন এই অবস্থায় অতিবাহিত হলো, না ছিল কোন খাবার পানি। না পারছিলেন বাহিরে বের হতে। বাহিরে বের হতেন তো ইংরেজদের টার্গেটে পরিণত হতেন। এভাবে যখন কয়েকদিন অতিবাহিত হলো। প্রাণ ওষ্ঠাগত পান করবেন সেই পানিটুকু নেই। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। তখন চিন্তা করলেন যে, আমার যতটুকু শক্তি আছে আমি চেষ্টা করি এরপর আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তো কাছেই একটি পেয়ালা পড়েছিল, ক্ষুধা পিপাসার কারণে এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, চলাই দুষ্কর। পেয়ালা হাতে নিয়ে হেলে দুলে উঠান পর্যন্ত পৌঁছলেন এবং উঠানে নিয়ে রেখে দিলেন, এবং দু'আ করলেন, আয় আল্লাহ্! আমার সামর্থ্য ছিল এখানে, এসে পেয়ালা রেখে দেয়া। এখন, বৃষ্টি বর্ষণ করা আপনার কাজ। আপনার ফযলে আসমান থেকে এতে পানি দান করুন– এই দু'আ করলেন। যখন বান্দা তার কাজ সম্পন্ন করেছে, এবং বিষয়টি আল্লাহর কাছে উত্থাপন করেছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন হ্যাঁ এখন আমার কাজ। মেঘ এলো বৃষ্টি বর্ষিত হলো পেয়ালা পানিতে পূর্ণ হয়ে গেল। তো আল্লাহ্ তা'আলার কাছে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার করণীয় করে ফেলবে। এরপর আল্লাহর কাছে চাইবে, গুনাহ্ থেকে বাঁচার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করবে। এটা অসম্ভব যে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে গুনাহ থেকে হেফাজত করবেন না।

এ সূরায় এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে

এই সূরায় আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা তো এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে নিজের কাজ করো এরপর আমার কাছে পানাহ চাও। শয়তান থেকে, আত্মিক

ব্যাধি থেকে, কোন খারাপ সঙ্গ পেয়েছেন। যে আপনাকে বিপথে পরিচালিত করেছে। আপনাকে কু-মন্ত্রণা দিচ্ছে, তো তার মন্দসঙ্গ থেকে বেঁচে থাকার জন্য। আল্লাহর কাছে পানাহ চান। হাদীসে রাসূল (সাঃ) দু'আ করেছেন। আয় আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই। مِنْ صَاحِبِ السُّوْءِ মন্দসঙ্গ থেকে যেই সঙ্গ আমাকে বিপথগামী করবে। সেইসঙ্গ থেকে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আশ্রয় প্রার্থনার অভ্যাস গড়ে তুলুন। প্রত্যেক খারাপ কাজ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন।

ছালাতুল হাজ্ত পড়ে দু'আ করুন

এখানে এই বিষয়টি উল্লেখ করছি যে, আশ্রয় প্রার্থনার এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সাহায্য চাওয়ার সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হলো যে মানুষ বিনম্রচিত্তে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। ছালাতুল হাজত পড়বে। নবী করীম (সাঃ) হাদীসে বলেছেন, যখন তোমাদের কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, কোন বিপদ দেখা দেয়। তো ছালাতুল হাজতের নিয়ত করে দু'রাকাত নামাজ পড়ুন। এরপর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন। এর কিছু দু'আও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। মুখস্থ করে নিলে ভাল হবে। এই দু'আ মুনাজাতে মাকবুলেও লেখা হয়েছে। এবং মাসনূন দু'আতেও লেখা হয়েছে। মুখস্থ করে নিলে ভাল হবে। একান্ত যদি মুখস্থ না হয় তাহলে لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ বলে আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে প্রয়োজন পেশ করা। আয় আল্লাহ্! আমার এই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আপনার দয়া ও অনুগ্রহে আমাকে দান করুন। সালাতুল হাজত পড়ে দু'আ করার পদ্ধতি সমস্ত প্রয়োজন সব সমস্যাকে সমাধান করার জন্য। সর্বোত্তম ও ফলপ্রসূ পন্থা এটা রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাত। হুজুর এ ব্যাপারে তালকীন করেছেন।

যে কোন কাজের জন্য তাবীজ নেয়া

আমি এজন্য বলছি যে, আজকাল আমাদের সমাজে যখনই কোন সমস্যা দেখা দেয় কিংবা কোন বিপদ ঘটে, তখন মানুষ তাবীজ কবচের ফিকিরে লেগে যায়, বলে কোন তাবীজের কথা বলে দিন। কিংবা কোন তাবীজ লিখে দিন। বড় বেশি তাবীজের ফিকির করা হচ্ছে। অথচ আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে সালাতুল হাজত পড়াকে আমলেই আনা হচ্ছেনা। অথচ নবী করীম (সাঃ) থেকে যে তরীকা সাব্যস্ত আছে তা হলো এই যে, দুই রাকাত নামাজ পড় এবং আল্লাহর দরবারে দু'আ করো। এটা অধিক ফলপ্রসূ এতে ছাওয়াবও আছে এবং আল্লাহ্

তাবারকা ওয়া তা'আলার দিকে রুজু হওয়ার ফায়দাও আছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী তাবীজ কবচ থেকে বেশি কার্যকরী এটা। এখন মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, ভাই সর্বক্ষেত্রে কোন তাবীজ থাকা চাই। অমুক বস্তুর জন্য তাবীজ, অমুক বস্তুর জন্য কবচ।

হযরত থানভী (রহ.) বলেন একবার এক মহিলা আসল এবং বলল হুজুর আমার চুল বাঁকা হয়ে থাকে সোজা হয় না। চিরুনি করি তার পরও সোজা হয়না। এমন কোন তাবীজ দিন, যেন আমার চুল সোজা হয়ে যাবে। তিনি বললেন, এমন কোন তাবীজ নেই, মহিলা বলল, আমাকে একটি তাবীজ দেন। আপনি আলেম মানুষ। মানুষ মনে করে যে, আলেম হয় সে সব দ্বীনি ইলম হাসিল করে। সে ইলম অর্জন করে তাবীজ কবচের জন্য। যার তাবীজ কবচের জ্ঞান নেই সে আলেমই না। তো আজকাল মানুষের মন-মস্তিষ্ক এটাই ধরে নেয়। বিশেষ করে মহিলারা এই ধারণা পোষণ করে যে, যদি এ আলেম হয় তাহলে কোন না কোন, তাবীজ লিখতে পারবে, এবং এমন তাবীজ দিবেন যার মাধ্যমে আমার উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

নবীজী কখনো তাবীজ দেন নেই

ভালভাবে বুঝে নিন যে, হুজুর (সাঃ) গোটা জিন্দিগীতে একটা তাবীজও দেন নেই। হ্যাঁ কখনো কখনো ঝাড় ফুঁক করেছেন। কেননা কোরআন বলেছে قُلْ বলে মুখে বলো তো কোন কোন সময় অসুস্থের উপর ঝাড় ফুঁক করেছেন– اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَائُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا পড়ে দম করেছেন, এবং اَسْئَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَشْفِيَكَ পড়ে দম করেছেন। এ জাতীয় কিছু যিকির আছে। যা পড়ে দম করাতো হুজুর আলাইহিস সালাম থেকে সাব্যস্ত। এই দু'আগুলোর তরজমা হলো আল্লাহ্ যিনি সব মানুষের স্রষ্টা। এই রোগ দূর করে দিন। اَنْتَ الشَّافِيْ আপনিই আরোগ্য দানকারী। لَا شِفَاءَ لَا يُغَادِرُ اِلَّا شِفَائُكَ আপনি ছাড়া কেউ আরোগ্য দান করতে পারেনা। سَقَمًا। এমন আরোগ্য দান করুন যার পর কোন রোগব্যাধি থাকবেনা। এই দু'আ হুজুর (সাঃ) থেকে সাব্যস্ত اَسْئَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَشْفِيَكَ। আমি ঐ মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি। যিনি মহা আরশের অধিপতি। যিনি আপনাকে আরোগ্য দান করবেন। এটা হুজুর (সাঃ) থেকে সাব্যস্ত আছে তো হুজুর (সাঃ) অনেক ক্ষেত্রে ঝাড় ফুঁক করেছেন। কিন্তু তাবীজ লেখে দেন নেই। না কোন সাহাবীকে বলেছেন তুমি লেখে দাও।

সাহাবায়ে কেরাম তাবীজ লিখেছেন

অবশ্য যারা লিখতে পারেনা। পড়তে পারেনা। তাদের জন্য কতিপয় সাহাবী (রাঃ) এটা করেছেন যে তারা তো মুখস্থ করতে পারবে না এবং পড়ে দম করতে পারবে না। নাও এটা লিখে দিলাম তো বেঁধে নাও। নিজের বাযুর উপর বেঁধে নাও। কিংবা গলায় পরো, এটা কতিপয় সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে। এজন্য তাবীজ কবচ জায়েয। কেউ কোরআনের আয়াত লিখিত তাবীজ গলায় দিলে তাহলে হারাম হবে না। কিন্তু ঐ তাবীজ জায়েয যাতে কোরআনে কারীমের কোন আয়াত কিংবা কোন দু'আ বা যিকির উল্লেখ থাকে এবং তার অর্থ বুঝে আসে।

এ জাতীয় তাবীজ হারাম

এমন তাবীজ যাতে এমন কথা লেখা হয়েছে যার উদ্দেশ্য বুঝে আসে না। তা হারাম। যদি এমন কোন বাক্য লেখা হয় কিংবা এমন কোন কথা লেখা হয় যার উদ্দেশ্য বুঝে আসেনা। এ জাতীয় তাবীজ ব্যবহার করা না জায়েজ। কিছু তাবীজ এমন হয় যাতে গাইরুল্লাহর সাহায্য চাওয়া হয়। চাই তিনি নবী হোন। ওলী হোন কিংবা বড় কোন বুযুর্গ। আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্যের কাছে উদ্দেশ্য প্রার্থনা করা মানুষকে শিরকের কাছে পৌঁছে দেয়। এজন্য ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, তাবীজে যদি এমন কোন কথা লেখা হয়, যা আমরা বা আপনি বুঝছেন না। কে জানে তার ভিতরে গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছে। কোন শিরকী কথা তার ভিতর লেখা আছে। এজন্য এ ধরনের তাবীজ ব্যবহার করা একেবারে না জায়েয। কিন্তু যদি কোরআন কারীমের আয়াত হয়, কিংবা আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলার কোন যিকির, হয় তা কোন দু'আ বা তাবীজে লেখা হয়েছে, তো তা জায়েয আছে, কিন্তু এতে কোন পুণ্য নেই।

তাবীজ দু'আ রূহানী চিকিৎসা নয়

মানুষ মনে করে যে লোক তাবীজ তুমার করে সে আধ্যাত্মিক চিকিৎসক তার নাম দিয়েছে চিকিৎসা। এটা কোন রূহানী চিকিৎসা নয়, তা এমন চিকিৎসা যেমন আপনি হাকিমের কাছে গিয়েছেন, ডাক্তারের কাছে গিয়েছেন, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে গিয়েছেন, এমনি কোন সচিবের কাছে গেলেন, তো এটাকে রূহানী চিকিৎসা বলা ভুল হবে। বরং এ হলো শারীরিক চিকিৎসা। না এর মধ্যে কোন ফযিলত আছে, না আছে কোন ছাওয়াব, না আছে এর সঙ্গে পবিত্রতার কোন সম্পর্ক। এতটুকু যে একটা জায়েয কাজ।

তিলাওয়াতের ছাওয়াব পাবে না

এটা বুঝে নিন যে, যদি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, মানুষ কোরআন পড়ে যাতে তার আরোগ্য লাভ হয়। তার ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়। কিংবা আল্লাহ্ তাকে জীবিকা দান করেন। সন্তান দান করেন, তো এতে তিলাওয়াতের ছাওয়াব অর্জিত হবে না। তবে জায়েয আছে, কিন্তু তিলাওয়াতের ছাওয়াব তখনই হাসিল হবে। যখন বান্দা একমাত্র আল্লাহর জন্য পড়বে। আল্লাহর জন্য তিলাওয়াত করবে তখন ছাওয়াব হাসিল হবে। যদি কোন লক্ষ্য নিয়ে পড়ে তাহলে জায়েয আছে, কোন গুনাহও নেই। অর্থাৎ আমাদের সমাজে এ ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝি হচ্ছে।

চিকিৎসার সঠিক পন্থা

যে পন্থা আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন যে, قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ পড়ো এবং যে পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন হুজুর (সাঃ) সে পদ্ধতিতে আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলার কাছে দু'আ কর। আর দু'আ এমন কাজ যদি দুনিয়াবী মাকছাদে করা হয় তাহলেও ছাওয়াব আছে। যদি কেউ দু'আ করে আয় আল্লাহ্! আমার ঋণ পরিশোধ, আয় আল্লাহ্ আমাকে রিযিক দান করুন। আয় আল্লাহ্! আমাকে রোগ থেকে মুক্তি দিন। প্রার্থনা করছেন, নিজের জন্য কিন্তু প্রত্যেক দু'আর উপর আল্লাহর দরবারে ছাওয়াব লিখা হচ্ছে, ইবাদত কিন্তু তাবীজ কবজ কোন ইবাদত নয়। জায়েয আছে, যেমন ঃ চিকিৎসা করেন, এটাও একটা চিকিৎসা। আমাদের সমাজে সব বিষয়ের সমাধান তাবীজ কবচ দ্বারা করার চেষ্টা করা হয়। আর যিনি কবিরাজ তাবীজ দেন, তিনি তো অনেক বড় আলেম, বড় পীর যদি তাবীজ না দেয় তাহলে বুঝতে হবে সে জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছে কোন পড়া লেখাই করেনি।

অদ্ভুত তাবীজ

হযরত গাংগুহি (রহঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি আমার কাছে আসল, এবং এসে বলতে লাগলো হুজুর আমাকে অমুক কাজের জন্য একটা তাবীজ দেন। হযরত বললেন, আমি জানিনা এর কোন তাবীজ আছে কিনা ঠিক আছে আমি দু'আ করবো। লোকটি বলতে লাগল, না না তাবীজ দেন। হযরত বললেন, তাবীজ সম্পর্কে আমার জানা নেই আমি দু'আ জানি। হযরত চিন্তা করলেন সে তো নাছোড় বান্দা গ্রাম্য লোক তাকে আমি ফিরিয়ে দিব। সে মনে কষ্ট পাবে। তো আল্লাহর কাছে দু'আ করে একটা তাবীজ লিখলেন। উর্দূতে লিখলেন যে, আয়

আল্লাহ্! আমিও জানিনা এও জানেনা। আপনার দয়া ও অনুগ্রহে তার উদ্দেশ্য পুরা করে দিন। এ দু'আ লিখে দিলেন, আর এর বরকতে আল্লাহ্ তাকে ফায়দা দান করলেন।

তাবীজের সূচনা

এই তাবীজের বিষয় না কোরআনে এসেছে না হাদীসে। কিন্তু তার সূচনা হয়েছে এভাবে যে, জনৈক বুযুর্গ কাউকে কোন দু'আ, লিখে দিয়েছেন এবং ঐ দু'আর বরকতে কার্যসিদ্ধি হয়েছে, তো মানুষ নাম দিয়েছে এটা অমুক কাজের তাবীজ। এটা জ্বরের তাবীজ ওটা মাথা ব্যথার তাবীজ। এভাবে সূচনা হয়েছে তাবীজের। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো যে, যখন সমস্যা দেখা দেয় কিংবা কোন বিপদ ঘটে, তখন কোরআন যে নির্দেশনা দিয়েছে এবং নবী করীম (সাঃ) যে পথ দেখিয়েছেন। সেইদিকে ঝুঁকে এবং আত্মাধিক গুরুত্বপূর্ণ করা। অধিক কার্যকারী মনে করা এবং অন্য সবকিছুকে তার মোকাবেলায় অতি নগণ্য ভাবা। বর্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত, মানুষ তাবীজকে দু'আ থেকে বেশি মূল্য দেয়। মনে করা হয় সব কিছুর জন্যই কোন না কোন তাবীজ আছে। অথচ এটা একদম ভুল ধারণা এবং কোরআন হাদীসকে অমর্যাদার সমার্থক। আমি বলব কোরআন হাদীস থেকে অধিক কার্যকরী, না তাবীজ না কবজ না ঝাড়ফুঁক, যা নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তাকে মুখস্থ করে নিন, সালাতুল হাজত পড়ুন তারপর যে দু'আ আছে ওটা পড়ে সব উদ্দেশ্য আল্লাহর দরবারে পেশ করুন। আল্লাহ্ তার ফযলে ও করমে আমাদেরকে এরপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

জগতসমূহের ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা

সূরা ফাতিহার তাফসীর (১)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ إِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ آمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত

সম্মানিত দ্বীনি ভায়েরা! সূরা ফাতেহার মোট আয়াত সংখ্যা সাতটি। এবং প্রথম আয়াত হলো– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ যার অর্থ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক।

সব কিছুর প্রশংসা যেন আল্লাহ্ তা'আলারই প্রশংসা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার। এই কথার অর্থ এই যে, যখন বিশ্ব জগতের কোন বস্তুর প্রশংসা করা হয়। তখন যেন স্বয়ং আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুরই প্রশংসা করা হয়, কারণ যখন মানুষ কোন বস্তুর প্রশংসা করে, তখন সে প্রশংসা যেন তার স্রষ্টারই প্রশংসা। যেমন কেউ কোন দালানের প্রশংসা করল, কত বড়। কত উঁচু, কী সুন্দর। এই প্রশংসা তো নকশাবিদ ইঞ্জিনিয়ারেরই প্রশংসা। ঠিক তেমনি ভাবে যখন বিশ্বজগতের কোন কিছুর প্রশংসা করা হয়, তখন মূলত

আল্লাহ্ তা'আলারই প্রশংসা করা হয়। কেননা তিনিই তো একমাত্র জগত নির্মাতা– তিনিই তো একমাত্র স্রষ্টা সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য।

বিশ্ব জগতের প্রতিপালক

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ একথা বলার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আরেকটি গুণ বর্ণনা করেছেন رَبِّ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ তিনি সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। বস্তুত যদি লক্ষ্য করা হয় তখন দেখা যাবে যে, "আলহামদুলিল্লাহ" এর মধ্যে দাবি করা হয়েছিল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার। এখন (স্বভাবতই) প্রশ্ন আসে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য কেন? এ প্রশ্নের জবাবে বলা হচ্ছে এজন্য যে, তিনি رَبِّ الْعَالَمِيْنَ যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক, লালন পালনকারী, পরওয়ার দিগার। আর শব্দ ব্যবহার করেছেন– عَالَمِيْنَ সারা জাহানের– অর্থাৎ এই বিশ্বে যত জগত আছে– মানব জগত, দানব জগত, জড়জগৎ আকাশ-বাতাস, চাঁদ-সূর্য, গ্রহ-তারা, মেঘমালা-পর্বতমালার জগত নদ নদী ও সমুদ্র। এককথায় মহাবিশ্বে যত জগত আছে, তিনি সব জগতের প্রতিপালনকারী প্রভু।

একটি প্রশ্ন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ এই বাক্যটি এক আশ্চর্যজনক ইঙ্গিত বহন করছে সেটা হচ্ছে দাবি তো করা হয়েছে যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সব কাজ প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু কখনো কখনো মানুষের মনে সংশয় দেখা দেয় সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, প্রতিনিয়ত আমাদের সামনে কত অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে। যা প্রশংসার যোগ্য তো নয়ই বরং মানুষ তা দেখে মনক্ষুণ্ন হয়। যেমন ঃ কোন মানুষ কোন মানুষের উপর জুলুম করে। কেউ কারো সঙ্গে বাড়াবাড়ি করে। অন্যায়ভাবে খুন করে, ছিনতাই রাহাজানি করে। সবই তো বিশ্বে ঘটছে। মানুষ করছে, তাই বলে তো এ জাতীয় কোন কাজ প্রশংসার যোগ্য হতে পারেনা। তাহলে একথা কীভাবে বলা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার সব কাজ প্রশংসার যোগ্য? যখন আমাদের সামনে এমন ঘটনা ঘটে যা প্রশংসার যোগ্য তো নয়ই বরং তাতে রয়েছে যাতনা ও যন্ত্রণা। তখন আমাদের মনে বিভিন্ন প্রশ্ন জাগে। সন্দেহ সংশয় দেখা দেয়। মূলত رَبِّ الْعَالَمِيْنَ এই শব্দের মাঝে সব জিজ্ঞাসার জবাব রয়েছে। আর তা হলো, যখন আপনার সামনে এমন কোন ঘটনা ঘটে যা দেখে আপনি ক্রুদ্ধ হন, আপনার কষ্ট লাগে। তখন আপনি

চিন্তা করেন আপনার জ্ঞানের ক্ষুদ্র পরিধি থেকে। অথচ জ্ঞানের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে থেকে কোন ব্যাপারে এই ফায়সালা করা যাবেনা যে, এটা মনঃপূত হচ্ছে না। এটা ভাল না, এটা কষ্টকর, এতে রয়েছে দুঃখ যাতনা, লাঞ্ছনা বঞ্চনা আর আপনি তো এ মন্তব্য করেছেন আপনার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে। কিন্তু যিনি সারা জাহানের স্রষ্টা, জগত নিয়ন্ত্রক, মহান প্রতিপালক, তার দৃষ্টি রয়েছে কোন কাজ জগতবাসীর জন্য মঙ্গলজনক এবং কোন কাজ অমঙ্গলজনক। আপনার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে তার ভালত্ব ও মন্দত্ব ধরা পড়বে না।

আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞানের দৃষ্টান্ত

যেমন ধরুন। কোন বাচ্চার শরীরে ফোঁড়া হয়েছে এবং ডাক্তার ঐ ফোঁড়া অপারেশন করছে। আর বাচ্চা চিৎকার করে এলাকাবাসীর ঘুম হারাম করে দিচ্ছে। ঐ বাচ্চার চিৎকার চেঁচামেচি শুনে আপনি মনে মনে বললেন, তার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে, তার প্রতি জুলুম করা হচ্ছে। আহারে! বাচ্চাটা কীভাবে কাঁদছে, চিৎকার করছে। আর ডাক্তার বেটা তার উপর ছুরি চালাচ্ছে। কিন্তু যদি একটু চিন্তা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে, তার সঙ্গে যে আচরণ করা হচ্ছে তা মূলত তার উপকারার্থে করা হচ্ছে এবং এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে তার কল্যাণ। আর তার প্রতি কল্যাণকামিতা এবং সহমর্মিতার দাবী ও এটাই। একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত মাত্র। সুতরাং সারা জগতের যিনি ব্যবস্থাপক তিনিই জানেন কখন কোন মুহূর্তে কোন কাজ জগতের জন্য কল্যাণকর। আর তিনি তো হলেন رَبِّ الْعَالَمِيْنَ এ জন্য তিনি যে ফায়সালা করেন তা বড় ন্যায়সঙ্গত ফায়সালা এবং তিনি যা করেন তা বান্দার কল্যাণার্থেই করেন। তবে কখনো কখনো আল্লাহ্ তা'আলা এই জগত সমূহের রহস্যপূর্ণ কল্যাণকর বিষয়গুলো কোন কোন নেক বান্দার সামনে প্রকাশ করে দেন।

এক বিচ্ছুর অদ্ভূত ঘটনা

প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে কাবীর প্রণেতা ইমাম রাযি (রহ.) এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে জনৈক বুযুর্গের একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, একবার এক বুযুর্গ ফোরাত নদীর পাড় দিয়ে হাঁটছিলেন। যেতে যেতে দেখলেন, একটি বড় আকারের বিচ্ছু তার সামনে দিয়ে যাচ্ছে। তখন তার অন্তরে এই খেয়াল আসলো যে, সমস্ত বিশ্বজগতে কোন কিছু কোন মাকছাদ ছাড়া বে-ফায়দা হরকত করেনা– তাতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন না কোন কল্যাণ নিহিত থাকে। নিশ্চয়ই এই বিচ্ছু কোন কাজে যাচ্ছে। আজকে

আমি তার পিছু নিব, এবং দেখবো সে কোথায় যায়, কী করে। যেমন চিন্তা তেমন কাজ। তিনি বিচ্ছুর অনুসরণ করতে শুরু করলেন, আগে বিচ্ছু পেছনে বুযুর্গ। বুযুর্গ চলছেন, বিচ্ছুও চলছে। এক পর্যায়ে বিচ্ছু মোড় পরিবর্তন করে এবং নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে যায়। বুযুর্গও দাঁড়িয়ে যান এটা দেখার জন্য যে, এরপর কী হয়?

বিচ্ছুর জন্য খোদায়ী কিশতী

কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর বুযুর্গ দেখলেন, একটি কচ্ছপ সাঁতার কেটে আসছে এবং ঠিক ঐ জায়গাটায় এসে নেমেছে যেখানে বিচ্ছু দাঁড়িয়ে আছে। কচ্ছপটি আসা মাত্রই বিচ্ছুটি লাফ দিয়ে কচ্ছপের পিঠে চড়ে বসে। বুযুর্গ মনে মনে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বিচ্ছুকে নদী পার করার জন্য কিশতী পাঠিয়েছেন। আজকে আমাকে তার পিছু নিতে হবে। দেখবো সে কোথায় যায়? এজন্য আমিও একটি ছোট কিশতী নিয়ে নিলাম, এবং কিশতীতে চড়ে নদী পার হতে শুরু করলাম। আর কচ্ছপ ও সাঁতরিয়ে নদীর একূল থেকে ওকূলে পৌঁছল এবং যখন পাড় ঘেষে দাঁড়াল তখন বিচ্ছু কচ্ছপের পিঠ থেকে লাফ দিয়ে পাড়ে নামে। আমিও কিশতী ভিড়িয়ে তীরে নামি। অতঃপর বিচ্ছু চলা শুরু করল। আল্লাহ্ ভাল জানেন কোথায় যাচ্ছে? কোথায় তার গন্তব্য? কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছি তার পিছু নেব এবং দেখবো সে কোথায় যায়। এমন এক জায়গায় গেল যেখানে এক ব্যক্তি শুয়ে আছে। আমি চিন্তা করলাম হয়ত বিচ্ছু ঐ ব্যক্তিকে দংশন করবে। এ জন্যই হয়ত সে সফর করে এসেছে। এভাবে আমিও তার পিছু পিছু চলতে লাগলাম। যখন আমি ঐ ঘুমন্ত ব্যক্তির কাছে গেলাম তখন দেখলাম একটা বিষধর সাপ ফনা উঠিয়ে রেখেছে। ঐ ব্যক্তিকে দংশন করতে উদ্যত। সাপটা ঐ লোককে দংশন করার উপক্রম হয়েছে। এদিকে তৎক্ষণাৎ বিচ্ছুটা সাপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এত জোরে দংশন করে যে, সাপটা কাত হয়ে পড়ে যায়। আর ঐ ব্যক্তিতো শুয়েই আছে, তার তো খবর নেই যে এদিকে কী ঘটে চলছে।

এক বিচ্ছু তোমার মোহসিন

যখন ঘুমন্ত ব্যক্তি চোখ খুলল তখন দেখলো, তার পাশ দিয়ে একটি বিচ্ছু যাচ্ছে। তখন সে একটি পাথর উঠিয়ে বিচ্ছুকে মারার ইচ্ছা করল। আমি গিয়ে তার হাত ধরে ফেললাম, এবং বললাম আল্লাহর ওয়াস্তে তাকে মারবেন না। এ তোমার উপকারী। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে রক্ষা করার জন্য একে অনেক দূর

থেকে পাঠিয়েছেন। যদি এই বিচ্ছু না থাকতো তাহলে সাপ তোমাকে দংশন করত এবং তুমি মারা পড়তে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সেই কোত্থেকে এই বিচ্ছুকে তোমার জন্য পাঠিয়েছেন। সে এসে ঐ সাপকে মেরেছে যে সাপ তোমাকে পরপারে পাঠাতো। বুযুর্গ বলেন, আজ এখানে এসে আমার এই বুঝ এসে গেছে যে, এ জগতে কোন হরকত কোন নড়াচড়া কোন কল্যাণ থেকে খালিনা। অতএব তিনিই رَبِّ الْعَالَمِيْنَ যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

জগতসমূহের মহাব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা

যখন (ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কোন) কীট-পতঙ্গও নড়াচড়া করে। তখন তারও কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে। তাকেও আল্লাহ্ তা'আলা কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন। এটাও আল্লাহ্ তা'আলার 'রুবুবিয়্যাতের, প্রত্যক্ষ নিদর্শন। যার মাধ্যমে জগত পরিচালিত হচ্ছে। আপনি একটু চিন্তা করুন, যদি এই ব্যক্তি জাগ্রত থাকত। আর এই বিচ্ছুকে দেখত। তখন স্বভাবতই তার মনে এই খেয়াল আসত যে, এটা তো বিষাক্ত প্রাণী। একে মেরে ফেলা দরকার। কিন্তু তার তো জানা নেই যে, এই বিচ্ছু তার জন্য (জীবনের নতুন পয়গাম) নিয়ে এসেছে। সুতরাং এই বিশ্ব জগতে প্রতিনিয়ত যত ঘটনা ঘটছে। (তার মধ্যে) অনেক ঘটনা এমন আছে মানুষ তার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যার নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনে ব্যর্থ হয়। এজন্য আমরা মনে করি এগুলো হলো দুঃখ, কষ্ট ও ক্রোধপূর্ণ অপ্রীতিকর ঘটনা। অথচ যিনি জগতসমূহ পরিচালনা করছেন। তিনি এটাও জানেন, কখন কী হওয়া উচিত।

হযরত মুসা (আঃ) এবং খিজির (আঃ) এর ঘটনা

আপনি শুনেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুসা (আঃ) কে হযরত খিজির (আঃ) এর কাছে পাঠিয়েছেন। ঘটনা হলো, একবার হযরত মুসা (আঃ) ভাষণ দিচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, বর্তমান দুনিয়ায় সবচে বেশি ইলম কার কাছে। সে সময় হযরত মুসা (আঃ) নবী ছিলেন। যখন দুনিয়ায় কোন নবী থাকেন তখন তার চেয়ে বড় আলেম কেউ হয় না। এ প্রেক্ষিতে হযরত মুসা (আঃ) বললেন, আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ইলম আছে।

যদিও শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত মুসা (আঃ) সে যুগের সবচে বড় আলেম ছিলেন। কিন্তু যখন ঐ ব্যক্তি প্রশ্ন করেছেন সবচে বড় আলেম কে? তখন তাঁর উচিৎ ছিল বিষয়টি আল্লাহর হাওলায় ছেড়ে দেয়া এবং একথা বলা যে, আল্লাহ্ই সবচে ভাল জানেন, কে বড় আলিম। আমি 'সবচে বড় আলিম। একথা

আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দ হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন : তুমি তো বলেছ যে, তুমি সবচে বড় আলেম। তাই আমি তোমাকে আমার এমন এক বান্দার কাছে পাঠাবো যার ইলম তোমার চেয়ে বেশি।

মাছ হারিয়ে গেল

হযরত খিযির (আঃ) এর কাছে হযরত মুসা (আঃ) কে পাঠানো হল। হযরত মুসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আয় আল্লাহ্! কীভাবে সেখানে পৌছবো। বলা হলো : তোমার সঙ্গে একটা মাছ নিবে। চলতে চলতে এমন এক জায়গায় পৌছবে, যেখানে মাছ তোমাদের থেকে হারিয়ে যাবে। মাছটা যেখানে হারিয়ে যাবে। সেখানে ঐ ব্যক্তির দেখা পাবে। মুসা (আঃ) চলতে লাগলেন, একসময় মাছ হারিয়ে যায়। এবং সমুদ্রে চলে যায়। কিন্তু মুসা (আঃ) এর সহচর হযরত ইউশা (আঃ) মাছের কথা ভুলে যান এবং গন্তব্য ছেড়ে আগে বেড়ে যান। অনেক দূর যাওয়ার পর মূসা বললেন, মাছ কোথায়? হযরত ইউশা (আঃ) বললেন, যেখানে আমরা শুয়েছিলাম সেখান থেকে মাছ সমুদ্রে চলে গিয়েছে। হযরত মুসা (আঃ) বললেন–

ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ○ (سورة الكهف ٦٤)

আমরা তো তাই চাচ্ছিলাম। তারা পিছনে ফিরে আসলেন, এবং সেখানেই হযরত খিযির (আঃ) এর সঙ্গে দেখা হয়। হযরত মুসা (আঃ) হযরত খিযির (আঃ) কে বললেন, আপনার সোহবতে আমি কিছু সময় কাটাতে চাই। যাতে আল্লাহ্ আপনাকে যে ইলম দান করেছেন তা আমাকেও দান করেন।

আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না

হযরত খিযির (আঃ) বললেন, যদি আপনি আমার সঙ্গে থাকেন, তাহলে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না। হযরত মুসা (আঃ) বললেন, ইনশাআল্লাহ ধৈর্য ধারণ করবো এবং আপনি যেমন বলবেন, আমি ঠিক তেমনই করবো। হযরত খিযির (আঃ) বললেন, ঠিক আছে আমি যা যা করবো, সে ব্যাপারে আমি নিজ থেকে কোন ব্যাখ্যা করার আগে আপনি কোন প্রশ্ন করবেন না। এবং এ কথা বলতে পারবেন না যে, আমি কী করছি? কেন করছি? হযরত মুসা (আঃ) বললেন, ঠিক আছে, জিজ্ঞাসা করবো না। হযরত খিযির (আঃ) তো رَبِّ الْعَالَمِيْنَ এর পক্ষ থেকে বিশ্ব পরিচালনার জন্য নিয়োজিত ছিলেন। এরপর তারা দু'জন সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হলেন। একটি কিশতি পাওয়া গেল। কিশতির

চালকদের সঙ্গে কথাবার্তা হল, তারা কোন ভাড়া ছাড়াই কিশতিতে চড়েন, কিশতি চলতে শুরু করল। গন্তব্যে পৌছার পর হযরত খিযির (আঃ) (একটি কোদাল নিয়ে) ঐ কিশতির একটি কাঠ ভেঙ্গে ফেললেন। এটা দেখে হযরত মুসা (আঃ) ঘাবড়ে গেলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর বান্দা : যারা আমাদেরকে বিনা ভাড়ায় কিশতিতে আরোহণ করিয়েছে, অথচ আপনি তাদের কিশতি ভাঙ্গছেন? তখন হযরত খিযির (আঃ) বললেন। আমি প্রথমেই বলেছি আপনি ধৈর্য ধরতে পারবেন না। এবং এও বলেছি যে, কোন প্রশ্ন করা যাবে না। পেরেশান হয়ে মুসা (আঃ) বললেন, ভুল হয়ে গেছে। মাফ করে দিন, ভুলে গিয়েছি।

শিশুকে হত্যা করলেন

সামনে অগ্রসর হলেন। কিশতি থেকে নেমে দেখলেন, একটি নাবালেগ শিশু খেলছে। হযরত খিযির (আঃ) ঐ শিশুটিকে পাকড়াও করলেন এবং ধড় থেকে তার মাথা আলাদা করে ফেললেন। তখন হযরত মুসা (আঃ) তীব্রবেগে ছুটে এলেন। এবং বললেন, অন্যায়ভাবে হত্যা করাতো হারাম। আর এতো নাবালেগ শিশু! আপনি অন্যায় করেছেন। নিষ্পাপ, নাবালেগ বাচ্চাকে হত্যা করে রাগ মিটিয়েছেন। তখন হযরত খিযির (আঃ) বললেন, আমি প্রথমেই আপনাকে বলেছি যে, আপনি ধৈর্য ধরতে পারবেন না। হযরত মুসা (আঃ) বুঝতে পারলেন যে, এই ব্যক্তির সঙ্গে চলা মুশকিল, মুসা (আঃ) বললেন, ঠিক আছে, আমি আর প্রশ্ন করব না। যদি করি তাহলে আমাকে আপনার সঙ্গে রাখবেন না। এরপর তারা একজনপদের দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানকার লোকদের কাছে তারা আতিথ্য কামনা করলেন। বললেন আমরা মুসাফির কিছু খাবার দাবারের ব্যবস্থা করো। ঐ জনপদবাসী ছিল ভীষণ কৃপণ। সঙ্গে সঙ্গে তারা অস্বীকৃতি জানিয়ে বলল, আমরা আপনাদেরকে আপ্যায়ন করতে পারবো না। নিকটেই হযরত খিযির (আঃ) দেখলেন একটি দেয়াল ধসে পড়ার উপক্রম হচ্ছে। তিনি দেয়ালটির পুনঃনির্মাণ শুরু করলেন, এবং ঠিক আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনলেন। হযরত মুসা (আঃ) বললেন, এই শহরের লোকেরা তো আমাদের মেহমান বানাতে চায়নি, আর কাজটাও এমন, যদি চাইতেন সামান্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন এবং আমাদের খাবার দাবারের ব্যবস্থা হত। খিযির (আঃ) বললেন, এখন আমাদের পৃথক হওয়ার সময় এসে গেছে। আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম যে, আপনি ধৈর্য ধরতে পারবেন না।

প্রতিটি কাজ পরওয়ার দিগারের হুকুমেই করেছেন

হযরত খিযির (আঃ) বললেন, এখন শোনেন ঘটনা কী? যে কিশতির কাষ্ঠখণ্ড ভাঙ্গা হয়েছিল, তা এই কারণে হয়েছিল যে, কিশতিটি যে অঞ্চলে যাচ্ছিল, সেখানে এক জালিম বাদশা আছে, যে ভাল ভাল কিশতিগুলো ছিনিয়ে নেয়। এই বেচারা নিঃস্ব মানুষ। সমুদ্রে কাজ করে। যদি খুঁত ছাড়া কিশতি সেখানে পৌঁছতো, তাহলে বাদশা ছিনিয়ে নিত এবং তার কিশতিটা খোয়া যেত। বাদশার জুলুম থেকে বাঁচানোর জন্য কিশতিটাকে আমি ত্রুটি যুক্ত করে দিয়েছিলাম। যাতে করে তার দিকে বাদশার দৃষ্টি না পড়ে। আর যে শিশুটিকে দেখেছেন, তাকে আমি হত্যা করেছি এ জন্য যে, তার বাবা বড় নেক লোক ছিলেন। তার ব্যাপারে আল্লাহ্ জানতেন যে, এই শিশু বড় হয়ে তার বাবা মাকে কুফুর এবং শিরিকের পরীক্ষায় ফেলবে। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাকে খতম করে দিতে বলেছেন এবং তার পরিবর্তে তিনি তাদেরকে আরেকটি নেক সন্তান দান করবেন। আর যে দেয়াল সোজা করেছি। তার উদ্দেশ্য ছিল, ঐ দেয়ালের নিচে দু'জন ইয়াতীম বালকের সম্পদ প্রোথিত ছিল যদি এই দেয়াল পড়ে যেত তাহলে মানুষ এই সম্পদ লুটে নিত এবং তারা দু'জন বঞ্চিত হত। এজন্য আমি চেয়েছি যে, এই বালকেরা বড় হবে, এবং তারা তাদের সঞ্চিত সম্পদ বের করে নিবে। আর আমি যা যা করেছি, তা আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় করেছি। স্বেচ্ছায় কিছুই করিনি।

সব কাজের পিছনে আছে একটি গোপন রহস্য

এ সব দৃশ্য আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুসা (আঃ) কে এই জন্য দেখিয়েছেন যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে সব ছিল মন্দ কাজ। কিশতির কাষ্ঠখণ্ড ভাঙ্গা, নাবালেগ বাচ্চাকে হত্যা করা বাহ্যত খারাপ ছিল কিন্তু ঐ সত্তা যিনি জগতসমূহ পরিচালনা করছেন। তিনি জানেন কোন্ সময় কোন্ কাজ জগতসমূহের জন্য কল্যাণকর। তিনি এগুলো করেন তার হিকমত এবং জ্ঞানের আলোকে। কেননা তিনিই সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় এবং পূর্ণতার আধার অথচ আপনি ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক স্বল্প জ্ঞান অপরিমিত বাসনা নিয়ে তার ব্যাপারে গবেষণা করেন, এবং এ মন্তব্য করেন যে, অমুক কাজ মন্দ অমুক কাজ খারাপ, কিন্তু ঐ সত্তা যিনি জগতসমূহ পরিচালনা করেন তিনি জানেন কখন কোন কাজ ফলপ্রসূ হবে। এবং কোন্ কাজ হেকমত পূর্ণ ও কল্যাণকর হবে। তিনি رَبِّ الْعَالَمِيْنَ যিনি জগতসমূহের স্রষ্টা পরিচালক, প্রতিপালক, পর্যবেক্ষক। অতএব এ বিশ্বে এমন কোন কাজ নেই যা কল্যাণ শূন্য।

আল্লামা ইকবাল বলেছেন,

نہیں ہے چیز نکمّی کوی زمانے میں

کوی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

কোন কালেই কোন কিছু অসম্পূর্ণ নয়

কুদরতের কারখানায় কোন কিছুই মন্দ নয়

সুতরাং যা কিছু হচ্ছে তা আল্লাহ্ তা'আলার হিকমত ও ইলম অনুযায়ী হচ্ছে। এই বিশ্ব নীতির দাবি এটাই এবং বিশ্বকল্যাণের চাহিদাও এটা। (আপনারা তো সামান্য বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বসে আছেন। সামান্য জ্ঞানে তুষ্ট আছেন।

আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকুন

এ জন্যই আপনারা কোন কারণে ক্ষেপে যান কোন দুর্ঘটনায় ক্রুদ্ধ হন। দুঃখ পান, পরিতাপ করেন। ঠিক আছে দুঃখ করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাস রাখেন যে, আমার দুঃখ করা। এটা আল্লাহর ফায়সালা। তার ইচ্ছা এবং হিকমত অনুযায়ী। আর এরই নাম ছবর। চাই মানুষ কষ্ট পাক, কাঁদুক চোখ থেকে অশ্রু ঝরুক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হোক। তবে অন্তর একথার উপর আশ্বস্ত হবে যে, বিশ্ব চরাচরে যা কিছু হচ্ছে তা আল্লাহর ইচ্ছায় হচ্ছে, তাঁর হিকমত ও জ্ঞান অনুযায়ী ঘটছে। আমরা তার ফায়সালায় সন্তুষ্ট। এটাকে ছবর বলেন–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ ○ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوْا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ○ (سورة البقرة ١٥٥-١٥٦)

অর্থ ঃ আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব। কখনো তোমাদের উপর ভীতিকর অবস্থা তৈরি হবে। কখনো অনাহারের পরীক্ষা হবে। কখনো তোমাদের সম্পদ হ্রাস পাবে। কখনো তোমাদের জান-মালে কমি আসবে। কখনো তোমাদের প্রেমাস্পদ, নিকটাত্মীয়, ভাই বন্ধুদের মধ্য থেকে বিদায় নিবে। কখনো তোমাদের ফসল হ্রাস পাবে, সবই হবে আর এর মাধ্যমে আমি তোমাদের পরীক্ষা করবো। আপনি সুসংবাদ দিন ঐ সব লোকদেরকে যারা যখন কোন বিপদের মুখোমুখি হয় তখন তারা বলে, আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবো, "আল্লাহর জন্য" এ কথার উদ্দেশ্য কী?

উদ্দেশ্য হলো সারা জাহানে যা কিছু হচ্ছে তা হিকমত ও কল্যাণ অনুযায়ী হচ্ছে। আমরা তার কাছেই প্রত্যাবর্তন করবো। যারা একথা বলে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রহমত বা অনুগ্রহ, তারাই সঠিক পথে আছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার তাওফিক দান করুন আমীন।

সারকথা

ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ এই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি সারা জাহানের মালিক– একথাই প্রমাণ করে যে, সারা জগতে যা কিছু হচ্ছে তা বাস্তবেই হচ্ছে। আল্লাহর ইচ্ছায় হচ্ছে তার কল্যাণ ও হিকমত অনুযায়ী হচ্ছে। এর উপর ঈমান আনা সব মুসলমানের দায়িত্ব। চাই তা মনঃপূত হোক বা না হোক। আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকুন। তিনি যা করেছেন, যথাযথই করেছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে এই উপলব্ধি দান করুন, এবং ঈমানের উপর অটল রাখুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

আল্লাহ্ তা'আলা রহমানও রহীমও
সূরা ফাতিহার তাফসীর (২)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَآ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ○ آمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

সম্মানিত মুসল্লি ও দ্বীনি ভাইয়েরা! সূরা ফাতিহার তাফসির চলছিল। এই সূরায় সাতটি আয়াত আছে। গত জুমায় প্রথম আয়াতের প্রয়োজন পরিমাণ আলোচনা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন। আয়াতের তরজমা এই, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

বিশ্ব জগতে রয়েছে অসংখ্য জগত

عَالَمِيْنَ এটা عَالِم এর বহুবচন। প্রত্যেকটি জগতকে আরবীতে আলম বলে। বহুবচন ব্যবহার করে আল্লাহ্ তা'আলা একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই জগতে আরো অনেক জগত রয়েছে। একটা জগত তো আমরা সকলেই দেখতে পাচ্ছি। তা হলো এই পৃথিবী। আর এই পৃথিবীরও এমন অনেক বিষয় আছে যা আমরা দেখতে পাই না। জানিনা আল্লাহ্ তা'আলা কত ধরনের এবং

কত রকমের 'মাখলূক, এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করে রেখেছেন। মানুষ ও প্রাণী, প্রাণীরও একটা জগত আছে। এবং প্রাণীর মাঝেও বিভিন্ন প্রকার আছে। যেমন চতুস্পদ জন্তু। স্থলে বসবাসকারী প্রাণী জলে বসবাসকারী প্রাণী। আসলে, কত রকমের জন্তু বা প্রাণী আছে তার গণনা অসম্ভব। আমরা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু প্রত্যক্ষ করছি এটাকেই শুধু জগত মনে করছি।

সমুদ্র জগত

সমুদ্রের নিচে কী অদ্ভুত জগত লুকিয়ে আছে? অধিকাংশ মানুষ সে ব্যাপারে বে-খবর। সাবমেরিনে করে দুইবার আমার সমুদ্রের তলদেশে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। নিচে নামার পর আমি দেখলাম, সমুদ্রের নিচে যে জগত তা সমুদ্রের উপরের জগত থেকে কয়েক গুণ প্রশস্ত, এবং বিস্তৃত। সমুদ্রের তলদেশে আছে উদ্ভিদ জগত। রয়েছে প্রাণী জগত। অসংখ্য, অগণিত জীব-জন্তু। রংও বড় অদ্ভুত। পর্বতমালা, বনাঞ্চল ও মালভূমিতে এক দেড় ঘন্টা থাকার সুযোগ হয়েছিল। জগতসমূহের বড় এক জগত আল্লাহ্ তা'আলা দেখিয়েছেন। মোট কথা মানুষের আকলে ধরবেনা যে, আল্লাহ্ তা'আলা এত 'মাখলুকাত, সৃষ্টি করেছেন এবং জগতসমূহের প্রতিপালন আল্লাহ্ তা'আলাই করছেন। তার খাদ্য সরবরাহ করছেন তিনিই। খাদ্য সৃষ্টি করছেন তিনিই এবং দেখভাল করছেন, এবং বৃদ্ধি ঘটাচ্ছেন। সামুদ্রিক প্রাণীর সব প্রয়োজন সমুদ্রের নিচেই সম্পন্ন হচ্ছে। তিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। এক জগতের নয়, আর এগুলো তো শুধু দুনিয়ার আলোচনা।

এই পৃথিবী কণা বরাবরও নয়

পৃথিবীকে যদি মহাবিশ্বের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে তা একটি ক্ষুদ্র কণাও নয়। পৃথিবী একটি ক্ষুদ্র গ্রহ, তাকে যদি মহাবিশ্বের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে তা একটি কণা বরাবরও নয়। কত গ্রহ রয়েছে যা সদা প্রদক্ষিণরত বর্তমান যুগে যে সকল বিশালাকৃতির দূরবীন আবিষ্কৃত হয়েছে তার সাহায্য নিয়ে বিজ্ঞানীরা বলেন, লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষের ব্যাপ্তি দৃষ্টিগোচর হওয়ার পরও মহাবিশ্বের সমাপ্তির সন্ধান পাওয়া যায় নি।

আলোকবর্ষ পরিচিতি

'আলোকবর্ষ' পরিভাষাটি বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনকৃত। এই কারণে যে, দূরত্বের গণনা শেষ হয়ে গেছে। যদি আপনি বলেন শত কোটি দশ হাজার কোটি বা

কোটি কোটি। কিন্তু তারপর আমাদের কাছে গণনার কোন রাস্তা নেই। তাই তারা একটি নতুন পরিভাষা উদ্ভাবন করেছেন, যদি আলোকরশ্মি পুরোবছর আলোকপথ অতিক্রম করে, তাহলে বছরব্যাপী যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করবে। তা একটি আলোকবর্ষ বলে বিবেচিত হবে। এ থেকে আপনি অনুমান করুন যে, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব এককোটি ছিয়াশি লাখ মাইল। যখন সূর্য উদিত হয় তখন তার রশ্মি মাত্র আট সেকেন্ডে পৃথিবীতে পৌছে যায়। অর্থাৎ আট সেকেন্ডে এক কোটি ছিয়াশি লাখ মাইল অতিক্রম করে। এভাবে যদি আলোকরশ্মি বছরব্যাপী দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে সেই দূরত্ব হল এক আলোকবর্ষ। আর মহাবিশ্বের ব্যপ্তি ও পরিধি সম্পর্কে বলা হয় তা লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষব্যাপী বিস্তৃত। এরপর মানুষের জ্ঞানের পরিসমাপ্তি ঘটে। এবং তাদের দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রমাণ করে কত বিশাল জগত তিনি সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং বিশ্ব জগত আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন, এবং তার ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও দেখভাল তিনিই করছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ তিনিই প্রতিপালক যিনি জগতসমূহকে প্রতিপালন করেন। এবং জগতসমূহের কার্য নির্ধারণ করেন। আমাদের একটি আয়াতের আলোচনা সম্পন্ন হলো।

দ্বিতীয় আয়াত

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন : الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ঐ সত্তা যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালন করছেন। তার বিশেষ একটি গুণ হলো, তিনি সকলের প্রতি দয়াবান এবং অতিশয় দয়ালু। الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কুরআনুল কারীমে দুটি শব্দ পৃথক পৃথক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু উর্দূতে অন্য কোন তরজমা সম্ভব নয়। এ জন্য সাধারণভাবে এই তরজমা করা হয় যে, তিনি পরম করুণাময় অতিশয় দয়ালু। কিন্তু আরবী ভাষায় উভয় শব্দের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। الرَّحْمٰن ঐ সত্তাকে বলে যার রহমত অনেক প্রশস্ত ব্যাপ্ত। অর্থাৎ প্রত্যেকের উপর যার রহমত রয়েছে। তাকে 'রহমান, বলে। আর 'রহীম' ঐ সত্তাকে বলে যার রহমত অনেক বেশি এবং পরিপূর্ণ। উভয় শব্দের মধ্যে পার্থক্য এই যে, রহমানের ব্যাপ্তি বেশি, আর রহীমের মাঝে গভীরতা বেশী। ইংরেজীতে যেমন বলা হয় Extensive এবং Intesive. الرَّحْمٰن Extensive রহমত, যা সমগ্র জগতকে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং الرَّحِيْمِ Intesive রহমত। পরিপূর্ণ রহমত, অতিশয় রহমত। সুতরাং এই উভয় শব্দের মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

'রহমান' সিফাতে প্রকাশস্থল

আল্লাহ্ তা'আলার গুণ বাচক নাম রহমানের প্রকাশস্থল হলো এই পৃথিবী। অর্থাৎ তার রহমত প্রত্যেককে অন্তর্ভুক্ত করে। তিনি আপন অনুগ্রহে সবকে রিযিক দান করেন। সবাইকে প্রতিপালন করেন এবং সবকে দুনিয়ার নিয়ামতসমূহ দান করেন। চাই সে মুসলমান হোক অথবা কাফের হোক। চাই আল্লাহর বন্ধু হোক কিংবা আল্লাহর দুশমন হোক। সবার উপর আল্লাহর রহমত বিস্তৃত। তার রহমতের ব্যাপারে আপনি ধারণা করতে পারেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বকে স্বীকার করে না বরং অস্বীকার করে। আল্লাহর নাফরমানিতে উঠে পড়ে লেগে যায়, এমনকি আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে (নাউযুবিল্লাহ) তামাশা করে। তাকেও আল্লাহ্ রিযিক দেন, এবং প্রচুর পরিমাণে দেন। শায়েখ সাঈদ (রহঃ) বলেন,

ادیم زمین سفرء عام اوست

بریں خوان یغما چہ دشمن چہ دوست

(এই যমীন– আল্লাহ তা'আলার বিরাট দস্তরখানা। এই দস্তরখানে সবাই খায়। চাই সে আল্লাহর দোস্ত হোক বা দুশমন) এবং সেও খায় যে আল্লাহর নাফরমানিতে আদাজল খেয়ে নেমেছে। তাদের দেখ! কীভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের লালন-পালন করছেন। তাদের প্রতিপালন হচ্ছে। তারা সুস্থ থাকছে। উপার্জনের ব্যবস্থা হচ্ছে। রিযিকের অভাব হচ্ছে না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার রহমত দুনিয়াময় ব্যাপ্ত, অনেক বিস্তৃত। চাই মানুষটা মুসলমান হোক বা কাফের। দুনিয়ার নেয়ামত আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের সঙ্গে কাফেরদেরও দান করেন। সুতরাং রহমানের অর্থ হলো, যার রহমত পরিব্যাপ্ত।

الرَّحِيْم এই গুণবাচক নামের প্রকাশস্থল

আর الرَّحِيْم যার অর্থ পরিপূর্ণ দয়া। অর্থাৎ যার দয়া পূর্ণতর এবং তার প্রকাশ ঘটবে আখেরাতে। সেখানে কাফেরদের প্রতি কোন দয়া দেখানো হবেনা। আখেরাতে যারা আল্লাহর দুশমন তাদের সঙ্গে রহমতের মুআমালা করা হবে না। কিন্তু যারা ঈমানদার, তাদের প্রতি পরিপূর্ণ দয়া করা হবে।

দুনিয়ার রহমত অসম্পূর্ণ

নিঃসন্দেহে দুনিয়াতে রহমত আছে কিন্তু তা পূর্ণাঙ্গ নয়। বরং দুনিয়ায় রয়েছে আরামের সঙ্গে ব্যারাম, সুখের সঙ্গে দুঃখ। কখনো কোন সুসংবাদ

আসে, তাও পরিপূর্ণরূপে আসেনা। তাতেও কোন না কোন কষ্টের কারণ থাকে। স্বস্তি পাও তাও অপূর্ণ। তার মাঝেও খুঁতখুঁতে ভাব থাকে। কোন মহান শাসক, বাদশা, ডাক্তার বা যত বড় ধনকুবের হোক এ দাবি করতে পারে না যে, আমার শান্তি পরম শান্তি। না বরং তাতে কষ্ট আসে। পেরেশানী আসে, দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। আর আল্লাহ্ তা'আলা এভাবেই এ দুনিয়া তৈরি করেছেন।

তিনটি জগত

ভাল করে বুঝে নিন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি জগত সৃষ্টি করেছেন। একটা জগত, যেখানে শুধু আনন্দ আর আনন্দ। আরাম আর আরাম। শান্তি আর শান্তি। যেখানে কোন দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, পেরেশানী নেই। সেটা হলো জান্নাত। দ্বিতীয় জগত, যেখানে শুধু কষ্ট আর কষ্ট, দুঃখ আর দুঃখ, আযাব আর আযাব। আল্লাহ তা'আলা সব মুসলমানকে হেফাজত করুন। আমীন। সেটা হলো জাহান্নাম। তৃতীয় আরেকটি জগত আছে যেখানে উভয় বস্তুই বিদ্যমান। কষ্ট আছে, আরাম আছে, আনন্দ আছে বেদনাও আছে। এটা হলো দুনিয়া। দুনিয়ায় যদিও আল্লাহর রহমত অনেক বিস্তৃত, সকলের উপর ব্যাপ্ত কিন্তু পরিপূর্ণ নয়। বরং প্রত্যেকের কোননা কোন কষ্ট আছে। এটা আল্লাহ্ তাবারকা ও তা'আলার সুন্নত বা অমোঘ বিধান। কোন মানুষ বা কোন ব্যক্তি এর থেকে মুক্ত নয়। ধরো অনেক বড় ধনাঢ্য ব্যক্তি। যার ভোগ বিলাসের সব উপকরণ রয়েছে। তাকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন, এই আরাম আয়েশের আড়ালে তার কোন কষ্ট আছে কিনা, উত্তরে সে অসংখ্য দুঃখের কথা বলবে। আমার এই কষ্ট, এই দুঃখ, না পূর্ণ শান্তি আছে না পূর্ণ কষ্ট আছে। যেহেতু এটা দুনিয়া। এর মধ্যে কষ্টও আছে, দুঃখও আছে আর আছে যন্ত্রণা। সে জন্য দুনিয়াতে আল্লাহর রহমত ব্যাপ্ত। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নয়। পূর্ণাঙ্গ তখন হবে যখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এই পয়গাম পাওয়া যাবে। জান্নাতবাসীদের আজকের পর কোন ভয় নেই। কোন দুঃখ নেই, لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ আজকের পর না কোন শঙ্কা আছে না আছে কোন পেরেশানী।

দুনিয়াতে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আশঙ্কা

দেখুন ঃ যদি দুনিয়াতে আপনি কোন দস্তরখানে খেতে বসলেন, এবং আপনার সামনে অনেক মজার খাবার রয়েছে। পেটেও অনেক ক্ষুধা। আপনি খুব মজা করে খেতে শুরু করলেন। কিন্তু মনে মনে এই দু'আও করেন যে, আল্লাহ্ যেন হজম হয়, পেট খারাপ না হয়। কিন্তু জান্নাতে যে সব নেয়ামত থাকবে তার

দ্বারা না বদ হজমের আশঙ্কা থাকবে না পেট খারাপের ভয় থাকবে, আর না মৃত্যুর। তাতে কষ্টের লেশও থাকবে না। দুঃখ-দুর্দশার তো প্রশ্নই আসে না। এজন্য ওখানে যে আরাম হবে তা হবে পূর্ণাঙ্গ। আল্লাহ্ তা'আলা আপন অনুগ্রহে আমাদের সবকে এই পূর্ণাঙ্গ রহমত দান করুন। আমীন। তিনি رَحْمٰنِ ও তার রহমত অনেক প্রশস্ত ও পরিব্যাপ্ত এবং তিনি রহীমও, তার রহমত পরিপূর্ণ। এই জন্যই বুযুর্গরা আল্লাহ্ তা'আলার শানে বলেন ঃ رَحْمٰنَ الدُّنْيَاوَ رَحِيْمَ الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ দুনিয়াতে তিনি রহমান এবং আখেরাতে রহীম। এই দুই ছিফাত আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ফাতিহার এক আয়াতের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। তা হলো الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার আসল সিফাত হলো রহমত।

আল্লাহর রহমত তাঁর ক্রোধের চেয়ে প্রবল

এক হাদীসে কুদসিতে রাসূল সা. আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ নকল করে বলেন :

سَبَقَتْ رَحْمَتِيْ عَلٰى غَضَبِيْ -

আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল। অর্থাৎ তাঁর রহমত বেশী। আল্লাহ্ তা'আলার সিফাত হলো, তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহশীল। যদিও বান্দা নাফরমানির পথ বেছে নেয়, বান্দা-বান্দা হওয়াকে অস্বীকার করে। আল্লাহর রহমত কবুল করা থেকে অস্বীকৃতি জানায়।

দেখুন! কত মুহাব্বত করে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন :

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ -

আল্লাহ্ তোমাদের আযাব দিয়ে কী করবেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও এবং ঈমান আনো?

আল্লাহ্ তা'আলা কত আদর করে বলছেন, তিনি তোমাদের আযাব দিয়ে কী করবেন যদি তোমরা ঈমান আনো? এ দ্বারা কথা বলাই উদ্দেশ্য যে, তিনি বান্দাদের উপর অনুগ্রহশীল এবং এটা তাঁর আসল গুণ। আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করার বাহানা খুঁজেন।

ক্রোধ তো তখনই আসে যখন বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানি করে এবং নাফরমানির পথ বেছে নেয়।

ভুল হয়েছে তাহলে তাওবা করো

আল্লাহ্ তো এ কথা বলেন যে, হে আল্লাহর বান্দা! ভুল হয়ে গেছে, গুনাহও হয়ে গেছে। তুমি আমার কাছে আস, লজ্জিত হয়ে আস। অনুতপ্ত হয়ে আস, এবং তাওবা করো, ক্ষমা মিলবে। আমি তোমার গুনাহ মাফ করে দিব।

يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○ (سورة الزمر ٥٣)

কত ভালবেসে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন : হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। বিশ্বাস রাখ! আল্লাহ্ তা'আলা সব গুনাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন। এবং আমার কাছে আস। একবার বান্দা হয়ে আস। তাওবা করো। কিছুটা অনুশোচনা করে বলো, আল্লাহ্ ভুল হয়ে গেছে, মাফ করে দেন। তো আমি তোমার গুনাহ মাফ করার জন্য প্রস্তুত আছি। তোমার ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করার জন্য তৈরি আছি। আমার রহমত তো এত বড় যে, সত্তর বছর পর্যন্ত বান্দা গুনাহে ডুবে থাকে। কোন নেক কাজ করেনা। এরপর যখন হুঁশ আসে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হয়ে বলে যে,

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ -

যদি মন থেকে তাওবা করে, এবং ভবিষ্যতে গুনাহ না করার উপর দৃঢ় সংকল্প করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : হে বান্দা! আমি তোমার সত্তর বছরের গুনাহ মাফ করে দিব।

গুনাহের উপর অটল থেকো না

এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

(سورة آل عمران ١٣٥)

অর্থাৎ যদি তাদের থেকে কোন অশ্লীল কাজ হয়ে যায়। অথবা তারা কোন গুনাহ করে ফেলে, নিজেদের উপর জুলুম করে। অতঃপর আল্লাহ্কে স্মরণ করে, এবং স্বীয় গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। তাহলে তো আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নেই যিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। তবে যে কাজ করেছো তার উপর অটল থাকা

যাবে না। এবং একথা বলা যাবে না যে, আমি ঠিক কাজ করেছি। জেনে বুঝে এ কাজের উপর জিদ করা যাবে না। বরং লজ্জিত হয়ে, অনুতপ্ত হয়ে আমার দরবারে এসে যাও। আমি তোমাদের মাফ করে দিব।

দেখুন! কত মোহাব্বত করে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন। কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ্ বলেছেন, আমার আসল ছিফাত রহমতের ছিফাত। যা আমার ক্রোধের উপর প্রবল। এজন্য নিরাশ হয়ো না। যখন হুঁশ হবে, আল্লাহ্ তা'আলার কথা স্মরণ হবে, তখন আমার কাছে আস। আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তাওবা করো, ভবিষ্যতে ভাল হয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করো। তাহলে আমি তোমাদের মাফ করে দিব।

রহমতই আল্লাহ্ তা'আলার আসল গুণ

সূরা ফাতিহায় আল্লাহ্তা'আলা প্রথম আয়াতের পর প্রথম যে শব্দটি এনেছেন। তা হলো গুণবাচক নাম رَحِيْمِ দেখুন! পুরো সূরা ফাতিহার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন সিফাত বর্ণনা করেছেন। একটা ছিফাত : رَبِّ الْعَالَمِيْنَ একটা ছিফাত رَحْمٰنِ একটা ছিফাত رَحِيْمِ এবং সামনে আসবে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ | কিন্তু কোথাও কোন ক্রোধ উদ্রেককারী ছিফাত নেই এবং ক্রোধের কোন গুণও বর্ণনা করেননি। এই কারণে যে, ক্রোধ এমন একটা গুণ যার প্রকাশ আল্লাহ্ তা'আলা খুব কমই করেছেন। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার মূলগুণই হলো রহমত। তাই সূরা ফাতেহায় আল্লাহ্ তা'আলা এই গুণটি উল্লেখ করেছেন এবং আমাকে আপনাকে আহ্বান করে বলছেন, আমার রহমত থেকে ফায়দা উঠাও। আর ফায়দা উঠানোর পদ্ধতি হলো, আমার কাছে শোকরগুজার বান্দা হয়ে আস। আর যদি ভুল হয়েও যায়, তাহলে আমি জানি তুমি আদম সন্তান।

তোমাদের থেকে ভুল হবে, এটাও আমি জানি। কিন্তু এই ভুল শোধরানোর সুযোগও আমি তোমাদের করে দিয়েছি। যদি কখনো ভুল হয়েও যায়, তাহলে তার উপর বড়াই করে গোয়ার্তুমি করো না। এবং ভুলের উপর অটল থেকো না, এবং ভুলকে সঠিক বলে চালানোর চেষ্টা করো না, বরং লজ্জিত হয়ে আমার বিচারালয়ে আস এবং বল, ভুল হয়েছে আমাকে মার্জনা করুন। যখন এমন করবে তখন আমি মাফ করে দিব। এর প্রতিষেধকও আমি তোমাদের দিয়ে রেখেছি। যাই হোক! الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর মধ্যে আল্লাহ রহমত ছিফাতের উল্লেখ করেছেন এবং একথা বলছেন যে, হে আমার বান্দা! আমার রহমত থেকে ফায়দা হাসিল কর।

অন্যের প্রতি দয়ার্দ্র হও

দ্বিতীয় কথা হলো, الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ থেকে একথা বুঝে আসছে যে, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা রহমান এবং রহীম এবং রহমত হলো তাঁর সত্তাগত গুণ। সেহেতু তিনি চান যে, বান্দারা ও একে অপরের প্রতি দয়ার্দ্র হবে। অন্যায় আচরণ করবে না। কাউকে বঞ্চিত করবে না। বরং একে অন্যের প্রতি সহমর্মী হবে।

দেখা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হাদীসের পাঠদানকারী মুহাদ্দিসিনে কেরাম থেকে এই রীতি প্রচলিত আছে, যখন কোন তালিবুল ইলম তাদের কাছে পড়ার জন্য যেত তখন তারা সর্বপ্রথম তাদেরকে এই হাদীস শুনাতেন। এই জন্য এই হাদীসকে مسلسل بالاولیت বলে। ঐ হাদীসের تسلسل বা ধারাবাহিকতা এই ভাবে অব্যাহত রয়েছে যে, যখন কোন উস্তাদের কাছে তার শাগরেদ গিয়েছে তখন তিনি সর্বপ্রথম এই হাদীস শুনিয়েছেন। হাদীসটি কী? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

الراحمون یرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من فی الأرض یرحمكم من فی السماء۔

অর্থ : যারা অন্যের প্রতি দয়া করে, রহমান তাদের প্রতি দয়া করেন। যমীনবাসীর প্রতি দয়া কর, তাহলে আসমানওয়ালা তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।

এই শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, যখন আমি রহমান এবং আমি রহীম তখন প্রতি কদমে আমি তোমাদের প্রতি দয়া করি। তোমার পুরো সত্তা পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমার রহমতের প্রকাশ কেন্দ্র। সুতরাং তুমিও আমার অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ কর। আমার অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি সদয় হও। অন্যায় এবং রূঢ় আচরণ করো না। সহমর্মী হও, সৃষ্টির প্রতি দয়া কর এটা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিকতর পছন্দনীয়। আর হাদীস শরীফে এমন অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, মাখলুকের উপর রহম করেছে। শুধুমাত্র এই গুণের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা অনেক মানুষকে মাফ করে দিয়েছেন।

আমাদের জন্য তিনটি পয়গাম তিনটি সবক

ভাই সব! সূরা ফাতেহায় আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা رَبِّ الْعَالَمِيْنَ এরপর الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ দুটি সিফাত বর্ণনা করেছেন। এ থেকে আমাদের জন্য তিনটি শিক্ষা রয়েছে। ১নং হলো আল্লাহ্ তা'আলার সিফাতে আসলী 'রহমত, যা

আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধের উপর গালেব। দ্বিতীয় হলো, বান্দাকে এই পয়গাম দিচ্ছেন যে, যখন আমি রহমান এবং রহীম তখন আমার রহমত থেকে ফায়দা হাসিল করো। এবং তোমার ভুল-ত্রুটি এবং গুনাহ থেকে তাওবা কর। ইস্তে গফার করো। মাফ চাও এবং সামনে নিজের সংশোধনের ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও। অজ্ঞতার কারণে যদি কখনো ভুল করেই ফেল, তাহলে চলে এস, তাওবা কর। আবারও ভুল করেছ, তাওবা কর।

بازآ بازآ ہرآنچہ ہستی بازآ
گر کافر و گبر و بت پرستی بازآ
ایں درگاہ ما درگہ ناامیدی نیست
صد بار گر توبہ شکستی بازآ

"এসো, ফিরে এসো, আমার এই দরবার নিরাশদের দরবার নয়। একশতবার তাওবা ভেঙ্গেছো, তারপরও আমার কাছে এসো, আমি তোমার তাওবা কবুল করার জন্য প্রস্তুত।"

তৃতীয় পয়গাম হলো, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের প্রতি দয়াশীল। সেহেতু হে আমার বান্দারা! তোমরাও স্বীয় সঙ্গী সাথী ও অন্যান্য জীবের প্রতি দয়া দেখাও। জীবের প্রতি যত দয়া করবে রহমানও তোমাদের প্রতি তত পরিমাণ দয়া করবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা আপন অনুগ্রহে আমাদেরকে এই কথাগুলোর উপর আমল করার তাওফিক দান করুন, আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বিচার দিবস অবশ্যম্ভাবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَآ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○آمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

তিনটি আয়াতে তিনটি গুণ

সম্মানিত মুসল্লিয়ানে কেরাম ও দ্বীনি ভাইয়েরা! সূরা ফাতিহার আলোচনা চলছিল। মাঝে আমার সফরের কারণে কিছুদিন বন্ধ ছিল। ইতোপূর্বে সূরা ফাতিহার যে বর্ণনা চলছিল তা সূরা ফাতিহার দুই আয়াতের ব্যাখ্যার উপর হয়েছিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ যার অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক। আর দ্বিতীয় আয়াত হলো الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তিনি রহমান। অর্থাৎ অত্যন্ত দয়ালু। যার রহমত সবকে ঘিরে রেখেছে, এবং তিনি রহীম। যার রহমত পরিপূর্ণ। অতঃপর তৃতীয় আয়াতে বলেছেন, مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ যিনি অধিপতি প্রতিদান দিবসের। এই তিন আয়াতে তিনটি ছিফাত বর্ণনা করেছেন। প্রথম আয়াতে তিনি বলেছেন জগতসমূহের প্রতিপালক। দ্বিতীয় আয়াতে তিনি বলেছেন ঃ তিনি অত্যন্ত দয়ালু। তৃতীয় আয়াতে বলেছেন ঃ তিনি বিচার দিবসের অধিপতি ঐ দিন যেদিন সব মানুষ হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে এবং তার কৃতকর্মের জবাব দিবে।

তিনটি মৌলিক বিশ্বাস

এই তিন আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মূলতঃ ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের দিকে ইশারা করেছেন এবং তার দলীলও বর্ণনা করেছেন। ইসলামের তিনটি মৌলিক বিশ্বাস কী? প্রথম হলো তাওহীদ। অর্থাৎ আল্লাহ্কে এক জানা এবং এক মানা। দ্বিতীয় হলো রিসালাত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের হেদায়াতের জন্য অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন এবং তাদের ধারাবাহিকতা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এসে পূর্ণ হয়েছে। হুজুর আলাইহিস সালাম সর্বশেষ নবী ছিলেন। এটা হলো দ্বিতীয় আকীদা। তৃতীয় আকীদা হলো যে, মৃত্যুর পর আরেকটি নতুন দিন আসবে, যেদিন মানুষ তার স্বীয় কর্মের হিসাব দিবে। ইসলামের মৌলিক আকীদা হলো এই, তিনটি– ১. তাওহীদ, ২. রিসালাত ৩. আখেরাত।

প্রথম আয়াতে তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস

প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যে গুণ বর্ণনা করেছেন, তাহলো ঃ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ জগতসমূহের প্রতিপালক এবং সমস্ত কার্যাদির ব্যবস্থাপক। এটা হলো আল্লাহ্ তা'আলার وحدانية তথা একত্ববাদের দলিল। ঐ সত্তা যিনি কাদেরে মুতলাক। যার কুদরতের পরিসীমা এত বড় যে, জগতসমূহের কার্যাদি তাঁর অধীনে সম্পন্ন হচ্ছে। তাঁর খোদায়ীর মাঝে অন্যকে অংশীদার করার প্রয়োজন নেই এবং দ্বিতীয় কোন সাহায্যকারীরও দরকার নেই। এজন্য খোদা আছেন তো একজনই আছেন। যখন তুমি খোদা মেনে নিয়েছ। এই বিশ্বাস করেছ যে, জগতসমূহ আল্লাহরই সৃষ্টি এবং তিনিই তা নিয়ন্ত্রণ করছেন। সুতরাং দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, তারপর কাউকে খোদা মানা, এবং তার ইবাদত করা একেবারেই অযৌক্তিক। সুতরাং رَبِّ الْعَالَمِيْنَ বলে প্রমাণ পেশ করেছেন তাওহীদের। আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের। যিনি একক, এবং তিনিই ইবাদতের যোগ্য।

দ্বিতীয় আয়াতে রিসালাতের দলীল

দ্বিতীয় আয়াত হলো الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ যদি এ ব্যাপারে ফিকির করা হয়, তাহলে তার অর্থ তো সেটাই যা আমি পূর্বের জুমায় বর্ণনা করেছি এবং মাসআলাও তাই যা আলোচনা করেছি। তার সঙ্গে সঙ্গে নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের একটা দলীল। তা এভাবে যে, মানুষের উপর আল্লাহ্ তা'আলার

নেয়ামত বেশুমার। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাকে দেখার, হাসার, বলার ক্ষমতা দিয়েছেন। চলা ফেরার শক্তি তিনিই দিয়েছেন। সুস্থতা দান করেছেন এবং রিযিক তিনিই দান করেন।

আরও কত অসংখ্য নেয়ামত রয়েছে, যা মানুষ গণনা করে শেষ করতে পারবে না। কিন্তু মানবতার উপর সবচেয়ে বেশি ও গুরুত্বপূর্ণ রহমত এটাই ছিল যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাকে দুনিয়াতে পাঠান তখন তাকে অন্ধকারে (পথ প্রদর্শক ছাড়া) ছাড়েন না। এবং তাকে দুনিয়াতে পাঠানোর পর এ কথা সম্পর্কে বে-খবর রাখেন না যে, কীভাবে সে জীবন-যাপন করবে। কোন্ কাজ করবে; কোন্ কাজ করবে না। যদি আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ায় মানুষ পাঠাতেন এবং আম্বিয়া (আঃ) এর প্রেরণের ধারাবাহিকতা এভাবে জারি না করতেন, যার মাধ্যমে মানুষ জানবে, দুনিয়ায় থেকে তার কী করণীয়, কী বর্জনীয়, কোন্ বস্তু ভাল, এবং কোন্ বস্তু খারাপ। মনিব খুশি হবেন কোন্ কাজে, এবং মনিব নারাজ হবেন কোন্ কাজে। যদি আল্লাহ্ তা'আলা নবুওয়াতের এই ধারা অব্যাহত না রাখতেন, তাহলে এটা হত তাঁর রহমতের পরিপন্থী কাজ। এবং তাঁর শানের অনুপযোগী। যেহেতু তিনি রহমান এবং রহীম। সেহেতু এটা অসম্ভব যে, তিনি কোন মানুষকে দুনিয়াতে পাঠাবেন, আর সে কীভাবে থাকবে? কী করবে, কী করবে না, এটা বলে দিবেন না। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের লাযেমী তাকাযা হলো, রিসালাত এবং নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা। তিনি আপন অনুগ্রহে নবী পাঠাবেন। তাঁর উপর ওহী নাযিল করবেন। এবং এই ওহীর মাধ্যমে তিনি পয়গম্বরদের অবহিত করবেন এবং তারা দুনিয়াবাসীকে অবহিত করবেন যে, কী ধরনের কাজ জায়েয এবং কী ধরনের কাজ না জায়েয। কী জাতীয় কাজ ভাল এবং কী জাতীয় কাজ খারাপ এবং দুনিয়ায় থাকার জন্য কোন্ পথ ও পন্থা অবলম্বন করা উচিত।

ইলম অর্জনের তিনটি মাধ্যম

দেখুন! যখন আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দুনিয়ায় পাঠান, তখন তার সব বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন থাকে, যাতে সে জানে কোন্টা আমার উপকারী, কোন্টা ক্ষতিকর। কী ভাল, কী খারাপ। কোন্ বস্তুর কী অধিকার? এই সব জ্ঞান অর্জন ছাড়া একজন মানুষ দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে পারে না। সুতরাং মানুষের জ্ঞান অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি মাধ্যম রেখেছেন।

জ্ঞানার্জনের প্রথম মাধ্যম পঞ্চ ইন্দ্রিয়

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জ্ঞানার্জনের আর একটি মাধ্যম দিয়েছেন। তাহলো আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় শক্তি, চোখ, কান, জিহ্বা, নাক, হাত-পা। অনেক কিছুর জ্ঞান চোখ দিয়ে দেখে অর্জিত হয়। চোখ দিয়ে দেখছি সামনে যে বস্তুটা আছে তা হলো একটি গাছ। সুতরাং তার গাছ হওয়ার ইলম আপনি চোখের মাধ্যমে অর্জন করেছেন। এমন অনেক কিছু আছে যার ইলম আপনি কানের মাধ্যমে অর্জন করছেন। কোন শব্দ শুনলেন তখন বুঝতে পারলেন যে, এটা কিসের শব্দ। কীভাবে হলো। শোরগোল হয়েছে। যদিও চোখ দিয়ে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু জানা গিয়েছে যে, শোরগোল হচ্ছে। কেউ এমন কোন কিছু ছুঁড়ল যা ক্ষতিকর। কানের মাধ্যমে খবর হয়ে যায়। এমন অনেক বস্তু আছে যা আমরা জিহ্বা দিয়ে চেখে বুঝতে পারি। খাবার সামনে এসেছে। মুখে নিলেন, তখন বুঝতে পারলেন, টক-না মিষ্টি, না লবণাক্ত। তো এই জ্ঞান আমাদের জিহ্বার মাধ্যমে অর্জিত হচ্ছে। কিছু কিছু তো এমন আছে যা হাত দিয়ে ছুঁয়ে চেনা যায়। যেমন : এটা জায়নামাজ, হাত দিয়ে ছুঁয়ে বুঝতে পারলেন যে, কোন নরম বস্তু দিয়ে তৈরি, মুলায়েম। সুতরাং হাতের মাধ্যমে অনেক কিছু জানা যাচ্ছে। যাই হোক! আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান দান করছেন। আপন চোখ, কান, নাক, জিহ্বার মাধ্যমে। আর কিছু বস্তুর ইলম স্বীয় হাত দ্বারা অর্জিত হচ্ছে। নাক দিয়ে অর্জিত হচ্ছে। কোন ফুল দেখে নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিলেন। তখন বুঝতে পারলেন যে, এটা খুশবুদার ফুল। সুতরাং বুঝা গেল, কিছু বস্তুর জ্ঞান চোখ দ্বারা অর্জিত হচ্ছে। কোনটা নাক দিয়ে, কোনটা কান দিয়ে, কোনটা জিহ্বার মাধ্যমে অর্জিত হচ্ছে। আর কোনটা ছুঁয়ে বুঝা যাচ্ছে।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান সীমাবদ্ধ

কিন্তু একটা পর্যায় আসে যখন এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় আমাদেরকে সংবাদ দিতে অক্ষম হয়ে পড়ে। তখন এই অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে আরও একটি বস্তু দান করেছেন। আর তা হলো মানুষের আকল (বিবেক)। সে আকল দ্বারা চিন্তা করে আকল তা অবগত করে। তাকে জ্ঞান দান করে। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়সমূহের একটি গণ্ডি আছে, সেখানে এরা কাজ করে। এর থেকে আগে বেড়ে এরা কাজ করতে পারে না। চোখ তো শুধু দেখতে পারে কিন্তু শুনতে পারে না। কান তো শুনতে পারে দেখতে পারেনা। যদি কোন ব্যক্তি চোখ বন্ধ করে, এই চিন্তা করে যে, আমি কান দিয়ে কোন কিছু দেখবো তখন সে কিছুই দেখতে পারবে না। কেউ মনে করল আমি কান বন্ধ করে চোখ দিয়ে শুনবো,

তাহলে সে শুনতে পারবে না। উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেকের আলাদা আলাদা গণ্ডি রয়েছে। আকল সেখানে কাজ করে যেখানে ইন্দ্রিয় কোন কাজ করে না। তো পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উপর আকল খাটানোর পন্থা আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন।

এর উদাহরণ হলো, মাইক্রোফোন। আমি চোখ দিয়ে দেখে বুঝতে পারলাম যে, তার রং কালো। হাত দিয়ে ছুঁয়ে বুঝতে পারলাম যে, তা শক্ত এবং প্লাস্টিকের তৈরি এবং আমি আমার মুখ দিয়ে যখন আওয়াজ করি তখন অনেক দূরে চলে যায়। তো কান দিয়ে শুনে বুঝতে পেরেছি যে, আওয়াজ অনেক দূরে পৌছে গেছে। তো এই তিনটি বিষয়ের ইলম আমার হাত, কান, এবং চোখের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে, মাইক্রোফোন কোত্থেকে এলো, এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তা বানিয়েছে সে তো আমার সামনে নেই যে আমি তাকে দেখতে পারবো। না তার আওয়াজ শুনছি যে, আওয়াজ শুনে বুঝতে পারবো, কোন্ ব্যক্তি বানিয়েছে? না সে আমার কাছে আছে যে হাত দিয়ে ছুঁয়ে তাকে চিনতে পারবো। তাহলে এখন প্রশ্ন মাইক্রোফোন কে বানিয়েছে? না আমার চোখ জবাব দিচ্ছে, না আমার কান উত্তর দিচ্ছে। না আমার হাত বলছে, কে তার উদ্ভাবক?

ইলম অর্জনের দ্বিতীয় মাধ্যম হলো আকল

আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আরো একটি জিনিস দিয়েছেন। আর তা হল আকল। আকল আমাকে একথা বলে যে, এই মেশিন অনেক দামী এবং তাকে বিশেষ পদ্ধতিতে বানানো হয়েছে। তার মাধ্যমে আওয়াজ দূর-দূরান্তে পৌছে। সে নিজে নিজেই অস্তিত্বে আসেনি। নিঃসন্দেহে কোন দক্ষ কারিগর তা বানিয়েছে। এবং ঐ দক্ষ কারিগর আমাদের সামনে নেই। ঐ দক্ষ কারিগরকে আমরা দেখি না। আমি তাকে ছুঁইনি। কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, নিশ্চয়ই কোন দক্ষ কারিগর তা বানিয়েছে। আমি কী করে জানলাম যে, দক্ষ কারিগর তা বানিয়েছে? এটা আমার আকল জানিয়েছে। যেখানে আমার এই ইন্দ্রিয়গুলো, কান, নাক, চোখ এবং হাত কাজে আসছিল না সেখানে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বিতীয় আরেকটি মাধ্যমে ইলম দান করেছেন এবং একথা বলেছেন যে, কোন দক্ষ কারিগরের মাধ্যমে ফ্লাট তৈরী হয়েছে। এই জ্ঞান আমাকে কে দিয়েছে? এটা আমার আকল দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে এই বিবেক (আকল) দান করেছেন যার মাধ্যমে সে সিদ্ধান্তে পৌছতে পারে। কিন্তু যেভাবে চোখের কাজ সীমাবদ্ধ, এক স্তরে গিয়ে থেমে যায়, কানের কাজ সীমাবদ্ধ, এক স্তর/পরিধি পেরিয়ে থেমে যায়। ঠিক তেমনি ভাবে আকলের কাজও সীমাবদ্ধ।

একটা পর্যায় এমন আসে যেখানে আকল জবাব দিতে পারে না। সেটা কী? উদাহরণস্বরূপ, এটা চিন্তা করো যে, আমি চোখ, কান এবং হাতের মাধ্যমে তো জানতে পারলাম যে, এর মাধ্যমে আওয়াজও অনেক দূরে পৌঁছে এবং এটা মাইক্রোফোন এবং আকলের মাধ্যমে জানা গেল যে কোন দক্ষ কারিগর এটা বানিয়েছে। কিন্তু এই যন্ত্রের কোন্ জাতীয় ব্যবহার জায়েয? এবং কোন জাতীয় ব্যবহার না জায়েয? কোন্টা ভাল? কোন্টা খারাপ। কীভাবে ফায়দা হবে? কীভাবে ক্ষতি হবে। এই প্রশ্ন যখন আমার সামনে আসল তখন না চোখ দিয়ে উত্তর দিতে পারছি, না কান দিয়ে, না জিহ্বা দিয়ে, না আকল দিয়ে। কারণ মানুষের আকল বা বিচার বুদ্ধি বিভিন্ন রকম। এক ব্যক্তি বলবে ভাল। কারণ এর মাধ্যমে গান শোনা যায়, মানুষ খুশি হয়। আরেক ব্যক্তির আকল বলছে, না ভাই যদি তাতে গান বাজানো হয় তাহলে মানুষের চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে। মানুষের আকল বা বিচারবুদ্ধি বিভিন্ন রকম। তো আকল দ্বিধায় পড়ে যাচ্ছে। কারো আকল এটা বলছে কারো আকল ওটা বলছে। তাহলে আকল আমাদেরকে কোন অকাট্য সমাধান দিতে পারছে না। সন্তোষজনক কোন উত্তর দিতে পারছে না। এটা এমন জায়গা যেখানে ইন্দ্রিয় শক্তি নিষ্ক্রিয় এবং আকলও অপারগ। অথবা সে দ্বিধা করতে শুরু করেছে এবং বিভিন্ন সংশয় জন্ম নিচ্ছে।

ইলম অর্জনের তৃতীয় মাধ্যম হলো 'ওহী'

এই অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তৃতীয় আরেকটি মাধ্যমে মানুষকে ইলম দান করেন। তার নাম 'ওহীয়ে ইলাহী,। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী আসে। এবং তা বলে দেয় কোন কাজ ভাল এবং কোন কাজ খারাপ। কোন্টা জায়েয এবং কোন্টা না জায়েয। ওহী পাঠানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দাদের থেকে কিছু বান্দাকে মনোনীত করেছেন। যদি প্রত্যেক মানুষের নিকট ওহী আসতো তাহলে প্রত্যেক মানুষ তা বহন করতে পারতো না।

এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মনোনীত বান্দাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উপর ওহী নাযিল করেছেন। যারা মানুষকে বলে দেন কোন্ কাজ ভাল এবং কোন্ কাজ মন্দ। কোন্ কাজ জায়েয এবং কোন্ কাজ না জায়েয। কী ধরনের কাজ হালাল কী ধরনের কাজ হারাম। আর এই সম্মানিত বান্দাদের নাম পয়গম্বর এবং আল্লাহর রাসূল। এবং তাদের উপর যে বিধি বিধান নাযিল হয় তার নাম ওহী এ এলাহি।

ওহী আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে

এই ওহীকে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনের বিভিন্ন স্থানে رحمة শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। এই বলে যে, এটা আমার রহমত। তিনি ইরশাদ করেন, أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফে তার পয়গম্বর হওয়ার ঘোষণা দিলেন এবং লোকদেরকে কোরআন শিক্ষা দিতে শুরু করলেন এবং একথা বললেন যে, ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে আল্লাহ্ তা'আলার কালাম আসে। তখন কতক মূর্খ বলল : আল্লাহর যদি ওহী নাযিল করতেই হয় তাহলে কোন বড় সম্পদশালীর উপর নাযিল করতেন। কোন বড় সরদারের উপর নাযিল করতেন। আমাদের অঞ্চলে দুটি বড় বড় শহর আছে। মক্কা, এবং তায়েফ। তৎকালে এই দুটোই ছিল বড় শহর। সেখানকার কোন সরদারের উপর নাযিল করতেন। এটা কেমন কথা যে বেচারা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর উপর নাযিল করেছেন। কোরআন এর জবাবে বলছে أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ "আল্লাহর রহমত কাকে দেয়া হবে এবং কাকে দেয়া হবে না এটা কী তাদের নিয়ন্ত্রণ এবং ইচ্ছায় হবে? নাকি তারা তাদের প্রতিপালকের রহমত বণ্টন করবে?

এখানে رحمة এর উদ্দেশ্য ওহী। এরা কি সিদ্ধান্ত নিবে ওহী কার উপর নাযিল করা হবে, এবং কার উপর নাযিল করা হবে না? যদি মানুষের উপর এই দায়িত্ব দেয়া হয় যে, ভাই তোমরা সিদ্ধান্ত করো কার উপর ওহী নাযিল করা হবে? তাহলে মানুষ তো এমন যার অন্তরে খায়েশাত আছে, সে তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর উপর ভিত্তি করে বলবে, অমুক ব্যক্তি যোগ্য, অমুক ব্যক্তি অযোগ্য।

মানুষের মতপার্থক্য

দেখুন! যদি সংসদ সদস্য নির্ধারণ করতে হয় তখন কত মত পার্থক্য দেখা দেয়। ১ জন বলে তাকে বানাও ২য় জন বলে তাকে বানাও, ৩য় জন বলে আমি যোগ্য। চতুর্থজন বলে আমি যোগ্য। যদি ওহী নাযিলের ক্ষমতা মানুষের হাতে ছেড়ে দেয়া হত? তাহলে নিশ্চিত তারা বলত, কোরআনের ভাষায়,

أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ○ (سورة الزخرف ٣٢)

তারা কি তোমার পরওয়ারদিগারের রহমত বণ্টন করবে? তাদের অবস্থা তো এমন যে, তারা দুনিয়ার রিযিক বণ্টনেরও যোগ্য নয়। যখন রিযিক বণ্টনের

বিষয় আসে, তখন না জানি কত মনে কত জল্পনা কল্পনা তৈরি হয়। কখনো স্বজনপ্রীতি তৈরি হয়। কখনো দুর্নীতি শুরু হয়ে যায়। কত কিছু হয়ে যায়। সুতরাং যখন দুনিয়ায় রিযিক বণ্টনের অযোগ্য হয় তখন আল্লাহর রহমত কীভাবে বণ্টন করবে। এই ফায়সালা তো আল্লাহ্ই করবেন যে কার উপর ওহী নাযিল করবেন। সুতরাং কোরআনুল কারীমে رَحْمَةَ رَبِّكَ বলে ওহী এ এলাহী এবং রিসালাতে পয়গম্বর উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

আম্বিয়া (আঃ) এর ধারাবাহিকতাও একটা রহমত

সূরা ফাতিহায় বর্ণিত হয়েছে الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ অর্থাৎ তিনি ঐ সত্তা যিনি স্বীয় বান্দাদের উপর অনুগ্রহশীল। তাঁর রহমতের দাবি হলো, বান্দাদেরকে ভুল এবং সঠিক বলার জন্য, ভাল-মন্দ বলার জন্য এবং হালাল-হারাম চেনানোর জন্য নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবেন। এজন্য الرَّحْمٰنِ এবং الرَّحِيْمِ হওয়ার অনিবার্য চাহিদা হলো, এই জগত ব্যবস্থা ঠিক রাখার জন্য এবং মানুষকে হেদায়াত দেয়ার জন্য নবী পাঠানো। আর নবীদের বিশ্বাস করা এবং তাদের কথা মানা মানুষের জন্য অপরিহার্য। এজন্য الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ গুণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের দ্বিতীয় 'আকীদা, রিসালাত এবং পয়গম্বরের প্রতি ইশারা করেছেন।

মানুষের দুই শ্রেণী

এখন কী হবে? নবী এসেছেন, তারা লোকদের বলেছেন যে, দেখো! এটা হালাল, এটা হারাম, এটা জায়েয, এটা নাজায়েয। এটা জুলুম, ওটা ইনসাফ। এ ভাল, এ মন্দ। নবীগণ এসব কথা বলে দিয়েছেন। এখন কেউ তার উপর আমল করেছে। কেউ আমল করেনি। কোন ব্যক্তি নবীদের কথা মেনে ভাল কাজ করছে, এবং এই পণ করেছে যে, আমি তাই করব যার হুকুম আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন, এবং নবীগণ আমাকে যে হুকুম দিয়েছে এর বহির্ভূত কোন কাজ করব না। এ এক শ্রেণীর মানুষ।

দ্বিতীয় শ্রেণী

দ্বিতীয় ব্যক্তি যে উদাসীনতার জগতে রয়েছে এবং বে-পরওয়াভাবে জীবন যাপন করছে। কোন্টা হালাল, কোন্টা হারাম। কী জায়েয, কী না জায়েয। ভাল কাজ কোন্টা, খারাপ কাজ কোন্টা। ন্যায়, অন্যায় কোন ব্যাপারে তার কোন ফিকির নেই (মাথাব্যথা নেই)। সে মানুষের উপর জুলুম করে। খুন-

খারাবি করে। অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন করে। মানুষকে লাঞ্ছিত করে, অপমানিত করে। আল্লাহর নাফরমানীতে ডুবে থাকে। দুনিয়াতে উভয় শ্রেণীর মানুষ আছে। যদি এই প্রথম ব্যক্তি মারা যায়, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি মারা যায়। এরপর হিসাব না হয়। নেক লোককে কোন প্রতিদান দেয়া না হয়। কোন পুরস্কার দেয়া না হয়। এই বলে যে, তুমি বড় ভাল কাজ করেছ। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছ। হালাল ভাবে জীবন-যাপন করেছ, জায়েয কাজ করেছ নাজায়েয কাজ পরিত্যাগ করেছ। এজন্য তাকে যদি পুরস্কার দেয়া না হয়। আর যে ব্যক্তি নির্ভয়ে সীমাহীন নাফরমানি করেছে। মানুষের উপর জুলুম করেছে, ছিনতাই করেছে, ডাকাতি করেছে। তার কোন শাস্তি না হয়। তাহলে এটা কি আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের তাকাযা। যে তিনি ভাল মন্দ সবকে অভিন্ন মানদণ্ড দিয়ে মাপছেন। দেখুন, কীভাবে ডাকাত পড়ছে। এক বেচারা খুব ভাল, পরহেজগার। জায়েয এবং হালাল পথে উপার্জন করে। খুব অনটনে জীবন অতিবাহিত করে। সে বেচারা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে তখন এক ব্যক্তি তার থেকে মাল ছিনিয়ে নিল এবং নিয়েই দৌড়। এমন কত ঘটনা ঘটে। পুলিশ অপরাধীকে ধরতে পারে না এবং তার কোন শাস্তিও হয় না।

প্রতিদান দিবস ও আল্লাহর রহমতের তাকাযা

একজন অপব্যয় এবং অপচয় করে মৃত্যুবরণ করে। আর এই বেচারা সম্পদ ছিনতাই হওয়ার পরও হালাল তরীকায় উপার্জন করার চিন্তা করতে থাকে এবং মনস্থির রাখে। আমি হারাম পথে উপার্জন করবো না, এবং সংকটময় জীবন যাপন করে লোকটা মৃত্যুবরণ করে। তাহলে তো দুজনের কারো প্রতি ইনসাফ হলো না। না এ পুরস্কার পেল, না সে শাস্তি পেল। তাহলে কি আল্লাহর ইনসাফের তাকাযা এটা? আল্লাহর রহমতের দাবি কি এটা যে, নেক এবং বদকে সমান করে দিবেন। যখন বিষয় এমন তখন আল্লাহর রহমতের তাকাযা হলো তিনি নেককারকে পুরস্কার দিবেন এবং বদকারকে শাস্তি দিবেন। সুতরাং অত্যাবশ্যকীয় ভাবে একটা সময় এমন হওয়া চাই, যে সময় নেককার এবং বদকারের ফায়সালা হবে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে বলছেন, مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তিনি রহমান এবং রহীম। আর রহমান এবং রহীম হওয়ার তাকাযাও এটা যে, একটা দিন এমন আসবে যেদিন নেককার পুরস্কার পাবে। এবং বদকার শাস্তি পাবে। আর তিনি সেই দিনের মালিক।

তৃতীয় আয়াতে আখেরাতমুখিতা

এভাবে তৃতীয় আয়াতে আমাদেরকে আখেরাতমুখী করা হয়েছে। যখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে আপন রহমত দ্বারা হালাল এবং হারাম চিনিয়েছেন, এবং ভাল-মন্দের কথা বলেছেন। তখন তোমাদের কাজ হলো তার উপর আমল করা। কেননা আখেরাতে তোমাদের প্রত্যেক কাজের হিসাব দিতে হবে। مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিদান দিবসের মালিক। এটা হলো এই তিন আয়াতের বিন্যাস। সূরা ফাতিহা হল কোরআনের সারমর্ম। এজন্য ইসলামের যত মৌলিক আকীদা বিশ্বাস, প্রথম তিন আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাওহিদ, রিসালাত, এবং আখেরাত। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে এই আকিদাসমূহ সঠিকভাবে জানার, মানার এবং বুঝার, তদুপরি তার উপর আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী
সূরা ফাতিহা (৪)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ- وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

সম্মানিত মুসল্লিয়ানে কেরাম ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! এটা সূরা ফাতিহার প্রথম তিন আয়াত। যা এখন আমি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি। এবং কয়েক সপ্তাহ যাবৎ এর ব্যাখ্যা চলছে। গত জুমায় আলোচনা চলছিল যে, এই তিনটি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের তিনটি মৌলিক আকিদার দিকে ইশারা করেছেন। ইসলামের মৌলিক তিনটি আকিদা এই। (১) একত্ববাদের বিশ্বাস যাকে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ : এই জগতে আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং নেই কোন ইবাদতের যোগ্য। (২) রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের হেদায়াতের জন্য বিভিন্ন নবীকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। যার ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে হযরত আদম (আঃ) থেকে এবং পরিসমাপ্তি ঘটেছে হুজুর (আঃ) এর মাধ্যমে। (৩) পরকালের প্রতি বিশ্বাস। মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জীবন শুরু হবে। এবং মানুষ তার কৃতকর্ম অনুযায়ী ছাওয়াব পাবে। এবং শাস্তিভোগ করবে। তো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

এর মধ্যে توحيد এর প্রতি ইশারা রয়েছে যে, رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ঐ সত্তা যিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য তিনি ছাড়া অন্য কেউ নেই।

আম্বিয়া (আঃ) এর প্রেরণ রহমতেরই তাকাযা

যেভাবে গত জুমায় আলোচনা করেছি যে, الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর মধ্যে সিফাতে রহমানের আলোচনা করা হয়েছে। আর ছিফাতে রহমান (رَحْمٰن) থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই কথাই উদ্ঘাটিত হয় যে, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা এই জগত সৃষ্টি করেছেন, এবং তাতে মানুষ পাঠিয়েছেন। সেহেতু তাঁর রহমতের তাকাযা এটা নয় যে তিনি মানুষকে অন্ধকারে ছেড়ে দিবেন। সে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে চলবে এবং তাকে কেউ হেদায়েত দিবে না। কোন্‌টা করণীয় কোনটা বর্জনীয়। এই দাবিই ছিল আল্লাহ্ তা'আলার ছিফাতে রহমতের যে, তিনি দুনিয়াতে নবী (আঃ) দের পাঠাবেন এবং তাদের মাধ্যমে মানুষকে হেদায়েত দিবেন এবং মানুষকে বলে দিবেন কোনটা ভাল কাজ এবং কোনটা খারাপ কাজ। কোন্ কাজে মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কোন কাজে 'লোকসান বা ক্ষতি নিহিত রয়েছে। এজন্য নবুওয়াতের পরম্পরা অব্যাহত রাখা হয়েছে। তৃতীয় আয়াত হলো, مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ আল্লাহ্ প্রতিদান দিবসের মালিক। অর্থাৎ সেই দিন যেদিন হিসাব-নিকাশের পর প্রতিটি মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী পুরস্কৃত করা হবে। বিনিময় দেয়া হবে। তাকে প্রতিদান দিবস বলে। جزاء অর্থ : বিনিময়-প্রতিদান– চাই তা ভালো হোক বা মন্দ হোক। যেদিন মানুষকে তার কর্মফল দেয়া হবে, উর্দূতে আমরা তাকে روزجزاء বলি। আরবিতে তার নাম يَوْمِ الدِّيْنِ তো আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ছিফাত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি প্রতিদান দিবসের মালিক।

কুল-কায়েনাতের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা

প্রথমে একথা বুঝতে হবে যে, আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা সারা বিশ্বের মালিক। আজও মালিক। আর জগতে এমন কোন কিছু নেই যা আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন নাই। এবং যা আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানাধীন নয়। গোটা বাদশাহী তারই। কোরআনে আছে–

لِلّٰهِ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ

আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য বাদশাহী, আসমানসমূহের ও যমীন সমূহেরও এবং আজও তিনিই মালিক।

আমাদেরকে অস্থায়ী মালিক বানানো হয়েছে

কিন্তু এই আয়াতের মধ্যে এদিকে ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, যদিও বাস্তবিক অর্থে আজও সব জিনিসের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে মানুষকে কোন কোন জিনিসের মালিক বানিয়ে রেখেছেন। টাকা-পয়সার মালিক বানিয়েছেন। জায়গার মালিক বানিয়েছেন। গাড়ির মালিক বানিয়েছেন, দোকানের মালিক বানিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মালিক বানিয়ে রেখেছেন। সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ○

(سورة يس ٧١)

লোকেরা কি দেখেনি যে, যে সব বস্তু আমি স্বীয় (কুদরতী) হাত দ্বারা তৈরি করেছিলাম। কিন্তু তারা সেগুলোর মালিক হয়ে রয়েছে' ---। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা বাহ্যিক মালিকানা, ক্ষমতা এবং দখলদারিত্ব দান করেছেন। বিভিন্ন বস্তুর উপর বাদশাহী দিয়ে রেখেছেন। কোন ব্যক্তিকে কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন। কাউকে বানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। আবার কাউকে দিয়েছেন কোন দেশের বাদশাহী। বাহ্যিক দৃষ্টিতে আজও এই সব রাজা-বাদশা বিদ্যমান। কিন্তু বাস্তবিক রাজত্ব এবং বাদশাহী আল্লাহ্ তাআলারই। তবে অস্থায়ীভাবে কাউকে কোন না কোন জিনিসের মালিক বানিয়ে রেখেছেন।

একদিন বাহ্যিক রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে

কিন্তু এদিকে ইশারা করা হয়েছে, এমন একদিন আসবে যেদিন এই যাহেরী রাজত্বসমূহের পরিসমাপ্তি ঘটবে। এবং যাহেরী বাদশাহী ও খতম হয়ে যাবে। সেদিন কোন বাদশা থাকবে না। সেদিন কেউ কোন বস্তুর মালিক থাকবে না। সেদিন তো মালিক একজনই হবে। مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ "তিনি প্রতিদান দিবসের মালিক"। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন সব মালিকানা খতম হয়ে যাবে, মানুষ পুনর্জীবিত হবে। হাদীস শরীফে এসেছে, সে সময় মানুষের শরীরে কাপড় থাকবে না। কুরআন বলছে–

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ○ (سورة الأنبياء ١٠٤)

অর্থ : যেভাবে আমি মানুষকে শুরুতে সৃষ্টি করেছি, যখন সে মায়ের পেটে ছিল তখনও তার শরীরে কাপড় ছিল না। এভাবে যখন তাকে পুনর্জীবিত করবো

তখনও তার শরীরে কাপড় থাকবে না। বরং পরবর্তীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে পোষাক দেয়া হবে। কিন্তু সেই সময়ও কাপড় থাকবে না। তখন মানুষকে দেখানো হবে যে, তুমি নিজেকে যে কাপড়ের মালিক মনে করতে আজ সেই কাপড় তোমার কাছে নেই। চিন্তা করে দেখুন, মানুষ যতই দরিদ্র হোক, নিঃস্ব হোক, তার পরিধানের জন্য কোন না কোন কাপড় তো থাকে। কিন্তু সেখানে সে ঐ কাপড়ের মালিকও হবে না। সব রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে।

আজ বাদশাহী কার?

তখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এই কথা বলা হবে لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ "আজ রাজত্ব কার?" যে লোক দুনিয়ায় নিজেকে দুনিয়ার বাদশা বলে দাবি করে। انا ولا غير আমিই, অন্য কেউ নয়। এই শ্লোগান দেয়। অহংকার আত্মম্ভরিতার কারণে ঘাড় উঁচিয়ে চলে। বুকের পাটা বের করে চলে। কোথায় আজ সেই বাদশা? কোথায় আজ সেই সম্রাটরা? যে নিজেকে ফেরাউন বানিয়েছিল। এরপর স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা উত্তর দিবেন–

لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○ (سورة المومن ١٦)

"আজ রাজত্ব মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ্ তা'আলার। তার উপর কোন পরাক্রমশালী নেই, তিনি সকলের উপর পরাক্রমশীল। তখন সব রাজত্বের অবসান ঘটবে। এবং ক্ষমতাবান হবেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই। مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ : মালিক তো আজ তিনিই, বাদশাহী তো তারই।

পার্থিব জীবন মূল্যহীন হয়ে যাবে

এই তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তৃতীয় ছিফাত বর্ণনা করে আমার আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেন : হে মানুষ! তুমি এই দুনিয়ায় জীবন যাপন করছ এবং এই জীবনকে সবকিছু ভেবে বসে আছ। তার খাতিরে সব ঝামেলা মাথা পেতে নিচ্ছ। কিন্তু তোমার কোন খবর নেই। অথচ খবর রাখা উচিত, আমি তোমাকে সূরা ফাতিহায় একথা বলেছি। একদিন এমন আসবে যেদিন এই জীবনকে মূল্যহীন মনে হবে, আর সেটা হলো 'বিচার দিবস'। আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা এই দিনকে এজন্য রেখেছেন যাতে প্রত্যেককে তার বদলা দেয়া যায়।

কোরআনে কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ○ (سورة المومن ١٧)

অর্থ : 'যাতে প্রত্যেক মানুষকে বিনিময় দেয়া যায়। ঐ সব কাজের কারণে যা সে দুনিয়ায় করেছে। আর এই জন্য আমি এই দিন রেখেছি। কোন কোন জায়গায় কোরআন এই বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে। আখেরাত যা মৃত্যুর পরের জিন্দেগী। এই দিনটি মানুষের বড় প্রয়োজন। এজন্য যে, যদি প্রতিদান না হয় তাহলে যে জালিম তাকে জুলুমের শাস্তি দেয়া যাবে না এবং যে নেককার এবং মুত্তাকী তাকে তাকওয়ার পুরস্কার দেয়া হবে না। তাহলে তো এর অর্থ হলো আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে এক পাল্লায় মাপছেন অত্যাচারীকে এবং অত্যাচারিতকে। অনুগত এবং অবাধ্যকে, নেককার এবং বদকারকে। সবাইকে এক লাঠি দিয়ে হাঁক দেয়া হয়েছে। দুনিয়াতে এক ব্যক্তি যুলুম করছে, অন্যায় করছে, পাপ করছে, অবাধ্য হচ্ছে, নাফরমানি করছে, সে হঠাৎ করে মরে গেল। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যে চেষ্টা সাধনা করে নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রেখেছে। সৎ কাজ করেছে, মানুষের কল্যাণ করেছে। সেও হঠাৎ করে মরে গেল। উভয়ের কারো মাঝে কোন পার্থক্য করা হলো না, এমনটা হবে না। কোরআন বলছে :

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ○ (سورة القلم ٣٥)

"আমরা কি অপরাধীদেরকে নিরপরাধ লোকদের মত বানিয়ে দিব?" যে তাদেরও তেমন হাশর হবে যেমন মুসলমানদের এবং অনুগত বান্দাদের হাশর হবে। এমন কি হতে পারে? আল্লাহর রহমত দ্বারা এবং ইনসাফের মাধ্যমে এ কাজ অসম্ভব যে তিনি সবকে সমান করে দিবেন। কোরআনে করীম এক স্থানে বলছে :

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ○

(سورة المؤمنون ١١٥)

অর্থাৎ তোমরা কি মনে করছ যে, তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে আর তোমরা আমাদের কাছে ফিরে আসবে না? গোটা দুনিয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে তাতে মানুষকে পরীক্ষা করা হবে। কে আমার বিধান মেনে চলে? আর কে আমার বিধানের বিপরীতে চলে? যে বিধান মেনে চলবে তার জন্য কোন পুরস্কার থাকা চাই। তার কোন বিনিময় হওয়া চাই। আর যে আমার নিয়মের বিপরীত করে। তার শাস্তি হওয়া চাই। সুতরাং যদি আখেরাত না হয়, হিসাব নিকাশ না হয়। তাহলে ভেড়া-বকরী সব সমান হয়ে যাবে। এমনটা হতে পারে না। বরং এমন একটা দিন থাকা চাই যেদিন সৎকর্মপরায়ণ তাদের সৎকর্মের বিনিময় পাবে। এবং অসৎরা তাদের অসৎ কাজের প্রতিদান পাবে। এজন্য আমরা আখেরাতের দিন রেখেছি।

এই দুনিয়াই কি সবকিছু?

কুরআন বিভিন্ন জায়গায় বলছে যে, তোমরা তো এই দুনিয়াকেই সব কিছু মনে কর। যেমন কাফেররা বলেছিল–

مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ○

(سورة الجاثية ٢٤)

"এটা তো শুধু আমাদের পার্থিব জীবন, আমরা এতে জীবিত হই। মৃত্যুবরণ করি। আর আমাদের তো কালের দুর্বিপাকেই মৃত্যু হয়"। ফলাফল এটাই যে, সব মানুষ একথা বলে আমি আমার দুনিয়া ভালভাবে গড়বো। দুনিয়া গড়ার জন্য যায়েয না জায়েযের ভেদাভেদ ভুলে যাব।

জনৈক ব্যক্তি বলেন,

بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست

হে বাবর! খুব আয়েশ করে নাও, দুনিয়ার জিন্দেগী দ্বিতীয়বার আর আসবে না। যে সব লোকদের মনে আখেরাতের বিন্দুমাত্র ফিকির নেই। معاذالله আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না। সে তো দুনিয়াকেই সব মনে করে এবং দুনিয়ায় যা কিছু করে তার জন্যই দৌড়ঝাঁপ করে।

এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী!

কিন্তু আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা বলেছেন, যখন আখেরাতে পৌঁছবে, তখন দুনিয়ার কথা মনে হলে এই অনুভূতি হবে–

لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ ○ (سورة يونس ٤٥)

ওখানে গিয়ে জানা যাবে যে, গোটা জীবন ছিল দিনের এক ঘণ্টা। যখন এই দুনিয়ার কল্পনা আসবে যে, দুনিয়ায় কি করছিলাম? তখন মনে হবে দুনিয়ায় এক ঘণ্টা ছিলাম। দুনিয়ার জীবনকে এতই সংক্ষিপ্ত মনে হবে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের তুলনায়। সুতরাং এই দুনিয়ার বাস্তবতা হলো কয়েকদিনের। চল্লিশ বছর বেঁচেছে, আরেকটু বেশি হলে ষাট বছর, সত্তর বছর, আশি বছর, নব্বই বছর, বেশি থেকে বেশি হলে একশত বছর। কিন্তু আখেরাতের জীবন অপরিসীম। যার কোন সময় সীমা নেই। ওখানে গিয়ে যখন দুনিয়ার কল্পনা আসবে, তখন মনে হবে, আমরা সেখানে দিনের কিছু সময় ছিলাম। এবং তা শেষও হয়ে গেছে। সুতরাং যে দুনিয়ার পিছনে তোমরা দৌড়ঝাঁপ করছ, যার বাস্তবতা এক ঘণ্টার চেয়েও কম। কিন্তু আখেরাত অনন্তকালের। আর

কোরআনের উদ্দেশ্যই হলো মানুষকে ঐ চিরস্থায়ী জীবনমুখী করা। এজন্য আখেরাত বানানোর ফিকির করো।

দুনিয়ার জন্য এতটুকুই কর

এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন। তিনি বলেন :

اعمل لدنياك بقدر بقائك فيها واعمل للاخرة بقدر بقائك فيها ـ

"দুনিয়ার জন্য অতটুকু কাজই করো যতটুকু দুনিয়ায় থাকবে। আর আখেরাতের জন্য ঐ পরিমাণ আমল করো, যে পরিমাণ সময় তুমি সেখানে থাকবে। এমন নয় যে, সারা জীবনের কাজ তুমি অল্প কয়েকদিনের জন্য করে নিলে আর আখেরাতের জন্য কিছুই করলে না। সুতরাং এটা বাস্তব যা আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনে সূরা ফাতিহার তৃতীয় নাম্বার আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিদান দিবসের মালিক। এখানে তো কেউ কেউ কোন জিনিসের মালিক বনে বসে আছে। কিন্তু আখেরাতে এই সব মালিকানা খতম হয়ে যাবে। আর তোমার সঙ্গে শুধু তোমার আমল যাবে এবং দুনিয়া থেকে কী আমল করে এসেছে তা দেখানো হবে এবং সে অনুযায়ী ফায়সালা হবে। এজন্য এই দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় ঐ আখেরাতের কল্পনা করে নাও। এবং তার কিছু প্রস্তুতিও নিয়ে নাও এবং ঐ অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করো। তৃতীয় আয়াতের পয়গাম এটাই। এর আরো ব্যাখ্যা রয়েছে। কিন্তু এখন সময় শেষ হয়ে গেছে। যদি বেঁচে থাকি তো ইনশাআল্লাহ আগামী জুমায় বিশদ বিবরণ পেশ করবো। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তার দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে আখেরাতের ফিকির দান করুন। যখন সেখানে নিবেন তখন যেন ভালভাবে নেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির সঙ্গে নেন। আমাদেরকে শামিল করুন ঐ সব বান্দাদের মধ্যে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

এই দুনিয়া শেষ ঘাঁটি নয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○آمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

সম্মানিত উপস্থিতি ও প্রিয় ভাইয়েরা! কয়েক সপ্তাহ যাবৎ সূরা ফাতিহার আলোচনা চলছে। ইতোপূর্বে তিনটি আয়াতের বর্ণনা হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ প্রথম আয়াত الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ দ্বিতীয় আয়াত مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তৃতীয় আয়াত।

প্রথম আয়াতে তাওহীদের প্রতি ইশারা

প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার একতা এবং একত্ববাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, তিনিই ঐ সত্তা যিনি জগতসমূহের দেখভাল করছেন এবং তার কার্যাদি পরিচালনা করছেন, তিনিই তার স্রষ্টা। তিনিই মালিক, তিনিই কর্মবিধায়ক। একথা স্পষ্ট যে, ইবাদতের একমাত্র যোগ্য আল্লাহ্ তা'আলাই। অন্য কেউ নয়। সুতরাং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ এর মধ্যে তাওহীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে রিসালাতের প্রতি ইঙ্গিত

দ্বিতীয় আয়াত الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর মধ্যে ইসলামের দ্বিতীয় আকীদা, অর্থাৎ রিসালাতের দিকে ইশারা করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের হেদায়াতের জন্য নবী প্রেরণ করেছেন। যার ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে। হযরত আদম (আঃ) থেকে এবং সরওয়ারে দো'আলম হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যা পূর্ণ হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা رَحْمٰنِ এবং رَحِيْمِ। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের তাকাযা এটাই যে, তিনি, স্বীয় বান্দাদেরকে দুনিয়ার অন্ধকারে ছেড়ে দিবেন না। বরং তার হেদায়াত এবং পথ প্রদর্শনের অবশ্যই ব্যবস্থা নিবেন। এবং হেদায়াত ও পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা এটাই যে, তিনি নবী আগমনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন। যাঁদের মাধ্যমে হেদায়াতের আলো মানুষকে পৌছাবেন।

তৃতীয় আয়াতে আখেরাতের বর্ণনা

তৃতীয় আয়াত হলো مَٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ যার আলোচনা চলছিল। তাতে রয়েছে ইসলামের তৃতীয় আকীদা, অর্থাৎ আখেরাতের আলোচনা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিদান দিবসের মালিক অর্থাৎ হিসাবের দিনের মালিক। যেমন আমি বিগত বয়ানে বলেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আজও সব জিনিসের মালিক। কিন্তু এই পৃথিবীতে বাহ্যত। কিছু মানুষকে মালিকানা বা রাজত্ব দান করে রেখেছেন। তো কেউ বলে আমি এই পোশাকের মালিক। আমি এই জায়গার মালিক। আমি এই গাড়ির মালিক। বাহ্যিক মালিকানা এখানে বিদ্যমান। এবং শাসনকার্য ও বাহ্যিকভাবে এই দুনিয়ায় বিদ্যমান যেমন মানুষ শাসক হচ্ছে। কেউ রাষ্ট্রপতি, কেউ বাদশা, আর কেউ বা প্রধানমন্ত্রী।

সব বাদশাহী এবং রাজত্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে

কিন্তু مَٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ বলে এই কথাই সাব্যস্ত করেছেন যে, কেয়ামতের দিন যেদিন হিসাব হবে, সেদিন সমস্ত বাদশাহী শেষ হয়ে যাবে। সেদিন কেউ কোন জিনিসের মালিক হবে না। এমনকি কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ ○ (سورة الأنبياء ١٠٤)

যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছিলাম। যখন তোমরা দুনিয়াতে এসেছ, কোন বস্তু তোমাদের মালিকানায় ছিল না। এমন কি পোশাকও ছিল না। বিবস্ত্র এসেছ। কোন কিছু তোমাদের কাছে ছিল না। কোন জিনিসের তোমরা মালিক ছিলে না। যখন আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি সে সময় যেভাবে তোমরা

কোন কিছুর মালিক ছিলে না। ঠিক এমনিভাবে আখেরাতে যখন তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে, তখনও কোন কিছুর মালিক থাকবে না। না টাকা পয়সার না বাড়ি-গাড়ির না অন্য কোন জিনিসের। খালি হাতে চলে আসবে। যত বাদশা এবং শাসকদের দেখি যারা নিজেদের প্রধানকে বানিয়ে বসে আছে। কেউ নিজেকে বাদশা বলে দাবি করছে, কেউ নিজেকে প্রধানমন্ত্রী বলে দাবি করছে। এ সব বাদশাহী শেষ হয়ে যাবে। সেদিন কোন বাদশা থাকবে না, কোন রাষ্ট্রপতি থাকবে না, না থাকবে কোন প্রধানমন্ত্রী।

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ○ (سورة المؤمن : ١٦)

আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, বলো আজ বাদশাহী কার? এরপর স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা উত্তর দিবেন :

لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○ (سورة المؤمن : ١٦)

পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলার বাদশাহী। তো مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এর অর্থ হলো, সেদিন বাদশাহী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার। দুনিয়ার বাহ্যিক বাদশাহী সব শেষ হয়ে যাবে।

তোমাদের কথা ও কাজের হিসাব হবে

কোরআনের সর্বপ্রথম সূরায় লোকদেরকে এই কথা স্মরণ করানো উদ্দেশ্য যে, দুনিয়ার একটু কিকিরের সঙ্গে থাকো। একটা দিন এমন আসবে যেদিন তোমাদের কথা ও কাজের হিসাব নেয়া হবে। এটা মনে করো না, মুখ থেকে একটা কথা বের করলে আর তা হাওয়ায় উড়ে গেল। না, বরং আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ○ (سورة ق ١٨)

মানুষ যে শব্দই উচ্চারণ করে, তা লিপিবদ্ধকারী বিদ্যমান রয়েছে। এখন তো টেপ রেকর্ডার এসেছে। মানুষের বুঝতেও সুবিধা হয়েছে। একটা একটা করে শব্দ রেকর্ড হচ্ছে। আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা চৌদ্দশত বছর পূর্বে বলেছেন যা কিছু তোমরা বলছ সবকিছু সংরক্ষিত হচ্ছে। যদি মিথ্যা বল, অথবা গীবত করো, বা কাউকে ভাল-মন্দ কিছু বললে, অথবা কারো মনে ব্যথা দিলে। তো সবকিছু আমার কাছে সংরক্ষিত হচ্ছে। কেউ ভাল কথা বলল, আল্লাহর যিকির করল কিংবা কাউকে শান্তি দিল (আরাম পৌছাল), কাউকে সাহায্য করল। এটাও সংরক্ষিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তাদের প্রত্যেকের হিসাব নিবেন। কেয়ামতের দিন সব পেশ করা হবে।

وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ○ (سورة الكهف ٤٩)

অর্থাৎ : যা কিছু দুনিয়ায় আমল করেছ, সবকিছু তোমার সামনে এসে উপস্থিত হয়ে যাবে। সব কিছু দৃশ্যমান হতে থাকবে, দুনিয়াতে কী করা হয়েছিল এবং কখন করা হয়েছিল? সবকিছুর হিসাব দিতে হবে। জবাব দিতে হবে। এটাই হলো আখেরাতের বিশ্বাস।

দুনিয়া থেকে একদিন যেতে হবে

এটা ভাববেন না যে, শুধু দুনিয়ায়-ই-থাকবো। যেভাবে খুশি সেভাবে। যেমন কাফেররা বলে,

مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا ○ (سورة الجاثية ٢٤)

অর্থাৎ : বাস এটা শুধু আমাদের পার্থিব জীবন, আমরা এখানেই বাঁচবো এখানেই মরবো। দুনিয়ার এ জীবন তো কয়েকদিনের জীবন মাত্র। বেশি থেকে বেশি, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০ বছর। আরেকটু হলে ১০০। এর চেয়ে বেশি হলে ১১০/১২০ বছর। কিন্তু এমন একটা জীবন আসবে যা স্থায়ী। সেখানে গেলে মনে হবে, কোরআনের ভাষায়–

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ○ (سورة النازعات ٤٦)

যখন কেয়ামতের দিন দেখবে তখন তার– দৈর্ঘ ও ব্যাপ্তি দেখতে পাবে। তখন দুনিয়াতে যতদিন ছিল সে প্রসঙ্গে বলবে। ভাই! যতদিন দুনিয়াতে ছিলাম, তা তো এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল। গোটা জীবনকে কয়েক ঘণ্টা মনে হবে। বাস্! দুনিয়ায় কয়েক ঘণ্টা থেকে চলে এসেছে। আসল জীবন তো এখন। مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আপনাকে এই দ্বীনের অভিমুখী করেছেন।

সূরা ফাতিহার রহমত ওয়ালা ছিফাত

যেমন আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছিলাম যে, সূরা ফাতিহার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা যত ছিফাত বর্ণনা করেছেন, সবগুলো রহমতওয়ালা ছিফাত। رَبِّ الْعَالَمِيْنَ আল্লাহ্ তা'আলা জগতসমূহের প্রতিপালক। রহমান رَحْمٰنِ তাঁর দয়া সকলের উপর বিস্তৃত। তাঁর দয়া অত্যন্ত বেশী। এই সব ছিফাত বর্ণনা করেছেন। ক্রোধের ছিফাত কিংবা আযাবের ছিফাত বর্ণনা করেন নি। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যা নবী করীম সা. বলেছেন :

سَبَقَتْ رَحْمَتِيْ عَلٰى غَضَبِيْ۔

অর্থাৎ আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর গালিব। তো এখানে রহমতের গুণ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ বলে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, 'বান্দাদের উপর আমার রহমত তো আছে সন্দেহাতীতভাবে।

তবে খেয়াল রাখতে হবে, যদি তোমরা দুনিয়াতে কোন ভুল কাজ করো, তাহলে আমি হিসাব গ্রহণ করবো। আর হিসাবের পরওয়ানা থেকে তুমি বাঁচতে পারবেনা। দুনিয়ায় তো সুপারিশ কাজে লাগে। ঘুষ কাজে আসে। সম্পর্কও কাজে লাগে। কিন্তু আখেরাতে–

لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ○ (سورة الأنعام ٥١)

"আল্লাহ্ ছাড়া কেউ নেই সেখানে রক্ষা করার এবং নেই কেউ সুপারিশ করার। আর এটাই হলো পরকালের বিশ্বাস। যা কোরআন আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দিতে চায় একথা বলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তো দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। আর এমন দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন যেখানে ভোগ-উপভোগের সামগ্রী ছড়ানো ছিটানো রয়েছে।

এই দুনিয়া তোমাদের শেষ বাসস্থান নয়

কিন্তু কোরআনের মাধ্যমে, আম্বিয়া (আঃ) দের মাধ্যমে বারবার স্মরণ করানো হচ্ছে, মনে রেখ যে, এই দুনিয়া তোমাদের আখেরী মানযিল নয়। এই দুনিয়া তোমাদের জীবনের লক্ষ্য না হওয়া চাই। এই দুনিয়া তো মুসাফিরের সরাইখানা। পরীক্ষার ক্ষেত্র। এজন্য প্রতি কদম ফেলার সময় স্মরণ রেখ এমন একটা দিন অবশ্যম্ভাবী। আর তা হলো আখেরাত। আমার ভাইয়েরা! আর এটাই হলো প্রকৃত আখেরাতের বিশ্বাস। যা মানুষকে গুনাহ থেকে, অপরাধ থেকে, অন্যায়, অনাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন করা থেকে রক্ষা করে। যদি মনে আখেরাতের ফিকির থাকে। আল্লাহর সামনে হিসাব দেয়ার ভয় থাকে, যাকে কোরআন তাকওয়া বলে। তো এই অবস্থায় মানুষ গুনাহের ধারে কাছেও যাবে না। কারো প্রতি জুলুম করবে না। বে-ইনসাফী করবে না। কেননা তার তো জানা আছে যে, যদি আমি কারো সঙ্গে বে ইনসাফী করি তাহলে আখেরাতে আমাকে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে এই আকীদা গেঁথে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে এত বেশি আখেরাতের আলোচনা করতেন যে, সব সময় আমাদের কাছে

মনে হত যেন, স্বচক্ষে আমরা আখেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'আলার সামনে হাযিরীও দেখতে পাচ্ছি। যার ফলশ্রুতিতে গুনাহ সংঘটিত হত না। আর যদি হয়েই যেত তাহলে তাওবা ইস্তেগফার করা হত এবং আল্লাহ্ তা'আলার সামনে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়ার তাওফিক হয়ে যেত। সাহাবায়ে কেরামের মোআমালাই ছিল এমন।

আজকের পৃথিবী কেন অন্যায় অনাচারের পৃথিবী

আজ অপরাধ জগত উত্তপ্ত বে-ইনসাফীর জগত। মানুষ অন্যায়, অনাচারে লিপ্ত এর কারণ কী? এর কারণ হলো আখেরাতের ফিকির নেই। আখেরাতের চিন্তা নেই। যদি কোন চোর চুরি করে, তাহলে কেন করে? এই জন্য করে যে, চুরির পরিণামে আমাকে কঠিন আযাবের মুখোমুখি হতে হবে। এই ফিকির তার নেই। যদি এটা জাগ্রত থাকত তাহলে সে চুরি করতো না। কোন ব্যক্তি ঘুষ খায়, কেন খায়? এজন্য খায় যে, মৃত্যুর পর আমার সঙ্গে কীরূপ আচরণ করা হবে এ ব্যাপারে তার কোন ফিকির নেই। যদি সে জানত! যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الراشی والمرتشی کلاهما فی النار۔

ঘুষ প্রদানকারী এবং ঘুষ গ্রহণকারী উভয়েই জাহান্নামী। এই কথার উপর যদি তার পূর্ণ ঈমান থাকত এবং এ ব্যাপারে তার কোন খেয়াল থাকত তাহলে সে ঘুষ খাওয়ার সাহস করত না। অন্যের অধিকার হরণ করা, অন্যের সঙ্গে বে-ইনসাফী করা, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা, ধোঁকা দেয়া, ষড়যন্ত্র করা, এসব গর্হিত কাজ করতো না। যদি আল্লাহ্ তা'আলার সামনে জবাবদিহী করার অনুভূতি তৈরি হয়। তাহলে সে গুনাহ তো করবেই না বরং যদি ভুলে করেই ফেলে তাহলে নিজের উপর নিজে শাস্তি জারি করবে।

এক মহিলার শিক্ষণীয় ঘটনা

দেখুন ! এক মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসল। এসে বলল, طهرنی یارسول الله ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার থেকে গুনাহ হয়ে গেছে, আমাকে পবিত্র করুন। কী গুনাহ হয়েছে। যিনা সংঘটিত হয়েছে। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিজেকে পেশ করে বলেছেন যে, আমাকে পবিত্র করুন। আমার উপর শাস্তি আরোপ করুন। এই কাজের জন্য শরীয়তে যে বিধান রয়েছে তা কার্যকর করুন। সরকারে দো'আলম

মুখ ফিরিয়ে নিলেন। দ্বিতীয়বার আরেক দিক থেকে আসল। তারপর স্বীকারোক্তি করল। হুজুর আরেক দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আবার আসল। এভাবে চারবার স্বীকার করল : হে আল্লাহর রাসূল! যে শাস্তি নির্ধারিত আছে তা আমার উপর কার্যকর করুন। কী শাস্তি? তাও জানা ছিল যে, তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। কিন্তু সে নিজেকে পেশ করে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আখেরাতের আযাব থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়ার আযাব সহ্য করতে প্রস্তুত আছি। সুতরাং আপনি আমাকে এই পাপ থেকে পবিত্র করুন। সরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি স্বীকার করেছ এখন তোমার উপর শাস্তি জারি হবে। কিন্তু এখন যেহেতু তোমার গর্ভে সন্তান আছে অপরাধ যা হয়েছে তোমার থেকে হয়েছে। বাচ্চা থেকে তো আর হয়নি। এজন্য আমি এখন তোমার উপর শাস্তি আরোপ করতে পারি না। ফিরে যাও বাচ্চা জন্ম লাভ করুক। তারপর বাচ্চার দুধের প্রয়োজন হবে। বাচ্চাকে দুধ পান করাও। এরপর যখন বাচ্চা চলার যোগ্য হবে, দুধের প্রয়োজন মিটে যাবে তখন আমার কাছে আসবে।

বাচ্চা জন্মের অপেক্ষা

ঐ মহিলা চলে যাচ্ছে। না কোন রেজিস্টারে তাঁর নাম লেখানো হয়েছে না কোন যামীন চাওয়া হয়েছে, চলে যাচ্ছে। বাচ্চা জন্মের অপেক্ষা করছে। বাচ্চার জন্ম হয়েছে, তাকে দুধ পান করিয়েছে। দুই বছর পর্যন্ত দুধ পান করিয়েছে। আপনি সামান্য চিন্তা করুন, এই ঘটনার তো দুই বছর অতিক্রম হয়েছে। এতদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তো মানুষের হুঁশ কমে আসে। আবেগ স্তিমিত হয়ে যায় তাৎক্ষণিক লজ্জাও অনুতাপের কারণে মানুষ যে কোন শাস্তি মাথা পেতে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সময়ের আবর্তনে এই অনুতাপও শেষ হয়ে যায়। আর বাচ্চাও জন্ম নিয়েছে। আর ঐ বাচ্চাও যার জন্য এক অদ্ভুত আকর্ষণের কারণ যার কারণে বাচ্চা মাকে তার দিকে আকর্ষিত করে। মায়ের মনে ব্যাকুলতা তৈরি হয়। কোন রেজিস্টারে নাম লেখেনি। কোন তাগিদ বা নোটিশ পাঠানো হয়নি যে, তুমি আস এবং নিজের উপর শাস্তি জারি করো।

ঐ মহিলার দৃঢ়তা

কিন্তু ঐ মহিলার দৃঢ়তা দেখুন! কয়েক বছর পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলো। এসে বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ওয়াদা করেছিলাম এবং বাচ্চাও নিয়ে এসেছি। তার মুখে রুটি। যা এই

কথা প্রমাণ করছে যে, তার আর দুধের প্রয়োজন নেই। এখন আমার উপর শাস্তি কায়েম করুন। সরকারে দো'আলম এরপর শাস্তি কায়েম করলেন। এমনকি ঐ মহিলাও আত্মবিসর্জন দিল।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযা পড়ালেন

যখন জানাযার নামাজের সময় হলো, তখন সরকারে দো'আলম তার জানাযার জন্য আগে বেড়ে গেলেন। ফারুকে আযম রা. আরয করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! এই মহিলা তো ব্যভিচারিণী। আপনি তার জানাযা পড়াচ্ছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে উমর! নিঃসন্দেহে ভুল হয়েছিল, কিন্তু সে এমন তাওবা করেছে, যদি তার তওবা মদীনাবাসীকে বণ্টন করে দেয়া হয় তাহলে মদীনাবাসীর মাগফেরাত হয়ে যাবে।

এটা ছিল পরকালের শাস্তির ফলাফল

আপনি চিন্তা করুন! না কোন রিপোর্ট আছে, না কোন যামানত আছে, না আছে কিছু। কিন্তু সে স্বেচ্ছায় নিজেকে পেশ করেছে। কেন? কারণ তার মনে চিন্তা ছিল যে, দুনিয়াতে যে সাজা হবে, যে কষ্ট হবে, তা আমি মাথা পেতে নিব। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলার সামনে উপস্থিত হবো তখন সমস্ত গুণাহ থেকে মুক্ত থাকবো। যখন আমার সঙ্গে ইনসাফের সময় হবে, তখন আমার পাল্লা থাকবে কোন গুনাহ মুক্ত। এই ফিকির ছিল। আর পরকালের ভাবনা অপরাধ এবং বে-ইনসাফির রাস্তা এমনভাবে বন্ধ করেছে যে, সাহাবায়ে কেরামের জীবনচরিত দেখুন! একেকজন সাহাবী ছিলেন নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল। ন্যায়-নীতির দিক থেকে, তাকওয়া পরহেযগারীর দিক থেকে। কারণ একটাই আখেরাতের চিন্তা তাদের অন্তরে সদা বিরাজমান ছিল। مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এর মাধ্যমে ফিকরে আখেরাতের প্রতি সূরা ফাতিহার তৃতীয় আয়াতে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। যে, আল্লাহ্ তা'আলা মালিক প্রতিদান দিবসের নিঃসন্দেহের তিনি رَبِّ الْعَالَمِيْنَ নিঃসন্দেহে তিনি رَحْمٰنِ নিঃসন্দেহে তিনি রহীম। সঙ্গে সঙ্গে ইনসাফকারী। সুতরাং আখেরাতে তোমাদের কথা ও কাজের হিসাব হবে।

সেই সময়ের মালিক তিনিই হবেন। তাই এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করো। কীভাবে প্রস্তুতি নিবে? এই কথা আল্লাহ্ তা'আলা সামনের আয়াতে বলেছেন : আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা তাওফিক দিলে ইনশাআল্লাহ আগামী জুমায় আলোচনা করবো।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

আল্লাহর হুকুম সবার আগে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ. وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا- اَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ- وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

তিনটি আয়াত তিনটি আকীদা

সম্মানিত উপস্থিতি ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! সূরা ফাতিহার আলোচনা কয়েক সপ্তাহ যাবৎ চলছে। এ পর্যন্ত সূরা ফাতিহার তিন আয়াতের বর্ণনা হয়েছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○

যেমন ইতোপূর্বে আমি বলেছিলাম যে, উল্লিখিত তিন আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের তিনটি মৌলিক আকীদার দিকে ইশারা করেছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ এর অর্থ হলো সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে একথাই প্রমাণ করে যে, যখন তিনি জগতসমূহের প্রতিপালক তখন একমাত্র তিনিই খোদা। তিনিই ইলাহ। তার কোন অংশীদার নেই। সুতরাং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ একত্ববাদ প্রমাণ করে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলেছেন الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা রহমান এবং রহীম। সকলের প্রতি দয়াশীল। অত্যন্ত দয়াময়, আর এই রহমতের দাবি হলো, তিনি মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে অন্ধকারে ছেড়ে দিবেন

না। বরং তাকে বলে দিবেন, কীভাবে দুনিয়াতে জীবন-যাপন করবে। এ কাজের জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরদের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছিলেন। নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, তাঁদের উপর কিতাব নাযিল করেছেন। কিতাবের মাধ্যমে তারা মানুষকে জীবন পদ্ধতি ও জীবন ব্যবস্থা বাতলে দিবেন। এজন্য দ্বিতীয় আয়াত থেকে রিসালাতের আকীদা প্রমাণিত হয়।

তৃতীয় আয়াত مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হিসাব দিনের মালিক। সেই দিনের মালিক যেদিন সমস্ত মানুষের আমলের হিসাব হবে। এতে আখেরাতের আকীদা বর্ণনা করেছেন যে, জীবনের যে সময়টা তোমরা অতিবাহিত করছ তা এমন নয় যে, মনে চাইল ঘুমালাম, খেলাম, পান করলাম, ব্যাস সব শেষ। বরং এক সময় এই জীবন শেষ হয়ে নতুন জীবন শুরু হবে। আর ঐ জীবন অনন্তকালের যার কোন পরিসমাপ্তি নেই। আর ঐ জীবনে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পার্থিব কর্মকাণ্ডের হিসাব নিবেন। এটা ভেবো না যে, তোমরা যা খাচ্ছো, যা কিছু করছ, যবান দ্বারা যা বলছ, সব বাতাসে উড়ে মিলিয়ে যাবে। না, বরং আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন :

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ○ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ○ (سورة ق ١٧-١٨)

অর্থাৎ : আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে দু'জন ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন। একজন ডান দিকে আরেকজন বাম দিকে বসে আছে। তোমরা যা কিছু করছ সব আল্লাহ্ তা'আলার কাছে রেকর্ড হচ্ছে। আর মানুষ তার মুখ থেকে যে কথাই বের করুক, তার সামনে একজন পর্যবেক্ষক নিয়োজিত আছে যিনি সবসময় তার কথা রেকর্ড করার জন্য প্রস্তুত। যে শব্দ সে মুখ থেকে বের করেছে, যে কথা সে বলেছে। তা সে রেকর্ড করছে। আর আখেরাতে যখন আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে পৌঁছবে। কোরআন বলছে :

وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ○ (سورة الكهف ٤٩)

অর্থাৎ যা কিছু আমল করেছ সব তোমার সামনে উপস্থিত পাবে। বালেগ হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা কিছু আমল করেছ সব তোমার সামনে উপস্থিত হবে। কী কী করছিলে, সবগুলোর চিত্র দেখানো হবে। যা জনসম্মুখে করেছ তাও, যা নির্জনে করেছ তাও। সবকিছু দেখানো হবে।

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ○ (سورة الكهف ٤٩)

আর আপনার প্রতিপালক কারো প্রতি জুলুম করবেন না। যেমন কর্ম হবে তেমন ফল হবে এবং যা কিছু এখানে বুনেছ। সেখানে তা কাটবে। এটা হলো আখেরাতের আকীদা। مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ বলে আল্লাহ্ যেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একটা সময় এমন আসবে যখন তোমাদের কথা ও কাজের হিসাব দিতে হবে। এজন্য প্রত্যেক কাজ করার সময় একথা খেয়াল রেখো এক সময় এ কাজের জবাবদিহী করতে হবে। এজন্য আল্লাহর বিধান মোতাবেক, তাঁর দেয়া শিক্ষা, এবং তার বর্ণিত শিষ্টাচার (আদব) অনুযায়ী এই জীবন কাটানো উচিৎ।

এর উপর কীভাবে আমল হবে

এখন প্রশ্ন জাগে, আমাদের উপর এত বড় দায়িত্ব চাপানো হয়েছে যে দুনিয়াতে জীবন যাপন করবো আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান মোতাবেক, হালাল পথে চলবো, হারাম থেকে বেঁচে থাকবো। ফরয ও ওয়াজিব পূর্ণ করবো। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবো। রমযান মাস এসেছে তো রোযা রাখবো। যদি সম্পদশালী হই তাহলে যাকাত আদায় করবো। মিথ্যা বলবো না। গীবত করবো না। অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন করবো না। ঘুষ খাব না। ঘুষ দিব না। এত এত কাজ আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াবাসীর জন্য নির্ধারণ করেছেন। আয় আল্লাহ্! এ কী করে সম্ভব? কীভাবে আমরা এর পাবন্দি করবো। এর উপর সামনের আয়াতে :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

অর্থাৎ হে প্রতিপালক! আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য চাই। অর্থাৎ আমরা তো ঈমান এনেছি আপনার একত্ববাদের উপর। এবং এই কথার উপর যে, একদিন মৃত্যুর পর আপনার সামনে উপস্থিত হবো। আর ইবাদত করি আপনারই। কারো কথা শুনবো না বা কারো কাজ করবো না আপনি ছাড়া।

কিন্তু প্রশ্ন হল, আমরা যা বলছি, একমাত্র আপনারই ইবাদত করবো অন্য কারো নয়। এটা আমাদের ক্ষমতায় নেই যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার সাহায্য শামেলে হাল না হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার তাওফিক শামেলে হাল না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এটা করতে পারবো না। এজন্য ইবাদত আপনারই করবো। কিন্তু যখন আমরা কর্মময় জীবনে প্রবেশ করবো তখন তো পদে পদে বিপদ আসবে। আয় আল্লাহ্! এর উপর কীভাবে আমল করবো? অমুক বিধান

কী করে মানবো? তো তার ব্যবস্থাপত্র এটাই যে, যখন কোন বিপদে পড়বে তখন আমার কাছে এসে যাও। আমার কাছে সাহায্য চাও। এবং এটা বলো إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আয় আল্লাহ্! আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য চাই।

আয়াতের ভাষ্য

إِيَّاكَ نَعْبُدُ এর অর্থ কী? আমরা আপনারই ইবাদত করি। তাহলে ইবাদতের অর্থ কী? ইবাদতের অর্থ বন্দেগী। বন্দেগীকে এভাবে বুঝো যেমন : গোলামি, বা দাসত্ব। অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমরা আপনারই দাসত্ব করবো। আপনি ছাড়া অন্য কারো গোলামী করবো না, কী অর্থ? যখন তুমি আমাকে স্রষ্টা মেনেছ, তোমার মালিক মেনেছ, তোমার প্রতিপালক মেনেছ এবং তোমার উপাস্য মেনেছ। তোমার প্রতিপালক একমাত্র আনুগত্যের যোগ্য। যার আনুগত্য, যার বশ্যতা স্বীকার করা আমাদের উপর আবশ্যক।

যেদিন পড়েছি أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ সেদিন স্বীকার করে নিয়েছি যে, আনুগত্য এবং বশ্যতার যোগ্য একমাত্র তুমিই। অন্য কেউ নয়। সুতরাং إِيَّاكَ نَعْبُدُ বলা মূলত এই কথারই ঘোষণা করা যে, আমরা আপনার কথাই মানব। আর কেউ যদি আমাদেরকে আপনার হুকুমের বিপরীত কোন কাজ করতে বলে, তাহলে তা ছেড়ে দিব। আপনার হুকুম অনুপাতে করবো। চাই সে বাদশা হোক, রাষ্ট্রপ্রধান হোক। নিকটাত্মীয় হোক, স্ত্রী, পুত্র বা মা, বাবা যেই হোক।

আল্লাহর অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য হতে পারে না

আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে এভাবে বলেছেন যে–

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق -

অর্থ : স্রষ্টার অবাধ্যতায় কোন মাখলুকের আনুগত্য নেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তিকে তোমার উপর শাসক বানানো হয়েছে তার আনুগত্য করো। বশ্যতা স্বীকার করো। সে যে নির্দেশ দিবে সে অনুযায়ী কাজ করো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বলে দিয়েছেন যে, ইতায়াতে মাখলুক, সৎ কাজে আনুগত্য। যদি সে এমন কাজের হুকুম দেয় যা আল্লাহর হুকুমের পরিপন্থী তাহলে তার আনুগত্য করা যাবে না। যাকে আল্লাহ্ বৈধ স্বীকৃতি দিয়েছেন, অথবা যা আল্লাহর হুকুম মোতাবেক এবং স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য করতে বলেছেন হ্যাঁ যদি স্বামী শরীয়তপরিপন্থী কোন কাজের আদেশ

করে তাহলে স্ত্রীর যিম্মায় কোন আনুগত্য নেই। স্ত্রী বলবে আমি আল্লাহর আনুগত্য করবো। তোমার আনুগত্য করবো না। সন্তানকে পিতা-মাতার আনুগত্যের আদেশ করা হয়েছে। তবে পিতা-মাতা যদি না জায়েয কাজের হুকুম দেয় তাহলে মাতা-পিতার আনুগত্য নেই।

পিতা-মাতা এবং স্বামীর আনুগত্যে ধোঁকা

এখানে এসে অনেক মানুষ ধোঁকা খায় এবং আল্লাহ্ তো পিতা-মাতার আনুগত্যের হুকুম দিয়েছেন। আল্লাহ্ তো স্বামীর আনুগত্যের হুকুম দিয়েছেন। সুতরাং তারা যদি আমাদেরকে কোন কাজের কথা বলেন চাই তা জায়েয হোক বা নাজায়েয। আমাদের মানা উচিত, এটা একদম ভুল কথা এবং إِيَّاكَ نَعْبُدُ এর দাবীর পরিপন্থী, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবো না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, নিঃসন্দেহে মা-বাবার আনুগত্য করো। কুরআনে কারীমে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় মক্কা মোকারমায় এমন অনেক মুহূর্ত এসেছে যে, সন্তান মুসলমান হয়ে গেছে অথচ মা-বাবা কাফের।

এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, মা তার সন্তানকে বলেছে তুমি মোহাম্মদের দ্বীন ছেড়ে দাও। আমাদের ধর্মে ফিরে আস। আর যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মাদের কথা অস্বীকার না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি খাবো না। অনশন পালন করব। যদি তুমি ফিরে না আস তাহলে ধর্মঘট চলবে। অনশনও চলবে। ঐ সন্তান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সমস্যায় আটকা পড়েছি। একদিকে মা-বাবা এই বলছে আরেক দিকে আল্লাহর হুকুম। আমরা কী করব? তখন কুরআনে কারীমে আয়াত নাযিল হয়েছে।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ○ (سورة الأحقاف ١٥)

"আমি মানুষকে আদেশ করেছি যেন সে তার মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচারণ করে। তার মা তাকে কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট করে জন্ম দিয়েছে। আর তার গর্ভকাল ও স্তন্যপানকাল হল ৩০ মাস। (সূরা আহকাফ : ১৫)

সুতরাং মায়ের প্রাপ্য অধিকার হলো তাকে সম্মান করা এবং তার সঙ্গে উত্তম আচরণ করা।

মা-বাবার আনুগত্যের সীমা

এরপর অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○ (سورة العنكبوت ٨)

নিঃসন্দেহে– আমি মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু যদি তারা তোমাদেরকে বাধ্য করে এবং বলে– আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করো। তখন তুমি তার আনুগত্য করো না। কিন্তু দুনিয়াতে তার সঙ্গে ভাল আচরণ করো। তাদেরকে আরাম-আয়েশে রাখো। সেবা যত্ন করো। তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো। তাদের মন্দ বলো না। যথাসম্ভব তাদেরকে কষ্ট দিও না। তবে কুফুর-শিরিকে তাদের আনুগত্য করা যাবে না। আনুগত্য তো আল্লাহর। সুতরাং إِيَّاكَ نَعْبُدُ এর অর্থ হলো আমরা আপনারই ইবাদত করি। আপনার গোলামী দাসত্ব করি। অন্য কারো নয়। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর গোলামি ছেড়ে দেয়, العياذبالله আল্লাহ্ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। আমীন। আল্লাহর গোলামী থেকে নিজেকে বের করে নেয়, তাহলে তার হাজারো মানুষের এবং কোটি মাখলুকের গোলামী করতে হবে।

আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করো

যখন আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করেছ তখন অন্য কারো দাসত্ব নেই। কবি ইকবাল বড় উত্তম কথা বলেছেন,

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

একটা সেজদা আল্লাহর সামনে করেছ। এরপর হাজার সিজদা থেকে নাজাত মিলবে। আল্লাহর দরবার ছাড়া কোথাও কপাল ঝুঁকে না এবং কোথাও নত হয় না। এটা إِيَّاكَ نَعْبُدُ এর মর্মার্থ। সুতরাং যখন আল্লাহর হুকুম এসে যায় তখন অন্য কারো আনুগত্য থাকে না। তখন শুধু আল্লাহরই ইতাআত طاعة এবং তারই অনুসরণ। সুতরাং, إِيَّاكَ نَعْبُدُ যা আমরা সব নামাযে বরং প্রত্যেক রাকাতে পড়ি, এ আল্লাহ্ তা'আলার সামনে তার দাসত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ।

এই মিথ্যা স্বীকারোক্তি তুমি করছ না

একটু দেখুন। আমাদের এই স্বীকারোক্তি কোন সীমা পর্যন্ত সত্য? কোথাও তো এমন নেই যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে নামাযে দাঁড়াই তখন মিথ্যা বলি। হে আল্লাহ্ আমরা আপনারই ইবাদত করছি। অথচ বাস্তবে ইবাদত করছি শয়তানের, ইবাদত করছি প্রবৃত্তির। ইবাদত করছি মাখলুকের। ইবাদত করছি নাজায়েয কাজের আদেশদাতাদের। আর আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে বলছি إِيَّاكَ نَعْبُدُ অর্থাৎ আয় আল্লাহ্! আপনারই ইবাদত করছি। এটা মিথ্যা স্বীকারোক্তি নয় কি? আমাদের প্রত্যেকের একটু চিন্তা করা উচিৎ, আমাদের ইবাদত গাইরুল্লাহর জন্য হচ্ছে না তো?

ইবাদতের অর্থ কী

দেখুন। ইবাদত তো শুধু এটা নয় যে, তাঁর সামনে সেজদা করা হয়েছে। ইবাদতের অর্থ তো এটা যে, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে আনুগত্যের যোগ্য মনে না করা। আর যখন কোথাও টক্কর লাগে তখন আল্লাহর কথাকে প্রাধান্য দিবে। আল্লাহর হুকুমকে প্রাধান্য দিবে অন্য কাউকে নয়। হযরত সাহাবা কেরামকে দেখুন, আল্লাহ্ তা'আলা কী অদ্ভুত মাখলুক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে তৈরি করেছেন। খারাপ স্বভাব, মন্দ অভ্যাস মনে বসে গিয়েছিল। কিন্তু যখনই আল্লাহর হুকুম এসেছে তখনই তাকে বিদায় বলেছে।

শরাবের অভ্যাস

দেখুন যখন কারো শরাবের অভ্যাস হয়ে যায়, তখন কুস্বভাব হয়ে যায়। তাকে ছাড়তে কষ্ট হয়। আজকাল তো আমাদের কেউ ধুমপায়ী হচ্ছে। কেউ পানখোর, তামাকখোর হচ্ছে। কেউবা হচ্ছে নেশাখোর। এই অভ্যাস ছাড়তে কি পরিমাণ কষ্ট হয়।

কিন্তু মদের কুঅভ্যাস এমন, العياذ بالله আল্লাহ্ প্রত্যেক মুসলমানকে হেফাজত করুন, যদি একবার হয়ে যায় তাহলে ছাড়ানো অনেক কঠিন। মদের স্বভাব হলো সে প্রত্যেক মানুষকে তার মুখাপেক্ষী বানিয়ে ফেলে যে, আল্লাহ্ যতদিন বাঁচিয়ে রাখবেন ততদিন সে পান করবে। গালীব বলেন :

چھوٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگ ہوئی

অর্থ : ভাই নাপাকি যাকে একবার পেয়েছে
তাকে সে ছাড়তে না পেরেছে।

ইউরোপে মদের ফলাফল

এটা ১৯২২ সালের কথা। ইউরোপের লোকজন অনুভব করেছে যে, মদ অনেক ক্ষতিকর এবং বড় খতরনাক বস্তু। মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট করে দেয় এবং এর কারণে বিভিন্ন অঘটন ঘটে। আরো কত কিছু ঘটে যায় যার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। ১৯২২ সালে তারা মদ বন্ধ করার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করে। মদ বন্ধ, কেউ মদ পান করবে না। আইন তো হল। এখন আইনের উদ্দেশ্য কী? যে পুলিশ তার দেখভাল তত্ত্বাবধান করবে এবং আইন বাস্তবায়নকারী এজেন্সী তা দেখাশুনা করবে। লোকজন পুলিশের সামনে এবং আইন বাস্তবায়নকারী এজেন্সীর সামনে মদ ছেড়ে দেয়। কিন্তু ঘরে তাদের ভাড় বানিয়ে নেয় এবং মদ পান চলতে থাকে। এতদিন তো কারখানায় মদ তৈরি হত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হত। কিন্তু এখন ঘরে বানানো হচ্ছে। ফলে এর মধ্যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হচ্ছে এবং তাতে ক্ষতিও বেশি হচ্ছে। কিন্তু ছেড়েছে এমন একজনও নেই। কেননা আইনের বলয় মানুষকে জনসম্মুখে অপরাধ থেকে বিরত রাখে। তবে বন-জঙ্গলের নির্জনতায়, রাতের অন্ধকারে তার উপর কোন্ পাহারাদার আছে? আর পাহারা দেয়ার বস্তু তো একটাই। আর তাহলো আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার ইহসাস ও অনুভূতি। যা মানুষকে নির্জন বন-জঙ্গলে, এবং রাতের অন্ধকারে ও তার অন্তরে পাহারা বসায়। আর তাদের তো এটা ছিল না। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। কয়েক সপ্তাহ পর এই কথা বলে আইন উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে যে, আমরা ব্যর্থ। আমাদের পক্ষে মদ বন্ধ করা সম্ভব নয়।

আরববাসী এবং মদ

আসুন, এখন আরবের দিকে। যে সমাজে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেছিলেন, সেখানে মদ ছিল মজ্জাগত বিষয়। তারা গর্ব করে বলত যে, আমরা মদ্যপায়ী। আর তা তাদের তবিয়তের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে, আরবী ভাষায় মদের জন্য প্রায় দুইশত শব্দ আছে। সকালে যে মদ পান করা হয় তার আলাদা নাম। যা সন্ধ্যায় পান করা হয় তার আলাদা নাম।

খেজুর দিয়ে যা বানানো হয় তার এক নাম। আবার আঙুর দিয়ে যা বানানো হয় তার আরেক নাম। যেমন পানি মিশিয়ে যায় তার ভিন্ন নাম। আর যে মদ মধু দিয়ে মিশিয়ে পান করা হয় তার আরেক নাম। শিরকা মিলিয়ে যে মদ পান করা হয় তার অন্য নাম। এভাবে দুইশত নাম আছে মদের। মদের প্রতি মোহাব্বত ছিল যে, কবি গর্ব করে বলছে :

اذا ما اصطحت أربعا شد ئزاری۔

"যখন আমি সকালে মদের চারটি পাত্র নিয়ে বের হই, তখন যমীনের সঙ্গে আমার লুঙ্গি হেঁচড়ায়। অবস্থা এমন ছিল যে, যে যত বেশি মদ পান করত তাকে তত বেশি সম্মানী মনে করা হত। যাই হোক, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আগমন করলেন, তখন ঘরে ঘরে মদ পান চলত। কিন্তু সারকায়ে দো'আলম কখনো মদ ছুঁয়েও দেখেননি। অথচ অন্য সকলে মদ পানে ডুবে ছিল। আর গাযওয়ায়ে উহুদ পর্যন্ত মদের বৈধতা (অনুমোদন) ছিল। এমনকি উহুদ যুদ্ধে এমন কয়েকজন সাহাবী শরীক হয়েছিলেন যারা সকাল বেলা মদ পান করে তারা যুদ্ধে শহীদ হন। অবশ্য সে সময় কোরআনে মদের কিছু খারাবি বর্ণনা করা হয়েছিল,

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ○ (سورة البقرة ٢١٩)

"মানুষ আপনাকে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি তাদের বলে দিন, তাতে খারাবি অনেক ফায়দা কম। কিন্তু খারাবি অনেক বেশি উপকারের মোকাবেলায়। এটা বলেননি যে হারাম ছেড়ে দাও। তৎক্ষণাৎ বলেননি। হালকা মানসিকতা তৈরি করেছেন।

আরবে মদ হারাম করার ফল

কিন্তু যখন বিধান নাযিল হলো,

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○ (سورة المائدة ٩٠)

এটা মদ, এটা জুয়া যা তোমরা খেল। এগুলো সব শয়তানের কাজ। অপবিত্র, এ থেকে বেঁচে থাক। যখন এই বিধান আসল তখন হযরত আনাস (রাঃ) তিনি নবী করীম ﷺ এর বিশেষ খাদেম ছিলেন, তিনি বলেন, সেদিন আমি আমার শ্বশুরালয় আবু তালহার ঘরে অনুষ্ঠিত একটা মজলিসের সাকী ছিলাম এবং লোকজনকে মদ পান করাচ্ছিলাম। আবু তালহা তার শ্বশুর ছিলেন। তার ঘরে লোকজন একত্রিত হয়েছিল। এবং মদ পান চলছিল। হযরত আনাস বলেন, আমি মদ পান করাচ্ছিলাম। তখন এক ঘোষকের আওয়াজ এলো, যে মহল্লায় ঘোষণা করছিল–

الا ان الخمر قد حرمت۔

"সকলে শুনে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মদ হারাম করা হয়েছে। তো হযরত আনাস (রাঃ) বলেন : যখন সাহাবায়ে কেরামের কানে এ আওয়াজ পৌঁছল, তখন যার হাতে পেয়ালা ছিল, এবং মুখ পর্যন্ত পৌঁছেছিল কিন্তু তিনি নামিয়ে রাখলেন ও পেয়ালাটা যমীনে ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন : যতগুলো মটকায় শরাব আছে সব ভেঙ্গে ফেলো। তিনদিন পর্যন্ত শরাব মদীনা মুনাওয়ারার অলিতে গলিতে পানির মত প্রবাহিত হচ্ছিল।

আপনি চিন্তা করুন, সারা জীবনের অভ্যাস। যা ছাড়া জীবন অচল। মনের চাহিদা পান করো। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছে যে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ আয় আল্লাহ্! আমরা আপনারই ইবাদত করবো। অন্য কারো নয়। তাই নফসের ইবাদত ছেড়ে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের খাতিরে নিজের সত্তর বছরের পুরনো অভ্যাসকে বিদায় বলেছে, ছেড়ে দিয়েছে। কেউ ঐ পেয়ালা দ্বিতীয়বার মুখে লাগায় নি যে পাত্রে মদ রেখেছে সে পাত্র ভেঙে ফেলে। বিক্রি করারও চিন্তা করেন নি। এতে টাকা পয়সা ব্যয় হয়েছে। কোন কাফেরের কাছে বিক্রি করে দেই, কিন্তু পয়সা আসবে, না তাও নয়।

এক সাহাবীর শিক্ষণীয় ঘটনা

যেভাবে আরবদের মাঝে মদের প্রচলন ছিল, ঠিক সেভাবে গাইরে মাহরাম মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ব্যভিচার করার ব্যাপক প্রচলন ছিল। তো এক সাহাবীর এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। যেমন অবাধ যৌনাচারে বিশ্বাসীদের মাঝে হয়। এই সম্পর্ক মানবিক সম্পর্কের সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু যখন মুসলমান হয়েছেন এবং কালেমা পড়েছেন এবং আল্লাহর সামনে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর স্বীকার করেছেন তখন একদিন সেই সাহাবী কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ঐ মহিলার সঙ্গে তার দেখা হলে মহিলা তাকে গুনাহের প্রতি আহ্বান জানালো। তখন ঐ সাহাবী উত্তর দিলেন যে, এখন তোমার-আমার মাঝে ইসলাম প্রতিবন্ধক হয়ে গেছে। আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। এখন তোমার-আমার মাঝে সম্পর্ক থাকতে পারেনা। যা ইতোপূর্বে তোমার আমার মাঝে ছিল। সে তার ভালবাসার দোহাই দিল। তার প্রেমের দাবি করে বলল, তোমার কী হয়েছে? সারা জীবন তোমাকে ভালবেসেছি। তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছি। তোমাকে ছাড়া আমি কী করে বাঁচবো। তখন এই সাহাবী বললেন : যদি সম্পর্ক রাখতেই হয় তাহলে পথ একটা। আর তা হলো বিবাহ। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ করবো না যতক্ষণ পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি যে, অমুসলিম নারীর সঙ্গে বিবাহ জায়েয আছে কি

নেই? সাহাবী (রাঃ) হুজুরের দরবারে এলেন। সবকিছু খুলে বললেন : এবং জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহর রাসূল এই অবস্থায় কি আমি বিবাহ করতে পারি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ করে থাকলেন। বললেন : আল্লাহর পক্ষ থেকে এখনো কোন বিধান নাযিল হয় নি। তখন আয়াত অবতীর্ণ হলো–

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ○

হে মুসলমান! তোমরা মুশরিক নারীদের বিবাহ করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। এবং মনে রেখ, একজন মুসলিম দাসী একজন স্বাধীন মুশরিক নারী থেকে উত্তম। যদিও ঐ মুশরিক তোমাদের পছন্দ হয়। এই আয়াত অবতীর্ণ হলো। ঐ সাহাবী গিয়ে বললেন, তোমার আমার মাঝে সম্পর্ক ঠিক রাখার একটাই উপায় ছিল, আর তা হলো বিবাহ করা। কিন্তু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং অমুসলিম হওয়ার কারণে আমার তোমার মাঝে বিবাহ হতে পারে না। এজন্য এখন আমি নিরুপায়।

আল্লাহর হুকুমের সামনে সব কিছু কোরবান

এখন চিন্তা করুন, জযবা খায়েশাতে, কি কিছু হবে? কিন্তু আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলার বিধান আসার পর সমস্ত জযবা শেষ হয়ে গিয়েছে। সমস্ত খায়েশাত কোরবান হয়ে গিয়েছে। কেন? এজন্য যে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে স্বীকার করে নিয়েছে যে, হে আল্লাহ্ আমরা আপনারই ইবাদত করি। আপনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করি না। এটাই সেই স্বীকারোক্তি যা আমি সূরা ফাতিহায় করেছি। সুতরাং ভাই! এই দাবির ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা চাই। এই দাবি অনুযায়ী আমল করা চাই এবং চেষ্টা সাধনা অব্যাহত রাখা চাই। আল্লাহ্ আমাকে আপনাকে সবাইকে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

শুধু আল্লাহর কাছে চাও

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

মুহতারাম মুসল্লি ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! কয়েক জুমা ধরে সূরা ফাতিহার তাফসীর চলছে। প্রথম তিন আয়াতের বর্ণনা আল-হামদুলিল্লাহ হয়েছে। চতুর্থ আয়াত অর্থাৎ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর বয়ান চলছিল। إِيَّاكَ نَعْبُدُ যার অর্থ আমরা আপনারই ইবাদত করি, অন্য কারো নয়। গত জুমায় বলেছিলাম যে, এই অর্থের মাঝে এই কথাও অন্তর্ভুক্ত যে, মানুষ কাউকে واجب الإطاعة মনে করবে না। واجب الإطاعة তো একমাত্র আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা। তবে হাঁ যে লোকদের আনুগত্যের কথা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, তাদের আনুগত্য আল্লাহ্ তা'আলারই আনুগত্য। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের হুকুম ও আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন।

وَأَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ۔

আল্লাহরও আনুগত্য করো এবং তার রাসূলেরও আনুগত্য করো।

সুতরাং বাস্তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য আল্লাহ্ তা'আলারই আনুগত্য। এভাবে মা-বাবার আনুগত্যের হুকুম দেয়া হয়েছে। এটাও আল্লাহ্ই দিয়েছেন। কিন্তু মা-বাবার আনুগত্য হোক কিংবা কোন

শাসকের আনুগত্য হোক। আনুগত্য সেই সময় পর্যন্ত যে সময় তারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের হুকুমের বিপরীত আদেশ করবে না। কিন্তু যদি তার হুকুমের বিপরীত কোন হুকুম দেয় তাহলে তার আনুগত্য নেই। তখন আনুগত্য আল্লাহর। এই সব কথা إِيَّاكَ نَعْبُدُ এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। এবং তার মাঝে এই স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, আয় আল্লাহ্! আমি আমার গোটা জীবন আপনার হুকুম মোতাবেক অতিবাহিত করার চেষ্টা করবো। যে কাজের হুকুম আপনি দিয়েছেন। তা সম্পন্ন করবো। এবং যে সব কাজ পরিত্যাজ্য সেগুলো পরিত্যাগ করবো। এই সব কথা إِيَّاكَ نَعْبُدُ এর মাঝে নিহিত রয়েছে।

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর ব্যাখ্যা

আল্লাহ্ তা'আলা বড় অর্থপূর্ণ আয়াত বর্ণনা করেছেন– আমাদের জন্য তাতে অনেক শিক্ষা রয়েছে। আর তা হলো وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আয় আল্লাহ্! আমরা আপনারই কাছে সাহায্য চাই। মানে কী? আমাদের বলার বলে দিয়েছি যে, হে আল্লাহ্ আমরা আপনারই ইবাদত করি। আপনি ছাড়া অন্য কারো না। কিন্তু কর্ম জীবনে তো এর প্রতিফলন সম্ভব না। যদি আপনার সাহায্য শামিলে হাল না হয়।

আয় আল্লাহ্ আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং ইবাদত করার জন্য আপনারই সাহায্য চাই। আপনি আপনার দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের অবিচল থাকার এবং আপনার ইবাদতের তাওফিক দান করুন। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এই দু'আ শিখিয়েছেন যে, যখন কোন কাজ করতে গিয়ে কোন সমস্যার সম্মুখীন হও, তখন আমার দিকে রুজু হও। আমাকে বল, আয় আল্লাহ্! আমি আপনার হুকুমের উপর আমল করতে চাই। কিন্তু প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। নফস আমাকে ভুল পথ দেখায়। শয়তান আমাকে প্রতারিত করে। বন্ধু-বান্ধব ভুল পথে নিয়ে যায়। যদি আপনি আমাকে সাহায্য না করেন। আপনি যদি আমাকে তাওফিক না দেন, তাহলে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব।

গুরুত্বপূর্ণ প্রেশক্রিপশন ও মহান শিক্ষা

এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রেশক্রিপশন যা আল্লাহ্ তা'আলা দুই শব্দের মধ্যে বলে দিয়েছে। আমার দিকে রুজু হও। আমার প্রতি একনিষ্ঠ হও। আমার কাছে চাও। আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন। আমার কাছে তাওফিক অন্বেষণ করুন। আমার ইবাদতের গণ্ডিতে থেকে যা কিছু করা উচিৎ তা আমার কাছে চাও। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আপনাকে এই শিক্ষা দান করুন।

এমন পরিবেশে কী করে চলবো

বর্তমান সময়ে যখন কোন মানুষকে বলা হয় শরীয়তের পাবন্দি কর। শরীয়ত মত চল। ফরয ওয়াজিব পালন কর। গুনাহ থেকে বাঁচ। যে সব বস্তুকে হারাম করা হয়েছে তা থেকে দূরে থাক। তখন কিছু লোক বলে, এটা কি করে মানবো? আশ-পাশ তো দিকভ্রান্ত। বাহিরে বের হলে গুনাহ থেকে বাঁচা যায় না। অফিস-আদালতে গেলে দেখবেন ঘুষের বাজার রমরমা। কোন পার্টিতে যান, সেখানে পুরুষ ও মহিলাদের এত নৈকট্য যে, গুনাহ থেকে বাঁচা বড় দায়। পুরো সমাজ উল্টো পথে চলছে। কোন ব্যক্তি যদি সমাজ থেকে বের হয়ে কোন কাজ করতে চায় তখন তাকে অপদার্থ বানিয়ে ছাড়ে। সুদের-ঘুষের ছড়াছড়ি। কেউ চায় যে, আমি ঘুষ খাবও না দিবও না। ঘুষ নিবেনা তো ঠিক। কিন্তু ঘুষ দিবে না, তাহলে কাজও হবে না। লোকজন বাধ্য। সুদকে বৈধ মনে করছে। বাজারে সুদি লেনদেন চলছে। হালাল-হারামের কোন পথে চলছে। আমি একা কী করবো? শরীয়তের বিধান কীভাবে মানবো?

হাশরের মাঠের কল্পনা করুন

আমার শায়েখ হযরত আরেফী (আল্লাহ্ তার মর্যাদা সমুন্নত করুন।) তিনি বলেন, একটু কল্পনা করুন, হাশরের মাঠে আপনি আল্লাহ্ তা'আলার সামনে দাঁড়িয়েছেন, তিনি আপনাকে আপনার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন যে, কেন গুনাহ করেছিলে? আমার অবাধ্য কেন হয়েছিলে? আপনি তার জবাবে বলছেন, হে আল্লাহ্ আমার কী করার ছিল? আপনি আমাকে এমন এক যামানায় সৃষ্টি করেছেন যেখানে চারদিকে নাফরমানি, গুনাহের বাজার ছিল রমরমা। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। দ্বীনের উপর চলা ছিল মুশকিল। আমি অপারগ হয়ে গুনাহে লিপ্ত হয়েছি। যদি এর উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যদি তোমার সমস্যা হয়ে থাকে, সমাজের বিপরীতে চলা মুশকিল হয়ে থাকে, তাহলে কেন তুমি আমার দিকে ফিরনি? কেন আমার কাছে প্রার্থনা করনি? আমি কোরআনের বলেছি,

إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

আর তুমি ঈমানও এনেছিলে এই কথার উপর যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং নামাজেও পড়তে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ তাহলে বলো যখন তুমি কোন সমস্যায় পড়ে যেতে তখন আমার দিকে রুজু হয়ে কেন

প্রার্থনা করে বলতে না? হায় আল্লাহ্! আমি সংকটাপন্ন, পরিবেশ খারাপ, যামানা পাল্টে গেছে। এই সমাজে ও এই যুগে দ্বীনের উপর চলা আমার জন্য অসাধ্য। আয় আল্লাহ্! আপন অনুগ্রহে আমাকে তাওফিক দান করুন। আমাকে সাহায্য করুন যেন আপনার বাতলানো পন্থা অনুসারে জীবন অতিবাহিত করতে পারি।

এর কী জবাব আছে?

বলো এর কী জবাব আছে? এর কোন জবাব নেই। আল্লাহ্ তা'আলা তো প্রত্যেক নামাযে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়িয়েছেন। প্রত্যেক রাকাতে আপনি পড়েছেন যে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ কিন্তু আমল করেননি কেন?

আল্লাহ্ তা'আলার কাছে চান, হে আল্লাহ্! আমার থেকে হয় না, আপনি আমাকে তাওফিক দান করুন। আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের উপর, কুদরতের উপর ঈমান রেখে চান। আয় আল্লাহ্! আমি সুদি কারবারে ফেঁসে গেছি। আপনি আমাকে এ থেকে বের করুন। হে আল্লাহ্ আমি অমুক গুনাহে ফেঁসে গেছি। আপনি আমাকে এ থেকে পানাহ দান করুন। চাইতে থাকুন। ধারাবাহিকভাবে চান।

অকৃত্রিমভাবে চান

আমার হযরত এও বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বড় রহীম বড় করীম। মা-বাবা থেকেও অধিক করুণাবৎসল। সুতরাং তার কাছে বে-তাকাল্লুফীর সঙ্গে চান। বলুন, হে আল্লাহ্ আমাকে তাওফিক দান করুন। অন্যথায় আখেরাতে আমাকে পাকড়াও করবেন না। আখেরাতে আমাকে ধরবেন না। আমি তো আমার কাজ, আমার মোআমালা আপনার কাছে সোপর্দ করছি। আমার অবস্থা ঠিক করে দিন। অন্যথায় আখেরাতে আমাকে পাকড়াও করবেন না। আল্লাহর কাছে চান। মানুষ সাধারণ কাজ মনে করে এদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। কিন্তু সত্য কথা হলো, নিজের সংশোধনের জন্য এটা অনেক বড় রাস্তা। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে কাকুতি-মিনতি করে বড় আবেগের সঙ্গে চান।

এই দু'আ করুন

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কোরবান, তিনি আমাদের জন্য কোন কিছুই ছাড়েন নি। দু'আটি হল :

اَللّٰهُمَّ اِنَّ قُلُوْبَنَا وَنَوَاصِيَنَا وَجَوَارِحَنَا بِيَدِكَ لَمْ تُمَلِّكْنَا مِنْهَا شَيْئًا . فَإِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ فَكُنْ اَنْتَ وَلِيَّنَا وَاهْدِنَا اِلٰى سَوَاءِ السَّبِيْلِ۔

হে আল্লাহ্! আমাদের অন্তরসমূহ আপনার কবযায়, আমাদের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ আপনার কবযায়। আমরা এগুলোর কোন কিছুরই মালিক নই। সব কিছুর মালিক আপনিই। আপনি এই সব বস্তু আপনার কবযায় রেখেছেন।

সুতরাং হে আল্লাহ্! আপনার দয়া ও অনুগ্রহে আপনি আমাদের তত্ত্বাবধায়ক হোন। আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এই দু'আ করুন। আরেকটি দু'আ হুজুর করেছেন–

اللّٰه انك سئالتنا من انفسنا مالا تملك الا به فاعطنا ما يرضيك -

হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের কাছে এমন কাজের দাবি করেছেন। আপনার তাওফিক ছাড়া যার উপর আমল করা সম্ভব না। তাই আপনি আমাদেরকে দান করুন এমন বস্তু যা আপনাকে সন্তুষ্ট করবে।

যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে এই দু'আ করবে এবং চেষ্টাও করবে। দু'আ করার মানে এটা নয় যে, শুধু দু'আই করা আর চেষ্টা ছেড়ে দেয়া। আল্লাহ্ তা'আলা সব কাজে এই হুকুম দিয়েছেন, নিজের পক্ষ থেকে চেষ্টা পূর্ণ করো। অতঃপর আমার কাছে চাও। চেষ্টাও করেছ, সঙ্গে সঙ্গে দু'আও করেছ। এরপর সম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তোমাকে আযাব দিবেন। গুনাহ থেকে বাঁচাবেন না। তা না হলে অন্ততপক্ষে ক্ষমা করে দিবেন।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

আমি আপনাদেরকে একটি ঘটনা শোনাচ্ছি। আজ থেকে প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর আগের ঘটনা। জার্মান থেকে এক ব্যক্তি আমার কাছে চিঠি লিখল। সে ছিল পাকিস্তানী বংশোদ্ভুত এবং জার্মান নাগরিক। তার নাম আব্দুল লতীফ। সে লিখেছে যে, আমি পাকিস্তান থেকে জীবিকা অন্বেষণে জার্মানী এসেছিলাম। ধর্ম কর্মের ব্যাপারে কোন ফিকির ছিল না। নামায, রোজা তো নয়ই। পেটের দায়ে পাকিস্তান ছেড়ে জার্মানী এসেছি। এক মেয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয়েছে। সে খ্রিস্টান। সম্পর্কের এক পর্যায়ে সে বলল, আমি যেন আমি তাকে বিবাহ করি। ইসলাম ধর্মের প্রতি বিশেষ কোন ভাবনা ছিল না। না নামাজ, না রোজা, না যাকাত, কিন্তু বিবাহ করেছি। বিবাহ হয়েছে। এভাবে বে ফিকিরের সঙ্গে অনেকদিন কাটল, সন্তান হলো।

আমার ভেতরের মুসলমান জেগে উঠল

যখন আমার সন্তান বড় হলো এবং পড়ালেখা করার যোগ্য হলো, তখন আমি দেখলাম, আমার খৃস্টান স্ত্রী আমার ছেলেকে খৃস্টধর্ম শিখাচ্ছে। একদিন হঠাৎ করে আমার ভিতরের মুসলিম সত্তা জেগে উঠে। আমার আত্মমর্যাদাবোধ আমাকে নাড়া দেয় যে, এ সন্তান আমার। সে খৃস্টান হচ্ছে। তার মা তাকে খৃস্টান ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছে। আমার ভেতর আলোড়ন সৃষ্টি হলো। আমি চিন্তা করলাম তাকে বাধা দিব। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম এ আমার সন্তান, তুমি তাকে খৃস্টধর্ম শিক্ষা দিতে পার না। স্ত্রী বলল, কেন দিব না? সে তো আমারও সন্তান। আমি যে ধর্ম সত্য মনে করি, সঠিক জানি সে অনুযায়ী আমি আমার ছেলেকে শিক্ষা দেব। তোমার বাধা দেয়ার কোন অধিকার নেই। আমি বললাম, তোমার ধর্ম সত্য নয়, আমার ধর্ম সত্য। সে বলল, কেন সত্য বলো? এখন যখন কথা শুরু করলাম– ধর্মের ব্যাপারে তার অনেক জ্ঞান ছিল, কিন্তু আমার ধর্মের ব্যাপারে আমার কোন জ্ঞানই ছিল না– ফলাফল এটাই হলো যখন তার সঙ্গে আমার তর্ক হত তখন সে জিতে যেত। আর আমি উত্তর খুঁজে পেতাম না। এভাবে চলতে লাগল। এই ঝগড়া-ঝাটির কারণে আমি নামাজ রোজার প্রতি কিছুটা ঝুঁকি। কিন্তু যখনই বিতর্ক করি তাকে আমি লা-জাওয়াব করতে পারি না। সে আমার ছেলেকে খৃস্টান বানাচ্ছে।

আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে সাহায্য করুন। এই চিঠি আমার কাছে এসেছে। আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করলাম যে, আয় আল্লাহ্ এই ব্যক্তি সমস্যায় আছে। এমন কোন তদবীর আপনি আমার মনে ঢেলে দেন যার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হবে।

দু'টি কাজের উপর তাকে রাজি করান

এরপর আমি তাকে চিঠি লিখলাম। খৃস্টান ধর্ম সম্পর্কে আমার একটি বই আছে। খৃস্টধর্ম কী? উর্দূতে আর ইংরেজিতে What is Christianity এই নামে ছাপা হয়েছে। আপনি তার সঙ্গে তর্ক করা ছেড়ে দিন। তর্ক করে কোন ফায়দা নেই। বিশেষত যখন দ্বীন সম্পর্কে আপনার কোন জ্ঞান নেই। অবশ্য তাকে দুইটি কাজের উপর যে কোনভাবে রাজি করান। এক এই কিতাব যা আমি পাঠাচ্ছি সে তা পড়বে। দ্বিতীয় কাজ, তাকে এই কথা বলবেন যে, তুমিও আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো আমিও আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখি। তাই তুমি প্রতি রাতে বসে এই দু'আ করবে যে, হে আল্লাহ্! যদি খৃস্টধর্ম সত্যি হয় তাহলে তার উপর আমাকে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আর যদি ইসলাম ধর্ম সত্য হয় তাহলে তার

সত্যতা আমার মনে ঢেলে দিন। তার সঠিকতার 'প্রবক্তা, বানান। এই দু'আ করবে।

কিছুদিন পর তার চিঠি এলো। যে সন্তুষ্ট হয়েছে, এবং আপনার বইটিও পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে রাতেও দু'আ করছে। কিন্তু কোন পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না। যেমন ছিল তেমনি আছে। ইসলামের প্রতি কোন ঝোঁক তৈরি হয়নি। আমি তাকে দ্বিতীয়বার চিঠি লিখলাম ও বললাম, ঘাবড়াবেন না। তাকে বলুন : তুমি নিরবচ্ছিন্নভাবে তোমার কাজ চালিয়ে যাও, আপনি দু'আ করবেন, হে আল্লাহ্! আপনি তার মনে সঠিক বিষয়টি ঢেলে দিন। আর ঐ মহিলাও করতে থাকুক।

আল্লাহ্ তা'আলাকে স্বচক্ষে দেখেছি

তৃতীয় যে চিঠি এসেছে তাতে সে লিখেছিল, মাওলানা আপনি তো আল্লাহ্কে নিদর্শন দেখে চিনেছেন। আর আমি স্বচক্ষে আল্লাহ্কে দেখেছি। সে লিখেছে যে, এটা গতকালকের ঘটনা। আমার স্ত্রী পরীক্ষার কারণে ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিল। আমিও তার সঙ্গে গিয়েছিলাম। আমরা ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে আসছিলাম। সে গাড়ী ড্রাইভ করছিল। ড্রাইভিং করতে করতে হঠাৎ করে গাড়ী রাস্তার বাম পাশে ব্রেক করে এবং গাড়ীর স্টিয়ারিং এর উপর মুখ রেখে কাঁদতে থাকে। আমি ভাবলাম যে, (আল্লাহ্ না করুন) কেউ মনে হয় তাকে কষ্ট দিয়েছে, বা সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হঠাৎ করে গাড়ি থামিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কী হয়েছে সে এত এত কাঁদছিল যে কথাই বলতে পারছে না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম কী হয়েছে? কোন কষ্ট? কোন পেরেশানী?

আমাকে মুসলমান বানাও

সে কাঁদতে কাঁদতে অনেক কষ্ট করে বলল। আমাকে কোথাও নিয়ে মুসলমান করো। আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এই সেই নারী যে আমার সঙ্গে তর্ক করতো। আর আজ সে বলছে আমাকে মুসলমান বানাও। আমি সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভিং করে নিকটবর্তী একটি ইসলামী সেন্টারে পৌছলাম। তাকে সেখানে নিয়ে কালেমা পড়ালাম। দ্বীনের কথা বুঝালাম। সে মুসলমান হলো। আজ ছিল রমাযানের প্রথম দিন। সাহ্রীতে আমরা দুইজনই উঠেছি এবং রোজা রেখেছি। একটি চিঠি ছিল ঐ ব্যক্তির, আরেকটি চিঠি ছিল ঐ মহিলার। সে লিখেছে যে, আমি আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আপনি আমাকে এমন পন্থা বলে দিয়েছেন যা আমার সামনে সত্যের দ্বার খুলে দিয়েছে। এখন বলুন আমি কীভাবে সামনে চলবো?

আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই দান করেন

আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলার কাছে যদি কিছু চাওয়া হয়। বিশেষভাবে হেদায়াত, যদি দ্বীনের উপর আমল ও আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক জীবন-যাপন। তাহলে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা দান করবেন। কারণ, إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে এই পথ দেখিয়েছেন যে, কখনো যদি তোমাদের দ্বীনের উপর আমল করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা অনুভূত হয়। তাহলে আমার কাছে এসে যাও। আমার কাছে বলো কী সমস্যা। কী কষ্ট, কী পেরেশানী। আমার কাছে বল, হে আল্লাহ্! এই পেরেশানী এসেছে। আপনার অনুগ্রহে তা দূর করে দিন। إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর অর্থ হলো : হে আল্লাহ্ আমরা আপনারই ইবাদতকারী এবং আপনারই কাছেই সাহায্য চাই। আজ তো পুরো সমাজে সবার মুখে এই কথা যে, যামানা খারাপ। সমাজ পাল্টে গেছে। এই অবস্থায় দ্বীনের উপর চলা মুশকিল। কিন্তু কথাই চলছে। এ থেকে উত্তরণের কোন চেষ্টা চলছে না। অন্তরে বসে গেছে যে, দ্বীনের উপর চলা মুশকিল। এই কারণে হাতের উপর হাত রেখে বসে আছে। না কোন চেষ্টা আছে। না আল্লাহ্ তা'আলার দিকে রুজু হওয়ার কোন ইহতেমাম আছে। যে, তার কাছে দু'আ করি, তার কাছে তাওফিক চাই। রাস্তা এটাই যে চেষ্টা করা এবং চেষ্টার সঙ্গে আল্লাহর কাছে চাওয়া। এরপর দেখো আল্লাহ্ তা'আলা কীভাবে সাহায্য করেন। এবং কীভাবে তাওফিক দান করুন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আপনাকে এর উপর আমল করার তাওফিক দান করুন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

আল্লাহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَآ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○آمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ- وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

ভূমিকা

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! সূরা ফাতেহার ব্যাখ্যা এবং তাফসীর কয়েক সপ্তাহব্যাপী চলছে। এবং বিগত জুমাগুলো তো সূরা ফাতিহার চতুর্থ আয়াত অর্থাৎ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছিলাম। যার অর্থ এই যে, আয় আল্লাহ্ আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই সাহায্য চাই।

এই আয়াতের এক দিক

এই আয়াতের এক দিক তো আমি আগের জুমাগুলোতে আলোচনা করেছিলাম যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, তিনি প্রতিদান দিবস ও শাস্তির দিবসের মালিক। তখন প্রশ্ন জাগে যে, এই শাস্তি এবং প্রতিদানের দিনে কীভাবে সফল হবো? আর এই দুনিয়ায় কীভাবে জীবন কাটাবো যে, হিসাবের দিনে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ইজ্জত সম্মান দান করবেন। তো এই আয়াত إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর মধ্যে একটি কার্যকরী পন্থা বলে দিয়েছেন যে, যখন তোমরা

দ্বীনের উপর আমল করতে সামান্য পরিমাণ ও কষ্ট অনুভব করো তখন আমার দিকে রুজু হও। এই কথা বলো, হে আল্লাহ্! আমরা ইবাদত করি আপনারই। কিন্তু আপনার ইবাদতও আনুগত্য করতে গিয়ে কষ্ট আসে। সমস্যা দৃষ্টিগোচর হয়, পরিবেশ ভিন্ন দিকে নিয়ে যায়। এজন্য وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আপনারই সাহায্য চাই। অর্থাৎ আপনার সঠিক ইবাদত ও আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার সাহায্য শামেলে হাল হবে। এই জন্য এই পারগাম দিয়েছেন যে, ইবাদতের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। আল্লাহ্ তা'আলার দিকে রুজু হও।

আল্লাহরই কাছে চাও

আর এই আয়াতের মধ্যে এই পারগামও দেয়া হচ্ছে যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের 'ইকরার' করো তখন সঙ্গে সঙ্গে আল্লারই কাছে চাও। এই জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوْءِ وَتَمَامَ الصَّلٰوةِ وَتَمَامَ مَغْفِرَتِكَ وَتَمَامَ رِضْوَانِكَ۔

"আয় আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি যে, আমার ওযু আপনার সন্তুষ্টি মোতাবেক পূর্ণাঙ্গ হয়। আমার নামাজও আপনার সন্তুষ্টি মোতাবেক পূর্ণাঙ্গ হয়। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি যে, আমার গোটা কর্মজীবনও যেন আপনার সন্তুষ্টি মোতাবেক হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে এই দু'আ করতেন। তো এই আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলার সমস্ত ইবাদত এবং আনুগত্য ও আল্লাহ্ তা'আলার মদদ ছাড়া সম্ভব নয়।

এই আয়াতের দ্বিতীয় দিক

এই আয়াতের দ্বিতীয় অংশ এটা। বড় গুরুত্বপূর্ণ। তা এই যে, আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা বলেছেন! إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ অর্থাৎ আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, বলো! আয় আল্লাহ্ আমরা আপনারই কাছে সাহায্য চাই। কোন বিষয়ে আপনার সাহায্য চাই? এটা নির্দিষ্ট করেন নি। শুধু এতটুকু বলেছেন, হে আল্লাহ্ আমরা আপনারই কাছে সাহায্য চাই। আরবী ভাষার নিয়ম হলো, যখন কোন ব্যক্তি কোন কিছুকে নির্দিষ্ট না করে তখন তার উদ্দেশ্য হয় যে, সব বিষয়ে চাওয়া। ইবাদতের ক্ষেত্রেও আপনার সাহায্য চাই। দুনিয়া ও আখেরাতে সব কাজে আপনার সাহায্য চাই।

একটি সূক্ষ্ম বিষয়

একটি সূক্ষ্ম বিষয় আছে যে, আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা তাঁর প্রথম সিফাত বর্ণনা করেছেন যে,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○

رَبِّ الْعَالَمِيْنَ উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। মানব জগতের এবং দানব জগতেরও। গোটা জগতের প্রতিপালক। এই আয়াতের সম্পর্ক দুনিয়ার সঙ্গে। অর্থাৎ, দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সকলের প্রতিপালন করছেন। আর مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এর সম্পর্ক আখেরাতের সঙ্গে। অর্থাৎ যিনি আখেরাতের মালিক। الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ মাঝখানে এসেছে। এর সম্পর্ক দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের সঙ্গে। প্রথমে তো এই কথা বলে দিয়েছেন যে, দুনিয়া ও আখেরাতে যা কিছু হবে আমার হুকুমেই হবে। তা আমার ইচ্ছাই হবে। আমার ফায়সালা অনুযায়ী হবে। আর আমিই করবো। এখন সামনের আয়াতে বলছেন যে, আমার কাছে সাহায্য চাও। এবং বল, اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ হে আল্লাহ্! আপনারই কাছে সাহায্য চাই। অর্থাৎ দুনিয়ার সব কাজেও আপনারই সাহায্য চাই। এবং আখেরাতের সব কাজেও।

আল্লাহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌছার মাধ্যম

আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা তার পর্যন্ত পৌছার একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপত্র বলে দিয়েছেন, যদি তোমরা চাও যে, আমার সঙ্গে তোমাদের দৃঢ় সম্পর্ক হবে। তোমরা আমার পর্যন্ত পৌছবে। তো তুমি তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারের ভিখারী বানিয়ে নাও। আমার দরবারের ভিখারী বনে যাও।

সব সময় আমার কাছে কিছু না কিছু চাইতে থাক। দুনিয়াবী কোন প্রয়োজন, আমার কাছে চাও। আখেরাতের প্রয়োজনও আমার কাছে চাও, সব কিছু আমারই কাছে চাও।

দুনিয়ার নিয়ম এই যে, যত বড় ধনী হোক। যত বড় দয়ালু, দাতা হোক। কিন্তু যদি কোন মানুষ তার কাছে বারবার চাইতে থাকে। একবার এটা চাইলো। দ্বিতীয়বার আরেক জিনিস চাইল। তৃতীয়বার আরেক বস্তু চাইল। কিছুক্ষণ পর সে বিরক্ত হয়ে বলবে যে, ভাই তুমি আমার পিছু লেগেছ। এক বস্তুর উপর ক্ষান্ত হচ্ছো না। তোমাকে এটা দিচ্ছি, ওটা দিচ্ছি। এরপরও তুমি বারবার চাচ্ছো। সে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিবে।

কিন্তু ঐ মহানুভবের দরবার এত বড় যে, তিনি বলেন : তুমি আমার কাছে যত চাইবে আমি তোমার প্রতি খুশি হবো। হাদীস শরীফে এসেছে :

مَنْ لَّمْ يَسْئَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ اللّٰهُ عَلَيْهِ-

তরজমা : 'যে আল্লাহর কাছে চায় না, আল্লাহ্ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হোন।' আল্লাহ্ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হোন। কেন তুমি আমার কাছে চাইলে না? বান্দার প্রার্থনা আল্লাহর অনেক প্রিয়। হাদীস শরীফে সারওয়ারে দো'আলম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, যদি তোমাদের জুতার ফিতাও ছিঁড়ে যায় তাহলেও আল্লাহর কাছে বল যে, আয় আল্লাহ্! আমার জুতার ফিতা ছিঁড়ে গিয়েছে। এটাকে ঠিক করে দিন। দুনিয়া বা আখেরাতের ছোট, বড় যে কোন প্রয়োজনই হোক না কেন, এটা আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করার একটি অদ্ভুত ও সহজ পথ।

এক. অবুঝ শিশু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন

বিখ্যাত গ্রন্থ মছনবী রচয়িতা আল্লামা রুমি (রহ.) মছনবীর এক জায়গায় বলেছেন, তোমার কখনো কোন অবুঝ শিশুকে দেখেছ, যার কাছে তার মা-ই পৃথিবীর সবকিছু? কোন সমস্যা হয়েছে তো মাকেই ডেকেছে। খেলার মাঠে কোন বাচ্চা তাকে মারলো, বা তাকে বিরক্ত করল, তখনও তার মুখ থেকে মা শব্দটাই বের হয়। অথচ সে জানে এখন মা শুনছে না, তার পরও সে মা বলে ডাকে। মার কাছে অভিযোগ করে।

আল্লামা রুমি বলেন, মাকে তো সে সব জায়গায় দেখে না। আর মা সব জায়গায় থাকেনও না। এ সত্ত্বেও শিশু মা বলে ডাকে। কিন্তু তুমি সেই স্রষ্টার সৃষ্টি। যিনি সবত্র বিরাজমান। ডাকলেই সাড়া দেন। তিনি বলেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ-

'আল্লাহ্ তা'আলা তো সবকিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন।' তাহলে তুমি তোমার স্রষ্টার সঙ্গে এমন সম্পর্ক তৈরি করতে পার না যেমন শিশু তার মায়ের সঙ্গে করে। যখন তোমার কোন প্রয়োজন হয় তখন তুমি আল্লাহর কাছে রুজু হয়ে তার কাছে চাইবে।

সব প্রয়োজনে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে চাও

বুযুর্গরা বলেন, মানুষের এমন কোন মুহূর্ত নেই যখন তার কোন প্রয়োজন থাকে না। এজন্য সে সব প্রয়োজন আল্লাহ্ তা'আলার দরবারেই পেশ করুন। আপনি ঘর থেকে বের হলেন এবং মসজিদে আসলেন, গরম লাগছে। তখন আল্লাহর কাছে বলুন : আয় আল্লাহ্! গরম লাগছে। গরমের তীব্রতা কমিয়ে দিন। বাহিরে বের হলেন, ঘরে যাবেন। কোন বাহন তালাশ করছেন। তখন বলুন! আয় আল্লাহ্ আমাকে উত্তম বাহন দান করুন। গাড়িতে বসেছেন তখন বলুন!

আর আল্লাহ্ আমাকে নিরাপদে ঘরে পৌছান। বাড়ি পৌছেছেন বলুন, আর আল্লাহ্! ঘরে প্রবেশ করছি, আমাকে ভাল অবস্থা দেখান। তখন ঘরওয়ালাদের সুস্থ ও নিরাপদ পাবেন। কোন পেরেশানী আসবে না, সমস্যাও দেখা দিবে না। যে কাজ করছেন এবং যেই কাজের ইচ্ছা করেছেন, ঐ কাজে আল্লাহ্ তা'আলাকে অব্যাহত ভাবে ডাকতে থাকুন। বারবার আল্লাহর কাছে চান। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে। এর মাধ্যমে আপনি আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছার একটি নিকটতর পন্থা অবলম্বন করছেন।

বিভিন্ন হালতের দু'আসমূহ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন স্থানে পড়ার জন্য বিভিন্ন দু'আ শিখিয়েছেন। যেমন : ঘুম থেকে উঠে এই দু'আ পড়ো :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ۔

যখন ইস্তেঞ্জাখানায় যাও তখন প্রথমে এই দু'আ পড়ো :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ۔

"আল্লাহ্ আমি আপনার কাছে নিকৃষ্ট মাখলুকাত এবং নাজাসাত থেকে পানাহ চাই। হাজত শেষ করে ফিরে আসার সময় পড়ো :

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّی الْاَذٰی وَعَافَانِیْ ۔

আর ফজরের সময় যখন মসজিদে যাও তখন রাস্তায় এই দু'আ পড়তে পড়তে যাও।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ فِیْ قَلْبِیْ نُوْرًا وَفِیْ بَصَرِیْ نُوْرًا وَفِیْ سَمْعِیْ نُوْرًا وَ عَنْ یَمِیْنِیْ نُوْرًا وَعَنْ شِمَالِیْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِیْ نُوْرًا وَ مِنْ فَوْقِیْ نُوْرًا وَعَنْ اَمَامِیْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِیْ نُوْرًا وَاَعْظِمْ لِیْ نُوْرًا۔

মসজিদে প্রবেশ করছ তখন বলো :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۔

মসজিদ থেকে বের হচ্ছে তো বল :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ۔

যখন ঘরে ফিরে আস তখন বলো :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَ خَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

খাবার সামনে এসেছে তখন বল :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ رَزَقَنِيْ هٰذَا مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ.

খাওয়া শুরু করেছ তো বল :

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللهِ.

এবং খাবার শেষ করেছ তো বল :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ.

মোটকথা বিভিন্ন হালতে বিভিন্ন অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন।

এই দু'আগুলো এমন যে, একটি দু'আও যদি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কবুল হয়ে যায় তাহলে মানুষ নিরাপদেই নিজ গন্তব্যে পৌছে যাবে। দেখুন! যখন মসজিদে প্রবেশ করছেন, তখন কী দু'আ পড়েছেন :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

আয় আল্লাহ্ আমার জন্য রহমতের দরজা খুলে দিন।

যদি শুধুমাত্র এই ছোট একটি দোআ দরবারে ইলাহীতে কবুল হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন বান্দার জন্য রহমতের দরজা খুলে দেয়া হয়। তখন দুনিয়া ও আখেরাতে এমন কোন কাজ নেই যা তার জন্য সঠিক হবে না। মানুষের মুশকিল আসান হয়ে যাবে। এই সব দু'আয় একটা ফায়দা এই।

আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় হয়

দ্বিতীয় ফায়দা এই যে, বারবার আল্লাহ্ তা'আলার দিকে রুজু হওয়া ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক দৃঢ় হয়।

"তাআল্লুক মাআ আল্লাহ্, এই কথাটা তো আপনি শুনেছেন। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় হওয়া। সব সুফী ও আওলিয়াকেরাম যেই উদ্দেশ্যে রিয়াযাত মুজাহাদা করতে থাকেন এ জন্যই যেন আল্লাহ্র সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক মজবুত

হয়। এর সহজ পন্থা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। ইসলাহী খুতুবাতে তের নাম্বার খণ্ডে এর বিশদ বিবরণ রয়েছে। সারকারে দো'আলম (সা.) বারবার দু'আ করার তালকীন করেছেন, তা কেন? যাতে বান্দা إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর উপর আমলের শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। যেন বলে, আয় আল্লাহ্! সব কাজে আপনার সাহায্য চাচ্ছি। সব বিষয় আপনারই কাছে পেশ করছি। যেমনটা কোরআন বলছে,

اَللّٰهُ يَجْتَبِيْ إِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ إِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ○ (سورۃ الشوری ۱۳)

'আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা যাকে চান বাছাই করেন এবং আপন করে নেন আর যে বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার দিকে রুজু করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হিদায়েত দান করেন। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু হও।

সারমর্ম

যাই হোক! সূরা ফাতিহার সূচনাতেই আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আমার কাছে প্রার্থনা করো। জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেছে আমার কাছে চাও। প্রদীপের সলিতা পড়ে গেছে আমার কাছে চাও। বিদ্যুৎ চলে গেছে আমার কাছে প্রার্থনা করো। ক্ষুধা লেগেছে, আমাকে বলো। পিপাসা লেগেছে আমাকে বলো। বাহন খুঁজছো তো আমার কাছে আস। সর্বক্ষেত্রে, প্রতি মুহূর্তে, প্রতি কদমে কিছু না কিছু আল্লাহ্ তা'আলার কাছে চাওয়ার অভ্যাস গড়ে নাও।

এর মধ্যে না কোন কষ্ট আছে না কোন সময় ব্যয় হচ্ছে। না কোন পয়সা খরচ হচ্ছে। চলতে, ফিরতে, উঠতে-বসতে, মানুষ যখন তার প্রয়োজন আল্লাহর দরবারে পেশ করে, আল্লাহর কাছে চায়, তখন আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক মজবুত হয়, দৃঢ় হয়। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে পুরস্কার দেন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফিক দান করুন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

প্রয়োজন পূর্ণকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা

সূরা ইখলাসের তাফসীর

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ. وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَآ شَرِيْكَ لَهٗ. وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ○ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ○ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ○ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ○ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

সূরার নামকরণ

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! যে সূরা আমি এখন আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি, তার নাম সূরা ইখলাস। ইখলাস অর্থ কোন কাজ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য করা। আর এই সূরার নাম ইখলাস রাখা হয়েছে এজন্য যে আল্লাহ তা'আলা এই সূরায় বান্দাকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদত করতে আদেশ করেছেন। অন্য কোনো অংশীদার সাব্যস্ত করতে নিষেধ করেছেন।

এই সূরার শানে নুযূল

এই সূরা তখনই নাযিল হয়েছে, যখন আল্লাহ তা'আলা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা মুকাররমায় তাওহীদের বাণী প্রচার প্রসার করার আদেশ করেছেন। আপনারা জানেন সে সময়ে গোটা আরব এমন কি সারা পৃথিবীবাসী কঠিনভাবে প্রতিমা পূজায় লিপ্ত ছিল। মানুষ স্বহস্তে প্রতিমা নির্মাণ করে পূজা করত এবং এই সকল মূর্তিকে ভাবত সমস্যা সমাধানকারী, প্রয়োজন পূর্ণকারী, রিযিকদাতা সন্তানদানকারী আরোগ্যদানকারী, বিধাতা। সে অসংখ্য বানোয়াট প্রতিমাকে উপাস্য বানিয়ে সেগুলোর ইবাদত করত।

ইবাদতের যোগ্য শুধু আল্লাহ তা'আলা

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন একত্ববাদের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন তখন মানুষকে একথা বুঝানোর চেষ্টা করলেন যে, নিজ হাতে তোমরা যে মূর্তি বানাচ্ছো, তা কী করে সমস্যার সমাধানকারী হতে পারে? কীভাবে তোমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে? প্রয়োজন পূর্ণ তো তিনিই করবেন যিনি জগতসমূহের স্রষ্টা, যিনি তোমার এবং তোমার পূর্ববর্তীদের স্রষ্টা। আকাশ, বাতাস, নদ-নদী, পাহাড়-পবর্ত, চন্দ্র-সূর্য, সমুদ্র সবই তাঁর সৃষ্টি। সুতরাং তাঁরই ইবাদত করা উচিত। অন্য কারো নয়। আর لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর অর্থও এটাই যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। অতএব হে নবী! আপনি মক্কাবাসীর কাছে এই দাওয়াত পৌঁছে দিন।

মূর্খদের মূর্খতাসুলভ প্রশ্ন

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কাবাসীকে দাওয়াত দিলেন, তোমাদের স্রষ্টা এক আল্লাহ। তিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নন। তখন অজ্ঞ মুশরিকরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহ আবার কী বানিয়েছেন? তিনি কোন বস্তু বানিয়েছেন? স্বর্ণ, রৌপ্য না লৌহ? কারণ তাদের কল্পনায় খোদার আকৃতি ছিল পাথরের মূর্তির ন্যায়। পিতল ও লোহার তৈরী প্রতিমার ন্যায়।

খোদা তিনিই যিনি নির্মুখাপেক্ষি

কতক মূর্খ ও নির্বোধ জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহর বংশ পরিচয় কী? কেননা দুনিয়াতে যখন আমরা কারো সম্পর্কে জানতে চাই তখন সাধারণত জিজ্ঞাসা করি এ কার সন্তান? তার বাবা কে? তার দাদা কে? এভাবে আমরা বংশ পরিচয় জানি। তো আল্লাহর বংশ পরিচয় কী, তিনি কার সন্তান? মূর্খরা এমন প্রশ্ন করতে লাগল। কেননা এক হল সাধারণ বিবেকবান মানুষও এ কথা চিন্তা করে যে যদি আল্লাহ তা'আলা এই মূর্তিগুলোর মতো পাথর, পিতল স্বর্ণ কিংবা লোহা হন তাহলে তো তিনি খোদা হতে পারেন না। বরং খোদা তো তিনিই যিনি অমুখাপেক্ষী, সকল মানুষ তার মুখাপেক্ষী। যদি তিনি স্বর্ণ নির্মিত হতেন তাহলে তার অর্থ হলো যে আগে স্বর্ণ অস্তিত্বে এসেছে এরপর আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্বে এসেছেন। এরপর কেউ স্বর্ণ গলিয়ে আল্লাহর প্রতিকৃতি নির্মাণ করল আর আল্লাহর সত্তা প্রস্তুত হয়ে গেল। (নাউযুবিল্লাহ)। একজন সাধারণ মানুষও এটা বুঝতে পারে, কিন্তু তারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ জাতীয়

অবান্তর প্রশ্ন করত। এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা সূরা ইখলাস নাযিল করেছেন।

এই সূরা কোরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান

এক হাদীসে এসেছে একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে একত্র করে ইরশাদ করলেন, আজ আমি তোমাদের সামনে কোরআনে কারীমের এক-তৃতীয়াংশ তেলাওয়াত করব। যখন সকল সাহাবী একত্র হলেন তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করলেন। এরপর বললেন, এই সূরা কোরআনুল কারীমের এক-তৃতীয়াংশের সমান। এজন্য ফুকাহায়ে কেরাম এই হাদীস থেকে এই মাসআলা উদ্ভাবন করেন যে ব্যক্তি একবার সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করবে সে কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ তেলাওয়াত করার সওয়াব অর্জন করবে। সুতরাং বুঝা গেল যে সূরা ইখলাস তিনবার তিলাওয়াত করবে সে পূর্ণ এক খতম কোরআনের ছাওয়াব পাবে।

এর ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে

আপনি দেখে থাকবেন, ঈসালে ছাওয়াবের উদ্দেশ্যে যখন যিয়ারত করা হয়, তখন সালাম পেশ করার পর তিনবার قل هو الله পড়ে ঐ মৃত ব্যক্তিকে সওয়াব পৌছানো হয়। যেন কোরআন খতম করে সওয়াব পৌছানো হয়।

এক হাদীসে এসেছে, এক সাহাবী নামাযের মধ্যে অধিক পরিমাণে সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সূরা আমার অনেক প্রিয়। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, حبك اياها ادخلك الجنة এই সূরার প্রতি ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এ সূরার গুরুত্ব ও ফযীলত অসীম।

এই সূরা প্রয়োজন পূরণের মাধ্যম

এক হাদীসে আছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা সূরা ইখলাস পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। আরো বলেছেন, এই তিন সূরা–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

তিলাওয়াত না করে রাতে ঘুমাবে না। বিভিন্ন হাদীসে এই সূরার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এই সূরাগুলো যদিও সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক।

আল্লাহ এক অদ্বিতীয়

এখন সূরার তরজমা এবং উদ্দেশ্য বুঝুন। এই সূরার প্রথম আয়াত : قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। আপনি বলুন। অর্থাৎ যারা আপনার কাছে অনর্থক প্রশ্ন করে, আল্লাহ কী বানিয়েছেন? আল্লাহ তা'আলার বংশ পরিচয় কী? এ সকল লোকদের বলে দিন আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়।

أَحَدٌ (এক) শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর আরবীতে واحد শব্দটির অর্থও এক। কিন্তু উভয়ের মাঝে পার্থক্য আছে। আমাদের ভাষায় أَحَدٌ এবং واحد উভয়ের মাঝে বিভাজনের জন্য 'এক', এই অর্থ ছাড়া অন্য কোনো অর্থ নেই। পক্ষান্তরে আরবী ভাষা অনেক ব্যাপক বিস্তৃত। এ কারণে বলা হয় আরবীতে সমার্থক কোন শব্দ নেই, বরং প্রতিটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে।

أَحَدٌ এবং واحد এর মাঝে সূক্ষ্ম পার্থক্য

ভাষায় أَحَدٌ এবং واحد শব্দের মাঝে ভাষাগত পার্থক্য হলো যে, واحد শব্দটা احد এর বিপরীতে আসে। যেমন এক শব্দটি দুই, তিন, চারের বিপরীতে আসে। যদি বলা হয় আল্লাহ একজন। তখন তার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ একজনই দুইজন, তিনজন , চারজন, পাঁচজন না। সুতরাং এক-এর অতিরিক্ত কে নাকচ করার জন্য যেন واحد (ওয়াহেদ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আর احد (আহাদ) হল যার কোন অংশ নেই। যেমন একটা বস্তু যা দশটা বস্তু দ্বারা তৈরী হয়েছে। যেমন : একটা চেয়ার একে ওয়াহিদ বলবে কিন্তু আহাদ বলবে না। কেননা চেয়ার এটা কয়েকটা বস্তু মিলে তৈরী হয়েছে। কারণ এর পায়ের কাঠ, হেলান দেয়ার কাঠ, বসার কাঠ সব আলাদা। এজন্য চেয়ারকে ওয়াহিদ বলে, আহাদ বলে না। পক্ষান্তরে আহাদ এমন বস্তু তার তৈরীতে অপরিহার্য কোন বস্তুর সমন্বয় ঘটে না; বরং আহাদ হলো এক ও অদ্বিতীয়।

আল্লাহ বস্তু এবং অংশ থেকে পবিত্র

বলা হয়েছে যে, هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ তিনি আল্লাহ আহাদ। অর্থাৎ তিনি কোন বস্তু থেকে সৃষ্ট নন এবং তাঁর কোন অংশও নেই। যেমন তোমাদের প্রতিমাগুলো কোনটা স্বর্ণনির্মিত কোনটা রুপার তৈরী কোনটা পিতলের তৈরী। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কোনো অংশ নেই বরং তিনি তো এমন এক সত্তা, যিনি সকল সৃষ্টির স্রষ্টা। জগতে যা কিছু ছোট হোক কিংবা বড় হোক। সব আল্লাহ তা'আলার

সৃষ্টি। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা আহাদ। তাঁর কোন অংশ নেই। তিনি কোনো কিছুর সাথে যুক্ত নন বা সম্পর্কিত। অতএব এ প্রশ্ন অনর্থক যে আল্লাহ কিসের। বরং তিনি তো আহাদ।

তিনি নির্মুখাপেক্ষী

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আহাদ কেন? তাঁর অংশ নেই কেন? এজন্য যে, اَللّٰهُ الصَّمَدُ আল্লাহ সামাদ– صَمَدُ এমন শব্দ যে উর্দুতে তার সঠিক তরজমা করা বেশ মুশকিল। আপনি যদি কোরআনে কারীমের তরজমা খুলে দেখেন তাহলে দেখবেন যে صَمَدُ এর রূপক তরজমা করা হয়েছে। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, কিন্তু এই শব্দের মাধ্যমে صَمَدُ এর পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায় না। আরবী ভাষায় 'সামাদ, ঐ সত্তাকে বলে গোটা সৃষ্টি যার মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। অর্থাৎ মাখলুকের বিভিন্ন প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন সে অন্যের মুহতাজ হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী হন না। তার কোনো প্রয়োজন হয় না। বরং তিনিই সকলের কর্মবিধায়ক। এমন সত্তাকেই সামাদ বলে। (বলেছেন اَللّٰهُ الصَّمَدُ আল্লাহ তা'আলা সামাদ। অর্থাৎ সকলের সব প্রয়োজন তার কাছে। কিন্তু কারো কাছে তার কোনো প্রয়োজন নেই।)

আল্লাহ বস্তু নির্মিত নন

যেহেতু আল্লাহ তাআলা সকল প্রয়োজনের উর্ধ্বে। যদি ধরে নেয়া হয়, তিনি কোন বস্তু থেকে, উদাহরণস্বরূপ সোনা রুপা কিংবা লোহা নির্মিত, তাহলে তার উদ্দেশ্য হবে এই যে, অস্তিত্ব লাভে তিনি স্বর্ণের মুখাপেক্ষী। ধরুন, একটা স্বর্ণের অলংকার বানানোর জন্য প্রথমে স্বর্ণ অস্তিত্বে আসবে তাকে ছাঁচে ঢালা হবে তখন অলংকার তৈরি হবে, ঠিক তেমনিভাবে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে যদি বলা হয় যে তিনি স্বর্ণের তৈরী তখন তার উদ্দেশ্য হবে, আল্লাহ স্বর্ণের 'মুহতাজ। অথচ আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছুর মুহতাজ নন। সুতরাং একথা সাব্যস্ত হল আল্লাহ তা'আলা কোনো বস্তু থেকে সৃষ্ট নন।

প্রতিটি বস্তু তাঁর মুখাপেক্ষী

সকল সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী, এ জন্য সোনাও তার মুখাপেক্ষী। কেননা ঐ সোনা অস্তিত্বে আসতে পারে না যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাকে সৃষ্টি করেন। এজন্য খোদ সোনা তার সৃষ্টিতে আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি করার ফলে সোনা সৃষ্টি হয়েছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা তার পূর্ব থেকেই

অস্তিত্ববান। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা, স্বর্ণ, রুপা, লোহা, তামা, পাথর কিংবা অন্য কোন বস্তু নির্মিত নন। উদাহরণস্বরূপ, মানুষ হাড় মাংসে তৈরী। এজন্য মানুষ হাড় মাংসের মুখাপেক্ষী। যদি এই বস্তু না থাকে তাহলে মানব সত্তার বিনাশ ঘটবে। অতএব আল্লাহ তা'আলার হাড় মাংস, সোনা, রুপা, লোহা, তামা, কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। তিনি এমন সত্তা সকলে যার মুহতাজ, অথচ তিনি কারো মুহতাজ নন। الله الصمد এর অর্থ এটাই।

আল্লাহ্ তা'আলার কোনো পিতা নেই

সামনে বলা হয়েছে– لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ এটা মূলত ঐ লোকদের উদ্ভট প্রশ্নের উত্তর যারা বলে আল্লাহর বংশ পরিচয় কী? আল্লাহ্ তা'আলার বাপ দাদা কে? তাঁর সন্তান কে? বলা হয়েছে যে, না তিনি কারো দ্বারা জন্ম লাভ করেছেন। না তাঁর থেকে কেউ জন্মগ্রহণ করেছে। অর্থাৎ তাঁর কোনো পিতা নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন। কেন? এজন্য যে যেহেতু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সকলেই তার মুখাপেক্ষী। যদি বলা হয় তিনি কোন পিতার ঘরে জন্ম নিয়েছেন। তখন এর অর্থ দাঁড়ায় তিনি পিতার মুখাপেক্ষী হয়েছেন। কারণ সন্তান অস্তিত্বে আসার ক্ষেত্রে পিতার মুহতাজ।

আল্লাহর কোনো সন্তান নেই

এমনিভাবে তাঁর কোন সন্তান নেই। এর মাধ্যমে তিনি ঐ লোকদের কথা খণ্ডন করেছেন যারা আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে। যেমন খ্রিস্টানরা বলে যে হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র। যেহেতু পুত্র পিতার অংশ সুতরাং যখন আল্লাহ তা'আলা একথা বলে দিয়েছেন যে তার কোনো অংশ নেই, তিনি সকল বিষয় থেকে অমুখাপেক্ষী তাহলে আল্লাহর কোনো সন্তান হতে পারে না।

দুই খোদা হয়ে যায়

দ্বিতীয় কথা হলো এই যে, (আল্লাহর পানাহ) যদি আল্লাহর কোনো সন্তান থাকত তাহলে সেও খোদা হত কিংবা হত না। যদি সে খোদা হয়ে যেত তাহলে খোদা হত দুইজন। অথচ এক খোদার বেশী কল্পনা করা অসম্ভব। এই কারণে তাঁর সন্তান নেই। সুতরাং যারা তাঁর সন্তান সাব্যস্ত করেছে এই আয়াতের মাধ্যমে তাদের কথা নাকচ হয়ে গেছে لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ না তার কোনো সন্তান আছে, না তিনি কারো সন্তান।

কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়

সর্বশেষ বলেছেন– وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ তার না আছে কোনো অংশীদার, আর না আছে কোনো শরীক। অর্থাৎ তাঁর কোন সমকক্ষ নেই। তাঁর অনুরূপ কেউ নেই। যত প্রকার মাখলুক আছে প্রত্যেকের সদৃশ আছে। একজন মানুষের সমকক্ষ আরেকজন মানুষ পাওয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ, অংশীদার কোনটাই নেই। ইরশাদ হয়েছে, قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ বলে দিন আল্লাহ এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। না তিনি কারো সন্তান, না তার কোনো সন্তান আছে আর না আছে কোন অংশীদার।

ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য

এই সূরায় আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের গুণসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এখন বান্দার কাজ হলো সে যখন ইবাদত করবে তখন একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে। আল্লাহ ছাড়া অন্যকিছু মূর্তি, ফেরেশতা, ওলী কিংবা নবী। ইবাদত কারো জন্য নয়। শুধু আল্লাহর জন্য। এই ইখলাসের সূরা, যার মাঝে কোন শিরক ও শরীক ছাড়া একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে।

সমস্যা সমাধানকারী আল্লাহ তা'আলা

এই সূরায় বলা হয়েছে আল্লাহই 'সামাদ'। সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সমস্যার সমাধানকারী, মুশকিল আসানকারী, কর্মবিধায়ক হতে পারে না। প্রয়োজন তিনিই পূর্ণ করেন। সমস্যার সমাধান করবেন তাহলে তিনিই করবেন। বিপর্যস্ত করবেন তো তিনিই করবেন। এজন্য আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে এগুলোর কোন একটি বিশেষ বলা বা মনে করা যাবে না। কেননা এতে আল্লাহর সাথে শিরক হয়ে যাবে এবং আল্লাহর বিশেষ গুণে অন্যকে গুণান্বিত করা হবে। আমাদের সমাজে কিছু কথা কারো কারো ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। এটা সঠিক নয়। বড় থেকে বড় বুযুর্গের ব্যাপারে একথা বলে দেয়া যে তিনি সমস্যার সমাধানকারী। যেমন হযরত আলী রা. এর ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে। আল্লাহ হেফাজত করুন।

অপরকে সাহায্য করার তাওফীক আল্লাহর পক্ষ থেকে

অবশ্য উপায়-উপকরণ ও আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট। যেমন কেউ অসুস্থ ছিল আপনি তাকে সাহায্য করলেন, আসলে এ সাহায্য মূলত আপনি আল্লাহ তা'আলার তাওফীকে করেছেন। যদি আল্লাহ তা'আলার তাওফীক শামিলে হাল না হত তাহলে আপনি এই সাহায্য করতে পারতেন না। বান্দার সাধ্য নেই যে,

সে কাউকে সাহায্য করতে পারে। কোন নবী, ওলী, বুযুর্গের ব্যাপারে একথা বলা জায়েয নেই যে, তিনি মুশকিল আসানকারী, প্রয়োজনপূরণকারী, কার্য সম্পাদনকারী। (আল্লাহ হেফাজত করুন), এই কাজ মানুষকে শিরক পৌঁছে দেয়।

মৃত ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা করা শিরক

আমাদের সমাজে কিছু মানুষ কবরের সামনে গিয়ে মৃত ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা করে। বুযুর্গের কবরের কাছে গিয়ে বলে দাতাজ্বী আমাকে সন্তান দান করুন। দাতাজ্বী আমাকে চাকরি মিলিয়ে দেন। এভাবে গায়রুল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা সম্পূর্ণ হারাম। আল্লাহ হেফাজত করুন। এর মাঝে শিরকের আশঙ্কা আছে। পৃথিবীতে মানুষ একে অপরের কাছে সাহায্য চায়, এই মনে করে না যে সে আমার সমস্যা দূর করবে। বরং আল্লাহ তা'আলা একটা মাধ্যম বানিয়েছেন। শুধু এই মাধ্যমের ওপর ভিত্তি করে তার দিকে ফিরেছে। কিন্তু তাকে সত্তাগতভাবে প্রয়োজনপূর্ণকারী মনে করে না। এতে কোনো গুনাহ নেই। কিন্তু এই বিশ্বাস রাখা যে সে আমার সমস্যা সমাধানকারী কিংবা ইনি আমার প্রয়োজন পূর্ণকারী এই আকীদা পোষণ মানুষকে শিরকের নিকটবর্তী করে দেয়।

দেখুন! যারা মক্কার মুশরিক ছিল তারা বলত, আমাদের প্রতিমাগুলো আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করে এবং আমাদের সমস্যার সমাধান করে। আমাদের কার্যোদ্ধার করে। এ কারণে আমরা এগুলোর উপাসনা করেছি। এজন্য প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য এ সকল কাজ পরিহার করা। কেননা সূরা ইখলাসের শিক্ষা এই যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রয়োজনপূর্ণকারী, সমস্যার সমাধানকারী মনে করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে, আপন মহিমায় এর উপর যথাযথ ঈমান রাখা এবং সুদৃঢ় থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ –

সূরা লাহাবের তাফসীর

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَآ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ○ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ○ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ○ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ○ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ○آمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ- وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

অবতরণিকা

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! এটা সূরা লাহাব। ইতোমধ্যে আমি যা তিলাওয়াত করেছি, এটাও ঐ সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত যা অধিকাংশ মুসলমানের মুখস্থ আছে এবং নামাযে অধিক পরিমাণে তেলাওয়াত করা হয়। এখন এই সূরার ব্যাখ্যা প্রদান করার ইচ্ছা পোষণ করছি। আল্লাহ তা'আলা তার সন্তুষ্টি মোতাবেক সঠিক তাফসীর করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সূরার তরজমা

প্রথমে এই সূরার তরজমা শুনুন। এরপর তার শানে নুযুল, ব্যাখ্যা এবং তার থেকে প্রাপ্ত দিক-নির্দেশনা সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। সূরা লাহাবের তরজমা হলো এই, আবু লাহাবের হাত ভাঙ্গুক এবং ভেঙ্গে গেছে। তার ধন সম্পদ তার কোনো কাজে আসেনি এবং কাজে আসেনি তার উপার্জন। অচিরেই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রী, লাকড়ী বহনকারিণী। তার গলায় থাকবে পাকানো রশি।

সাফা পর্বতে ঘোষণা

তখন পর্যন্ত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করেন নি। বরং নিজ গৃহেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এই আদেশ আসল যে "আত্মীয়-স্বজন ও স্বগোত্রীয় লোকদের সতর্ক করুন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন। তখন তিনি এই আদেশকে কাজে পরিণত করলেন এবং গোত্রের লোকদেরকে সমবেত করলেন। মসজিদে হারামের নিকট একটি পাহাড় আছে যার নাম 'সাফা, হাজীরা এখান থেকেই 'সা'য়ী, শুরু করেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পর্বতে আরোহণ করে লোকদের উদ্দেশ্যে আওয়াজ দিলেন– وَاصباحاه জাহিলিয়াতের যুগে আরববাসীর মাঝে বিরামহীন কলহ বিবাদ, হত্যা ইত্যাদি লেগেই থাকত আর এক গোত্র ছিল অপর গোত্রের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। এ কারণে প্রতিটি গোত্র সব সময় এ আতঙ্কে থাকত, কখন যেন শত্রু আক্রমণ করে বসে।

وَاصباحاه এর ঘোষণা

আহলে আরবের রীতি ছিল যদি কোনো গোত্রের কোনো ব্যক্তি এ ব্যাপারে অবহিত হতে পারত যে, শত্রু আমাদের উপর আক্রমণ করতে চাচ্ছে। তখন যেহেতু মোবাইল ইন্টারনেট ছিল না, তাই প্রচার মাধ্যম হিসেবে কোনো উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে সতর্ক সংকেত রূপে গোত্রের লোকেরা সমস্বরে চিৎকার করত- وَاصباحاه যার উদ্দেশ্য ছিল ভয়াল প্রভাত আসছে। তোমরা এর জন্য তৈরী হও। সকালের উল্লেখ এজন্য যে, যেহেতু আক্রমণ হত সাধারণত সকালে। وَاصباحاه বাক্যটি আরবে প্রচলিত ছিল। যদি কোনো ব্যক্তি পাহাড়ে উঠে 'ওয়া ছাবাহাহ, ঘোষণা করত, তখন তার অর্থ দাঁড়াত যে শত্রুর হামলা সন্নিকটে। এজন্য গোটা সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে যেত একথা জানার জন্য যে, তুমি কোথেকে জেনেছ। কোন শত্রু আক্রমণ করবে।

শানে নুযূল

এই সূরার প্রেক্ষাপট ও শানে নুযুল এই যে, আবু লাহাব ছিল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা, তার আসল নাম ছিল আব্দুল উযযা। তাকে আবু লাহাব এজন্য বলা হতো যে তার চেহারা ছিল অগ্নিশিখার ন্যায় শুভ্রলাল। আরবী ভাষায় অগ্নিশিখাকে 'লাহাব' বলে। আবু লাহাবের অর্থ হলো 'শিখাময়, অর্থাৎ

শিখার অধিকারী। যেহেতু তার চেহারা ছিল শিখার মতো তাই তাকে আবু লাহাব বলে অবহিত করা হতো।

স্বগোত্রকে সতর্ক করুন

আত্মীয়তার সম্পর্কের থেকে যদিও সে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা ছিল কিন্তু শত্রুতায় ছিল সবচে এগিয়ে। তাই যখন হুযূরের উপর ওহী নাযিল হওয়া শুরু হলো এবং তিনি নবুওয়াত প্রাপ্ত হলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই মর্মে আদেশ করলেন যে,

وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ○ (سورة الشعراء)

অর্থাৎ "আপনার ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে সতর্ক করুন।" যদি তারা কুফর এবং শিরক না ছাড়ে এবং তাওহীদের প্রতি ঈমান না আনে তাহলে তাদের পরিণতি হবে বড়ই মন্দ। তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।

তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে?

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেহেতু এই পদ্ধতি জানা ছিল। তাই তিনি সাফা পর্বতের উপরে উঠে 'ওয়া ছাবাহাহ, বলে চিৎকার করলেন। বিভিন্ন গোত্র বিশেষত কোরাইশ গোত্রকে একত্র করার জন্য এই আওয়াজ করলেন। যখন লোকজন সমবেত হলো, তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরাইশদের সম্বোধন করে বললেন, হে কোরাইশ সম্প্রদায়! যদি আমি তোমাদেরকে বলি ঐ পাহাড়ের পিছনে একদল শত্রু আছে, যারা অচিরেই তোমাদের উপর আক্রমণ করবে। তোমরা কি আমার কথা মানবে? আমাকে বিশ্বাস করবে?

আমরা অবশ্যই তোমাকে বিশ্বাস করবো

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে চল্লিশ বছর অবস্থান করেছেন, মানুষ তাকে সর্বাবস্থায় দেখেছে এবং পরখ করেছে। আর তিনি মক্কা মুকাররমায় আলআমীন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সর্বদা সত্য বলতেন। কখনো মিথ্যা বলতেন না। আমানতদার ছিলেন। মানুষ তাঁর কাছে মাল গচ্ছিত রাখত কিন্তু তিনি কখনো খেয়ানত করেন নি। এ কারণে তখন সকলে একবাক্যে বলল যে কেন আমরা আপনাকে বিশ্বাস করবো না? অবশ্যই আমরা আপনাকে বিশ্বাস করবো। কেননা আপনাকে তো আমরা কোনোদিন মিথ্যা বলতে দেখিনি।

আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের ঘোষক হও

এর উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

فإني نذير لكم بين يدى عذاب شديد۔

আমি যখন তোমাদেরকে সংবাদ দিয়েছি যে পাহাড়ের আড়ালে শত্রু আছে, যারা তোমাদের উপর আক্রমণ করতে প্রস্তুত। তখন তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করেছ, এখন আমি তোমাদেরকে এরচেয়ে ভয়ানক শত্রু সম্পর্কে অবগত করতে চাচ্ছি। তা এই যে, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনো এবং মূর্তিপূজা ছেড়ে আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকার না করো তাহলে এখানের শত্রুর তুলনায় আখেরাতে আল্লাহর সামনে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। এরপর তাওহীদের বার্তা লোকদের সামনে বিশদভাবে পেশ করলেন। যদি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো, সত্যবাদী বলে জানো, তাহলে (আমি বলছি) আল্লাহ আমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন তোমাদেরকে অবগত করার জন্য এবং সংবাদ দেয়ার জন্য। তোমরা আমার কথা মেনে নাও। অন্যথায় তোমাদের ওপর কঠিন শাস্তি অবধারিত।

এই উদ্দেশ্যেই কি আমাদের ডেকেছ?

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর বক্তব্য পূর্ণ করলেন, তখন কতক লোক যারা সবসময় তাঁকে সত্যবাদী বলে জানত, তাদের মনে ঈমানের জন্ম হলো। ফলে তারা ঈমান আনলো। কিন্তু হুযূরের চাচা আবু লাহাব ঐ মজলিসে উপস্থিত ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, تبالك يا محمد! ألهذا جمعتنا؟ হে মুহাম্মাদ! তুমি ধ্বংস হও, বরবাদ হও, এই উদ্দেশ্যেই কি তুমি আমাদের ডেকেছ? আবু লাহাব হুযূরের কথা তো মানেই নি, উল্টো হুযুরকে অপমান করেছে এবং তার জন্য বদদোআ করেছে যে তুমি ধ্বংস হও। এরপর থেকে সে একের পর এক ফিকির করতে লাগল, কী করে হুযূরকে কষ্ট দেয়া যায়। যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের দাওয়াত দেয়ার জন্য, তাওহীদের প্রতি আহ্বান করার জন্য বের হতেন তখন সে হুযূরের পিছু নিত এবং বলে বেড়াত এর কথা শুনবেন না। এভাবে সে মানুষকে ঈমান থেকে বাধা দিত।

আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীলের কৃতকর্ম

অন্যদিকে আবু লাহাবের স্ত্রী ছিল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচী। তার নাম ছিল উম্মে জামিল। সেও তার স্বামীর মতো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উত্যক্ত করত। তার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন সে

জানতে পারত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও তাশরীফ নিচ্ছেন। তখন সে কাঁটাদার গাছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথে ছড়িয়ে দিত যাতে হুযুর কষ্ট পান।

নবীজীর নিকৃষ্ট শত্রু

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। নামাযে কোরআন তিলাওয়াত করতেন। কয়েকদিন হুযূরের স্বাস্থ্য খারাপ ছিল। তাই তিনি শেষ রাতে উঠতেন না। তখন উম্মে জামীল (নাউযুবিল্লাহ) এই অপবাদ দিল যে, মুহাম্মদের কাছে সে শয়তান আসা বন্ধ করে দিয়েছে। এই প্রেক্ষিতে সূরা দুহা অবতীর্ণ হয়েছে। এই উম্মে জামীল সে ছিল নবীজীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট শত্রু। স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলে হুযুরকে অনেক কষ্ট দিত। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সূরা লাহাব নাযিল করেন।

আবু লাহাবের উভয় হাত ভাঙ্গা

"ধ্বংস হোক আবু লাহাবের উভয় হাত।" পরে বলেছেন– وَتَبَّ অর্থাৎ সে ধ্বংস হয়ে গেছে। তার মৃত্যু পরোয়ানা জারি হয়ে গেছে। সুতরাং মনে করো যে সে হালাক হয়ে গেছে। বদর যুদ্ধে যখন মুশরিকরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আক্রমণ করেছিল, তখন আবু লাহাব নিজেকে বাঁচিয়ে তার স্থলে অন্য আরেকজনকে পাঠিয়েছিল। তার এই আশংকা ছিল যদি আমি বদর যুদ্ধে যাই, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ স্বীয় সাহায্য দ্বারা অনুগ্রহ করেন, তাহলে না জানি কোথায় আমি মারা পড়ি। যমের ভয়ে সে আর যুদ্ধে যায় নি। যদিও মক্কার বড় সর্দার আবু জাহ্‌ল, উমাইয়্যা ইবনে খলফ এবং উবাই ইবনে খলফ সেই লড়াইয়ে অংশ নিয়েছে। তারা সকলেই মারা পড়েছে। কিন্তু আবু লাহাব যায় নি বরং মক্কায় থেকে গেছে।

আবু লাহাবের ইহকালীন পরিণতি

কিন্তু তার পরিণতি এই হয়েছিল যে যখন লোকজন বদর যুদ্ধ থেকে ফিরে আসল, তখন চার মাস অতিক্রম না হতেই তার শরীরে প্লেগের গুটি দেখা দিল। আর প্লেগ এমন রোগ যখন তার আবির্ভাব ঘটে তখন গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। নিঃশেষ হতে থাকে গ্রামের পর গ্রাম। এ রোগকে আরববাসী প্রচণ্ড রকমের ভয় পেত। যদি কারো গায়ে প্লেগের গুটি দেখা দিত তখন তাকে ঘরে জায়গা দিত না। কেননা যদি সে ঘরে থাকে তাহলে অন্যান্যদের মাঝে এ রোগ

ছড়িয়ে পড়ত। এ জন্য তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হত, এমন কি কেউ তার খোঁজ নিত না। এই রোগে সকলের অজ্ঞাতসারে সে নির্মমভাবে মারা গেল। আফসোস তার পরিবারের লোকজনও তার কাছে উপস্থিত ছিল না। তার শরীর পচে গলে গিয়েছিল। যখন দুর্গন্ধ ছুটেছে তখন মানুষ গর্ত খুঁড়ে তাকে পুঁতে রেখেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন, (وتبّ) তো আল্লাহ তা'আলা জগতবাসীকে তার পরিণতি দেখিয়ে দিয়েছেন।

তার সম্পদ তার কাজে আসেনি

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ অর্থাৎ না তার সম্পদ তার কোনো কাজে এসেছে না তার উপার্জন তার কোনো কাজে এসেছে। এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এদিকে ইশারা করছেন যে, সে যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিচ্ছিল তখন কেউ তাকে বলল, আল্লাহর বান্দা একটু চিন্তা করো, সে সত্যবাদী মানুষ। জীবনে কোনোদিন মিথ্যা কথা বলেনি। সে যা বলছে এ ব্যাপারে যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে দেখো তোমাকে মরতে হবে। মৃত্যুর পর আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। অন্যদের মতো তোমারও শাস্তি হবে। আবু লাহাব সামান্য ভেবে বলল, ঠিক আছে, আমি তো তাকে মানি না। ধর যদি আমাকে আল্লাহর সামনে যেতে হয় এবং আমার উপর কঠিন শাস্তি চাপানো হয়, তো আমার ধন সম্পদ আছে। এত পয়সা আছে যা ব্যয় করে আমি আযাব থেকে বেঁচে যাবো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বললেন, না তার সম্পদ তার কোনো কাজে এসেছে, না তার কামাই। বরং সবকিছু ছেড়ে খালি হাতে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

পরকালীন পরিণতি

মানুষ দুনিয়ায় কত সম্পদ জমা করে কত বড় বিত্তশালী হয়ে যায়। কিন্তু যখন সে দুনিয়া থেকে যায় তখন খালি হাতে যায়। কাফনের কাপড় ছাড়া তার গায়ে কিছুই থাকে না। এভাবে আবু লাহাবের সম্পদ না তার কোনো কাজে এসেছে, না কাজে এসেছে তার উপার্জন। দুনিয়াতেই তার পরিণতি এমন হয়েছে, আখেরাতে না জানি কী হয়েছে? তার সম্পর্কে কোরআন বলছে– سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ অচিরেই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে। তার উপাধিও ছিল আবু লাহাব। আর আবু লাহাবের অর্থ অগ্নিশিখা। সে নিজেকে আবু লাহাব বলে গর্বিত হতো। তার পরিণতিও এমনই হবে তার উপর লেলিহান শিখা জ্বলবে।

তার স্ত্রীর পরিণতি

وَامْرَاَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ আর তার স্ত্রীও তার অনুগত হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষতি করার চেষ্টায় থাকত। সেও জাহান্নামী। এই মহিলা কাঁটাদার গাছপালা কুড়িয়ে হুযূরের চলার পথে বিছিয়ে রাখত যাতে হুযূরের কষ্ট হয়। এজন্য সে আখেরাতে উঠবে, তার মাথায় লাকড়ির বোঝা থাকবে। অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে, আল্লাহ তার মাথায় লাকড়ির বোঝা চাপিয়ে দেবেন। এ অবস্থায় সে জাহান্নামে অবস্থান করবে। আর আবু লাহাব যে আগুনে জ্বলছে সে আগুনে এই কাঠগুলো ইন্ধনরূপে ঢেলে দেয়ার জন্য তার স্ত্রীকে বাধ্য করা হবে। যাতে আগুন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। কেননা সাহাবায়ে কেরাম এবং নবীজীকে যুলুম নির্যাতন করার ক্ষেত্রে সে ছিল আবু লাহাবের সঙ্গিনী। শুধু যে সাহায্যকারী ছিল তাই নয় বরং সে সর্বদা হিংসানলে দগ্ধ হতো। এজন্য কেয়ামতের দিন তাকে বাধ্য করা হবে যে এই লাকড়ির বোঝা নিয়ে যাও। তোমার স্বামীর অগ্নিতে ঢেলে দাও। যাতে আগুন নতুন মাত্রা লাভ করে।

তার গলায় থাকবে দড়ির শৃঙ্খল

فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ তার গলায় থাকবে পাকানো রশি। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন একে তো সে দগ্ধ হবে তারপর আবার লাকড়ির বোঝা বহন করবে এবং তার গলায় থাকবে পাকানো রশি। এ অবস্থায় সে জাহান্নামে জ্বলতে থাকবে। এই সূরার ব্যাখ্যা এবং তরজমা এটাই। এই সূরায় আমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা এবং পথ নির্দেশনা। আগামী জুমায় এর বিশদ আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

কোরআনুল কারীমে তার মন্দ পরিণতির উল্লেখ

প্রসঙ্গক্রমে এ বিষয়টি উল্লেখ করা সংগত মনে করছি। দেখুন, কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের আলোচনা করেছেন। জাহান্নামের আলোচনাও করেছেন। ঈমানের আলোচনা করেছেন, কুফুরির আলোচনাও করেছেন। কিন্তু, ব্যাপকভাবে উল্লেখ করেছেন যে, মুমিনদের পরিণতি হবে এই। কাফেরদের পরিণতি হবে এই। তবে ব্যক্তি বিশেষের আলোচনা খুব কমই করেছেন। উদাহরণস্বরূপ ফেরাউন এবং তার উজির হামান, কারুন সম্পর্কে বলেছেন। কিন্তু যারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশমন ছিলো তাদের কারো নামই কোরআন উল্লেখ করেনি। তবে একমাত্র আবু লাহাবের নাম এবং তার পরিণতি এই সূরায় উল্লেখ করেছেন। আর এমনভাবে বলেছেন যে,

কিয়ামত পর্যন্ত কোরআনে এই সূরা পঠিত হবে। আর মানুষ তাকে অভিশাপ দিবে। আল্লাহ তা'আলা আবু লাহাবের এমন পরিণতি করেছেন যা অন্য কোনো কাফেরের করেন নি।

জেনে বুঝে সত্যকে অস্বীকার করার ফল

বাহ্যত, কোনো মানুষ ভুলে নিমজ্জিত সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু যে ব্যক্তি হকের দুশমন, জেনে শুনে হকের বিরোধিতায় লিপ্ত তার পরিণতি খুব ভয়াবহ। এমন মনে হয় যে সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা কোরআনে আবু লাহাবের কথা উল্লেখ করেছেন এ কারণে যে, তার শত্রুতা অন্যদের তুলনায় বেশী ছিল। সে হুযূরের চাচা ছিল। যার ফলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুব কাছ থেকে দেখেছে। হুযূরের প্রতিটি নড়াচড়া ছিল তার সামনে। স্বচক্ষে সে হুযূরের সততা দেখেছে। এতদসত্ত্বেও সে রাসূলুল্লাহর শত্রুতা করেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলাও তার এই পরিণতি করেছেন। দেখুন, মক্কার বড় বড় সর্দারদের নাম কোরআনে নেই। আবু জাহেলের নাম নেই, পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা এই সূরায় আবু লাহাবের নাম উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা তার ফযল ও করমে আমাদেরকে সত্যকে সত্য জেনে তার বিরোধিতা করা থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ—

এই ধন-সম্পদ কাজে আসবে না

সূরা লাহাবের তাফসীর (২)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَآ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ○ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ○ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ○ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ○ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ○ آمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ- وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

অবতরণিকা

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! আপনাদের সামনে আমি এখন তেলাওয়াত করলাম। গত জুমায় আমি আপনাদের খেদমতে তার তরজমা এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলাম। যার সারাংশ ছিল যে আবু লাহাব হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চরম শত্রু ছিল এবং বিভিন্নভাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়ার ফন্দি ফিকিরে থাকত।

সর্বমহলে দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি

রেওয়ায়েতে এসেছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করার জন্য আরবের বিভিন্ন বাজারে এবং মেলায় তাশরীফ নিতেন। আরবে উকায, যুল মাজায এবং যুল মুজনা নামক তিনটি প্রসিদ্ধ মেলা হতো। যেখানে গোটা আরববাসী এসে ব্যবসা-পণ্য ক্রয় বিক্রয় করত। গান বাজনা হতো, কাব্য চর্চা হতো। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য ঐ মেলাগুলোতে তাশরিফ নিতেন। কারণ এখানে সর্বশ্রেণীর মানুষ একত্রিত হত। একযোগে সকলকে ইসলামের বাণী পৌঁছানো সহজ। এ কারণে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে গমন করতেন এবং লোকজনকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا লোক সকল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু এই কালেমা বলো অর্থাৎ এক কথায় স্বীকার করো যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।

আবু লাহাব এবং তার স্ত্রীর অভ্যাস

বর্ণিত হয়েছে যে, এ সকল স্থানেও আবু লাহাব হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছু নিত। যখনই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন যে ইসলাম গ্রহণ কর, আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের স্বীকার কর, দেব-দেবীদের পরিত্যাগ কর। তখনই আবু লাহাব বলতো, কখনো এর কথা শুনো না। নাউযুবিল্লাহ। এতো নির্বোধ ও উন্মাদ। এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করতো। আর তার স্ত্রী হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিত।

সূরার তরজমা

আল্লাহ তা'আলা এই সূরার মধ্যে তাদের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন–

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

আবু লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হোক, আর সে ধ্বংস হয়ে গেছে।

مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

না তার সম্পদ তার কোনো কাজে এসেছে, না তার কামাই কোনো কাজে এসেছে।

سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান অগ্নিতে।

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

এবং তার স্ত্রীও প্রবেশ করবে, লাকড়ির বোঝা বহন করে।

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ

তার গলায় থাকবে পাকানো রশি।

প্রতিটি ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করা

যদিও এই সূরায় আবু লাহাবের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু তার থেকে কিছু শিক্ষা পাওয়া যায়। কেননা যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোরআন নাযিল করা হয়েছে এবং এর মাঝে যত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, এই ঘটনাগুলো শুধু এই উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়নি যে মানুষ শুনবে আর মজা পাবে। না প্রতিটি ঘটনায় কোনো না কোনো শিক্ষা রয়েছে। কোরআনের উদ্দেশ্য এটাই যে যখন মানুষ পড়বে তখন শিক্ষা লাভ করবে।

বদদো'আ অনুচিত

প্রথম কথা এই যে, এই সূরাটির সূচনা হয়েছে একটি বদদোআ দিয়ে।

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ۔

আবু লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হোক। এরপর বলেছেন, وَتَبَّ সে ধ্বংস হয়ে গেছে। এখানে বিষয় হলো যে বদ দোআ করার বিধান কী? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত বদদো'আ করতেন না। যথাসম্ভব এই চেষ্টা করতেন যাতে বদদো'আ না দিতে হয়। হ্যাঁ, ক্ষেত্রবিশেষ যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফিরদের পক্ষ থেকে মারাত্মক কষ্ট দেয়া হয়েছে, তখন তিনি এই দো'আ করেছেন যে, اللهم اهد قومی فإنهم لایعلمون আয় আল্লাহ আমার সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করুন। কেননা তারা না জেনে অজ্ঞতাবশতঃ এমন কাজ করছে।

আবু লাহাবের জন্য কেন বদদো'আ

এই কারণে উত্তম হলো, কেউ কাফের হোক বা মুশরিক কিংবা কোনো মন্দ কাজে লিপ্ত থাকুক তার জন্য হেদায়েতের দোআ করা। বদদোআ না করা। কিন্তু কিছু মানুষের ব্যাপারে এই ফায়সালা হয়েছে যে তারা হেদায়াত লাভ করবে না। তাদের ব্যাপারে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদদো'আ করেছেন। আর এই সূরায় আবু লাহাবের বিরুদ্ধে দোআ করা হয়েছে এই কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা জানতেন তার কপালে হেদায়েত নেই। এই লোক কুফুরি এবং শিরকের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। তাই তার জন্য বদদোআ করেছেন। শুধু এ ধরনের কয়েকটি স্থানে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বদদোআ করার বিষয়টি বর্ণিত আছে।

কতিপয় লোকের জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদদো'আ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে সকল বদদো'আ করা সাব্যস্ত আছে, তার মধ্যে কয়েকটি এরূপ : اللهم عليك بأبي جهل আয় আল্লাহ! আবু জাহালকে পাকড়াও করুন। এই পাকড়াও এর মাঝে সব ধরনের উদ্দেশ্য নিহিত। এ কথাও অন্তর্ভুক্ত যে, সে যত অন্যায় অনাচার, যুলুম, নির্যাতন করছে তা থেকে তাকে বিরত রাখুন। যাতে সে যুলুমের উপর সক্ষম না হয়।

কখনো বলেছেন, اللهم العنه আয় আল্লাহ! তাদের উপর অভিসম্পাত করুন। ঘটনা এই যে, বীরে মাউনার লোকজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আবেদন করল যে, আমরা কোরআন শিখতে চাই। আমরা ইসলামের শিক্ষা অর্জন করতে চাই। তাই আমাদের সাথে কিছুসংখ্যক লোক পাঠান, যারা আমাদেরকে কোরআন শিখাবে। এভাবে ধোঁকা দিয়ে হুযুরকে ভুলিয়েছে। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন পড়াতে সক্ষম এমন সত্তর জন সাহাবীর একটি বড় জামাত তাদের সাথে প্রেরণ করলেন। বাস্তবে তা ছিল একটি প্রতারণামূলক ষড়যন্ত্র। বড় নির্মমভাবে তারা সত্তরজন সাহাবীকে শহীদ করে। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনা সম্পর্কে অবগত হলেন তখন কুনুতে নাযেলার মাধ্যমে ঐ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদো'আ করলেন। যারা অন্যায়ভাবে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সাহাবায়ে কেরামকে হত্যা করেছিল, তাদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, اللهم العنهم মোটকথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহীর মাধ্যমে যাদের ব্যাপারে আল্লাহর লানতের কথা জানতে পেরেছেন শুধু তাদেরকে তিনি লা'নত করেছেন।

ব্যাপকভাবে বদদো'আ করা জায়েয

কিন্তু যার একথা জানা নাই যে, অমুক কীভাবে মৃত্যুবরণ করবে– ঈমানদার হয়ে না বেঈমান হয়ে– তার নাম নিয়ে বদদো'আ করা, অভিশাপ দেয়া মুনাসিব নয়। কার জানা আছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে হেদায়াত দান করবেন এবং তার ঈমান নসীব হবে। হ্যাঁ, ব্যাপকভাবে বদদো'আ করা যায়, তবে তা এভাবে যে, আয় আল্লাহ! যারা ইসলামের শত্রু তাদের অভিসম্পাত করুন। আয় আল্লাহ! যারা মুসলমানের শত্রু তাদের ধ্বংস ও বরবাদ করুন। এই জাতীয় শব্দ দিয়ে বদদো'আ করতে পারবেন যে, আয় আল্লাহ! তাদেরকে হেদায়াত করুন। যদি তাদের ভাগ্যে হেদায়াত না থাকে তাহলে তাদেরকে ধ্বংস করুন। এভাবে দু'আ করায় কোনো সমস্যা নেই। এই সূরা থেকে এই একটা মাসআলা উদ্ভাবিত হয়।

না কাজে এসেছে তার সম্পদ না তার উপার্জন

দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমাদেরকে পথ বাতলাচ্ছে তা সূরার এই অংশ– "না আবু লাহাবের সম্পদ তার কোনো কাজে এসেছে না তার কাজে এসেছে তার উপার্জন।" এখানে কুরআনুল কারীম দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছে– এক মাল, দুই কামাই। মালের মাঝে সব ধরনের মাল অন্তর্ভুক্ত। কেননা কোনো কোনো সময় মানুষ এমনভাবে ধন-সম্পদ লাভ করে যাতে তার কোনো শ্রম, চেষ্টা সাধনা ব্যয় হয় নি। উদাহরণস্বরূপ, সন্তান পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পেয়েছে, কিংবা কেউ উপঢৌকন হিসেবে অর্থ দিয়েছে।

আর কামাই হলো যা মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, কায়িক শ্রম ব্যয় করে উপার্জন করে। সুতরাং উভয়ের ব্যাপারে বলা হয়েছে না "তার ঐ সম্পদ কাজে এসেছে যা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, না কাজে এসেছে নিজ হাতে উপার্জিত সম্পদ।" সর্বশেষ সে লাঞ্ছিত হয়ে মৃত্যু বরণ করছে এবং অচিরেই সে আল্লাহ তা'আলার নিকট পৌছবে এবং জ্বলন্ত অঙ্গারে নিক্ষিপ্ত হবে।

ধন-সম্পদ সাময়িক সঙ্গী

এখানে আমাদের যে হেদায়াত দান করা হয়েছে তা এই যে মানুষ কখনো কখনো পার্থিব ধন-সম্পদের মোহে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে এবং সম্পদ উপার্জনকে সব কিছুর মূল মনে করে। আমার ব্যাংক ব্যালেন্স হবে, বাড়ি গাড়ি হবে, দিন রাত এই ঘোরে বিভোর থাকে। কোরআন কারীমের উক্ত আয়াত আমাকে আপনাকে এই ব্যাপারে সতর্ক করছে যে, দেখ! এই ধন-সম্পদ যা কিছু তুমি উপার্জন করেছ তা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমায় সঙ্গ দিবে। এরপর আর তোমার সঙ্গ দিতে পারবে না। তুমি যতই সম্পদ উপার্জন করো, মালের পাহাড় গড়ে তোল কিন্তু তুমি আল্লাহ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করেছ। তো সর্বশেষে যখন তোমার চক্ষু বন্ধ হয়ে যাবে, তুমি কবরে যাবে এবং আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়াবে তখন তোমার ঐ সম্পদ তোমার কাজে আসবে না। এই সম্পদ কিসের জন্য তুমি জমা করেছ। এ তো তুমি ওয়ারিছদের জন্য ছেড়ে চলে গেলে।

তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির সঙ্গী হয়

এক হাদীসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো মানুষের জানাযা নিয়ে রওয়ানা করা হয় তখন তিনটি বস্তু মৃতের সাথে যায়। এক. মৃতের আত্মীয়-স্বজন যারা তাকে দাফনের জন্য যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত তার মাল তার সাথে যাচ্ছে। (এখানে মাল দ্বারা উদ্দেশ্য পরিধেয় চাদর ইত্যাদি। কোনো কোনো অঞ্চলে তো এগুলো ছাড়া সম্পদও তার সাথে দিয়ে দেয়।) তৃতীয় হলো

তার আমল তার সাথে যায়। প্রথম দুই বস্তু কবর পর্যন্ত তাকে সঙ্গ দেয়। এরপর আত্মীয় স্বজন ফিরে আসে, সাথে তার মালও ফিরে আসে। শুধু থেকে যায় তার আমল। যদি আমল ভাল হয় তাহলে সামনের গন্তব্য হবে আরামদায়ক। ব্যবস্থাপনা হবে সন্তোষজনক। আর যদি আমল খারাপ হয় আল্লাহ হেফাজত করুন, কষ্ট আর বিপদ হবে তার সঙ্গী।

সম্পদ কতদিন ভোগ করবেন

মনে করুন, আপনি এই সম্পদ দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন তো কতদিন পর্যন্ত? হতে পারে এই সম্পদ আপনার কবর পর্যন্ত আপনাকে উপকৃত করছে। অথচ কোরআনে কারীম ইরশাদ করছে :

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ○ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ○ (سورة آل عمران ١٩٦-١٩٧)

কাফের মুশরিকরা পৃথিবীতে আস্ফালন করছে, "আর পার্থিব জীবনে তাদের ভোগ বিলাস যেন আপনাকে ধোঁকায় না ফেলে" এরা তো ভোগ বিলাস করছে, আনন্দ বিনোদন করছে, কিন্তু কতক্ষণ? মৃত্যু পর্যন্ত, ব্যস, এরপর ঠিকানা জাহান্নাম। তা বড়ই নিকৃষ্ট জায়গা।

প্রথমত কতদিন পর্যন্ত এই সম্পদ মানুষকে রক্ষা করবে? সবাই মালের পিছনে ছুটছে, হালাল হারামের বাছবিচার নেই, জায়েয নাজায়েযের পরোয়া নেই। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী এই সম্পদের জন্য কাটাকাটি করছে, মামলা করছে। আফসোস! যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে তখন সবই অন্যের জন্য রেখে যাবে।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) লিখেছেন, আগের দিনে মানুষ সম্পদ জমা করে মাটিতে পুঁতে রাখতো। এক ধনী লোক ছিল। সে মাটি খুঁড়ে একটি ধন-ভাণ্ডার বানায়। তাতে বিশালাকার দুটি আলমারী রাখে। সেই আলমারিতে সোনা রুপার ইট জমা করে রাখে এবং তাতে তালা মেরে এমন জাগায় চাবি রাখত যে, কেউ জানতো না। একবার ঐ ব্যক্তি তার ধন ভাণ্ডার পরিদর্শনের জন্য আলমারীর ভিতর প্রবেশ করল এবং ভিতর দিয়ে তালা মেরে দিল। মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং সেখানে তার মৃত্যু ঘটল। চাবির খোঁজ না থাকায় কেউ সেখানে ঢুকতে পারল না। ফলে নিজের ধন-ভাণ্ডারেই তার সমাধি রচিত হল।

টাকার নাম শান্তি

আমরা আজ টাকার নাম রেখেছি শান্তি এবং শান্তির উপকরণের নামও রেখেছি শান্তি। যার ফলশ্রুতিতে আমরা প্রকৃত শান্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। যদি আল্লাহ তা'আলা হালাল এবং জায়েয পন্থায় সম্পদ দান করেন তখন তাতে বরকত দেন। সম্পদ তার জন্য হবে স্বস্তিদায়ক, আর যদি বে-বরকত হয় তাহলে সম্পদের পাহাড়ও তার কোন কাজে আসবে না। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ না তার সম্পদ কোনো কাজে এসেছে, না কাজে এসেছে তার উপার্জন।

ঐ সম্পদ না দুনিয়াতে কাজে এসেছে না আখেরাতে

এই সম্পদ দুনিয়ায়ও কাজে আসেনি আখেরাতেও কাজে আসেনি। দুনিয়াতে এ জন্য কাজে আসেনি যে, শেষ জীবনে সে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। যার কারণে শরীরে পচন ধরে গিয়েছিল। বাড়ির লোকজন তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল। অথচ ঘরে তার ধন-সম্পদ সবই ছিল। আত্মীয়-স্বজন সবাই ছিল। কিন্তু সে অসহায়ভাবে ঘরের বাইরে একাকী পড়েছিল। এজন্য তার সম্পদ দুনিয়াতে কোনো কাজে আসেনি। আখেরাতে তো নিশ্চিত কোনো কাজে আসবে না। আর তার কামাই তো নাই-ই।

একমাত্র বৈধ সম্পদ কাজে আসবে

এই সূরা থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা এই যে, এই পৃথিবীতে ধন-সম্পদ যা কিছু আছে, যদি আপনি এর মাধ্যমে স্বস্তি পেতে চান, তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। যা কিছু উপার্জন করুন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মোতাবেক উপার্জন করুন। হারাম পথ পরিহার করুন। সুদ-ঘুষ-জুয়া থেকে বেঁচে থাকুন। ধোঁকা প্রতারণা বর্জন করুন।

এরপর যদি সামান্য সম্পদও অর্জন হয়। ইনশাআল্লাহ এর মধ্যেই বরকত হবে এবং দুনিয়াতেও কাজে আসবে আখেরাতেও কাজে আসবে। এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

نعم المال الصالح للرجل الصالح.

যে সৎ মাল, অর্থাৎ যে সম্পদ হালাল তরীকায় উপার্জন করা হয়েছে তা নেককার লোকদের জন্য উত্তম বস্তু। দুনিয়ায়ও কাজে আসবে, আখেরাতেও কার্যকরী হবে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে একথাগুলো বুঝার এবং তার ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ –

মক্কা বিজয়ের ঘটনা

সূরা নাসরের তাফসীর

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَآ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ○ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ○ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ○ وَصَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمِ-

সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! আমি এখন আপনাদের সামনে সূরা নাসর তিলওয়াত করেছি। এই সূরা নামাযে অধিক পরিমাণে পড়া হয়। প্রায় সকল মুসলমানের মুখস্থ আছে। এই সূরার বিশেষত্ব হল যে, এটা কুরআনুল কারীমে পূর্ণাঙ্গরূপে অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা একসাথে অবতীর্ণ। এরপর কোনো সূরা একসাথে অবতীর্ণ হয়নি। কিছু কিছু আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমন সূরা মায়েদার এই আয়াত–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ ○ (سورة المائدة)

এমনভাবে–

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ○ (سورة البقرة)

এটা সূরা বাকারার আয়াত যা এই সূরার পর অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সূরা যা সবার পর নাযিল হয়েছে তা সূরা নাসর। তারপর পরিপূর্ণ রূপে কোনো সূরা অবতীর্ণ হয়নি। এটাই এ সূরার বিশেষত্ব।

এই সূরার তরজমা

এই সূরায় একটি বড় সুসংবাদ ও মহান শিক্ষা রয়েছে। প্রথমে তরজমা বুঝে নিন।

এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং বিজয় অর্জিত হবে।

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا এবং আপনি দেখবেন যে, লোকজন দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে। فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের তাসবীহসহ প্রশংসা পাঠ করুন এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا নিঃসন্দেহে তিনি অনেক তাওবা কবুলকারী এবং বড় ক্ষমাকারী। এটুকু এই সূরার তরজমা।

খায়বার যুদ্ধের পর অবতীর্ণ সূরা

আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, এটা সর্বশেষ সূরা, যা পূর্ণাঙ্গরূপে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই বছর দুনিয়ায় ছিলেন। বিশুদ্ধ মত হল, এই সূরা খায়বার যুদ্ধের পর নাযিল হয়েছে। খায়বার যুদ্ধ সপ্তম হিজরীতে ইহুদীদের সাথে সংঘটিত হয়েছে। সে যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে ইহুদীদের উপর বিজয় দান করেছেন। খায়বার ছিল ইহুদিদের অঞ্চল। তারা সেখানে থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতো। এ যুদ্ধের পর সূরা নাসর অবতীর্ণ হয়।

মক্কা বিজয়ে সুসংবাদ

এই সূরায় ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সাহায্যকারী এবং বিজয় দানকারী। আর বিজয় দ্বারা ইশারা করা হয়েছে মক্কা বিজয়ের দিকে। এই সেই মক্কা মুকাররমা যার প্রশস্ত ভূমি মুসলমানদের জন্য ছিল সংকীর্ণ। যেখানে মুসলমানদের ওপর চলত যুলুম নির্যাতনের স্টিম রোলার। কোনো ব্যক্তি যদি কালিমায়ে তাওহীদ পড়ত, তাহলে তাকে তপ্ত বালুকায় শোয়ানো হতো এবং তার বুকে চাপা দেয়া হতো বড় বড় পাথর খণ্ড। তাকে কোড়া মারা হতো। সেই মক্কা মুকাররমা এখন রাসূলুল্লাহর হাতে বিজিত হবে। এরপর তিনি দেখবেন দলে দলে লোকজন আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে। দলবদ্ধ হয়ে কিংবা প্রতিনিধিরূপে হুযূরের দরবারে আসছে এবং মুসলমান হচ্ছে।

মক্কার সর্বশেষ পরিণতির অপেক্ষা

এমনই হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় সম্পন্ন করেছেন এরপর গোটা আরবের বিভিন্ন গোত্র দলে দলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনে প্রবেশ করে। কেননা আরবের গোত্রগুলোর একটি বড় সংখ্যা ছিল যারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোজেযা সম্পর্কে জানত এবং অনেক আগেই ইসলামের সত্যতা তাদের মনে গেঁথে ছিল। কিন্তু তারা মক্কার সর্দারগণ এবং সমগ্র আরবের শক্তি কোরাইশ গোত্রের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করতো না। তাদের আশঙ্কা ছিল যে যদি আমরা ইসলাম গ্রহণ করি, এর ফলে কুরাইশ এবং এখানকার বড় বড় সর্দাররা আমাদের উপর ক্ষেপে যায়। এ জন্য তারা অপেক্ষা করছিল যে, কুরাইশ এবং মক্কার অন্যান্য সর্দারদের কী পরিণতি হয়?

ফাতহে মক্কার পর ব্যাপক ক্ষমার ঘোষণা

যখন আল্লাহ তা'আলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা বিজয় দান করলেন। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারামে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম হযরত বেলাল (রা.)- কে বাইতুল্লাহর ছাদে দাঁড়িয়ে আযান দেয়ার আদেশ করেন। হযরত বেলাল (রা.) আযান দিলেন। বেলাল (রা.) এর আযানে মক্কা নগরী গুঞ্জরিত হল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রতিশোধ না নিয়ে কোন রক্তপাত না করে এই ঘোষণা দিলেন, যে ব্যক্তি মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। যে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে দিবে সেও নিরাপদ। যে হাতিয়ার রেখে দিবে সে নিরাপদ। যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। এভাবে সার্বজনীন ক্ষমার ঘোষণা দিলেন।

মক্কার বড় বড় সর্দাররা যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল, তাঁকে পাকড়াও করার পায়তারা করেছিল, যারা জনজীবনে মুসলমানদের কোণঠাসা করে রেখেছিল, তারা যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আসল তখন নবীজী বললেন :

لاتثريب عليكم اليوم انتم الطلقاء۔

আজ তোমাদের কোনো ধরপাকড় নেই। আজ তোমাদের থেকে কোনো প্রতিশোধ নেয়া হবে না। তোমরা সকলে স্বাধীন। তোমাদের জীবন নিরাপদ।

রহমাতুল্লিল আলামীন এর রহমতের অনুপম নিদর্শন

এটা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দান, যারা তেরটি বছর মুসলমানদেরকে যুলুমের যাঁতাকলে পিষল, যখন তাদের উপর কর্তৃত্ব কায়েম হলো তখন তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। তিনি না হয়ে অন্য কেউ হলে তাহলে মক্কায় রক্তগঙ্গা বইয়ে দিত। ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালাতো এবং বুক ফুলিয়ে প্রবেশ করতো। কিন্তু যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করলেন তখন তিনি উটের উপর সাওয়ার ছিলেন। গর্দান ছিল অবনমিত, চোখ থেকে অশ্রু অব্যাহত। আর যবান মোবারকে ছিল এই আয়াত :

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ○ (سورة الفتح)

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, "আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।" এই আয়াত পড়ছিলেন এবং সবাইকে নিরাপত্তা দিচ্ছিলেন। কারও থেকে প্রতিশোধ নেন নি। রাহমাতুল্লিল আলামীন এমন দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে যার কোন নজীর নেই। খুনের নেশায় উন্মাদ, নির্দয়তায় নির্মম, যুলুম নির্যাতনে যারা সিদ্ধহস্ত। তরবারির নিচে পেয়েও তাদের সাথে হুযূরের আচরণ ছিল এমনই।

ব্যাপক ক্ষমার ফলাফল, ইসলাম গ্রহণ

তার ফলাফল এই ছিল যে, সকল বড় বড় সর্দার যারা ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু ছিল তারাও ইসলামের সুশীতল ছায়ায় প্রবেশ করল এবং সাগ্রহে ইসলাম গ্রহণ করল। এবং সারকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য মেনে নিল। যারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেয় করে কবিতা রচনা করেছিল এবং হুযূরের শানে গোস্তাখি করেছিল তারাও হুযূরের কাছে এসে ক্ষমা চাইল এবং ইসলামে দাখিল হলো। আল্লাহ তা'আলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সম্মান দান করেছেন।

অন্যান্য আরব গোত্রের ইসলাম গ্রহণ

এরপর আরবের অন্যান্য গোত্র যারা চাতক পাখির তৃষ্ণা নিয়ে প্রতীক্ষার প্রহর গুণছিল যে মক্কার সর্দার এবং কুরাইশদের শেষ পরিণতি কী হয়? যখন তারা দেখল খোদ কুরাইশের লোকেরা পরাভূত হয়ে গেছে এবং তাদের অধিকাংশ ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে। তখন ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তাদের মনে যে সামান্য শঙ্কা ছিল যে ইসলাম গ্রহণ করবো কি করবো না। সে সংশয়টুকুও কেটে গেছে। এমন কি মক্কা বিজয়ের পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছলেন তখন আরব গোত্রগুলো দলে

দলে এবং প্রতিনিধি বানিয়ে হুযূরের দরবারে উপস্থিত হয়। শুধু ইয়ামান থেকে আগত একটি প্রতিনিধি দলের সদস্য সংখ্যাই ছিল ৭০০ (সাতশত)। সাতশত সদস্য এসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বায়আত হলো এবং ইসলাম গ্রহণ করল।

সূরা নাসর অবতীর্ণ হওয়ার সময় সাহাবাদের (রা.) আনন্দ

খায়বার যুদ্ধের পর কোরআন যে নকশা এঁকেছিল যে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য আসবে, মক্কা বিজয় হবে এবং তোমরা স্বচক্ষে দেখবে মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছে। এই দৃশ্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক আগেই দেখানো হয়েছিল। যেহেতু এই সূরায় ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে অচিরেই মুসলমানগণ এক মহান বিজয় লাভ করবে এবং আরব উপদ্বীপের লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে। এজন্য যখন এই সূরা অবতীর্ণ হলো এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে তেলাওয়াত করে শোনালেন তখন তাঁরা বড় আনন্দিত হলেন। হযরত সিদ্দিকে আকবার, হযরত ওমর ফারুক (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীগণ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন যে, আল্লাহ তা'আলা এই সুসংবাদ দিয়েছেন যে, অচিরেই ইসলামের এক মহান বিজয় অর্জিত হবে।

তাঁর বিদায়ের সময় সন্নিকটে

কিন্তু হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস (রা.) এই ঘটনায় আনন্দিত না হয়ে কাঁদতে লাগলেন। হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন কী হয়েছে? আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, এই সূরা আপনার বিদায়ের বার্তা নিয়ে এসেছে। এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন যাতে ইসলামের জয় হয়। মুসলমানগণ বিজয়ী হয় এবং ইসলাম দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। আর আল্লাহ তা'আলা এই সূরার মধ্যে বলেছেন অচিরেই ঐ সময় আসবে। অর্থাৎ আপনার পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। আর যখন উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে, তো নিশ্চিত আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বেশীদিন তাঁর থেকে দূরে রাখবেন না। আপনাকে তাঁর কাছে ডেকে নিবেন। যার ফলশ্রুতিতে আপনাকে প্রশংসা, তাসবীহ এবং ইস্তেগফারের নির্দেশ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, আপনার দুনিয়া ত্যাগের সময় খুবই নিকটে। এ জন্য আমি কাঁদছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। এই সূরায় ঘটনাক্রমে ঐ ইঙ্গিত বিদ্যমান সে সময় ঘনিয়ে আসছে যখন আমি দুনিয়া ছেড়ে

চলে যাবো। কেননা আমার আগমনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে এবং এর ধারা ক্রমবর্ধমান রয়েছে। আরব উপদ্বীপে ইসলামের বিজয় ধ্বনি গুঞ্জরিত হচ্ছে। এটাই ছিল আমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য।পরবর্তীতে হযরত ওমর ফারুক, আবু বকর সিদ্দীক (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) একই কথা বললেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সত্যায়ন করলেন।

তাসবীহ, প্রশংসা এবং ইস্তেগফারের আধিক্য

একবার হুযূরকে এই হুকুম দেয়া হয়েছে যে, সূরা নাসরের তৃতীয় আয়াত অর্থাৎ যখন আপনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য এবং বিজয় প্রত্যক্ষ করেছেন তখন আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা, তাসবীহ এবং ইস্তেগফারে নিরত থাকুন। কেননা আপনার আগমনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে এবং আপনি আপনার দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন। এখন আপনি আল্লাহভিমুখী হোন এবং হামদ, তাসবীহ ও ইস্তেগফার করুন।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে সেজদায়, রুকুতে অধিক পরিমাণে এই দু'আ পড়তেন, سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك কেননা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সূরায় বলাই হয়েছে তাসবীহ পড়ুন। তার অনুকরণে سبحانك اللهم পড়তেন। নির্দেশ দেয়া হয়েছে প্রশংসা করুন। তার আমলে وبحمدك পড়তেন। বলা হয়েছে যে, ক্ষমা প্রার্থনা করুন। হুকুম তা'মীলে واتوب اليك পড়তেন।

সিজদায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাসবীহ

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত সিজদায় سبحان ربي الاعلى পড়তেন। একবার আমি দেখেছি যে, সেজদায় তিনি سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك পড়ছেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এই কালেমা কেন পড়লেন? তিনি বললেন, আমার প্রতিপালক, আমার রব আমাকে সূরা নাসরের মাধ্যমে এই কালেমা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি তাঁর উপর আমল করছি। এটাই হলো এই সূরার সারাংশ। এই সূরায় আমাদের জন্য কিছু শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তা বুঝার এবং তার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কামিয়াবী আল্লাহর মদদে হয়

প্রথম সবক এই যে, এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা দুটি শব্দ পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং বিজয় আসবে। যদি এমন বলতেন যে إِذَا جَاءَ الْفَتْحُ যখন মক্কা মুকাররমার বিজয় অর্জিত হয়ে তখন এই কাজ করো। এটাও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা দুটি শব্দ উল্লেখ করেছেন। এক সাহায্যের, দুই বিজয়ের। এতে এই কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, যখন কোনো মানুষ সফলতা লাভ করে, বিজয় অর্জন করে, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে তখন তার একথা মনে রাখা চাই যে, যা কিছু প্রাপ্তি এতে আমার কোনো দখল নেই। বরং এটা আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এবং নুসরত। إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং বিজয় আসবে। একজন মুমিনের শান এটাই যে, যখন সে কোনো কাজে সফল হবে তখন তাকে নিজের কারিশমা বলবে না। এটা মনে করবে না যে, একটা বড় কাজ আঞ্জাম দিয়েছি, বিরাট কীর্তি গড়েছি। বরং সকল কৃতিত্ব আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করবে। আমার আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন। আমার আল্লাহ আমাকে তাওফীক দান করেছেন।

সফলতার চাবিকাঠি আল্লাহ তা'আলার হাতে

এই শিক্ষা শুধু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেয়া হয় নি বরং কেয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা সকল মুসলমানকে দেয়া হয়েছে। হে মুমিন! জীবনের কোন বাঁকে সফলতার হাতছানি পাও তাহলে সেটাকে আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ও তাঁর সাহায্যরূপে গ্রহণ করো। এ কথা স্মরণ করো যে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও তাওফীক ছাড়া সফলতা অসম্ভব। চাই সে সফলতা যুদ্ধ জয়ের আকৃতিতে হোক কিংবা স্বীয় চেষ্টার ফলস্বরূপ হোক। যেমন, কোনো মানুষ চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে তো চাকরি মিলে গেলো, কিংবা কোনো ব্যক্তি ঋণে জর্জরিত তার ঋণ পরিশোধ হয়ে গেল। কোনো ব্যক্তির প্রমোশন প্রয়োজন, সে প্রমোশন লাভ করল তো এই ফলাফলকে স্বীয় মেহেনতের ফল মনে না করে আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ও তাঁর সাহায্যের দিকে সম্পৃক্ত করা, উচিত একথা ভাবা যে, আল্লাহ তা'আলার ফযলে করমে এই কাজ হয়েছে।

ক্রিয়া সৃষ্টিকারী আল্লাহ তা'আলা

এটা কোনো আকীদামূলক কথা নয় বরং বাস্তবতা এটাই। কেননা মানুষ শুধু উপায় উপকরণ একত্র করতে পারে। কিন্তু এই উপকরণের ক্ষমতা সৃষ্টি করা

আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো কাজ নয়। যেমন, আপনি অসুস্থ হয়েছেন এবং চিকিৎসাও শুরু করেছেন। অষুধ খাচ্ছেন এবং ঐ অষুধের বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা আরোগ্য দান করেছেন। বাহ্যত যদিও ঐ অষুধের মাধ্যমে আপনি উপকৃত হয়েছেন, আরোগ্য লাভ করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, ঐ অষুধের কোনো ক্ষমতা নেই। যদি আল্লাহ তা'আলা তাতে ক্রিয়া সৃষ্টি না করেন এ কারণে কখনো কখনো আপনি হাজারো ট্যাবলেট গিলেন এবং বছরের পর বছর ডাক্তারের পিছনে ছুটেন, কিন্তু রোগমুক্তির কোনো লক্ষণই দেখেন না।

কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে, একই রোগ, অষুধও এক, কিন্তু একজন খেলে সুস্থ হয়ে যাচ্ছে, অন্যজনের কোনো উপকারই হচ্ছে না। এজন্য যদি আরোগ্য লাভ হয় তাহলে তার নিসবত আল্লাহ তা'আলার দিকে করা ডাক্তারের দিকে না করা এবং প্রার্থনা করা যে, আল্লাহ আপনার ফযল ও করমে আমাকে আরোগ্য দান করেন এবং এই ঔষধে ক্ষমতা দান করেন। আমীন।

গ্রাহক আল্লাহ তা'আলাই পাঠান

আপনি দোকান খুলে বসে গিয়েছেন, ব্যস্ আপনি শুধু এতটুকুই করেছেন যে, দোকান খুলেছেন এবং মাল সামান রেখে দিয়েছেন। কিন্তু এখন দেখুন গ্রাহক কে পাঠান? মনে করেন যে দোকান খুলে বসে পড়লেন, মাল সাজালেন এবং প্রচারও করলেন। কিন্তু কোনো গ্রাহকই আসল না। তখন গালের উপর হাত রেখে বসে থাকবেন। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তা'আলাই গ্রাহকদের অন্তরে একথা ঢেলে দেন যে যাও তার থেকে মাল খরিদ করো।

আজ ছুটি কাটাই

আমার ভাই মরহুম যাকী কাফী সাহেব, লাহোরে ইদারায়ে ইসলাম নামে তার একটি দ্বীনী কুতুবখানা ছিল। তিনি বলেন, একবার লাহোরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। প্রবল বর্ষণের কারণে রাস্তায় পানি জমে যায় এবং যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আমার মনে হলো, এই ঝড় বাদলের দিনে কে ঘর থেকে আসবে ধর্মীয় পুস্তক কিনতে। আর বিশেষ প্রয়োজনে বের হলেও বাজার করে ঘরে ফিরে যাবে। আজ দোকানে যাবো না। ছুটি কাটাবো।

আমার আল্লাহই তাকে পাঠিয়েছেন

যেহেতু বুযুর্গদের ছোহবতে থেকেছেন, এজন্য বলেন, অতঃপর আমার মনে ভিন্ন চিন্তা এলো যে, প্রথম যে খেয়াল এসেছে এটা শয়তানি খেয়াল। আরে দোকান থেকে রুযি রোজগার হয় না। কামাই রোজগার তো আল্লাহ দান

করেন। আমার কাজ হলো দোকান খুলে বসে যাওয়া। গ্রাহক পাঠানো অন্য কারো কাজ। যদি তিনি চান তাহলে পাঠাবেন। অন্যথায় পাঠাবেন না। আমি ছাতা মেললাম এবং পানি ভেঙ্গে কয়েক ঘন্টার মেহনতে দোকানে গিয়ে পৌছলাম এবং বসে চিন্তা করলাম, গ্রাহক না আসে তাহলে তিলাওয়াত করি। অতএব কোরআন তিলাওয়াত শুরু করে দিলাম। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় লোকজন আসতে লাগল। এসে কিতাব ক্রয় করছিল। আমি চিন্তা করলাম, এই ব্যক্তির এই বৃষ্টির মধ্যে কিতাব ক্রয়ের কী প্রয়োজন দেখা দিল যে, সে কিতাব কেনার জন্য এখানে এসেছে? কিন্তু আমার রুযির সামান তৈরি করার জন্য তাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

মানুষের কাজ চেষ্টা করা

যাই হোক! দুনিয়ার এমন কোনো কাজ নেই সর্বশেষ যার তাওফীক এবং তাছীর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয় না। মানুষের কাজ চেষ্টা করা। এ কারণে যখন কোনো কাজে সফল হও তখন মনে করো যে, এই সফলতা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। আল্লাহর সাহায্যে এসেছে এবং আল্লাহর তাওফীকে সম্পন্ন হয়েছে। এ শিক্ষাই দিচ্ছে إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ আয়াতটি। যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং বিজয় আসবে তো এরপর এই এই কাজ করো। এই সূরা থেকে আরো কিছু সবক হাসিল হয়। হায়াতে থাকলে ইনশাআল্লাহ আগামী জুমায় আলোচনা করবো। আল্লাহর ফযল ও করমে আমাদের আমল করার তাওফীক দান করুন আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ –

আল্লাহর শোকর নেয়ামত বৃদ্ধির মাধ্যম

সূরা নাসরের তাফসীর (২)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَآ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ○ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ○ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ○ آمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

অবতরণিকা

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! গত জুমায় আমি সূরা নাসরের তাফসীর শুরু করেছিলাম। যার সারমর্ম ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলা এই সূরার মাঝে হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুসংবাদ দিয়েছেন অচিরেই মক্কা বিজয় সংঘটিত হবে এবং লোকজন দলে দলে আপনার দ্বীনে প্রবেশ করবে। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের করণীয় কী হবে? সে সম্পর্কে বলছেন, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলার সাহায্য আসবে এবং মক্কা বিজয় হবে, লোকজন দলে দলে আল্লাহ তা'আলার দ্বীনে প্রবেশ করবে। তখন আপনি আপনার রবের হামদ-ছানা ও তাসবীহে ব্যাপৃত থাকুন এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখেন।

হুযূরের বিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসছে

আমি গত জুমায় বলেছিলাম, যখন এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে তখন হযরত আব্বাস (রা.) কাঁদছিলেন। তাঁর ক্রন্দন দেখে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, এই সূরা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, দুনিয়া থেকে আপনার বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন তাঁর দ্বীন প্রচারের জন্য। যেহেতু এই সূরায় বলা হয়েছে অচিরেই সে সময় আসবে যখন দ্বীন বিস্তৃতি লাভ করবে এবং মানুষ দলে দলে ইসলামে দাখিল হবে। এর উদ্দেশ্য হলো যে, আপনার দুনিয়ায় আগমনের লক্ষ্য পূর্ণতা লাভ করবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাঁর সান্নিধ্যে নিয়ে যাবেন। তিনি হযরত আব্বাস (রা.) কথার সত্যতা স্বীকার করেন।

কামিয়াবী আল্লাহর সাহায্যে হয়

এই সূরা থেকে আমাদের বাস্তব জীবনে দুটি বড় বড় শিক্ষা লাভ হয়। প্রথম শিক্ষা যা আমি গত জুমায় আলোচনা করেছিলাম। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং বিজয় লাভ হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলতে পারতেন, إِذَا جَاءَ الْفَتْحُ যখন মক্কা মুকাররমা বিজয় হবে তখন আপনি এই কাজ করুন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা نَصْرُ اللهِ শব্দ যোগ করে এই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করছেন যে, দুনিয়াতে যত সফলতা অর্জিত হয় তা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে হয়। কারো শক্তিমত্তায় হয় না। আল্লাহর সাহায্য আসবে, বিজয় অর্জিত হবে। আল্লাহর সাহায্য আসবে না, বিজয়ও অর্জিত হবে না। এর মাধ্যমে এই কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, যখন কোনো মানুষ কৃতকার্য হবে তখন তার এটা ভাবা উচিৎ যে আল্লাহর সাহায্যে কৃতকার্য হয়েছি। এই সূরা থেকে অর্জিত একটি শিক্ষা তো এই।

কামিয়াব হওয়ার পর করণীয়

এই সূরা থেকে দ্বিতীয় শিক্ষা আল্লাহ তা'আলা হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যার নির্দেশ দিয়েছেন। فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ অর্থাৎ যখন এই সাহায্য আসবে তখন আল্লাহর তাসবীহ করুন। আল্লাহর প্রশংসা করুন। আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করুন। তাঁর শুকরিয়া আদায় করুন। দুটি কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক তাসবীহসহ প্রশংসা করা, দুই ইস্তেগফার করা। এর মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে, মানুষ যখন কোনো কাজে সফল হবে, তখন একথা না বলা যে, শক্তি বলে হয়েছে বরং আল্লাহর প্রশংসায় নিরত হওয়া যে আয় আল্লাহ! আপনার শোকর যে আপনি নিজ ফযল ও করমে এই সাহায্য করেছেন।

সফলতার উপর বড়াই করা অহংকারের আলামত

এ জন্য ইহকালে যত, নেয়ামত, আরাম, শান্তি-খুশি আনন্দের মুহূর্ত আসবে সর্বাবস্থায় আসমানী শিক্ষা এটাই যে, যে আল্লাহর প্রশংসা কর এবং আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলার কৃতজ্ঞতা আদায় কর। এর মাধ্যমে একথার স্বীকারোক্তি হবে যে যা কিছু হয়েছে আল্লাহ তা'আলার তাওফীকে হয়েছে। আর শুকরিয়া এমন একটা বিষয় যা মানুষের অন্তর থেকে অহংকারের জড় সমূলে উৎপাটন করে ফেলে। যে ব্যক্তি নিজের শক্তি, ক্ষমতা এবং চেষ্টা সাধনার উপর নির্ভর করে সে ব্যক্তি সফল হওয়ার পর মনে করে যে আমি তো কাজের কাজ করে ফেলেছি। ঘুঁটিটা ঠিক মতোই চাল দিয়েছি। এই ধ্যান ধারণা তার মনে অহং ও অহমিকার জন্ম দেয়, যার ফলে সে অবজ্ঞা করে।

মক্কা প্রবেশের সময় হুযূরের অবস্থা

কিন্তু যে বান্দা সফলতার উপর আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলার শোকর আদায় করে এবং বলে, আয় আল্লাহ! যা কিছু হয়েছে তা আপনারই দান। আপনার অনুগ্রহ ও মহানুভবতা, আপনারই তাওফীক আর যে বান্দা আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে অহংকার তার কাছেও ভিড়তে পারে না। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে যে, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ীরূপে মক্কা মোকাররমায় প্রবেশ করছিলেন এক সাহাবী বলেন, সে দৃশ্য আমার এখনো মনে পড়ে। আমি যেন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটনীর উপর আরোহণ করে সেই মক্কায় প্রবেশ করছেন যেখানে তেরটি বছর তাঁকে এবং তাঁর সাহাবীদেরকে যুলুম নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষ্ট করা হয়েছে। যুলুম নির্যাতনের এমন কোনো প্রকার ছিল না যা তাদের উপর প্রয়োগ করা হয়নি। এমন লোকদের উপর বিজয়ী হয়েছেন যারা অহমিকা, আত্মম্ভরিতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। অন্য কেউ হলে ঘাড় উঁচিয়ে বুক ফুলিয়ে انا ولا غير (আমিই অন্য কেউ নয়) হুংকার দিয়ে প্রবেশ করত এবং বিজয় উল্লাসে উল্লসিত হয়ে বিজয়সঙ্গীত বাজিয়ে প্রবেশ করত। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা মোকাররমায় প্রবেশ করছিলেন, তখন তিনি উটের উপর সওয়ার ছিলেন। মাথা মোবারক এত ঝুঁকে ছিল যে, থুতনি সীনা মোবারকের সাথে লেগে যাচ্ছিল। চোখ থেকে অবিরাম অশ্রু ঝরছিল এবং যবান মোবারকে জারি ছিল– انا فتحنا لك فتحا مبينا আল্লাহ তা'আলা যে ওয়াদা করেছিলেন "আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করবো," এ কথা স্মরণ করে একেবারে ছোট হয়ে নিজের অক্ষমতার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটিয়ে মক্কায় প্রবেশ করছিলেন।

মক্কাবাসীদের জন্য নিরাপত্তার পয়গাম

এ আচরণের মাধ্যমে জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন বিজয়ী বীরের জন্য এক অনুপম দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন যে, একজন বিজয়ী তার বিজিত অঞ্চলে কীভাবে প্রবেশ করবে। ঘাড় উঁচিয়ে বুক ফুলিয়ে নয়, বরং অবনত মস্তকে, প্রশান্ত চিত্তে, অক্ষমতার প্রকাশ ঘটিয়ে আল্লাহ তা'আলার শোকরিয়া আদায় করে প্রবেশ করবে। সেদিন অন্য কেউ হলে মক্কা মোকাররমায় রক্তের নদী বইয়ে দিত। কিন্তু হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা জগতবাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। এজন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে প্রবেশ করেছেন এবং গোটা মক্কাবাসীর নিরাপত্তা বিধান কায়েম করেছেন। ঘোষণা দিয়েছেন যে ব্যক্তি নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিবে সে নিরাপদ, যে তরবারি রেখে দিবে সে নিরাপদ, যে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। যদিও আল্লাহ তা'আলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই অনুমতি দিয়েছিলেন যে, আপনি চাইলে রক্তপাত ঘটাতে পারেন। এরপরেও যেহেতু হারামের মূল বিধান হলো– ومن دخله كان آمنا "যে তাতে (হারামে) প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।" তাকে হত্যা করা না জায়েয। কিন্তু মক্কার জন্য আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুমতি দিয়েছিলেন যে, যদি আপনি চান তো প্রয়োজন সাপেক্ষে কাফেরদের হত্যা করতে পারেন। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অনুমতি এবং ছাড়ের ওপর আমল করেন নি এবং মক্কা মোকাররমায় এক ফোঁটা রক্তও ঝরাননি। যে পথ দিয়ে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) প্রবেশ করেছেন সেদিকে সামান্য রক্তপাত ঘটেছে। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করেছেন যেদিক দিয়ে সেদিকে কোনো রক্তপাত ঘটেনি। আর এভাবেই মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়েছে।

আনন্দের মুহূর্তেও আল্লাহভিমুখী থাকা

আল্লাহ তা'আলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ এই অবস্থায় (বিজয়ের মুহূর্তে) "আপনি আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করুন এবং আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনা করুন।" হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চলা, বলা এবং সকল কাজের মাধ্যমে এর পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যেমন গত জুমায় বলেছিলাম যে, উক্ত নির্দেশ আসার পর হুযুর রুকু, সেজদায় খুব বেশী পরিমাণে এই তাসবীহ পাঠ করতেন سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك ইয়া আল্লাহ! আপনার প্রশংসা, আপনার হামদ এবং আপনার কাছে ইস্তেগফার করছি। আপনার দিকে রুজু হচ্ছি। এর মাধ্যমে আমাদেরকে শিক্ষা দেয়া

হচ্ছে যে, সাফল্যটা বড় হোক বা ছোট, কিংবা বৃহৎ বা ক্ষুদ্র নেয়ামত অর্জিত হোক, দুঃখের বা সুখের সর্বাবস্থায় সর্ব মুহূর্তে বান্দার কাজ হলো আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করা এবং বলা যে, আয় আল্লাহ! আপনার শোকরিয়া আদায় করছি। আপনি আমাকে এই কাজ করার তাওফীক দান করুন।

শুকরিয়া আদায় করার মাধ্যমে নেয়ামতে বৃদ্ধি ঘটে

আল্লাহ তা'আলার শোকরিয়া আদায় করা এমন কাজ যার উপকার দুনিয়াতে ও আখেরাতে, শারীরিকভাবেও আত্মিকভাবেও এত বেশী যে, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। শোকর আদায়ের উপর তো আল্লাহ তা'আলা কোরআনে বলেছেন–

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ "যদি তোমরা শোকরিয়া আদায় করো তাহলে আমি তোমাদেরকে অসংখ্য নেয়ামত দান করবো।" وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ "আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে মনে রেখ আমার আযাব বড়ই কঠিন। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের মধ্যে বলেছেন, শোকরগোযার হলে তার নেয়ামতসমূহে আরো উন্নতি দান করবেন। এজন্য দুনিয়ার বিচারে শোকর আদায়ের উপকার এই যে, যে বিষয়ের উপর আপনি শোকরিয়া আদায় করবেন আল্লাহ তা'আলা তাতে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করবেন এবং সমৃদ্ধি ঘটাবেন। উদারণস্বরূপ, সুস্থতার উপর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবেন, আল্লাহ তা'আলা আরো সুস্থ রাখবেন। সম্পদের উপর শোকর আদায় করবেন, আল্লাহ তা'আলা আরো সম্পদ দান করবেন। সন্তানের উপর শোকরিয়া আদায় করবেন আল্লাহ তা'আলা আরো সন্তান দান করবনে। তো যে নেয়ামতের উপর শোকরিয়া আদায় করবেন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই তাতে উন্নতি দান করবেন। এটা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা। এগুলো শুকরিয়া আদায়ের দুনিয়াবী উপকার।

শোকরের বিনিময় জান্নাত

শোকর আদায়ের ইহকালীন ও পরকালীন উপকার এই যে, আল্লাহ তা'আলা শোকরগুযার বান্দাদের জন্য জান্নাত রেখেছেন এবং এর ফলরূপে মানুষকে শয়তান থেকে নিরাপদ রাখেন। কেননা অকৃতজ্ঞ হলে অহংকারী হবে। আর অহংকার হলো অসংখ্য ব্যাধির উৎস। এজন্য আল্লাহ তা'আলা শোকরিয়া আদায় করতে বলেন, যা অহংকারকে সমূলে ধ্বংস করে।

শোকরগুজার বান্দা শয়তান থেকে নিরাপদ থাকে

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বড় আজীব কথা বলেছেন। যখন আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করছিলেন

তখন শয়তান আল্লাহ তা'আলাকে বলছিল যে, যেহেতু আদমের কারণে আমাকে জান্নাত থেকে বের হতে হলো এজন্য আমি আদমকে এবং আদম সন্তানকে ভ্রষ্ট করবো। আমি তাদের সম্মুখ থেকে এবং পশ্চাৎ থেকে হামলা করবো। ডান দিক থেকে হামলা করবো, বাম দিক থেকে হামলা করবো। অর্থাৎ চতুর্দিক থেকে বনী আদমকে প্রতারিত করার চেষ্টা করবো। এরপর বলল– আপনি তাদের অধিকাংশকে অকৃতজ্ঞ পাবেন। কেননা আমার আক্রমণের কারণে তারা শোকর আদায় করা থেকে গাফেল হয়ে যাবে। আমি তাদেরকে উদাসীন বানিয়ে রাখব। এর থেকে বুঝা যায় যে, শয়তানের সবচেয়ে বড় কৌশল হলো যে, বান্দাকে শোকর আদায় করা থেকে গাফেল করে রাখা। যখনই বান্দা শোকর আদায় করা থেকে উদাসীন হয়ে যায় তখনই শয়তানের জালে আটকা পড়ে যায়। তখন শয়তান তার মাঝে অহংকারের বীজ রোপণ করে। সম্পদের ভালবাসা, খ্যাতির মোহ, ক্রোধ এবং অসংখ্য রোগ তার মাঝে সৃষ্টি করে দেয়। এগুলো সব শোকরিয়া না করার কারণে হয়ে থাকে।

সর্বদা শোকর আদায় করো

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানবী (রহ.) বলেন যে শয়তানের হামলা থেকে বাঁচতে চাও তো বেশী বেশী শোকর আদায় করো। হাঁটতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, সুখে দুখে সর্বদা আল্লাহর শোকর আদায় করো। হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই (রহ.) বলতেন যে, মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে, শান্তির পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে তো বলুন, اللهم لك الحمد ولك الشكر আয় আল্লাহ তোমার প্রশংসা, তোমার কৃতজ্ঞতা। ঘরে প্রবেশ করেছেন, ঘরের লোকজনকে নিরাপদ পেয়েছেন বলুন, اللهم لك الحمد ولك الشكر খানা সামনে এসেছে, উত্তম খাবার বলুন اللهم لك الحمد ولك الشكر ঘর থেকে বের হয়েছেন, বাহন খুঁজছেন, পেয়ে গেলেন বলুন اللهم لك الحمد ولك الشكر গন্তব্যে পৌঁছেছেন বলুন اللهم لك الحمد ولك الشكر উদ্দেশ্য এই যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার যে সকল নেয়ামত বর্ষিত হচ্ছে তার উপর শোকরিয়া আদায় করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

শোকর একটি বিরাট সুপ্ত ইবাদত

হযরত দাউদ (আ.) সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে যে, إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا তিনি শোকর গুযার বান্দা ছিলেন। সর্বদা শুকরিয়া জ্ঞাপনে নিরত থাকতেন। শোকর তো এত বড় আমল যে, এর সম্পর্কে অন্য কেউ বলতে পারে না যে সে কি

আমল করেছে। যদি কোনো মানুষ অনেক নামায পড়ে তখন অন্যরা বলবে এই ব্যক্তি নামাযী। সেখানে লৌকিকতা ও খ্যাতির আশঙ্কা রয়েছে। শয়তান এই আমলের মাধ্যমে 'রিয়ায়' লিপ্ত করে দেয়। পক্ষান্তরে শোকর এমন একটা ইবাদত যার সম্পর্কে অন্য কেউ জানে না যে, সে কী আমল করছে। আপনি মনে মনে বলবেন, আয় আল্লাহ! আপনার কৃতজ্ঞতা আপনার মহানুভবতা। কারো কান শোনেনি, কিন্তু আপনি এক মহান ইবাদত করে ফেলেছেন। যার ফলশ্রুতিতে লৌকিকতা ও অহমিকা থেকে রক্ষা পেয়েছেন এবং আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত হয়েছেন। এ সকল কারণে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

তেইশ বছরে পুরো চিত্রই পাল্টে দিয়েছেন

আপনি একটু চিন্তা করুন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী অক্লান্ত পরিশ্রমই না করেছেন। পুরো আরব ছিল অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। মারামারি, হানাহানি এবং বেহায়াপনা ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছিল। মানুষ প্রতিমা পূজা করত। এমন কোনো অপকর্ম ছিল না যা তারা করতো না। এই ঘুণে ধরা সমাজ বিনির্মাণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তাঁকে। প্রথমে পুরো আরবে পরিবর্তন আনতে হবে। এরপর সারা দুনিয়ায়। এ কারণে যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দায়িত্ব আসল তখন তাঁর জ্বর এসে পড়েছিল। কেননা তিনি জানতেন যে, এরা সহজে কথা মানবে না। বিরোধিতার ঝড় বয়ে যাবে। তাদেরকে সোজা পথে আনার দায়িত্ব সোপর্দ করা হয়েছে। এবং সময় দেয়া হয়েছে তেইশ বছর। তেইশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আরব উপদ্বীপে তাওহীদের ডংকা বাজছিল এবং চারদিকে নববী শিক্ষার আলো ঝলমল করছিল।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। স্বদেশ ত্যাগ করেছেন, রক্ত ঝরিয়েছেন, দারিদ্র সহ্য করেছেন, আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়েছেন। এত ত্যাগ তিতিক্ষার পর যখন বিজয় অর্জিত হলো তখন বলা হচ্ছিল যে, এই বিজয়কে নিজের দিকে সম্পৃক্ত না করে আল্লাহর প্রশংসা করুন এবং তাঁর হামদ বর্ণনা করুন, যাতে আপনি শোকরগুযার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হন। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আপন অনুগ্রহে এর উপর আমাদের আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

এই আয়াতের দ্বিতীয় কালেমা হলো– استغفره

হায়াত থাকলে ইনশাআল্লাহ আগামী জুমায় এ ব্যাপারে আলোচনা করবো।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ –

সূরা মা'উন এবং তার প্রেক্ষাপট (১)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَآ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ○ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ○ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ○ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاۤؤُوْنَ ○ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ○ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

ভূমিকা

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! কয়েক সপ্তাহ পূর্ব থেকে আমি এই ধারাবাহিকতা শুরু করেছি যে, যে সকল সূরা নামাযে বেশী পরিমাণে তিলাওয়াত করা হয়। কিংবা তিলাওয়াত শোনা হয় তার তরজমা এবং কিছু ব্যাখ্যা আপনাদের সামনে পেশ করবো। এই পরম্পরায় আলহামদুলিল্লাহ প্রথমে সূরা ফালাক্ব এবং সূরা নাস, এরপর সূরা ইখলাস, সূরা লাহাব, সূরা নাসর এবং সূরা কাউসারের কিছু তাফসীর এবং প্রেক্ষাপট নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার তাওফীক হয়েছে। আজ আমি আপনাদের সামনে সূরা মাউন তিলাওয়াত করেছি। এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা কিছু উসূলী হিদায়াত বলেছেন এবং কিছু বিধান বর্ণনা করেছেন।

সূরার তরজমা

সূরার তরজমা এই اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ নবী কারীম সারওয়ারে দোআলমের মাধ্যমে সকল মানুষকে সম্বোধন। "আপনি 'কি ঐ ব্যক্তিকে

দেখেছেন যে প্রতিদান দিবসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে।" অর্থাৎ মৃত্যুর পর মানুষ পুনর্জীবিত হবে, তার ভাল কাজের পুরস্কার দেয়া হবে এবং মন্দ কাজের শাস্তি দেয়া হবে এই বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। এ নিয়ে সে তামাশা করছে, একে অনর্থক মনে করছে এবং বলছে এমন কিছু হবে না। ব্যাস যা কিছু এই পার্থিব জীবনেই। এখানেই বাঁচবো, এখানেই মরবো। أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ তরজমা এই যে আপনি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছেন যে প্রতিদান দিবসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيْمَ এই সেই ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয়।

রেওয়ায়েতে আছে যে, এক কাফেরের সাথে এমন ঘটনা ঘটেছিল। তার দুয়ারে জীর্ণশীর্ণ হতদরিদ্র এক ইয়াতীম বালক এসেছিল এবং তার কাছে যাচনা করেছিল, তখন সে ঐ বালককে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ এবং গরীব মানুষকে খাওয়ানোর ব্যাপারে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করে না।

পরকালের বিশ্বাস জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে

আখেরাতের বিশ্বাস এমন বিষয় যা মানুষের পার্থিব জীবনকে সংশোধন করে। এ বিশ্বাসে মানুষের দুনিয়া (কামাই) ও ঠিক হয়ে যাবে। যদি আখেরাতের আকীদা না থাকত তাহলে মানুষ পশুর ন্যায় হয়ে যেত, যাচ্ছে তাই করতো কোন জবাবদিহিতার চিন্তা করত না এবং অনুভূতিও রাখত না। এজন্য পরকালের বিশ্বাসের প্রতি উক্ত আয়াতে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। আর কোরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে, "যারা আখেরাত মানে না, পরকাল বিশ্বাস করে না। তারা যেন বলে কেন তাদেরকে দুনিয়াতে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ـ

কোরআন বলছে, "তোমরা কি মনে করেছ যে, আমি তোমাদেরকে উদ্দেশ্যহীনভাবে অনর্থক সৃষ্টি করেছি। এবং তোমরা আমার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে না।" আচ্ছা যদি প্রতিদান, কিংবা শাস্তি দিবস না থাকে তাহলে পৃথিবীতে অনেকে ভাল কাজ করছে, অনেকে খারাপ কাজ করছে, কেউ যুলুম করে যালেম হচ্ছে কেউ হচ্ছে মযলুম। তাহলে সবাই কি বরাবর হবে।

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُوْنَ ـ

অর্থ : "বলো যে ফাসেক (নাফরমান), মানুষের প্রতি যুলুম করছে, আমি কি তাদের সাথে এমন আচরণ করবো যেমন, যে আচরণ একজন মুত্তাকী পরহেযগারের সাথে করা হয়? যদি আখেরাত না থাকত তাহলে সব সমান হয়ে যেত। কাফের মুমিন সবাই সমান হয়ে যেত। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার হিকমত ও রহমতের ক্ষেত্রে এটা সুদূর পরাহত বিষয় যে, তিনি জালেমের সাথে যে আচরণ করবেন একজন মুত্তাকি পরহেজগারের সাথেও সে আচরণ করবেন।

অত্যাচার আর অত্যাচারিত সমান হতে পারে না

ফেরআউনের সাথে যে আচরণ করলেন, নমরুদের সাথে যে আচরণ করলেন সেই আচরণ মুসা আলাইহি সাল্লামের সাথে, উভয়ে তো সমান হতে পারে না। যখন সমান হতে পারে না, তখন এমন একটা সময় আসবে যখন ফেরআউনকে তার ফেরাউনির শাস্তি দেয়া হবে। আর মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর তাকওয়া, পরহেযগারীর পুরস্কার দেয়া হবে। অন্যথায় জগত সৃষ্টি অনর্থক। কোরআনের ভাষায়-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

হাদীস শরীফে এসেছে যে, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন এবং অযু করতেন তখন আসমানের দিকে তাকিয়ে সূরা আল-ইমরানের শেষ তিন আয়াত পড়তেন। এতে আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, দেখো আসমান যমীন যা তুমি দেখছ, আর রাত দিন যে আবর্তন করছে অর্থাৎ এখন দিন, এরপর রাত– এসবের মাঝে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ.

যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে এবং পার্শ্বশয়ন করে, তারা আসমান যমীনের সৃষ্টিতে চিন্তা ভাবনা করে যে, কে বানিয়েছেন, এই আসমান, এই যমীন–

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

হে পরওয়ারদিগার! আপনি তো এই সকল বস্তুকে অনর্থক সৃষ্টি করনে নি বরং কোন উদ্দেশ্য সামনে রেখে সৃষ্টি করেছেন। আর সেই উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে জালিম তার জুলুমের শাস্তি পাবে, আর ইনসাফগার, মুত্তাকী ও পরহেযগার তাদের নেক কাজের বিনিময় পাবে। সুতরাং سبحانك فقنا عذاب النار পবিত্র আপনার সত্তা তো হে আল্লাহ! আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন, যেভাবে আপনি আমাদেরকে দুনিয়ায় নেক হায়াত দান করেছেন।

এই বিশাল কারখানা কে গড়েছেন?

এখন আপনি ঐ লোকদের একটু জিজ্ঞাসা করুন যারা পরকাল বিশ্বাস করে না। মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে মানে না। যেহেতু মৃত্যুর পর নতুন কোন জীবন নাই, আখেরাত নাই তাহলে আল্লাহ তা'আলা কেন এত বড় কারখানা বানিয়েছেন? কেন বানিয়েছেন আকাশ? কেন বানিয়েছেন যমীন? কেন সৃষ্টি করেছেন বায়ু, চাঁদ-সূর্য, গাছ-পালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি? এ জগতসমূহকে আল্লাহ তা'আলা বানিয়েছেন যেন এগুলো মানুষের সেবা করে, এই আকাশ বাতাস, চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নদী, সমুদ্র সবকিছু মানুষের উপকারে সৃষ্টি করেছেন। গোটা জগতকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন, সূর্য উদিত হচ্ছে, আলো দান করছে, ক্ষেতে আলো বিকিরণ করছে, ফসল ফলছে, গম, চাল উৎপন্ন হচ্ছে, চাঁদ আপনাকে পথ নির্দেশ করছে, বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে যমীন সজীব করছে। আল্লাহ তা'আলা এই সকল ব্যবস্থা করে রেখেছেন। কিন্তু কার জন্য? আপনার জন্য। কোরআন বলছে–

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعاً۔

তিনি ঐ সত্তা যিনি বিশ্বজগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য। সৃষ্টি করেছেন তোমাদের উপকারার্থে। তোমাদের কে এমন আশ্চর্যজনকভাবে সকল শক্তিকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন। (সূরা বাক্বারাহ : ২৯)

প্রাণীকুল তোমাদের সেবায় নিয়োজিত

আপনি একটি ঘোড়ার মুখে লাগাম লাগিয়ে যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে যান। কিন্তু ঘোড়া কখনো আপনাকে এই প্রশ্ন করে না যে কেন আমি আপনার সেবা করবো? আমার শক্তি অনেক বেশী, শক্তি এত বেশী যে আপনি আপনার মেশিনের শক্তি যদি আমার মাঝে খুঁজেন, তার পাওয়ার যদি আমার উপর যাচাই করেন তাহলে দেখবেন যে, একটা মেশিন হাজারটা ঘোড়ার শক্তি রাখে। এত পাওয়ারফুল। এত শক্তি এত পাওয়ার থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে আপনার জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন। যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে যাচ্ছেন, কখনো বলে না যে, কেন আমার উপর সাওয়ার হচ্ছো? কেন তোমার বোঝা উঠাচ্ছো? বাহন হিসেবে গাধা, খচ্চর, উট প্রভৃতি প্রাণী আপনার সেবায় নিয়োজিত করে রাখা হয়েছে। আপনার জন্য বশীভূত করে রাখা হয়েছে। কখনো এই কথা বলে না যে, তোমার ক্ষমতা বেশী, তাই তুমি আমাকে দিয়ে তোমার কাজ করাচ্ছ। গোটা জগতকে আপনার সেবায় ব্যাপৃত রাখা হয়েছে তবে কেন? যদি পরকাল নাই থাকে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান নাই হয় তাহলে (খামাখা কেন) আল্লাহ তাবারাকা

ওয়া তা'আলা এই সকল কিছুকে আপনার সেবায় নিয়োজিত করেছেন। কেন নিরত রেখেছেন? কেন ব্যাপৃত করেছেন? একটু চিন্তা করুন যদি পরকাল না থাকে, তাহলে নিপীড়ক নিপীড়ন করবে। অন্যের অধিকার হরণ করবে। নির্যাতনের জাঁতাকলে পিষ্ট করবে। কিন্তু বলার কেউ নেই। যে, নিপীড়ন সহ্য করে উৎপীড়িত হচ্ছে। অন্যায় অবিচার মেনে নিয়েও ন্যায় ও সুবিচারকে শক্ত করে ধরেছে, তার কোন পুরস্কার নাই। সব বিফল?

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُوْنَ-

অর্থ : মুমিন আর ফাসেক বরাবর? কখনো বরাবর হতে পারে না। কোরআন বলছে যখন বরাবর না তখন মানতে হবে যে, একটা সময় আসবে এবং নেককারদেরকে তাদের নেক কাজের বিনিময় দেয়া হবে। এজন্য মনে রাখবেন, যারা আখেরাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারা মূলত জানেনা তাদের সৃষ্টিরহস্য, বিশ্ব সৃষ্টির লক্ষ্য উদ্দেশ্য। তো কোরআনে কারীমের সবচেয়ে বড় বার্তা এটাই।

আম্বিয়া আ. কে নাযীর, সতর্ককারী বলা হয়েছে

দেখুন যত নবী রাসূল এসেছেন তাদের সকলকে কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে 'নাযীর'। নাযীর শব্দের অর্থ, সতর্ককারী, ভীতি প্রদর্শনকারী, অবহিতকারী। আম্বিয়া কেরাম আ. কে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে যেন তোমরা পার্থিব ভোগ বিলাসে আসক্ত হয়ে একথা ভুলে না যাও যে এই পৃথিবী তোমাদের পরীক্ষার ক্ষেত্র, একথা তাঁরা তোমাদের অবহিত করবেন। এটাও জানাবেন যে, একটা সময় এমন আসবে, যখন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ পাবে। কেউ সফল হবে কেউ ব্যর্থ হবে। এ সকল ব্যাপারে, অবহিত করার জন্য আম্বিয়া আ. ধরাপৃষ্ঠে আগমন করেন। আর এই সূরার মধ্যে কোরআনে কারীম সর্ব প্রথম এই বিষয়টি বলেছে যে, সকল অনিষ্টের মূল হলো, প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করা, যা এই কাফেররা হামেশা করছে।

মুসলমান পরকাল সম্পর্কে বে-খবর

আল-হামদুলিল্লাহ মুসলমান অস্বীকার করে না। মুসলমান বলে যে মৃত্যুর পর এক জীবন আছে। তাতে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা শাস্তি এবং পুরস্কার দিবেন। একথা অন্তরে মানে, মুখেও স্বীকার করে। আল্লাহ তা'আলার শোকর। এটুকু যদি না হয় তাহলে কেমন মুসলমান। কিন্তু প্রশ্ন হলো যার ঈমান আছে, মনে ও মুখে তা স্বীকারও করে, সকাল সন্ধ্যার জীবনে কখনো কি এই

কথা তার মনে আসে যে, একটা দিন এমন আসবে যেদিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে প্রতিটি কথা ও কাজের জবাবদিহি করতে হবে। মেনে নিয়েছেন, ঈমানও এনেছেন, এবং মুখেও স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই সত্য কি আপনার মনে থাকে। আপনি কি কখনো এ ব্যাপারে ভাবেন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনার কতবার স্মরণ হয় যে, এই দুনিয়াই শেষ নয় বরং এরপর আরেকটা জগত আছে। বাস্তবতা এই যে, যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করি, তাহলে বড় গাফলতি ও উদাসীনতাই দৃষ্টিগোচর হবে। ঈমান তো আনা হয়েছে কিন্তু ঐ ঈমানের ধ্যান নাই, ফিকির নাই, সকাল সন্ধ্যার জীবনে এ কথা কখনো মনেও পড়ে না। যখন আমরা বাজারে যাই বেচা-কেনা করার জন্য তখন কি আমাদের একথা মনে পড়ে যে, আমি যে বেচা-কেনা করছি এটা কি হালাল, না হারাম?

যখন অফিসে বসেন এবং মানুষ আপনার কাছে কাজের জন্য আসে, তখন ঘুষ চেয়ে বসেন। মুখে বা কাজে কখনো কি একথা স্মরণ করেন, একদিন মরতে হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সামনে জবাবদিহি করতে হবে। যে পয়সা কামাচ্ছি, যে ঘুষ নিচ্ছি, পাই পাই করে তার প্রতিটি পয়সার হিসাব দিতে হবে?

কয়েকটি প্রশ্ন অবশ্যই করা হবে

হাদীস শরীফে এসেছে যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আখেরাতে কোন মানুষ এক কদমও অগ্রসর হতে পারবে না যতক্ষণ না তাকে কয়েকটি প্রশ্ন, করা হবে। প্রথম প্রশ্ন তোমাকে যে দীর্ঘ জীবন দান করা হয়েছে তা কোন কাজে ব্যয় করেছ? সম্পদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, কীভাবে অর্জন করেছ এবং কোন পথে ব্যয় করেছ? পাই পাই করে হিসাব দিতে হবে। মনে করতে পারেন, এই ষাট সত্তুর বছরে কত টাকাই তো কামিয়েছি, কে তার হিসাব রাখে? আরে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সব হিসাব করা আছে। এক এক করে প্রতিটি পয়সার হিসাব জমা আছে– কোত্থেকে উপার্জন করেছেন এবং কোথায় ব্যয় করেছেন তো যখন অফিসে বসেন, মানুষ কাজ নিয়ে আসে তখন তাকে ঘোরান, হেনস্তা করেন, তাকে বাধ্য করেন যাতে সে আপনার পকেট গরম করে। তখনও একথা স্মরণ রাখা যে একদিন আমাকে মরতে হবে। আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। যখন অধীনস্তদের সাথে ব্যবহার করেন তখন কি মনে থাকে যে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে? যখন আপনার স্ত্রী-সন্তান, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যাদের অভিভাবক বানিয়েছেন তাদের সাথে আচরণের সময় কি এই কথা মনে পড়ে যে, আখেরাতে আমাকে এ সবকিছুর হিসাব দিতে হবে। এটা হলো একটি চিন্তার বিষয় যেদিকে কোরআন সর্বপ্রথম আমাদের মনোযোগ

আকর্ষণ করেছে। أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ তাদের একটু দেখুন যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। ঠিক আছে তোমরা মিথ্যা বলছো না, মুখেও মিথ্যা বলছো না। তো কাজে-কর্মে কি ফুটে উঠেছে যে তোমরা আখেরাতে ঈমান রাখো, তোমরা আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার উপর ঈমান রাখো? তাই কোরআন সর্ব প্রথম এই বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা

আমার ভাই, দোস্ত, বন্ধু! মূলত : আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো যে, আমরা দুনিয়ায় এত জটিলতার মাঝে থাকি যে আমাদের মন থেকে আখেরাতের চিন্তা মুছে যাচ্ছে। নিজ হাতে আপনজনকে দাফন করেছেন, তার কবরে মাটি দিয়েছেন, তার জানাযা পড়েছেন, সব কিছু দেখেছেন। এও দেখেছেন যে, মানুষ হঠাৎ দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে। এও দেখেছেন যে, সুস্থ সবল মানুষটা ঘর থেকে বের হল আর লাশ হয়ে ঘরে ফিরল। এসব কিছু দেখার পরও (চরম উদাসীনভাবে দিন কাটাচ্ছেন। ভাবখানা যেন এই-) আমাদের অনেক সময় পড়ে আছে। আমরা সর্বক্ষেত্রে গাফলতির শিকার হই। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফযল ও করমে এই গাফলতি থেকে আমাদের উদ্ধার করুন। এই গাফলতি থেকে বেরিয়ে আসার উপায় এটাই যে, সব কাজের আগে এই খেয়াল করা যে আমাকে আল্লাহ তা'আলার সামনে জবাব দিতে হবে। এই অভ্যাস হয়ে গেলে ইনশাআল্লাহ গোটা জীবন ঠিক হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের মাঝে এই অনুভূতি সৃষ্টি করে দেন। আমীন

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ—

সূরা মা'উন এবং তার প্রেক্ষাপট (২)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَآ شَرِيْكَ لَهٗ. وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ○ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ○ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ○ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاۤءُوْنَ ○ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ○ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

সূচনা

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! এখন আমি আপনাদের সামনে সূরা মা'উন তিলাওয়াত করেছি। তার কিছু ব্যাখ্যা গত জুমায় করেছিলাম।

সূরার তরজমা, আল্লাহ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন– اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছেন যে প্রতিদান দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তী ঐ দিনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, যেদিন বান্দাকে তার নেক আমলের প্রতিদান এবং বদকারকে তার বদ আমলের শাস্তি দেয়া হবে।

فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ وَلَا يَحُضُّ এই সেই ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয় عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ এবং গরীব নিঃস্বকে খাওয়ানোর ব্যাপারে কাউকে উৎসাহিত করে না।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ আফসোস ঐ নামাযীদের জন্য যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন। اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاؤُوْنَ যারা (মানুষকে) দেখায়। وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ এবং সাধারণ জিনিসও অন্যকে দিতে নিষেধ করে। উক্ত সূরার তরজমা এতটুকুই।

কিছু মন্দ কাজ

গত জুমায় বলেছিলাম যে, উক্ত সূরায় আল্লাহ তা'আলা কিছু অন্যায় কাজের উল্লেখ করেছেন। ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয়া, অসহায়কে সাহায্য না করা, নামায থেকে গাফেল থাকা, লোক দেখানো, কাউকে তুচ্ছ বস্তু দিতেও অস্বীকার করা– এগুলো সব মন্দ কাজ। কিন্তু এই সকল মন্দ কাজ এবং গুনাহ উল্লেখ করার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা এগুলোর মূল ও কারণ সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার সামনে এ সকল কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এ কুবিশ্বাস কাফেরদের মাঝে নিকৃষ্টরূপে বিদ্যমান ছিল। তারা সরাসরি পরকালকে অস্বীকার করতো। তারা স্পষ্ট বলে ফেলে যে, আমরা এটা মানিনা যে, মৃত্যুর পর আমরা পুনরায় জীবিত হবো। ব্যাস! জীবন শুধু একটাই এখানেই মরবো, এখানেই বাঁচবো। পরকাল বলে কিছু নাই। আল্লাহ তা'আলা এই সূরার মধ্যে এ দিকেও ইশারা করেছেন যে, আমি যে মন্দ কাজ ও গুনাহগুলো উল্লেখ করছি তা মূলতঃ কাফেরদের কাজ, যারা প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করে।

কিন্তু যারা প্রতিদান দিবসের প্রতি ঈমান রাখে। যাদের বিশ্বাস এই যে, মৃত্যুর পর একদিন আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়াতে হবে। তাদের থেকে এ সূরায় উল্লিখিত মন্দ আচরণগুলোর কোনটি হয়ে যাওয়া বা হওয়ার আশংকাও সঙ্গত নয়। গত জুমায় আমি বলেছিলাম যে, আলহামদুলিল্লাহ! আমরা তো এ ব্যাপারে ঈমান রাখি যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার সামনে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু এই ঈমানের কোন ফিকির নেই সব সময় মনে থাকে না। ফলে আমরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে যখন পরকালের উপর ঈমান এনেছ তো এ ব্যাপারে চিন্তা ফিকিরও করো।

ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয়া

فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ এই সেই ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয়। বর্ণনায় আছে, এক কাফেরের, কাছে কোন ইয়াতীম সাহায্যের জন্য আসে। তখন সে ঐ ইয়াতীমকে কোন সাহায্য না করে, তাকে কিছু না দিয়ে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বের

করে দেয়। এই আয়াতে কারীমায় এই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একাজ কোন মুমিন করতে পারে না। কোন ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়াটা ঈমানদারের কাজ হতে পারে না।

ইয়াতীমের প্রতিপালনের ফযীলত

আল্লাহ তা'আলা ইয়াতীমের অধিকার রক্ষায় বড় গুরুত্বপূর্ণ বিধান দিয়েছেন। ইয়াতীমের প্রতিপালন করা, ইয়াতীমের দেখভাল করা, ইয়াতীমের যত্ন নেয়া বড় ফযীলতপূর্ণ আমল।

এক হাদীসে আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, কেয়ামতের দিন আমি এবং ইয়াতীমের লালনপালনকারী এই দুই আঙুলের মতো কাছাকাছি থাকবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইয়াতীমের দেখভাল করবে, তার প্রয়োজনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে তার মর্যাদা এত বড় হবে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের দিন সে আমার সাথে থাকবে। এ বলে তিনি (নবীজী) তাঁর তর্জনী ও মধ্যমার দিকে ইশারা করেছেন।

ইয়াতীমের অধিকার হরণের শাস্তি

ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ এবং অধিকার হরণের ব্যাপারে কোরআনে কারীম বলেছে–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا۔ (النساء : ١٠)

যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করে তারা তো আগুন দিয়ে উদরপূর্ণ করে। অর্থাৎ যদি ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে থাকে তো বাস্তবে সে কোন খাবার খায়নি, খেয়েছে আগুন আর জ্বলন্ত অঙ্গার। কেননা আখেরাতে এর এক এক লোকমা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

মানুষ ভাবে যে, আমরা কোথায় ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করি। আমরা তো ইয়াতীমের সম্পদ খাই না কিন্তু আমাদের সমাজের দিকে একটু লক্ষ্য করুন। সরাসরি যদিও ইয়াতীমের মাল খাওয়ার ধান্ধা করছে না। কিন্তু বিভিন্নভাবে ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা তো এখন ব্যাপক হয়ে গেছে।

উত্তরাধিকারী সম্পদ বণ্টন না করা

পরিবারের প্রাণপুরুষ পিতা যখন ইন্তেকাল করেন তখন শরীয়তের বিধান হলো, তার সম্পত্তি দ্রুত ভাগ করে দেয়া। শরীয়ত নির্ধারিত অংশ প্রত্যেক

অংশীদারকে দিয়ে দেয়া। এটা শরীয়তের বিধান। এ ব্যাপারে কোরআন দু'রুকু নাযিল করেছে। এটি সেই বিধান যার উপর যথাযথ আমল করা হলে আমাদের সমাজ অনেক মন্দ ও অন্যায় থেকে বেঁচে যেত। আমাদের সমাজে প্রচলন হয়ে গেছে যে, কারো ইন্তেকালের পর মিরাছ বন্টনের নাম নেয়াটাও যেন অপরাধ। মানুষ এই ভেবে এটাকে দোষণীয় মনে করে যে, কাফন দাফন শেষ না হতেই মাল বাটওয়ারা শুরু করে দিয়েছে। তখন এই কথা ভাবে যে আমরা কেন ভাগ বাটোয়ারা করবো। একসাথে থাকবো। এক সাথে খাবো-দাবো। কিছুদিন এভাবে চলে। কিন্তু এভাবে দীর্ঘ দিন হলো, আপনি কিছু বললেন না, বসে বসে তার সম্পদ ভোগ করছেন। এটা বিলকুল হারাম কাজ। এভাবে গোটা সমাজে মীরাছ বন্টিত হয় না। মানুষ স্বাধীনভাবে খায় দায়, ঘুরে ফিরে। এরা সবাই আয়াতের হুকুমে শামিল। আল্লাহ পানাহ– এরা হালাল হারামকে ভুলে গেছে, হালাল-হারামের অনুভূতি বিলীন হয়ে গেছে, যার ফলে হারামখোরদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। হারামকে হারাম মনে করা হচ্ছে না। হালালের মতই তার ব্যবহার চলছে। আমাদের উপর চারদিক থেকে এত বিপদ আসছে কেন? এর কারণ এই যে আমরা লাগামহীনভাবে হারাম খেতে শুরু করেছি। আমাদের গোটা সমাজ এই হারাম খাওয়ায় লিপ্ত। এমনকি একজন ভাল মানুষ, নামাযী, মসজিদে আসে, আলেম ওলামাদের মজলিসে বসে, সে যখন লেনদেন করে, কারবার করে তখন এদিকে লক্ষ্য রাখেনা যে আমার মালে হারাম মাল মিশে যাচ্ছে। আমি যে কথাগুলো বলছি, সামান্য যাচাই করলে দেখবেন যে, আপনার বন্ধু, আপনার পরিবার সকলের একই অবস্থা, এ অবস্থা এক মহামারীরূপে আমাদের সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। মীরাছ ঠিকভাবে বন্টন না হওয়ার কারণে গণহারে সবাই ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করছে। অন্যকে প্রাপ্য বঞ্চিত করছে।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় সাহাবীদের অবস্থা

হাদীসে আসে, যখন এই আয়াত إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى নাযিল হয়েছে যাতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করে তারা তাদের উদর আগুন দিয়ে পূর্ণ করে। তখন সাহাবায়ে কেরাম মারাত্মক ভয় পেলেন। যাদের ঘরে কোন ইয়াতীম ছিল। যেমন বড় ভাইয়ের সাথে ছোট ভাই ছিলেন তৎক্ষণাৎ তিনি তার অংশ পৃথক করে দিয়েছেন। তার মালিকানা আলাদা করে দিয়েছেন। তাদের যাবতীয় ব্যবস্থা তাদের সম্পদ থেকেই করা হয়েছে। এমনই ভয় পেয়েছেন যে, ছোট বাচ্চাদের জন্যও আলাদা

খাবার প্রস্তুত হতে লাগল। একসঙ্গে বসে খেতেও আশংকা করেছেন। এমন যেন না হয়ে যায় যে, আমরা ইয়াতীমের মাল খাচ্ছি। আমরা কোরআনে কারীমের উক্ত আয়াতের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়ে যাচ্ছি আমরা হারাম খাচ্ছি।

একটু চিন্তা করেন, সাহাবায়ে কেরাম ইয়াতীমের খাবারও তাদের খাবার থেকে পৃথক করেছিলেন। তারপর এক সঙ্গে বসে খেতেও ভয় পেয়েছিলেন যদি তাদের লোকমা আমার লোকমার সাথে মিশে যায়। তাহলে তো কেয়ামতের দিন আমি আগুন ভর্তি উদর নিয়ে উঠব। যেমনটা বলছে কোরআনুল কারীম। সাহাবায়ে কেরাম এত সূক্ষ্ম সতর্কতা অবলম্বন করা শুরু করলেন। তাই কোরআনে কারীমে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন। এটা আল্লাহ তা'আলার ধর্ম, এটা স্বভাবজাত ধর্ম। এ ধর্ম একজনকে অপরের অধিকার জানাবে। তবে এত কষ্টের কোন প্রয়োজন নাই যে, ইয়াতীমের জন্য ভিন্ন রান্না হবে। তারা আলাদা খাবে। (এমনটা হওয়া উচিত নয়।) কোরআনের ভাষায়–

وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔

অর্থাৎ, তোমরা যদি এদের সাথে মিলে মিশে খেয়েই ফেলো তাহলে এরা তো তোমাদেরই ভাই। এ কারণে তোমাদের কোন জবাবদিহিতা করতে হবে না। খাবার ঠিকমত তৈরি করো। চাই খাবার একই রকম হোক। আর বাজারে তাদের সম্পদও ব্যয় কর এবং একসাথে বসেই খাও। এজন্য তোমাদের কোন গুনাহ হবে না। وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ তবে ভালো করে বুঝে নাও কিন্তু কে ইয়াতীমের হিতাকাঙ্ক্ষী আর কে সুযোগে আত্মসাৎকারী। সুতরাং সতর্কভাবে খেয়াল রেখো যে, এটা ইয়াতীমের অংশ। আমরা তাদের ভরণ পোষণ হিসেবে ব্যয় করছি। যত টাকা নিজেদের জন্য খরচ করবে অত টাকা ইয়াতীমের জন্যও খরচ করবে সুশৃঙ্খলভাবে সতর্কতার সাথে একসাথে রান্না করবে। একসাথে বসে খেয়ে নাও। তাদের সম্পদ ব্যয় করে। এজন্য তোমাদের কোন ধরপাকড় হবে না। وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ভাল করে জানেন কে ফাসাদ করে। অর্থাৎ বাহানা খুঁজে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে। আর কে ইয়াতীমের ভাল কামনা করে।

وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ যদি আল্লাহ চাইতেন তোমাদেরকে বিপদে ফেলতেন, কষ্টে পতিত করতেন। এই নির্দেশ দিতেন যে, একটা কণাও এদিক সেদিক করা যাবে না। কিন্তু আমি তোমাদেরকে এই কষ্টে ফেলি নি। ব্যাস এ খেয়াল রাখো

যে, তার অংশ, তার মালিকানা যেন আলাদা থাকে। প্রয়োজনের তাগিদেও তোমরা তাদের সম্পদে হস্তক্ষেপ করবে না। এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু হায়! হুকুম তো হুকুমের জায়গায়।

নাবালেগ বাচ্চাদের হক্ব

আল্লাহ তা'আলা নাবালেগ বাচ্চাদেরও অধিকার প্রদান করেছেন। কোন কিছু নাবালেগ বাচ্চার মালিকানায় এলে তার যিম্মাদারের জন্য এ মালে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ফুকাহায়ে কেরাম এই মাসআলা লিখেছেন যে, যদি কেউ বাচ্চাকে কোন কিছু হাদিয়া দেয় তখন বাচ্চা ঐ বস্তুর মালিক হয়ে যায়। বাবা মা-রও অধিকার থাকে না যে, ঐ বাচ্চা থেকে নিয়ে অন্য কোন বাচ্চাকে কেউ দিবে। মনে করুন আপনার দু'জন সন্তান আছে তো কোন ব্যক্তি আপনার এক সন্তানকে কোন কিছু হাদিয়া দিল। মা-বাবার এখন অধিকার নেই এক সন্তানের উপহারের কাপড় অন্য সন্তানকে দেয়ার। কেননা, এই হাদিয়ার মালিক এখন সে। তার অভিভাবকের জন্য এখন তার বস্তুতে হস্তক্ষেপ করা জায়েয নেই।

বাচ্চাদেরকে হাদিয়া দেয়ার তরীকা

এজন্য উলামায়ে কেরাম বলেন, যখন কোন বাচ্চাকে হাদিয়া দিতে চান তখন তার হাতে দিবেন না। বাচ্চার বাবা মা' কে দিবেন। বলবেন এটা তোমার যে বাচ্চাকে খুশি দিতে পারো। যাতে করে মা-বাবার যে কোন সন্তানকে দেয়ার অধিকার থাকে। বিবাহ শাদি, আকীকা বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে বাচ্চাদের যে উপহার দেয়া হয় যে সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, এটা মূলত বাচ্চাদেরকে দেয়া হয় নাই। বরং তার বাবা মাকে দেয়া হয়েছে। যদি বাবার পরিচিত কেউ দেয়, তাহলে বাবাকে দিয়েছে। আর যদি মার পরিচিত কেউ দেয় তাহলে মাকে দিয়েছে। যেন তারা তাদের খুশিমত যে কোন সন্তানকে দিতে পারেন। হ্যাঁ যদি কোন বাচ্চার নাম নিয়ে দেয়া হয় যে এটা অমুক বাচ্চার তাহলে অন্য বাচ্চাকে তা দেয়া যাবে না। এটা না জায়েয। তো শরীয়ত এই বিধান এজন্য দিয়েছে, যাতে প্রতিটি বিষয় স্পষ্ট থাকে এবং হিসাব নিকাশ একেবারে পরিষ্কার থাকে। ঝগড়ার কোন অবকাশ না থাকে।

'মীরাছ, বণ্টন না হওয়ার পরিণতি

এমন কত ঘটনা যে দেখেছি বাবার ইন্তেকাল হয়েছে। সম্পত্তি বণ্টনের কথা উঠেছে, তো মানুষ (প্রশ্ন) করে বসে। আরে সাহেব! সম্পদ ভাগ বাটোয়ারা করার কী প্রয়োজন? সবাই ভাইবোন, আমাদের মাঝে সম্পর্ক ভালো। কোন দ্বন্দ্ব নেই, কোন বিরোধ নেই। সুখে আছি, শান্তিতে আছি। কী দরকার সম্পদ ভাগ করার? এখনও বাবার কাফন দাফন সম্পন্ন করতে পারলাম না। কেন আমরা আমাদের বাবার সম্পদ ভাগ করবো?

প্রথম প্রথম খুব মিলে মিশে থাকে। গলায় গলায় সম্পর্ক। এত মুহাব্বত এত ভালবাসা যে মীরাছ বন্টন করাটা মানহানিকর ও লজ্জাকর ব্যাপার মনে হয়। কিন্তু এক বছর যখন অতিবাহিত হয়। বিবাহ শাদি হয়, বাচ্চা হয় তো তখন চিন্তায় পড়ে, অমুকের বিবাহে এত খরচ হয়েছে। আমার উপর এত খরচ পড়েছে। অমুক অনুষ্ঠানে এত খরচ করা হয়েছে। আমাকে কিছুই দেয়া হয় নাই। মনে করেন যদি ব্যবসা হয়। তখন একজন বলে যে, আমার কায়িকশ্রম বেশী। লাভ আমার বেশী হওয়ার কথা। আবার সব ভাই বোনকে বিবাহ দিয়েছি। পড়াশোনা করিয়েছি।

অবস্থা ততদিন এত ঘোলাটে হয়েছে যে, হিসাব নিকাশ করা জটিল হয়ে পড়েছে। কেউ বেশী খেটেছে। কেউ বেশী খরচ করেছে। ফলে হিসাব করা দুঃসাধ্য। তাই ঝগড়া, কথা কাটাকাটি, কথা বন্ধ করা ছাড়া বিকল্প পথ থাকে না। বাধ্য হয়েই কোর্ট কাচারী পর্যন্ত যেতে হয়।

প্রথমে মুফতী সাহেবের কাছে এরপর আদালত

তখন মুফতী সাহেবের কাছে এসে বলে যে, সমস্যার সমাধান করে দিন। মুফতী সাহেবের মাথায় এই বিপদ চাপিয়ে দেয় যে ভাই এমন হয়েছিল। এখন মুফতী সাহেব বেচারা কী করবেন। দশ বছর এভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, না কোন হিসাব-নিকাশ আছে, না কোন বিষয় পরিষ্কার করা হয়েছে, না পরিষ্কার করা যাচ্ছে। এখন দশ বছর যাওয়ার পর মুফতী সাহেবের কাছে এসে বলছে যে, সমস্যার সমাধান দিন। তো মুফতী সাহেব কী করে সমাধান করবেন।

কেন এমনটা হচ্ছে? এই কারণে যে শরীয়তের যে বিধান ছিল তাকে পদদলিত করা হচ্ছে। ফলে ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা হচ্ছে। কন্যা এবং বোনদের অধিকার হরণ করা হচ্ছে। এর ফলে মামলা মোকাদ্দমা চলছে। বছরের পর বছর মামলা চলতে থাকে। বিবাদ লেগে থাকে।

ভাইয়েরা আমার! আমরা যে কোরআন পড়ি, কোরআনে কারীমের আয়াত পড়ি। একটু খেয়াল করা উচিত। তো শুধু এই কোরআন পড়া আর শোনার জন্য নয়; বরং আমল করার জন্যও। তো আমাদের সমাজে কোরআনের উপর আমল না থাকার কারণে কত বড় বড় অন্যায় ও খারাপ কাজ ঘটে চলছে। কোরআনের হুকুম মেনে চলা উচিত আর এই মাসআলার ব্যাপক প্রসার ঘটানো যে ভাই! ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার কঠিন শাস্তি রয়েছে। তা থেকে বাঁচার রাস্তা হলো আল্লাহ তা'আলার হুকুম, মীরাছ বন্টন করো। সে অনুযায়ী তাকসীম (বন্টন) করো। যদি এখনও না করে থাকেন তাহলে এখনই করে ফেলুন। অন্যথায় ঝগড়া ফাসাদের দিকে মোড় নেয়ার আশংকা আছে। আল্লাহ তা'আলা তার ফযল ও করমে আমল করার তাওফীক দান করুন আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ—

সূরা মা'উন এবং তার প্রেক্ষাপট (৩)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَآ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ○ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ○ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ○ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاۤؤُوْنَ ○ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ○ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ - وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

অবতরণিকা

সম্মানিত ও দ্বীনি ভাইয়েরা! আমি এখন আপনাদের সামনে সূরা মাউন তিলাওয়াত করেছি। বিগত কয়েক জুমা ধরে তার ব্যাখ্যা চলছে। আজ তা পূর্ণ হবে। এই সূরা অধিকাংশ মুসলমানেরই মুখস্থ আছে। নামাযে পড়া হয়। এতে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। সূরার তরজমা, আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন– اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছেন যে কর্মফল অস্বীকার করে। অর্থাৎ বলে যে, মৃত্যুর পর পুনরায় কাউকে জীবিত করা হবে না এবং মানুষকে ভাল-মন্দ কাজের প্রতিদান দেয়া হবে না। فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ এই সেই ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয়। وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ এবং অসহায় ও নিঃস্বদের খাবার দানে কাউকে উৎসাহিত করে না।

আখেরাত বিস্মৃত হওয়ার পরিণাম

আমি গত জুমায় বলেছিলাম যে, উক্ত সূরাতে আল্লাহ তা'আলা এ দিকে ইশারা করেছেন, যে মানুষ যখন মৃত্যু সম্পর্কে গাফেল হয়ে যায় এবং ভুলে যায় যে, মৃত্যুর পর আমাকে সকল কাজের হিসাব দিতে হবে তখন আমি স্বীয় কাজের বদলা পাব। তখন সে এমন মন্দ কাজ করে। ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয়। বর্ণনায় আসে যে, এই সূরা নাযিল হওয়ার তার পূর্বে এক কাফির এই আচরণ করেছিল। তার কাছে এক ইয়াতীম সাহায্য চাইতে গিয়েছিল। তখন সে ঐ ইয়াতীমকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিল। গত জুমায় আমি বলেছিলাম, এই আয়াতে ইয়াতীমদের সম্পর্কে হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। ইয়াতীমদের অধিকার বঞ্চিত করা তাদেরকে ধাক্কা দেয়ার শামিল। আমাদের সমাজে ইয়াতীমদের নিয়ে যা চলছে গত জুমায় আমি তা আলোচনা করেছিলাম।

মুনাফিকদের অন্যায় কাজ

সামনের আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন– فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ বড় কঠিন আযাব রয়েছে ঐ নামাযীদের জন্য যারা তাদের নামাযে চরম উদাসীন। الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاؤُوْنَ ঐ লোকেরা যারা লোক দেখানো নামায পড়ে। শুধু অন্যকে দেখানোর জন্য যে আমরা নামাযী। وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বস্তু (অন্যকে) দেয় না। তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ একটা কাজের জিনিস চাইলেও সে তা দিতে অস্বীকার করে। পুরো সূরার তরজমা এটাই। আর এখানে মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মুনাফিকদের আলামত

বর্ণনায় আছে যে, এমন অনেক মানুষ আছে যারা মুখে বলে, আমরা মুসলমান। বাহ্যিক বেশ ভূষা দেখে মনে হয় কালেমাধারী পাক্কা মুমিন। বাস্তবে সে মুখে মুসলমান, অন্তরে ঈমান নাই। গোপনে গোপনে কুফুর ও শিরকী কর্মকাণ্ডে জড়িত। কাফেরদের সাহায্যকারী। সে মুখে বলে আমি মুসলমান। নামাযের জন্য মসজিদে আসে। কোরআনে কারীম তাদের সম্পর্কে বলেছে,

وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى۔

অর্থাৎ যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায় তো বড় অলসভাবে দাঁড়ায়। যেন কেউ টেনে হেঁচড়ে মসজিদে এনেছে। তারা মানুষকে দেখানোর জন্য মসজিদে আসে। তো এই আয়াতে ঐ মুনাফিকদের আলোচনা করা হয়েছে যারা নামায তো পড়ে; কিন্তু বড়ই উদাসীনভাবে এবং মানুষকে দেখানোর জন্য।

মুসলমানদেরকে সতর্ক করা

যদিও মুনাফেকদের আলোচনা কিন্তু Indirectly পরোক্ষভাবে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মুসলমানদের সতর্ক করেছেন যে, তোমাদের কখনো যেন এমন অবস্থা না হয় তোমরা নামায পড়ছো অথচ তোমরা নামাযের প্রতি উদাসীন। নামায পড়ছো কিন্তু লোক দেখানোর জন্য।

নামাযের ব্যাপারে 'গাফেল ব্যাপক অর্থবহ। নামাযের গুরুত্ব না থাকা, কোন ফিকির না থাকা, কোনদিন পড়ছে কোনদিন ছাড়ছে। নামাযের পাবন্দি নাই। গুরুত্ব নাই। কেউ বলেছে ভাই নামায পড়ো, তো নামাযের জন্য দাঁড়িয়েছে, বলার কেউ নাই। গাফলতে সময় কাটে কিন্তু নামায পড়ে নাই। গাফলতির নিকৃষ্ট প্রকারের মধ্যে এটাও একটা। আল্লাহ তা'আলা সব মুসলমানকে এ থেকে হেফাজত করুন। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নামাযকে বলেছেন– الصلوٰة عماد الدين নামায দ্বীনের স্তম্ভ বা খুঁটি। যে ব্যক্তি তাকে ধসিয়ে দিয়েছে সে দ্বীনকে ধসিয়ে দিয়েছে।

নামায কোন অবস্থায় মা'ফ নেই

নামাযকে আল্লাহ তা'আলা এমন গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত বানিয়েছেন যে, কোন অবস্থায় একজন মুমিনের জন্য নামায ছাড়ার অবকাশ নাই। কেউ সফরে বের হয়েছে তো আল্লাহ তা'আলা নামাযের বিধান সহজ করে দিয়েছেন যে, চার রাকাতের পরিবর্তে দুই রাকাত পড়ুন। অসুস্থ, দাঁড়াতে অক্ষম, তো বসে বসে নামায পড়ুন। বসে পারেন না তো শুয়ে শুয়ে নামায পড়ুন। রুকু সিজদা করতে পারছেন না তো ইশারায় নামায পড়ুন। মুমূর্ষু অবস্থায়ও একজন মুমিনের নামায তরক করার অনুমতি নাই। অবস্থা যেমনই হোক নামায পড়তে হবে। আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন হালতে নামায পড়াকে আসান করে দিয়েছেন। বসে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন। এমনকি অসুস্থতার কারণে যখন নামাযই পড়তে অক্ষম তখনও পড়ুন। কোন কোন রোগের কারণে মানুষ সব সময় নাপাক থাকে, পাক থাকা সম্ভব হয় না।[১] হুকুম হল নাপাকের অবস্থায়ও নামায পড়বে, ছাড়বে না। নামাযকে আল্লাহ তা'আলা এমন ইবাদত বানিয়েছেন। বাস্তবে নামায এমন কিছু নয় যাকে মানুষ বোঝা মনে করে। এটা তো দিনে পাঁচবার আল্লাহর দরবারে বান্দার হাযিরি, যে আমার কাছে আসো এবং আমার সান্নিধ্য লাভ করো।

---

[১] রোগের কারণে যদি সর্বদা নাপাকি থাকে, তখন তার জন্য মাযূরের বিধান প্রযোজ্য। অর্থাৎ প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য নতুন করে অযু করে নামায আদায় করবে।

হাদীছ শরীফে আছে যে, বান্দা যখন সেজদা করে তখন সে আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বেশী নৈকট্য হাসিল করে। সবচেয়ে কাছের হয়। এজন্য একে বোঝা মনে করার কোন কারণ নাই। নাযিল হয়েছে–

وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ○ (سورة البقرة ٤٥)

একে বোঝা মনে হয়, কঠিন মনে হয়। কিন্তু যাদের অন্তরের রজ্জু আল্লাহর সাথে তাদের জন্য এটা সামান্য বোঝা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নামায আমার চক্ষুর শীতলতা। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানকে এমন হওয়ার তাওফীক দান করুন। তো নামাযের ব্যাপারে এক উদাসীনতা হলো এই যে, মানুষ অনিয়মিত কখনো নামায পড়ে কখনো ছেড়ে দেয়। আল্লাহ তা'আলা হেফাজত করুন। আমীন।

জামাতের গুরুত্ব নাই

নামাযের ব্যাপারে দ্বিতীয় যে বড় ধরনের গাফলতি তা হলো, জামাতের গুরুত্ব না দেয়া। পুরুষের জন্য মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করা সুন্নতে মুআক্কাদা। যা ওয়াজিবের কাছাকাছি। হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, কখনো কখনো আমার মনে চায় যে, কাউকে নির্দেশ দেই যে, কাউকে ইমাম বানিয়ে তুমি নামায শুরু করে দাও। এরপর আমি দেখব, কে কে মসজিদে যায়নি। তাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিব।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অন্তিম শয্যায় ছিলেন, তখন অসুস্থতার কারণে এমন অবস্থা হয়েছিল যে, তিনি কয়েক ওয়াক্ত মসজিদে তাশরীফ আনতে পারেন নাই। কিন্তু একদিন কিছুটা সুস্থতা বোধ করলেন দুইজন সাহাবীর কাঁধে ভর করে মসজিদে গমন করেন। উদ্দেশ্য এটা বোঝানোর যে, মসজিদের জামাত এমন না যে মানুষ তা থেকে গাফেল থাকবে। অসুস্থতার মাঝে যখনই সম্ভব তখন মানুষের উচিৎ মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করা। নামাযের প্রতি উদাসীনতার একটা অর্থ হলো যে, জামাতে নামায আদায় না করে একাকী নামায আদায় করা।

জামাতের ছাওয়াব

অসংখ্য হাদীছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাতের সাথে নামায পড়ার ব্যাপারে জোর তাকীদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, মসজিদে নামায পড়া ঘরে একাকী নামায পড়ার থেকে পঁচিশগুণ বেশী ছাওয়াব। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, সাতাশ গুণ বেশী ছাওয়াব। অর্থাৎ যদি ঘরে পড়েন তাহলে সাতাশ ভাগের এক ভাগ ছাওয়াব পাবেন। আর যদি মসজিদে পড়েন তাহলে সাতাশ গুণ বেশী ছাওয়াব পাবেন।

নামাযের আদব এবং শর্তসমূহের প্রতি লক্ষ্য না রাখা

তৃতীয় আরেকটা উদ্দেশ্য হলো যে, নামাযকে তার আদব ও শর্ত শারায়েতের সাথে আদায় না করা। নামায তো পড়ছে কিন্তু দায়সারাভাবে। না নামাযের আরকান এবং সহী তরীকায় নামাযের প্রতি খেয়াল আছে, না নামাযের প্রতি কোন মনোযোগ আছে যেন মাথা থেকে একটা বোঝা নামানোর জন্য এসে দাঁড়াল। মেশিন চালু করল। একদমে ফিনিশ করে ফেলল। এরপর চলে গেল। এমন হয়ে থাকে মুনাফেকদের নামায, একজন সাচ্চা মুসলমানের নামায কখনও এমন হতে পারে না।

প্রতিটি বিষয়ের নিয়ম কানুন থাকে

সব ক্ষেত্রেই কিছু নিয়ম-কানুন থাকে। মানুষ খেলাধুলা করে, সেখানেও নিয়ম কানুন আছে। মানুষ তা মেনে চলে। তো আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর ইবাদত। এরও কিছু কানুন রয়েছে। মানুষ এত গাফেল, যখন নামাযের ইচ্ছা করে তখন নামায পড়া শুরু করে। না নিয়ম নীতির তোয়াক্কা করে না সেগুলো শেখার প্রয়োজন বোধ করে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মতান্ত্রিকভাবে গুরুত্বের সাথে সাহাবায়ে কেরামকে নামায শিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম তাদের শাগরেদ, শিষ্যদের নামায শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত উমর রা. হযরত উসমান রা. তখন খলীফা আমীরুল মুমিনীন। অর্ধজাহানের বাদশা। কিন্তু মানুষকে বলছেন যে ওযুর তরীকা কী? সঠিক পদ্ধতিতে কীভাবে ওযু করা হয়। সঠিক পদ্ধতিতে কীভাবে নামায পড়া হয়। প্রতিটি বিয়য় খুলে খুলে বলেছেন। যখন হাত উঠাবে, তো কোন পর্যন্ত উঠাবে। যখন হাত কোমরে বাঁধবে তখন কীভাবে বাঁধবে। নামাযে দৃষ্টি কোথায় থাকবে। রুকু সিজদা কীভাবে করবে। এগুলো সব শিখার বিষয়।

সুন্নতের নূর হাসিল হবে না

যখন মানুষ সুন্নত সম্পর্কে বেখবর থেকে নামায পড়ে তখন তার সুন্নতের নূর ও বরকত হাসিল হয় না। সুন্নাতের ছাওয়াব অর্জন হয় না। নামাযের সুন্নাতের ব্যাপারে আমার একটি ছোট্ট পুস্তিকা আছে। নাম নামায সুন্নত মোতাবেক পড়ুন। নামাযে সাধারণত যে জাতীয় ভুল হয় এতে তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে। একটু চিন্তার বিষয়, একটু লক্ষ্য করার বিষয়। মানুষ যদি একটু লক্ষ্য করে নামায পড়ে তাহলে তার নামায সুন্নত মোতাবেক হয়ে যাবে। সুন্নতের নূর তার হাসিল হয়। অন্যমনষ্কভাবে নামায পড়ার কী ফায়দা? নামাযে কীভাবে হাত বাঁধবে? কোন পর্যন্ত রুকু করবে? কীভাবে সিজদা করবে? দাঁড়ানোটা কেমন

হবে? এগুলো সব শেখার বিষয়। নামায শিক্ষার অসংখ্য কিতাব মুদ্রিত হয়েছে। কম বেশী সব ভাষায়ই মুদ্রিত হয়েছে। নামাযের মাসলা মাসায়েল বিশদভাবে বর্ণনার ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরাম কোন কমতি করেন নি। আল-হামদুল্লিাহ।

মুফতীয়ে আজম পাকিস্তান এবং নামাযে ইশকাল

আমার মুহতারাম আব্বাজান মাও. মুফতী শফী সাহেব র. বলতেন যে, নামাযের মাসআলা মাসায়েল কখনো কখনো অত্যান্ত সূক্ষ্ম হয়ে যায়। তিনি বলেন, শৈশব থেকে পড়া এবং পড়ানো তে নিয়োজিত। নামাযের মাসআলা শেখা এবং শেখানোতে নিয়োজিত। পড়ছি, পড়াচ্ছি, ফতোয়া দিচ্ছি। এ কথা তিনি তখন বলেছেন যখন বয়সকাল ষাট বছর যাবৎ এই কাজ করছেন। তিনি বলেন, এরপরও কখনো কখনো নামাযে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, বলতে পারি না এখন হুকুম কী। আর কীভাবে হলো? আমার এখন কী করা উচিৎ? ষাট বছরের এই দীর্ঘ সফরের পরও কখনো কখনো এই অবস্থার সম্মুখীন হন। তিনি বলতেন, আমি দেখি যে, সাধারণ মানুষ নামায পড়ে, তাদের কোন খেয়ালই আসেনা যে, কী পড়ছে। তাদের কখনো এই চিন্তা আসে না যে, আমার নামায ঠিক হচ্ছে কি হচ্ছে না। তো ভাই! এ কথাই আল্লাহ তা'আলা বলছেন, তারা নামায পড়ে কিন্তু নামাযের ব্যাপারে বড়ই উদাসীন, বড়ই বে-খবর।

খালি মাথায় নামায পড়া সুন্নাতের খেলাফ

আমাদের আজকের সমাজে এমন অনেক বিষয় আছে যা সুন্নত-পরিপন্থী। এ ব্যাপারে মানুষের কোন পরোয়া নাই। মানুষ তো কখনো ভুল মাসআলা বুঝে থাকে। যেমন, খালি মাথায় নামায পড়া। কখনো কখনো নামাযের আদবের মধ্যে শামিল যে মানুষ মাথা ঢাকবে। টুপি পাগড়ি ইত্যাদি মাথায় রাখবে। অথচ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো খালি মাথায় নামায পড়েন নি। ছাহাবা কেরামের অবস্থাও তাই ছিল। কিন্তু আজকাল এই প্রচলন হয়ে গেছে যে, মানুষ খালি মাথায় থাকে। ঐ অবস্থায় মসজিদে চলে আসে। আমি এটা বলছি না যে, খালি মাথায় নামায পড়লে নামায হয় না। বরং সুন্নাতের ছাওয়াব, সুন্নাতের নূর, সুন্নাতের বরকত থেকে মাহরুম হয়ে যায়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে তরীকা ছিল মানুষের তা লাভ হয় না। এর কারণে নামাযের বরকত কমে যায়। এটাও একটা বেপরোয়া ভাব। মানুষ সামান্য একটু ফিকির করলেই বিষয়টা শোধরানো যায়। আরো কত অসংখ্য বিষয় আমাদের সমাজে ছড়িয়ে আছে যা ভুল। আদবের পরিপন্থী। কিন্তু মানুষ এ ব্যাপারে বে খবর। অথবা পরওয়া করছে না। ফলে সুন্নাতের নূর থেকে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে।

আদব ও শর্তবিশিষ্ট নামায

নামাযকে আল্লাহ তা'আলা এমন ইবাদত বানিয়েছেন যে, আল্লাহর ফযল ও করমে আদব ও শর্ত শারায়েতের সাথে নামায আদায় করা হলে তার ফলাফল নামায এমন সর্বব্যাপী কল্যাণকর ইবাদত বানিয়েছেন যে, যদি কেউ ওযু থেকে শুরু করে নামাযের ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতগুলো যথাযথভাবে আদায় করে, তাহলে এই নামাযের কার্যকারিতা আবশ্যম্ভাবী, যা আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বয়ান করেছেন– এই আয়াতে কারীমা ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر নিশ্চয় নামায মানুষকে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। শর্ত হলো নামাযকে নামাযের মত পড়তে হবে। ঐ তরীকায় করতে হবে যে তরীকা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন।

জামাতে কাতার সোজা করার গুরুত্ব

নামাযের কাতার সোজা করার গুরুত্ব সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যদি তোমরা কাতার সোজা না করো তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে, বিরোধ সৃষ্টি করে দিবেন। একটা কাজ, দাঁড়ানোর সময় খেয়াল করবে, আমার ডানে, বামে যারা আছে আমি তাদের মাঝে সোজা থাকব। পা, কাঁধ বরাবর থাকবে। এটা তো কোন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু উদাসীনতার কারণে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মনের মধ্যে বিরোধ দেখা দিবে। দেখুন আজ কেমন অন্তঃবিরোধের জন্ম হচ্ছে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্ববিষয়ের আদব শিক্ষা দিয়েছেন। আর শরীয়ত কত সুশৃঙ্খল পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। কাতার সোজা রাখো। এক সারিতে দাঁড়াও আল্লাহ তা'আলা 'সূরা সাফ্ফাতে, সারিবদ্ধদের কসম খেলেন– والصفات صفا কসম ঐ লোকদের যারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়। এই সকল বিধান জানা আবশ্যক। আর এথেকে বেপরোয়া থাকার ফলে মানুষ ঐ আয়াতের লক্ষ্যবস্তু হয়ে যায়– তারা তো নামায পড়ে, কিন্তু নামাযের ব্যাপারে বড়ই উদাসীন।

ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে যাওয়া

জুমার দিন মানুষের বড় সমাগম হয়। তাই হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন, মানুষের ঘাড় টপকিয়ে সামনে যেতে তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। বলতেন, যেখানে জায়গা পাচ্ছো বসে যাও।

যখন জামাত দাঁড়ায় তখন কোথাও ফাঁকা জায়গা পেলে দাঁড়িয়ে যাও। হাদীছে আছে যে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুৎবা দিচ্ছিলেন, আর এক ব্যক্তি এভাবে ঘাড় ডিঙ্গিয়ে আগে বাড়ছিল তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুৎবা বন্ধ করলেন– إجلس فقد آذيت বসে যাও। কেননা তুমি মানুষকে কষ্ট দিচ্ছ। শরীয়ত এ ব্যাপারে সবসময় সজাগ দৃষ্টি রাখে যে, একজন মানুষের কোন কাজের কারনে অন্য কেউ যেন সামান্য কষ্ট না পায়। এজন্য ঘাড় টপকানো থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এগুলো সবই শেখার বিষয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের কী কী আদব ও শর্ত বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ ঐ সব আদব কায়দা শেখা। নামায শিক্ষার অনেক কিতাব মুদ্রিত হয়েছে, তার মাধ্যমে নামাযকে ঠিক করা। এরপর নামাযের আদব ও শর্তের প্রতি খেয়াল রাখা যাতে উক্ত আয়াতের, হুমকির মুখে না পড়ে যাই যে ঐ সকল নামাযীর জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি যারা নামাযের ব্যাপারে উদাসীন, বে-খবর গাফেল। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার ফযল ও করমে ঐ আয়াতের সকল প্রকারের লক্ষ্যবস্তু হওয়া থেকে হেফাজত করুন, আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ –

সূরা কাফিরূন (১)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَآ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ○ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ○ وَلَآ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ○ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ○ وَلَآ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ○ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ ○ آمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ - وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

ফজরের নামাযে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! আমি এখন আপনাদের সামনে যে সূরা তিলাওয়াত করেছি, এই সূরাকে সূরাতুল কাফিরূন বলে, এর আরেক নাম সূরাতুল ইবাদাহ। আর এটা এমন সূরা যা অধিকাংশ মুসলমানের মুখস্থ এবং অধিকাংশ সময় নামাযে পড়া হয়। হাদীছে এই সূরার অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রেওয়ায়াত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকাত সুন্নাতের প্রথম রাকাতে সাধারণত قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ এ পড়তেন। এবং দ্বিতীয় রাকাতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়তেন। ফজরের আগের সুন্নাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দুই সূরা আমল ছিল। এমনিভাবে মাগরিবের পরের দুই রাকাত সুন্নাতেও এই সূরা পড়ার আমল ছিল। এ নামাযে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত : এই সূরা দু'টি পড়তেন।

ঘুমানোর আগে কী পড়া উচিৎ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসংখ্য সাহাবায়ে কেরামকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, রাতে যখন বিছানায় যাও তো ঘুমানোর পূর্বে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ অবশ্যই পড়ো। এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কুফরি এবং শিরক থেকে মুক্তি ও নাজাত দান করবেন। হযরত আনাস (রা.), হযরত জাবের রা. কে নবীজী এই সূরা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ঘুমানোর পূর্বে এই চার সূরা পড়বে–

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ○ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ○ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ○ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○

এগুলোকে চারকুল বলে। চারকুল পড়বে, এরপর হাতে দম করবে, এবং সারা শরীরে হাত ফেরাবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আমল ছিল, এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা অনেক বিপদ আপদ থেকে এবং শয়তান মানুষকে হেফাজত করেন। মোটকথা এই যে, হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময়ে সূরা কাফিরুনের ফযিলত বর্ণনা করেছেন।

সফরে পড়লে পেরেশানী দূর হয়

হযরত জুবাইর বিন মুতয়িম রা. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন তরীকা বাতলে দিব, যদি কখনো তোমরা সফর করো এবং এর উপর আমল করো তো সফরে তোমরা অন্যদের থেকে উত্তম অবস্থায় থাকবে। অন্যদের তুলনায় অধিক নিরাপদ নিশ্চিন্ত থাকবে। হযরত জুবাইর বিন মুতয়িম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো বিভিন্ন সময় সফর করি। কোন সন্দেহ নাই, এমন আমল আমার প্রয়োজন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা সফরে এই পাঁচটি সূরা– সূরাতুল কাফিরুন, সূরা নাসর, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়বে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সফরে কামিয়াব করবেন এবং ভাল অবস্থায় রাখবেন। হযরত জুবাইর বিন মুতয়িম রা. বলেন, এরপর থেকে আমি আমল বানিয়ে নিয়েছি। যখন কোন সফরে যেতাম তখন এই সূরাগুলো খুব বেশী তিলাওয়াত করতাম। ইতোপূর্বে আমি যত সফরে গিয়েছি সে সকল সফরে আমাকে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়েছে। পেরেশানী ভোগ করতে হয়েছে। কখনো কখনো অর্থ সংকট, অনাহার ও নিঃস্বতার কবলে পড়েছি কিন্তু যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতলানো এ আমল শুরু করলাম, এই পাঁচ

সূরা তিলাওয়াত শুরু করলাম, তখন আল্লাহর ফযল ও করমে আমার প্রতিটি সফর সফল হচ্ছিল, প্রতিটি সফর ভালভাবে অতিক্রান্ত হচ্ছিল। এটাও এই সূরার ফযীলত।

বিচ্ছু দংশনের ক্রিয়া দূর হয়

এক রেওয়ায়েতে আছে যে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি বিচ্ছু দংশন করেছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দংশন স্থানের উপর লবণ ও পানি ঢালছিলেন এবং قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ তিলাওয়াত করছিলেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করমে ঐ দংশনের ক্রিয়া দূর হয়ে গেল। মোটকথা এই সূরার ফযীলত আরো অনেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এজন্য আমাদের উচিৎ আমাদের আমলে এই সূরা রাখা। কমপক্ষে, ফজরের এবং মাগরিবের সুন্নাতে, ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে এবং হালতে সফরে এই সূরা তিলাওয়াত কে আমল বানানো চাই। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

এই সূরার শানে নুযূল

সূরার তাফসীরের পূর্বে শানে নূযুল জেনে নেয়া প্রয়োজন। বর্ণিত আছে যে, যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় ইসলামের দাওয়াত শুরু করলেন এবং লোকদেরকে তাওহীদ ও একত্ববাদের দিকে আহ্বান করতে শুরু করলেন, তখন যাদের ভাগ্যে হেদায়াত ছিল তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দিল এবং ইসলামে প্রবেশ করল। প্রতিমা পূজা ছেড়ে একত্ববাদের ঘোষণা হলো। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা'লীম অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত শুরু করলেন। কিন্তু মক্কার অনেক বড় বড় কাফের মুশরিক সর্দার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত গ্রহণে তাদের এই আশংকা ছিল যে, তাদের পদমর্যাদা ঝুঁকির মুখে পড়বে। তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতায় কোমর বেঁধে নেমেছিল। যখন মক্কায় মুসলমানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হলো তখন এই কাফেরদের ভয় হলো যে, যদি এই সংখ্যা আরো বেড়ে যায় তাহলে আমাদের জন্য সমস্যারূপে দেখা দিবে। তখন একদিন মক্কার বড় বড় কতিপয় সর্দার আছ বিন ওয়ায়েল, ওয়ালীদ বিন মুগীরা এবং জনৈক হাবশী ব্যক্তি এই তিনজন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে একটি সন্ধিচুক্তি পেশ করল। তারা বলল, আমাদের এবং আপনাদের মাঝে বিরোধ দিন দিন বেড়েই চলছে এবং মক্কা মুকাররমায় দুই দলের (সমস্যা) প্রকট হচ্ছে। তাদের মাঝে

আলোচনা পর্যালোচনা চলছে এবং কখনো কখনো অপ্রীতিকর ঘটনা ও ঘটেছে। এবং আমাদের পক্ষ থেকে মুসলমানগণ যুলুম-নির্যাতন ও অন্যায়-অনাচারের শিকার হচ্ছে। তো আসুন আমরা একটা ব্যাপারে একমত হয়ে যাই এবং তার উপর সমঝোতা করে নেই।

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করতে পারবো না

তারা সমঝোতার প্রথম প্রস্তাব এইপেশ করল যে, আপনি যেই খোদার ইবাদত করেন এবং যেই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার ইবাদতের প্রতি আহ্বান করেন। আমরাও তার ইবাদত করতে প্রস্তুত। কিন্তু শর্ত হলো, এক বছর আমরা আপনার আল্লাহর ইবাদত করবো। অন্য কারো ইবাদত করবো না। এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন। প্রতিমা পূজা করুন। এবং এতে আমাদের শরীক হয়ে যাবেন। আমরা এক বছর আপনার ধর্মের উপর আমল করবো। এক বছর আপনি আমাদের দ্বীন অনুযায়ী আমল করুন। তো এভাবে আমাদের মাঝে সমঝোতা হতে পারে, এরপর আমাদের লড়াই বন্ধ হবে এবং বিরোধের ঝড় থামবে।

আসল কথা হলো, তারা একটি পর্যায় পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলাকে মানত। কিন্তু সাথে সাথে তারা মূর্তিগুলোকে অংশীদার বানিয়ে রাখতো। এজন্য তারা চিন্তা করে দেখল আমাদের কোন ক্ষতি নেই। এভাবে প্রতিমা পূজাও চলবে এবং আল্লাহ তা'আলার ইবাদতও বাকি থাকবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বছর আমাদের প্রতিমা পূজা করলে আমাদের মর্যাদা বাড়বে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, এটা অসম্ভব। আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করতে পারবো না। আমি তো এই লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছি যে মানুষকে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের দিকে আহ্বান করবো এবং মানুষকে শিরক থেকে বিরত রাখবো। আমি এই প্রস্তাব গ্রহণে অক্ষম।

কাফেরদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব

তারা আরেকটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করলো যে, এমন করতে পারেন যখন মসজিদুল হারামে আসেন তখন মসজিদুল হারামে আপনার যিনি খোদা তাকে মানবেন। তার ইবাদত করবেন। কিন্তু কা'বার ভেতর যে সকল মূর্তি আছে, সেগুলো শুধু স্পর্শ করবেন। এছাড়া আপনি আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে থাকুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রস্তাবও নাকচ করেছিলেন। এরপর তৃতীয় তীর ছুঁড়ল। তারা বলল, আমরা আপনাকে সর্দার রূপে মেনে

নিব। আমাদের সকল সম্পদ আপনার খেদমতে পেশ করবো এবং মক্কার অনিন্দ্য সুন্দরীদের আপনার সেবায় নিয়োজিত করবো। আপনি শুধু এতটুকু করেন যে, আপনি আমাদের উপাস্যগুলো অস্বীকার করবেন না। শুধু নীরব থাকবেন। একথা বলবেন না যে, এই মূর্তিগুলো উপাস্য নয়। নীরবতা অবলম্বন করুন। উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা সূরা কাফিরুন নাযিল করলেন এবং তাদের প্রস্তাবের উত্তর শিক্ষা দিলেন।

তোমরা আল্লাহর ইবাদত করতে না

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে, তাদের প্রস্তাবের উত্তরে আপনি বলেন, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ হে কাফের সকল। لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ আমি ঐ সকল বস্তুর ইবাদত করি না যেগুলোর ইবাদত তোমরা করো। وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ আর না তোমরা ঐ খোদার ইবাদত কর যার ইবাদত আমি করছি। অর্থাৎ একথা বলা উদ্দেশ্য যে যদিও নাম নিচ্ছো আল্লাহর, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন, তোমরা তাকে মানো না।

لبيك اللهم হে আল্লাহ আমি হাযির-আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নাম নেয়। কোরআনে আছে যে, যখন তারা জাহাজে সফর করে এবং ঝড়ের কবলে পড়ে জাহাজ ডুবার উপক্রম হয় তখন সব দেবতার নাম ভুলে শুধু আল্লাহর নাম জপতে থাকে। আয় আল্লাহ! আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। আর যখন আল্লাহ তা'আলা বিপদ থেকে উদ্ধার করেন এবং জাহাজ তীরে ভিড়িয়ে দেন তখন তারা আল্লাহকে ভুলে যায়। এবং তাদের ভূত-প্রেতদের নাম জপতে শুরু করে। আল্লাহ তা'আলাকে তো মানে এবং মুখেও বলে আমরা আল্লাহকে মানি। কিন্তু এই হল তাদের আল্লাহকে মানা!

তোমাদের খোদা এবং আমাদের আল্লাহ

কিন্তু এই আয়াতে কারীমা একথা বলে যে, وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ যেই খোদার আমি ইবাদত করছি বাস্তবে তোমরা ঐ খোদার ইবাদত কর না। যদিও বা তার নাম নাও। কিন্তু তিনি তোমাদের আসল খোদা নন বরং অন্য কিছু তোমাদের খোদা যার উপাসনা তোমরা কর। আর আমার খোদা অন্য কেউ, আমি তাঁর ইবাদত করি। এজন্য আমার খোদা তো ঐ সত্তা, যার কোন সঙ্গী-সাথী নাই। যার কোন অংশীদার নাই। যিনি কারো মুহতাজ নন। যিনি বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও অধিপতি। তিনি একাই বিশ্বজগত পরিচালনা করছেন। তিনিই

খোদা, আর তোমরা আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে যেই খোদার কথা বলছো তা তোমাদের ধারণা ও কল্পনা মাত্র। সে তো এমন খোদা যে তার সকল শক্তি প্রতিমাকে দিয়ে নিষ্কর্মা বসে আছে। এখন যা কিছু করার এই প্রতিমাগুলোই করছে। রিযিক দিচ্ছে তো প্রতিমাগুলোই দিচ্ছে। সন্তান দান করছে তো দেব-দেবী দান করছে। সুস্থ করছে তো ঠাকুর করছে। ঐ জন্য যে খোদাকে তোমরা মানছো সে ভিন্ন কোন খোদা। আর আমি যে খোদাকে মানি তিনি অন্য কোন খোদা। وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ তোমরা ইবাদতকারী নও ঐ খোদার যার ইবাদত আমি করি। আমি তো ঐ খোদার ইবাদত করি, যার কোন শরীক নাই। যে খোদার কোন সাথী নাই। আর তোমরা ঐ খোদার ইবাদত করো যার অগণিত অসংখ্য শরীক রয়েছে। লাত, উয্যা, মানাত, হুবাল। আল্লাহ ভাল জানেন তোমরা কত না নাম বানিয়ে নিয়েছ।

আমি তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবো না

প্রথমে বলেছেন, وَلَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ, আমি ইবাদত করি না ঐ সকল উপাস্যের, যেগুলোর উপাসনা তোমরা কর। ভবিষ্যতের জন্য বলেছেন, وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ তোমরা এখন পর্যন্ত যাদের উপাসনা করছ ভবিষ্যতেও আমি সেগুলোর ইবাদত করবো না। তোমরা ধোঁকার মধ্যে আছো যে, এমন একটা সময় আসবে যখন আমি তোমাদের উপাস্যগুলোর উপাসনা করবো। وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ যাদের তোমরা উপাসনা করছো কেয়ামত পর্যন্তও কস্মিনকালেও আমি সেগুলোর উপাসক হবো না।

তোমরা ভবিষ্যতেও ঈমান আনবে না

لَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ এরপর দুইবার এই আয়াত পুনরাবৃত্তি করেছেন যে, তোমরা ভবিষ্যতেও ইবাদত করবে না ঐ খোদার, যার আমি ইবাদত করি। তার ইবাদত তোমরা ভবিষ্যতেও করবে না। এটা ঐ কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা, যাদের ব্যাপারে নিশ্চিত যে, তারা কখনো ঈমান আনবো না। যে কাফেররা সমঝোতার প্রস্তাব পেশ করেছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জানতেন যে, এদের সামনে যতই উজ্জ্বল, অকাট্য প্রমাণ পেশ করা হোক এরা কখনোই সত্যকে মেনে নেবো না। এজন্য তাদের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, তোমরা ভবিষ্যতেও ঐ খোদার ইবাদত করবে না আমি যার ইবাদত করছি।

আমার জন্য আমার ধর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম

আমার এবং তোমাদের মাঝে অবস্থা যখন এমন তখন لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাকে যে ধর্ম শিখিয়েছেন, আমি যার ঘোষক তা ভিন্ন দ্বীন। আর তোমরা যে ধর্মের উপর অটল ও অনড় হয়ে আছো তা ভিন্ন দ্বীন। এজন্য তোমরা যে প্রস্তাব পেশ করছো তা আমি কী করে গ্রহণ করতে পারি। এটাই এ সূরার ভাষ্য।

হাদীছ শরীফে এসেছে যে, যখন এই সূরা নাযিল হয় তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারামে তাশরীফ নিলেন। যারা সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল তিনি তাদেরকে সুউচ্চ স্বরে এই সূরা পড়ে শোনালেন। তারা বুঝতে পারলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় অবস্থান থেকে একটুও সরে আসবেন না। উক্ত আয়াতে কারীমার তাফসীর এটুকুই।

এই সূরা থেকে আমাদের অনেক ফায়দা হাসিল হয় এবং এতে রয়েছে বড় বড় হিদায়াত ও নির্দেশনা। কিন্তু এখন সময় শেষ। আল্লাহ যদি হায়াতে বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে সামনের জুমায় ইনশাআল্লাহ আরো তাফসীর পেশ করবো। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে স্বীয় ফযল ও করমে এবং আপন অনুগ্রহে এই দ্বীন বুঝার এবং তার উপর অটল থাকার এবং তদানুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ –

সূরা কাফিরূন (২)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَآ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ○ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ○ وَلَآ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ○ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ○ وَلَآ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ○ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ○ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

ভূমিকা

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! আমি আপনাদের সামনে সূরা কাফিরূন তিলাওয়াত করলাম। গত জুমায় আপনাদের সামনে উক্ত সূরার তরজামা, তার ব্যাখ্যা ও তাফসীর পেশ করার চেষ্টা করেছিলাম। আজ তার পরিশিষ্ট বর্ণনা করবো। এই সূরা কুরআনে কারীমের সংক্ষিপ্ত সূরাগুলোর একটি। অধিকাংশ মুসলমানের এই সূরা মুখস্ত আছে এবং নামাযেও পড়া হয়।

সূরা কাফিরুনের ফাযায়েল

হাদীছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সূরার অনেক ফযীলত বর্ণনা করেছেন। যার কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ আমি গত জুমায় করেছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ছিল এই যে, তিনি ফজরের সুন্নতে প্রথম রাকাতে قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ এবং দ্বিতীয় রাকাতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়তেন। কখনো কখনো অন্য সূরাও পড়তেন। তবে সাধারণত এই দুই সূরা-ই পড়তেন। এমনিভাবে অধিকাংশ সময় মাগরিবের সুন্নাতেও এই দুই সূরার আমল ছিল। এজন্য ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, ফজরের এবং মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নাতে

এই দুই সূরা তিলাওয়াত করা উত্তম। আবার এটাকে আবশ্যক বানিয়ে নেয়া উচিত নয় যে সর্বদা এই সূরা পড়া, অন্য কোন সূরা না পড়া। তবে অধিকাংশ সময় পড়া ভাল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে শোয়ার পূর্বেও এই সূরা তিলাওয়াত করতেন।

কাফেরদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব

গত জুমায় আমি আলোচনা করেছিলাম। শুধু স্মরণ করানোর জন্য বলছি যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কার কাফের সর্দাররা এই প্রস্তাব দিয়েছিল যে, যদি আমরা একটি বিষয়ের উপর সন্ধি করে নেই তাহলে আপনাকেও, আপনার সাথীদেরকে মক্কায় যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, জুলুম নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে তার পরিসমাপ্তি ঘটবে। তা এই যে, এক বছর আপনি আমাদের দেব-দেবীর উপাসনা করবেন। আর এক বছর আমরা আপনার আল্লাহর ইবাদত করবো। যদি আপনি এই প্রস্তাব মেনে নেন তাহলে আমাদের এবং আপনাদের মাঝে সকল শত্রুতা ও ঝগড়া-বিবাদ শেষ হয়ে যাবে এবং আমরা নিশ্চিন্ত থাকবো। আপনাকে কোন কষ্ট দিব না।

সূরা কাফিরূনের তরজমা

তাদের প্রস্তাবের উত্তরে এই সূরা অবতীর্ণ হলো। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছে যে, قل অর্থ বলো। অর্থাৎ ঐ কাফেরদের বলে দিন যারা সন্ধি প্রস্তাব করেছে, يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ হে কাফের সকল, لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ আমি ঐ সকল উপাস্যের উপাসনা করি না যাদের উপাসনা তোমরা করো। যে দেব দেবীর সামনে মাথা ঝুঁকাও আমি তাদের ইবাদত করি না। وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ আর না তোমরা ঐ খোদার ইবাদত করো আমি যার ইবাদত করি। আগামীর জন্য বলেছেন, وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ এখনও করি না, ভবিষ্যতেও করবো না। আমি ইবাদত করবো না ঐ সকল দেব-দেবীর, যাদের উপাসনা তোমরা করো। وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ আর না তোমরা ইবাদত করবে ঐ সত্তার যার ইবাদত আমি করি। অর্থাৎ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আমাদের জন্য আমাদের দ্বীন। এ ব্যাপারে কোন সমঝোতা হতে পারে না। এটুকু এই সূরার তরজমা।

আল্লাহকে কাফেরও মানে

আমি ওয়াদা করেছিলাম যে এই সূরা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও নির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করবো।

প্রথমে যে বিষয়টি এই সূরা থেকে জানা যায় তা এই যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার ইবাদত করা বান্দার দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর তা তখনই গ্রহণযোগ্য যখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার সাথে কোন কিছুকে শরীক করা হবে না। অন্যথায় আয়াতে কারীমায় তো বলা হয়েছে, وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ তোমরা ঐ আল্লাহর ইবাদত করো না আমি যার ইবাদত করি। কেননা, তারাও আল্লাহ তা'আলাকে মানে। মক্কা মুকাররমায় মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতো না। তারাও মানত যে বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা। কোরআনুল কারীমের বিভিন্ন জায়গায় এসেছে যে–

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ○ (سورة العنكبوت : ٦١)

আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে (তিনি যিনি) আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং চাঁদ সূর্যকে কাজে লাগিয়ে রেখেছেন, তখন তারা অবশ্যই বলবে যে আল্লাহ! তারা আল্লাহ তা'আলাকে স্রষ্টা মানে এবং তাঁকে এই বিশ্বজগতের খালেক মালেক মনে করে। তারা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না। বরং তাঁকে মানে এবং এবং তাঁর ইবাদত করে।

আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করে

ঐ কাফের মুশরিকরা কোন কাজ, কোন লেখা শুরু করে بسمك اللهم বলে এবং লেখে আয় আল্লাহ! আপনার নামে শুরু করছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' শিখিয়েছেন। তারা বাইতুল্লাহর তাওয়াফও করতো। বাইতুল্লাহকে আল্লাহর ঘর মানত; বাহ্যত আল্লাহর ইবাদত করত। কিন্তু এরপরও কোরআন বলছে- وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ আমি যেই আল্লাহর ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদত করো না। এর উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলা যে সকল গুণে গুণান্বিত তোমরা সেগুলোর সাথে গুণান্বিত অবস্থায় তাকে মানো না।

তারা দেবদেবীকে অংশীদার মনে করে

আসলে তারা একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল না। আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করে মানতো না। তাদের বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ তা'আলা সারা বিশ্ব কুলকায়েনাত, সকল মানুষকে, সকল প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি তাঁর সকল ক্ষমতা কিংবা আংশিক ক্ষমতা দেব-দেবীকে সোপর্দ করে দিয়েছেন। কোন দেবতাকে

এই ক্ষমতা দিয়েছেন যে সে মানুষকে রিযিক দিবে। কিংবা কাউকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন যে, রোগীকে আরোগ্য দান করবে। অন্যান্য দেবতাকে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়েছেন। এজন্য ঐ সকল দেবতার উপাসনা করা উচিৎ যাতে তারা আমাদের রিযিক দান করে। আমাদের কে আরোগ্য দান করে। সন্তান দান করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা মুখে এই কথা বলো যে আমরা আল্লাহকে মানি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে মানো না। কারণ তোমরা আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে এই কল্পনা করে বসে আছো যে বিশ্বজগত সৃষ্টি করে তিনি অকর্মা হয়ে বসে আছেন। তার সকল ক্ষমতা, এই দেব-দেবীকে সঁপে দিয়েছেন। তো এটাতো আল্লাহকে মানা বলে না। এটাকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বলে না।

সমুদ্রের ঝড়ে এই কাফেররা শুধু আল্লাহকেই ডাকে

কোরআনে অন্যত্র বলেছেন যে, এই কাফেররা যখন সমুদ্রে আরোহণ করে এবং সমুদ্রে ঝড় ওঠে। উত্তাল তরঙ্গ জাহাজকে কাত করে ফেলে। মনে হয় এই ডুবে যাচ্ছি। তখন তাদের দেবতাদের কথা মনে পড়ে না। তখন শুধু আল্লাহকেই ডাকে, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। আমাদের জাহাজ কূলে ভিড়িয়ে দেন। কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উদ্ধার করেন এবং ঘরে ফিরিয়ে আনেন, তখন প্রতিমা পূজা শুরু করে দেয়। এটা আল্লাহর ইবাদত না। এটা শুধু আল্লাহর নাম নেয়া। কিন্তু আল্লাহর ইবাদত না, কেননা তোমার ইবাদতের মধ্যে তার সাথে অন্যান্য দেবতাদের শরীক করো।

শিরকী আক্বীদা থেকে বাঁচা

উক্ত আলোচনা থেকে আমি আপনি এই শিক্ষা পাই যে, আজ আমাদের কারো কারো আক্বীদা বিশ্বাস এবং কাফের মুশরিকদের আক্বীদা বিশ্বাস ও কাজের নামান্তর। যেমন : কেউ কোন মানুষ, কোন নবী, কোন ওলী কোন বড় বুযুর্গ সম্পর্কে, বলে যে তিনি সমস্যার সমাধানকারী, প্রয়োজন পূর্ণকারী, সর্বশক্তিমান। এর অর্থ এই দাঁড়ায়, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁকে (বুযুর্গকে) এই ক্ষমতা দান করেছেন যে, তিনি সমস্যার সমাধান করবেন, তিনি আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। মনে রাখবেন, কোন নবী কিংবা কোন বড় বুযুর্গ অথবা ওলীআল্লাহ, তারা আমাদের চোখের মণি, আমাদের অন্তরে তাদের সম্মান ও ইহতেরাম থাকা দ্বীনী দায়িত্ব। কিন্তু তাদেরকে আল্লাহর সাথে মিলানো। আল্লাহ তা'আলার কোন গুণ তাদের দিকে সম্পৃক্ত করা, তাদের কাছে কাঙ্ক্ষিত বিষয় চাওয়া এবং এ কথা বলা যে, আপনি আমাদের মাকসুদ পুরা করুন -এটা শিরকী আকীদা। এটা কুফরী বিশ্বাস।

গ্রামাঞ্চলে ভ্রান্ত বিশ্বাস

বিশেষ করে আমাদের গ্রাম-অঞ্চলগুলোতে গিয়ে দেখুন, সেখানে কেউ অসুস্থ হলে আরোগ্য প্রার্থনা করার জন্য তাকে মাযারে নিয়ে যায়। অমুক মাযারে গিয়ে বলে আয় দাতা! আমাকে রোগমুক্ত করুন। আয় দাতা! আমাকে সন্তান দান করুন। কবরে গিয়ে কবর-ওয়ালার কাছে প্রার্থনা করে। কবরে যে বুযুর্গ আছেন, তার মর্যাদা, সম্মান, ইহতেরাম তো ঠিকই আছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার খাস সিফাত তার সাথে সম্পৃক্ত করা মানুষকে শিরক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। যে সম্পর্কে কোরআন বলেছে, যদি তোমরা এমন কর তবে তো তোমরা আল্লাহর ইবাদত করছ না।- وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ তোমরা আমার ইবাদত করো না, তোমরা তো তাদের উপাসনা শুরু করেছো।

মাযারে গিয়ে কী করা উচিৎ

আমাদের এখানে অনেক সুফিয়ায়ে কেরাম অতিবাহিত হয়েছেন। যেমন হযরত আলী হাজবীরী (রহ.), যার মাযার লাহোরে আছে। (যিনি প্রসিদ্ধ দাতা ছিলেন) হযরত আলী হাজবীরী (রহ.) অনেক উঁচুমানের বুযুর্গ ছিলেন। তাকে সম্মান করা, মর্যাদা দেয়া সব মানুষের কর্তব্য আমরা কখনো কখনো তাঁর মাযারে যাই। মাযারে যাওয়ার উদ্দেশ্য হলো, সেখানে গিয়ে তাঁকে সালাম পেশ করা। হাদীছ শরীফে এসেছে, যখন কারো কবরের সামনে গিয়ে তাকে সালাম পেশ করা হয় তখন তিনি তার উত্তর দেন। কোন বুযুর্গকে সালাম পেশ করা তো ভালো কাজ। তেমনিভাবে সেখানে গিয়ে তাঁকে ঈসালে ছাওয়াব করা -এটাও ভাল কাজ। কোন ব্যক্তি সেখানে গিয়ে তাঁর মর্যাদা বুলন্দ করার এবং তার (মৃত ব্যক্তির) মাগফেরাতের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করে। এবং নিজের জন্যও দু'আ করলে তাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু ঐ মাযারবাসীকে দাতা মনে করে এটা বলে যে, এ আমাকে সন্তান দিবে, রিযিক দিবে, চাকরি দিবে, কামাই দান করবে। العياذ بالله العلى العظيم সুউচ্চ সুমহান আল্লাহর আশ্রয়। এটা তো ঐ ভ্রান্তি যাকে মিটানোর জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন।

কোন বুযুর্গকে দাতা বলা জায়েয নেই

একবার আমি হযরত আলী হাজবীরী (রহ.)-এর মাযারে গেলাম। সালাম পেশ করলাম এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলাম। দেখলাম মানুষের ভিড় লেগে আছে। আমি স্বচক্ষে দেখলাম, মানুষ কবরের উপর সিজদা করছে। এক ব্যক্তিকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই আপনি সিজদা করছেন? এই কপাল

তো আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে ঝুঁকতে পারে না। একমাত্র তাঁর সামনেই ঝোঁকার যোগ্য। আপনি কি এঁকে সিজদা করছেন? উত্তরে সে বলল, জ্বী, আমি তো যা কিছু পেয়েছি তার থেকেই পেয়েছি। আল্লাহ ক্ষমা করুন, এমন আকীদা তো মানুষকে শিরকে পৌঁছে দেয়। আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানকে এ থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

মানুষ অজ্ঞতার কারণে এমন সব আকীদা বিশ্বাস রাখে। নিঃসন্দেহে তিনি বুযুর্গ, তবে বুযুর্গের সম্মান তার স্থানে। কিন্তু মাযারে গিয়ে তাকে আল্লাহর সাথে মিলানো, খোদা সমতুল্য মনে করা, খোদায়ী ছিফাত তার সাথে সম্পৃক্ত করা, এটা তো ঐ বস্তু যাকে নির্মূল করার জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন। গোটা কোরআন এ (শিরকের বিরুদ্ধে আয়াত) দিয়ে ভরপুর।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বড় বুযুর্গ কে?

ঐ কাফেররা খোদাকে অস্বীকার করতো না। তারা বলত খোদা ঐ দেবতাদেরকে ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছিল। ঐ কথাই আজ অন্যভাবে বলা হচ্ছে। মানুষের কোন প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে তো যা বলা হচ্ছে, অমুক মাযারে গিয়ে চাও। মনে রাখবেন এটা অনেক ভয়ানক কথা। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে বাঁচার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে দ্বীন দিয়েছেন তাতে প্রতিটি বস্তুর সীমা নির্ধারিত আছে। জগতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অধিক বুযুর্গ, অধিক উত্তম কে হতে পারে? কেউ হতে পারে না। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দেখো! আমি দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছি। কখনো আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করো না। আমাকে এত আগে বাড়িয়োনা যেমন : ঈসায়ীরা হযরত ঈসা আ. কে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে দিয়েছে। আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। তোমরা এমন করোনা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা সমতুল্য-অন্য কেউ নাই। কিন্তু এই মহান মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি বলেছেন, খোদার সীফাত কী এবং মাখলুক কী। এবং তিনি এও বলেছেন, আমি জানিনা আখেরাতে আমার সাথে কী আচরণ করা হবে। তোমাদের সাথে কেমন করা হবে।[২] এজন্য তোমরা আমাকে উঁচু করে আল্লাহর

---

[২] এ মর্মের বিভিন্ন হাদীছ উল্লেখ করেছেন প্রখ্যাত হাদীছ ও তাফসীরবিদ আল্লামা আবুল ফিদা ইসামঈল ইবনে কাছীর (মৃত্যু : ৭৭৪ হি.) কৃত 'তাফসীরুর কুরআনিল আযীম'-এ, সূরা আহকাফের নবম আয়াতের তাফসীরে।

শরীয়তের স্বতঃসিদ্ধ মৌলনীতির পরিপন্থী হওয়ায় এ মর্মের হাদীছগুলোকে তিনি 'অপছন্দনীয় ও অপরিচিত' আখ্যা দিয়েছেন। এবং পার্থিব জীবনে কী আচরণ অপেক্ষা

সমতুল্য করো না। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন তখন কে আছে এত বড় বুযুর্গ যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদধূলার সমতুল্য হতে পারে। এজন্য কারো ব্যাপারে এরূপ মন্তব্য করা যে, সে মুশকিল আসান করে, সমস্যার সমাধান করে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। নাউযূবিল্লাহ। এ জাতীয় কথা মানুষকে এমন পথে নিয়ে যায় যে পথ ছিল মক্কার মুশরিকদের। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের হেফাজত করুন। আমীন। এই সূরার সর্বপ্রথম শিক্ষা হচ্ছে যে, মুসলমানদের এ জাতীয় আকীদা বিশ্বাস এবং শিরকের ছিটে ফোঁটা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে এ জাতীয় ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাস থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

সন্ধির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত

এই সূরা থেকে আমাদের দ্বিতীয় শিক্ষা লাভ হচ্ছে যে, সন্ধি উত্তম। কিন্তু তখনই উত্তম যখন নিজস্ব স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিতে না হয়। যদি কোন সন্ধি সমঝোতা এমন শর্তের উপর হয় যার কারণে দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কিংবা দ্বীনকে কোরবান, বিসর্জন দিতে হয়। কিংবা দ্বীনের কোন বিধান লঙ্ঘন করতে হয় এমন সন্ধি কোন মুসলমান করতে পারে না। স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধি প্রস্তাবের দ্রষ্টা ছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারায় তিনি অনেক ইহুদীদের সাথে সন্ধি করেছিলেন। হুদাইবিয়ার ঘটনায় মুশরিকদের সাথে সন্ধি করেছেন। খোদ কোরআন বলছে–

করছে নবী ও সাহাবাদের জন্য তা নবীগণ জানতেন না-মর্মে তাফছীরকে গ্রহণ করেছেন। আর একই মত পোষণ করেন ইবনে জারীর তাবারীহ সহ অন্যান্য বিজ্ঞ মুফাসসিরগণ। এ মতকে জোরালো করে যে বিষয়টি তা এই যে, যদি নবী রাসূলগণ পরকালে আল্লাহ তা'আলার পুরস্কার ও সম্মানের ব্যাপারে নিশ্চিত না হন তবে কিসের জন্য কিসের ভিত্তিতে তারা অন্যদেরকে আল্লাহ তা'আলার দিকে ডাকবেন? তাছাড়া বিগত বিভিন্ন নবী-রাসূলগণের সাথে তার কওমের আচরণ ও দ্বিতীয় মতকে জোরালো করে।

সূরা আহকাফের নবম আয়াতে তাফসীরে এজাতীয়, এ অর্থ ও মর্মের হাদীছ উল্লেখ করে প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও তাফসীরবিদ আল্লামা আবুল ফিদা ইবনে কাছীর র. (মৃতু : ৭৭৪ হি.) সে হাদীসগুলো রদ করে দিয়েছেন। এর অন্যতম একটি কারণ হল, আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত এ সকল নবী-রাসূল যদি আখেরাতে নিজ দাওয়াতের উদ্দেশ্য ও গন্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত না হন তবে কিসের ভিত্তিতে কোন দিকে তারা দাওয়াত দেবেন? কিসের জন্য জীবন মরণ তাদের কাছে এক সমান?

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

যদি তারা 'কাফেররা' সন্ধির প্রতি ঝুঁকে তাহলে আপনিও তার দিকে ঝুঁকুন। এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা, সম্যক অবগত। তবে এমন শর্তের উপর সন্ধি করা যেতে পারে যার কারণে দ্বীনের ক্ষতি হবে না এবং তা মুসলমানের গ্রহণ করার অযোগ্য হবে না।

মুশরিকদের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব দেয়া হয়েছে যে, তোমরা এক বছর আমাদের উপাস্যকে উপাসনা করো। আমরাও এক বছর তোমাদের উপাস্যদের উপাসনা করবো। তার উত্তরে বলা হয়েছে-

(যদি তোমরা এমনটা বলো তাহলে) তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমাদের ধর্ম আমাদের। (আমরা সন্ধির জন্য প্রস্তুত নই।)

আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য হয়ে কারো আনুগত্য চলতে পারে না

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কখনো কখনো তর্ক বিতর্ক, বাদানুবাদ হয়। এসকল কারণে কোন কোন সময় সন্ধি বা পরস্পর সমঝোতার প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন দ্বীনের ক্ষতি করে কোন সন্ধি হতে পারে না। কেননা এমন সন্ধি কোন মুসলমানের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন–

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق۔

আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কোন মানুষের আনুগত্য চলতে পারে না। বাপ হোক মা হোক, স্বামী-স্ত্রী সন্তান যেই হোক না কেন যদি কোন কাজ করতে গিয়ে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করতে হয় তাহলে তা করা যাবে না। যদিও মা বাবার আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য। এ ব্যাপারে কোরআন অনেক জোর দিয়েছে। কিন্তু তাদের কেউ যদি গুনাহের আদেশ করে তো কোরআন বলছে যে,

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔

যদি তারা তোমাকে বাধ্য করে, আমার সাথে কোন কিছু শরীক করতে যে বিষয়ে তোমার কোন ইলম নেই। তুমি তাদের আনুগত্য করো না। হ্যাঁ দুনিয়াতে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা, তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা; কিন্তু তাদের ঐ সকল কথা না মানা যা আল্লাহ তা'আলার মরযির খিলাফ -এটাই শরীয়তের

নির্দেশ। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি বস্তুর সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মানুষ তার গণ্ডিতে থেকে যে কাজ করে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাইফা রা.-এর শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাইফা রা. একজন সাহাবী ছিলেন। হযরত ফারুকে আ'যম (রা.) তার খেলাফতকালে তাঁকে জিহাদে পাঠিয়েছেন। আল্লাহর ইচ্ছায় ঐ যুদ্ধে মুসলমানেরা পরাজিত হন। কাফের বাদশাহ মুসলমানদের এক বিশাল সংখ্যা বন্দী করে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাইফা ছিলেন মুসলিম সেনাপতি। বাদশা তাকে ডেকে বলল, তোমরা আমার সামনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা বলো ইসলাম থেকে অব্যাহতি ঘোষণা করো তাহলে আমি তোমাদের ছেড়ে দিবো। হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাইফা রা. বললেন, মরে আবার জীবিত হলেও আমি এই কাজ করবো না। বাদশা বললেন, দেখো! যদি আমার কথা না শোন তাহলে যন্ত্রণা দিয়ে তোমাদের হত্যা করবো। হযরত ইবনে হুযাইফা রা. বললেন, তোমার যেভাবে ইচ্ছা তুমি হত্যা করো। আমাকে টুকরা করে ফেল, আমি তাওহীদের কালেমা ছাড়বো না। বাদশা বললো, আমি তোমাদেরকে এমনভাবে হত্যা করবো যা অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বললেন, তুমি যেভাবে খুশি আমাকে সাজা দাও। বাদশা একটা বড় কড়াই আনতে বলল, তাতে তেল ঢালল। কড়াই আগুনে চড়াল। তারপর আগুনের তাপে তেলভর্তি কড়াই টগবগ করতে লাগল। তখন মুসলমানদের থেকে একজনকে ধরে ঐ ফুটন্ত তেলে ছেড়ে দেয়া হয়। যখন তাকে ছাড়া হয়, বর্ণিত আছে যে– মুহূর্তের মধ্যে ঐ ব্যক্তির হাড় মাংস বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সে জ্বলে কয়লা হয়ে যায়।

একশটি প্রাণ উৎসর্গ করতাম

হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাইফা রা. এই দৃশ্য দেখলেন, বাদশা বললো, দেখো! যদি তুমি আমার কথা না মানো তাহলে তোমার সাথে একই আচরণ করা হবে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাইফা রা. কাঁদতে লাগলেন। বাদশা বললো, যাক, এখন ভয়ে কাঁদছে। হুযাইফা রা. বললেন, এজন্য কাঁদছি না যে আমি ভয় পেয়েছি। আমি এজন্য কাঁদছি যে, আল্লাহর রাহে উৎসর্গ হওয়ার মত একটি প্রাণই আমার আছে। হায়, আমার কাছে যদি একশটি প্রাণ থাকত তাহলে আমি প্রতিটি প্রাণ এভাবে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করতাম। যখন বাদশা তাঁর দৃঢ়তা ও স্থিরতা দেখল, তখন মনে মনে ভাবল যে, এ কেমন সম্প্রদায়! স্বচক্ষে এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখছে। এরপরও বলছে, একটি প্রাণ নয় এভাবে একশটি প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

কাফের বাদশার ললাটে চুম্বন

এরপর হযরত ইবনে হুযাইফা রা. এর দৃঢ়তা ও সাহসিকতার বরকতে ঐ কাফেরের মন নরম হয়। সে বলল, আচ্ছা তোমরা তোমাদের দ্বীন থেকে না সরো, কিন্তু একটা কাজ করো যে, আগে বেড়ে আমার কপালে চুমু দাও। যদি আমার ললাটে চুম্বন করো তাহলে আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিব। হযরত ইবনে হুযাইফা রা. বললেন, শুধু আমাকে ছাড়বে না আমার সকল সাথীকে ছাড়বে? যদি তুমি আমার সকল সাথীকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত হও তাহলে আমি তোমার ললাট চুম্বন করবো। বাদশা বলল, আমি তোমার সকল সঙ্গীকে মুক্তি দিব।

হযরত ইবনে হুযাইফা রা. আগে বেড়ে তার ললাটে চুম্বন করলেন এবং তাঁর সকল সঙ্গীকে মুক্ত করে নিয়ে আসলেন। হযরত ফারুকে আযম রা. যখন তাদের মদীনায় আগমনের সংবাদ শুনলেন তখন তিনি লোকজন নিয়ে মদিনার উপকণ্ঠে যান এদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাইফা রা. -এর সাথে তিনি গলা মিলালেন। এবং তাঁর ললাটে চুম্বন করলেন। আমি তোমার ললাটে চুমো খাচ্ছি এজন্য যে, তুমি এক চুমো দিয়ে মুসলমানদের মুক্ত করেছ।

জান বাঁচানোর জন্য গুনাহ্ করা জায়েয

কারো মনে হতে পারে তিনি বলতে পারেন যে, তুমি তো কাফের। তোমার কপালে কী করে চুমো দিব? কিন্তু এটা আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ তা'আলা এ বিধান নির্ধারণ করেছেন যে, যদি কারো প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকে, এবং অন্তরে ঈমান রেখে মুখে কুফুরি কালিমা বলার কারণে প্রাণে বেঁচে যায় তো মুখে কুফুরি কালিমা বলা জায়েয। কিন্তু উত্তম হলো, প্রাণ বিসর্জন দিয়ে হলেও মুখে কুফুরি কালিমা উচ্চারণ না করা। হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাইফা রা. প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু কুফুরি কালেমা উচ্চারণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি গুনাহের উপর বাধ্য করে যে এই গুনাহ করো অন্যথায় মেরে ফেলবো। তো শরীয়তের বিধান হলো, এই অবস্থায় প্রাণ বাঁচানোর জন্য গুনাহ করো। যদি আপনি ঐ সময় এই কাজ না করেন তাহলে গুনাহগার হবেন। কেননা প্রাণ আপনার কাছে আল্লাহ তা'আলার আমানত ছিল। আপনি এভাবে তা বিসর্জন দিবেন– এটা জায়েয নাই।

এ ক্ষেত্রে হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাইফা রা. দেখলেন যে, কাফের বাদশার কপালে চুমু খাওয়া মারাত্মক গুনাহ। কেননা, কাফের বাদশাকে সম্মান করা গুনাহ। তার ললাটে চুমু খাওয়া সম্মান, তাই এটিও গুনাহ। কিন্তু নিজ প্রাণ এবং

সাথীদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য এই গুনাহ সহনীয়। এ কারণে তিনি এ গুনাহকে গ্রহণ করেছেন।

এটাই দ্বীনের বুঝ

আল্লাহর তা'আলার বিধান এটা কোথাও মানুষ দমে যায় এবং নত হয়। এই বিধান আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। এর নাম দ্বীনের বুঝ। এর নাম 'তাফাক্কুহ' ফিদদ্বীন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন।

যাই হোক, এই সূরা এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, যে চুক্তিতে দ্বীন ক্ষতিগস্ত হয় তা করা জায়েয নেই। হ্যাঁ শরীয়ত যেখানে অবকাশ দিয়েছে সেখানে চুক্তি করতে পারবেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফযল ও করমে তাঁর দেয়া বিধানবলীর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ –

প্রত্যেক ইবাদতের পর দু'টি কাজ

সূরা নাসরের তাফসীর (৩)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَآ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ○ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ○ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا○ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِىُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

সূচনা

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! আমি এখন আপনাদের সামনে সূরা নাসর তিলাওয়াত করলাম। বিগত দুই জুমা যাবৎ এর তাফসীর চলছে। খোলাসা এই যে এই সূরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হায়াতে তাইয়্যেবার শেষ দিকে অবতীর্ণ হয়েছে। অচিরেই আপনার হাতে মক্কা বিজয় হবে এই সূরায় আল্লাহর সাহায্য আসবে, লোকজন দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে। এ অবস্থায় আপনার করণীয় কী? আল্লাহ তা'আলা বলছেন, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ আপনার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করুন, এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের তওবা কবুলকারী।

সাফল্যের উপর শোকর আদায় করুন

এই সূরায় আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। গত জুমায় দু'টি শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আজ তৃতীয় আরেকটি শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করবো। মক্কা বিজয়ের পর এবং লোকজন দলে দলে ইসলাম গ্রহণের পর যে

নিয়মে আমল শিক্ষা দেয়া হয়েছে তার সারাংশ দু'টি কথা। এক. আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করা। দুই. আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। যখন বিজয় অর্জিত হচ্ছিল, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সফলতাকে নিজের কীর্তি মনে না করে আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করম মনে করেছেন এবং কৃতজ্ঞ হয়েছেন। এখান থেকে এই শিক্ষা অর্জন হয় যে, যখন কেউ কোন কাজে কৃতকার্য হয়, তখন তাকে নিজ সাধনার ফসল মনে না করে আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর অনুগ্রহ মনে করা এবং তার স্বীকৃতি স্বরূপ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত।

চিন্তার বিষয়

এই আয়াতে দ্বিতীয় কথা বলা হয়েছে যে, اِسْتَغْفِرُهُ আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। ইস্তেগফার অর্থ ক্ষমা চাওয়া। আর সাধারণত ক্ষমা চাওয়া হয় যখন মানুষ ভুল করে বসে কিংবা গুনাহ করে ফেলে। তখন মার্জনাকল্পে বলে আয় আল্লাহ! আমার ভুল হয়েছে, মাফ করে দিন। এখানে চিন্তার বিষয় হলো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা মোতাবেক সকল কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন এবং নবুওয়তের যে সকল দায়িত্ব তাঁর উপর সোপর্দ করা হয়েছে তা বড়ই উত্তমভাবে সম্পন্ন করেছেন। এত সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করেছেন যে তেইশ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে পুরো উপদ্বীপে আরব অভাবনীয় সাফল্যের এক ইনকিলাব সাধিত হয়েছে। যে সম্প্রদায় অজ্ঞতার আঁধারে নিমজ্জিত ছিল তাদেরকে শুধু সরল পথে আনেন নি বরং প্রতিমাপূজারী থেকে একত্ববাদের ঘোষক বানিয়েছেন। তাদের অস্থিমজ্জায় মিশে থাকা মন্দ অভ্যাসগুলো দূর করছেন। তাদেরকে অনুপম আদর্শের স্তম্ভরূপে গড়ে তুলেছেন।

মদ নিষিদ্ধকরণ

আপনি একটু চিন্তা করুন, কোন কিছু অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে ঐ অভ্যাস থেকে ফিরে আসাটা কষ্টদায়ক হয়ে যায়। যেমন কারো তামাকের অভ্যাস, কিংবা নস্যির অভ্যাস। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক অভ্যাস হলো মদের নেশা। আর মদ ছিল আরবদের সাধারণ অভ্যাস। এমন কেউ ছিল না যে মদ পানে অভ্যস্ত না। এই অভ্যাসকে বর্জন করানো মামুলি বিষয় ছিল না।

আজ গোটা দুনিয়ার মানুষ চাচ্ছে যে মদ বর্জন করবে। কিন্তু এ ব্যাপারে সফল হচ্ছে না। আমেরিকায় একবার মদ বর্জনের আন্দোলন হয়েছিল। দুঃখের বিষয় এর ফলে মদ্যপান আরো বেড়ে যায়। তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের তালীমের ফলে এবং তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আহলে আরব এমনভাবে মদ ত্যাগ করেছিল যে, যখন মদ হারামের বিধান আসল। তখন সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমরা এক মজলিসে বসেছিলাম এবং আমাদের মাঝে মদের পালা বদল চলছিল। হযরত আনাস রা. বলেন, আমি সবাইকে মদ পান করাচ্ছিলাম। আচানক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করল– الا ان الخمر قد حرمت শুনে রাখ! মদ হারাম করা হয়েছে। হযরত আনাস রা. বলেন, এই ঘোষণা আসার পর অবস্থা এই হয়েছিল যে, যাদের হাতে মদের পেয়ালা ছিল, এবং মুখের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের কেউ একথা ভাবেনি যে, আর এক ফোঁটা পান করি। বরং সঙ্গে সঙ্গে পেয়ালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এরপর আর কেউ শরাব ছুঁয়ে দেখেনি। শরাবের বড় বড় মটকা ভেঙ্গে ফেলা হয়। মদীনা মুনাওয়ারায় শরাবের ঢল বয়ে যায়। এটাতো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি কীর্তি মাত্র।

এখন আমার প্রতি এ আশা রেখো না

তাছাড়া অধিকাংশ আরবদের মাঝে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা ছিল পূর্ণমাত্রায়। হযরত মুদ্দাসসির বিন আবুবকর রা. বলেন, জাহেলী যুগে এক মহিলার সাথে আমার গভীর সম্পর্ক ছিল। ইসলাম গ্রহণ করার পর একবার ঐ মহিলার সাথে আমার দেখা হলো। সে আমাকে আকৃষ্ট করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালালো। বললো, আমার সাথে তোমারে বন্ধুত্ব ছিল, কতদিন পর আজ তোমার দেখা পেলাম। আসো আজ অতীতের হারানো দিনগুলো আমরা স্মরণ করি। হযরত মুদ্দাসসির রা. বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্ত মোবারকে বাইয়াত হয়েছি। সুতরাং এখন আমার প্রতি এই আশা রেখো না যে আমি গুনাহ করবো। ঐ মহিলা পেরেশান হলো, এবং বলল, তুমি কি সেই মুদ্দাসসির নও যে আমার প্রতি প্রেম-ভালবাসা প্রকাশে ব্যাকুল থাকত। হযরত মুদ্দাসসির বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে হেদায়াত দান করেছেন। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখন আমি এই কাজ করতে পারি না। তখন ঐ মহিলা বললো, আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবো না। এক কাজ করো, তুমি আমাকে বিবাহ করে ফেলো। হযরত মুদ্দাসির রা. বললেন, তুমি মুশরিক আর আমি মুমিন। আমি জানিনা আমার সাথে তোমার বিবাহ হতে পারে কি না। আমি গিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করবো। যদি তিনি অনুমতি দেন তাহলে অবশ্যই বিবাহ করবো। যদি অনুমতি না দেন তাহলে এরপর তোমাকে বিবাহ করতে পারবো না। তিনি গেলেন এবং

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন কোরআনুল কারীমের এই আয়াত অবতীর্ণ হলো–

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ○ (البقرة:۲۲۳)

মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। একজন মুমিন বাঁদী একজন মুশরিক (স্বাধীন) নারী থেকে উত্তম। হযরত মুদ্দাসসির রা. গিয়ে তাকে বলেন, আল্লাহ আমাকে অনুমতি দেননি। এজন্য এখন তোমার সাথে বিবাহ হতে পারে না।

এই মহা বিপ্লব কি কোন গুনাহ ছিল?

যেই সম্প্রদায় এত ভ্রষ্ট ছিল যে, মন্দ ও অসৎ স্বভাবসমূহ তাদের শিরা-উপশিরায় মিশে গিয়ে ছিল। তাদেরকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসকল পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করেছেন। তাদের মাঝে পরকাল ভাবনা তৈরি করেছেন। মানুষের মাঝে মনুষত্ববোধ সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তুলেছেন। আত্মার সকল কলুষতা ধুয়ে মুছে অন্তর সাফ করেছেন। প্রচণ্ড মেহনত করে, অসহনীয় ক্ষুধা-পিপাসা সহ্য করে, যুদ্ধ লড়ে, জান-মালের কষ্ট করে তেইশ বছরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিপ্লব সাধন করেছেন, তা কি কোন গুনাহ ছিল? কোন ভুল করেছেন যার উপর নবীজী ইস্তেগফার করবেন? তিনি তো এক মহান কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, আপনি তো এক মহান দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

ভাল কাজের পরও ইস্তেগফার করো

এর মাধ্যমে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখন মানুষ কোন ভাল কাজ করে, কিংবা কোন নেক আমল করে, কোন ইবাদত করে, আসলে আল্লাহ তা'আলার বন্দেগীর হক্ব তো কেউ আদায় করতেই পারে না। চাই সে যত ইবাদত করুক, যত নেক কাজ করুক। ঐ সত্তার নেয়ামতের কোন হক্ব আদায় হতে পারে না। এজন্য বান্দার কর্তব্য হলো কাজ করা এবং সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা যে আয় আল্লাহ! এই কাজে আমার থেকে যত অলসতা অবহেলা হয়েছে তা মাফ করে দিন।

হক্ব আদায় করে কেউ আল্লাহর ইবাদত করতে পারে না

ইবাদত, বন্দেগী এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ তামীলে যথাযথ হক্ব আদায়ে কেউ সক্ষম নয়। এজন্য বান্দার কাজ হলো, ইবাদত করার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাওয়া। হাদীছ শরীফে এসেছে যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য দাঁড়াতেন। তখন এত দীর্ঘ সময় দাঁড়াতেন যে তাঁর পা মোবারক ফুলে যেত। হযরত আয়েশা রা. বলেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত দীর্ঘ সেজদা করলেন যে, আল্লাহ না করুন আমার মনে হতে লাগল যে, হুযূরের রূহ ঊর্ধ্ববিচরণ করেছে। তখন আমি তাঁর পায়ে আঙ্গুল ধরে নাড়া দিয়েছি। তিনি এত দীর্ঘ সেজদা আদায় করতেন। এরপর ও আল্লাহ তা'আলাকে সম্বোধন করে বলছেন–

ما عبدناك حق عبادتك

ماعرفنك حق معرفتك

হে আল্লাহ আমরা হক্ব আদায় করে আপনার ইবাদত করতে পারি নি।
আমরা আপনার যথার্থ পরিচয় লাভ করতে পারি নি।

অসতর্কতার উপর এস্তেগফার করুন

এ সূরায় এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যত বড় নেক কাজ, বড় বড় আমল আপনার মাধ্যমে আদায় হোক এর উপর অহংকার, গর্ব বা বড়াই না করে এক তো আল্লাহর শোকর আদায় করুন। আল্লাহ তা'আলার হামদ-ছানাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং দ্বিতীয় কাজ হলো যে তার উপর ইস্তেগফার করুন। আয় আল্লাহ! আমার থেকে অসতর্কতামূলক যা কিছু হয়েছে তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি, ইস্তেগফার করছি। আপনি ক্ষমা করে দিন। মার্জনা করুন।

সে স্বীয় ইবাদতের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করে

দেখুন! নেক বান্দাদের কথা উল্লেখ করে কোরআনুল কারীম বলছে–

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ○

(الزريات: ١٧-١٨)

অর্থ : এই নেক বান্দারা রাতে খুব কম ঘুমায় (এবং তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে পৃথক থাকে। অর্থাৎ ইবাদতে মশগুল থাকে) এবং ভোর রাতে আল্লাহ তা'আলার কাছে ইস্তেগফার করে। হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

এই আয়াতে ঐ লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা রাতে ইবাদত করে। তাহলে ভোর-রাতে এরা কিসের ইস্তেগফার করে? কোন গুনাহ তো করেনি। যার কারণে তারা ইস্তেগফার করে। উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারা নিজ ইবাদতের কারণে ইস্তেগফার করে। আয় আল্লাহ! ইবাদত করার মাঝে যত, ভুল-ত্রুটিহয়েছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এই তরীকা কোরআন শিক্ষা দিয়েছে যে ইবাদতের পর ইস্তেগফার করো।

নামাযের পর তিনবার ইস্তেগফার

হাদীস শরীফে এসেছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষে সালাম ফেরাতেন তখন তিনবার استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله পড়তেন। এখানেও একই কথা, কোন গুনাহ তো করেননি। বরং নামায পড়লেন এবং আল্লাহর ইবাদত করলেন। এরপরও পড়ছেন استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله উদ্দেশ্য হলো একথা বলা যে, আয় আল্লাহ! নামায তো পড়েছি। কিন্তু যেভাবে নামায পড়া দরকার ছিল ঐভাবে পড়তে পারিনি। যথাযথ হক্ব আদায় করতে পারিনি। এজন্য আপনার কাছে ইস্তেগফার করছি, আপনি মাফ করে দিন।

নামাযের অসম্মান না করা

এখানে একটা বিষয় বোঝা দরকার। তা এই যে, অনেক সময় আমাদের মনে হয় আমরা যে নামায পড়ছি তা বে রূহ, প্রাণহীন। এর কোন হাকীকত নাই। ব্যস উঠা বসা করি আর সময় কাটাই। এই ধারণার ফলে আমাদের নামায পড়ার তাওফীক হচ্ছে তবে তার না শুকরি হচ্ছে; আমরা বলি, আরে আমাদের আবার নামায! আমরা তো শুধু কপাল লাগাই আর উঠা-বসা করি। একটা নিয়ম পালন করি আর কি? এই নামাযে না আছে রূহ, না আছে প্রাণ। মনে রাখবেন এগুলো ফালতু কথাবার্তা।

এটা ঠিক যে, আমরা নামাযের হক্ব আদায় করছি না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করমে ঐ লোকদের থেকে আমাদের অবস্থা অনেক ভাল যাদের নামাযের তাওফীকও হয়না। আল্লাহর অনেক বান্দা আছে যাদের মসজিদে আসার তাওফীকও হয় না। যাদের নামায পড়ার তাওফীক হয় না। আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবাণী যে তিনি আমাদেরকে ঐ সকল লোকদের মত বানাননি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফযল ও করমে আমাদেরকে মসজিদে আসার তাওফীক দান করেছেন। এজন্য নামাযের অসম্মান না করা চাই।

শয়তান কখনো কখনো আমাদের ধোঁকা দেয় তুমি যেই নামায পড়ছো এই নামাযে কোন হাকীকত নাই। তোমার নামায বে-জান, প্রাণহীন। এতে কোন ফায়দা নাই। এমন নামাযের কী প্রয়োজন? এরপর ধীরে ধীরে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নামায ছেড়ে দেয়।

সকল ইবাদতের পর দু'টি কাজ করা, শোকর এবং ইস্তেগফার

এজন্য সঠিক পদ্ধতি হলো যা আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে শিক্ষা দিয়েছেন, যখন কোন আমলের তাওফীক হয় তখন আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করুন এবং বলুন, আয় আল্লহ! আপনার শোকর যে আপনি এখানে উপস্থিত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। এভাবে শুকরিয়া আদায় করুন। সঙ্গে সঙ্গে ইস্তেগফারও করুন এবং বলুন, আয় আল্লাহ! আপনি আপনার অনুগ্রহ ও মেহেরবাণীতে এই ইবাদত করার তাওফীক দিয়েছেন। এজন্য আমি আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং সাথে সাথে এটাও সত্য যে এই ইবাদতের হক্ব আদায় করতে পারি নি, এই ইবাদতের মধ্যে না জানি কত ভুল হয়েছে কত ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটেছে। আয় আল্লাহ! আমি এই ভুল ভ্রান্তির জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। এই দুটি কাজ করুন, ইনশাআল্লাহ ঐ ইবাদত কবুল হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের ইবাদত থেকে বেনিয়ায

আরে! আমাদের ইবাদত দ্বারা তো আল্লাহ তা'আলার কোন ফায়দা হয় না। আমাদের ইবাদত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কোন আনন্দও লাগেনা। তাঁর বড়ত্ব তো এমন যে, যদি জগতবাসী একত্র হয়ে তাঁর নাফরমানী করে তাহলে তার মাহাত্ম্য ও বড়ত্ব বিন্দু পরিমাণও হ্রাস পাবে না। আর যদি বিশ্ববাসী একত্র হয়ে তাঁর সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে তাহলেও তাঁর মাহাত্ম্য ও বড়ত্ব সামান্য পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে না। তিনি যেমন ছিলেন তেমনই থাকবেন। তিনি তো আল্লাহুস্ সামাদ– الله الصمد। তিনি তো বে-নিয়ায। তিনি তো বান্দার ইবাদত থেকে নির্মুখাপেক্ষী। বান্দার যিকির শোকর থেকে তিনি নির্মুখাপেক্ষী। কিন্তু অনুগত বান্দা যখন আল্লাহমুখী হয় এবং 'বান্দা' হয়ে আল্লাহ তা'আলার দিকে ফেরে তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফযল ও অনুগ্রহে তাকে আরাম দান করেন। আর বান্দা হওয়ার রাস্তা এটাই যে, যে ইবাদতের তাওফীক হয়েছে তার উপর শোকর আদায় করা এবং ইবাদতে যত বিচ্যুতি হয়েছে তার জন্য ইস্তেগফার করা।

সে আমার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে

আমি আমার শায়েখ আরেফ বিল্লাহ আব্দুল হাই সাহেব র. এর কাছ থেকে হযরত আবু বকর রা. এর এক বাণী শুনেছি। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি নামাযের সালাম ফেরানোর পর দু'টি কালেমা বলে এক. الحمد لله দুই. استغفر الله। তখন শয়তান বলে সে আমার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। الحمد لله এজন্য বলা যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নামায পড়ার তাওফীক দান করেছেন। এর উপর আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করছি। আর নামাযের ভেতর যে ভুল হয়ে গেছে তার উপর استغفر الله বলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যখন শয়তান বলে এই বান্দা আমাকে শেষ করে দিল। কেননা শয়তান মানুষকে দুইভাবে ভ্রষ্ট করে। এক. মানুষকে অহংকার, গর্ব ও দম্ভে লিপ্ত রাখে, এই ইবাদত করে আমি অনেক বড় কাজ করে ফেলেছি। আমি এখন মুত্তাকী এবং ইবাদতগুযার হয়ে গেছি। এর বিপরীতে বান্দা বলে, الحمد لله এই ইবাদত করার তাওফীক আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন। এজন্য প্রশংসা শুধু তাঁরই। এটা আমার কোন কীর্তি নয়। এতে আমার গর্ব ও বড়াইয়ের কোন সুযোগ নাই।

শয়তানের ভ্রষ্ট করার দ্বিতীয় মাধ্যম এই যে, সে অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, আরে তুমি কীভাবে নামায পড়ছ? এ নামায তো একেবারে বে-জান, প্রাণশূন্য। এর মধ্যে না খুশু আছে, না খুযূ আছে। এমন প্রাণশূন্য নামায কি কোন কাজে আসবে? তুমি অনর্থক নামায পড়ছ। এই নামাযের কী প্রয়োজন? এর চিকিৎসা হল, নামাযের পর পর বলা استغفر الله। আয় আল্লাহ! নামাযে যত ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে আমি তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। আর আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা, কোন বান্দা যদি অনুগত হৃদয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার তওবা কবুল করবেন। তো যখন তওবা কবুল হবে তখন নামাযও কবুল হবে।

এক বুযুর্গের ঘটনা

মাওলানা রূমী র. মছনবী শরীফে এক বুযুর্গের ঘটনা লিখেছেন। তিনি প্রতিদিন তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠতেন। অযু করতেন, এবং তাহাজ্জুদ পড়তেন। এটা ছিল তাঁর প্রতিদিনের আমল। এক শাগরেদও খেদমতের জন্য তার সাথে উঠত। আল্লাহর নেক বান্দাদের পরীক্ষা তাদের শান অনুযায়ী হয়ে থাকে। একদিন তাহাজ্জুদের জন্য উঠলেন এবং অযু করলেন। তখন মনে হলো, আসমান থেকে আওয়াজ আসছে, তুমি কেন কষ্ট করছ। না তোমার অযু কবুল

হয়েছে, না তোমার নামায কবুল হয়েছে। না কবুল হয়েছে তোমার রুকু, না তোমার সিজদা। তিনি নিজ কানে এই আওয়াজ শুনলেন এবং তাঁর শাগরেদও এই আওয়াজ শুনল। কিন্তু তিনি সব সময়ের মত পূর্ণ প্রশান্তির সাথে ধীরে সুস্থে অযু করলেন এবং পূর্ণ প্রশান্তির সাথে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করলেন। পরের দিন তাহাজ্জুদের জন্য উঠলেন এবং ওযু করতে লাগলেন। তখন আবার এই আওয়াজ শুনলেন, তুমি অযথাই কষ্ট করছ। না তোমার অযু কবুল হয়েছে, না তোমার নামায, রুকু সিজদা। কিচ্ছু কবুল হয়নি। কিন্তু তিনি তার মত অযু করলেন এবং ইতমিনানের সাথে নামায আদায় করলেন। যখন নামায শেষ হলো শাগরেদ বলল, হযরত এই দুই দিন উপর থেকে আওয়াজ আসছে– তোমার নামায তোমার রুকু, তোমার সিজদা কোন কিছুই কবুল হয় না। এরপরও কেন আপনি এত কষ্ট করছেন? উত্তরে বুযুর্গ বললেন, তিনি চাইলে কবুল করবেন বা কবুল করবেন না। যদি দ্বিতীয় কোন দরজা থাকে বলো আমি সেখানে চলে যাই। দরজা তো একটাই, তিনি কবুল করবেন বা না করবেন। যদি তিনি কবুল না করেন তাহলে তারই কাছে মাফ চাই, তারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। তাঁরই অভিমুখী হই। لا ملجأ ولا منجا من الله الا إليه আল্লাহ তা'আলা থেকে পালিয়ে অন্য কোথাও যেতে পারবো না। আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় নিতে হবে। গ্রহণ করেন বা না করেন– এটা তাঁর কাজ। কিন্তু আমাদের কাজ হলো, আমি তাঁর দরজা ছাড়বো না। তাঁর দরজায় কড়া নাড়বো। যখন বুযুর্গ এই উত্তর দিলেন তখন দ্বিতীয়বার আসমান থেকে আওয়াজ আসল, তোমার অযুও কবুল, তোমার রুকুও কবুল। তোমার নামাযও কবুল। তোমার রুকুও কবুল। তোমার সেজদাও কবুল। মাওলানা রুমি র. এই ঘটনা বর্ণনা করে বলেন–

قبول است اگر.....

کہ جز ما پناہ دگر نیست

অর্থাৎ, এই আসলে যদিও তোমার কোন নৈপুণ্য ছিল না। এরপর তোমার এই কথা বলার কারণে তোমার আমল কবুল করা হয়েছে। কেননা আমি ছাড়া তোমার আর কোন আশ্রয় নাই।

মূলত এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা। আর তিনি তাঁর পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছেন।

প্রত্যেক ইবাদতের পর দু'টি কাজ করো

যাই হোক আল্লাহ তা'আলা যেই ইবাদতের তাওফীক দান করেন। চাই তা নামায হোক, রোজা হোক, দান সদকা হোক কিংবা কোন নেক কাজ হোক। তাতে দুই কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক. ঐ ইবাদতের উপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। এবং ঐ ইবাদতে যে ভুল ত্রুটি হয়েছে তার জন্য ইস্তে গফার করা। যদি এই দুটি কাজকে আমরা আমাদের আমল বানিয়ে নেই তো ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমাদের সকল ইবাদত কবুল হবে। আল্লাহ তা'আলা তার ফযল ও করমে আমাকে এবং আপনাকে সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ—

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান মর্যাদা

সূরা কাউসারের তাফসীর

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَآ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ○ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ○ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ○ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

ভূমিকা

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! কয়েক সপ্তাহ যাবত কুরআনে কারীমের যে সূরাগুলো নামাযে বেশী পড়া হয়, তার কিছু তাফসীর ও ব্যাখ্যা আপনাদের সামনে আলোচনা শুরু করেছিলাম। এরই ধারাবাহিকায় সূরা ফাতিহা, সূরা ফালাক, সূরা নাস, সূরা কাফিরূন, সূরা ইখলাসসহ বিভিন্ন সূরার তাফসীর বিগত জুমাগুলোতে করার তাওফীক হয়েছে। কিছু কারণে মাঝে এই ধারা ব্যাহত হয়েছে। আল্লাহর নামে আবার দ্বিতীয়বার শুরু করছি। এরই ধারাবাহিকতায় আজ আপনাদের সামনে সূরা কাউসার তিলাওয়াত করলাম।

সূরা কাওছারের শানে নুযুল

শব্দের বিবেচনায় এই সূরা কোরআনে কারীমের সবচে ছোট সূরা। প্রায় সব মুসলমানেরই মুখস্থ আছে। এই ছোট সূরার মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া বড় দুটি বিধানও এই সূরায় প্রদান করা হয়েছে।

যে ঘটনার প্রেক্ষিতে এই সূরা নাযিল হয়েছে তা এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদিজাতুল কুবরা রা. কে বিবাহ করেন। তখন

তাঁর ঘরে চার পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। প্রথম ছেলের নাম রেখেছিলেন কাসেম। তিনি শৈশবেই ইন্তেকাল করেন। এতে মক্কার কাফেররা অত্যন্ত খুশি হয়। আর তাদের কতক সর্দার বিশেষ করে আস বিন ওয়াইল বলে যে, দেখো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন পুত্র সন্তান নেই। যাও একজন হয়েছে সেও মারা গেছে। এখন তার কোন বংশ নেই। সুতরাং তাঁর ইন্তেকালের পর (নাউযুবিল্লাহ) তাঁর নাম নেয়ার কেউ থাকবে না। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আন্দোলন থেমে যাবে। তাঁর ধর্ম বিলীন হয়ে যাবে। জনসম্মুখে সে এই আলোচনা করতে শুরু করে।

কাফেরদের আনন্দ উল্লাস

আরবদের মাঝে প্রথা ছিল যে, কারো পুত্র সন্তান জন্ম নিলে তাকে ভাগ্যবান মনে করা হতো এবং ধরে নেয়া হতো, তার বংশ বিস্তার ঘটছে। অপরদিকে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে দোষণীয় ও নিন্দনীয় মনে করা হতো। আর পাপের লজ্জায় কন্যা সন্তানের পিতা মানুষ থেকে পালিয়ে বেড়াত। দুঃখ করে বলত, আমি কী করব। আমার তো মেয়ে হয়েছে। যার ফলে মেয়েরা জীবন্ত সমাধিস্থ হত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাগণ জীবিত ছিলেন এবং পুত্র সন্তান ইন্তেকাল করেছেন– তাই কাফেররা আনন্দে আটখানা হয়ে গেছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে চরম বেয়াদবি করেছে এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, নবীজীর পর তার দ্বীন যিন্দা থাকবে না। কাফেরদের বিষোদগারের জবাবে তিন আয়াতের এই সূরা অবতীর্ণ হয়।

সূরা কাউসার অবতীর্ণ হওয়ার পর নবীজীর আনন্দ

হযরত আনাস (রা.) বলেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ নিলেন। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় হুযূরের যে কাইফিয়াত (অবস্থা) হতো তখন ঠিক সেই কাইফিয়াত ছিল। যখন হুযূরের উপর ওহী অবতীর্ণ হতো তখন তিনি প্রায় মূর্ছা যেতেন। তো যখন ওহীর অবস্থা কেটে গেল তখন তিনি মুচকি হাসলেন এবং হাসি মুখে সাহাবাদের দিকে তাকালেন। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেন হাসছেন? কোন বিষয় আপনাকে আনন্দিত করেছে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখন আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর সূরা কাউসার তিলাওয়াত করলেন–

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ○ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ○ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ○

অর্থাৎ হে নবী! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য নামায পড়তে থাকুন কুরবানী করতে

থাকুন। নিশ্চয়ই আপনার শত্রু নির্বংশ। তারা বলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্বংশ। বাস্তবে আপনার শত্রুরাই নির্বংশ।

কাউসার অর্থ এবং হাউযে কাউসার

আপনাকে কাউসার দান করেছি। কাউসারের শাব্দিক অর্থ কল্যাণ। আমি একটু আগে যেই হাদীস আপনাদেরকে শোনালাম, এই হাদীসে আছে যে, যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সূরা কাউসার নাযিল হয়েছে তখন তিনি মুচকি হাসছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, اتدرون ماالكوثر؟ তোমরা কি জান কাউসার কী? পরে তিনিই ব্যাখ্যা করেছেন। কাউসার জান্নাতের একটি নহরের নাম ঐ নহর থেকে একটি হাউয জন্ম নিয়েছে, তার নাম হাউযে কাউসার। হাউযে কাউসারের পেয়ালা হবে আকাশের তারকা সংখ্যক। তার পানি এত স্বচ্ছ ও মিষ্ট হবে যা কোনো দিন পৃথিবীবাসীর কল্পনাতেও আসে নি। তার দৃশ্য এত মনোরম যা জগতবাসী ভাবতেও পারেনি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাউয থেকে মুসলমানদের পানি পান করাবেন।

হাউযে কাউসার থেকে লোকদের পানি পান করানো

এই নহর জান্নাতে হবে। [হাউযে কাউসার হাশরের ময়দানে হবে।] যখন সকল মানুষকে হিসাবের জন্য পুনর্জীবিত করা হবে, সেই সময়টা হবে পেরেশানী, আত্মচিন্তা ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসীর সময়। প্রচণ্ড গরম হবে। মানুষ গরমে অস্থির হয়ে যাবে। ঘামে ডুবতে থাকবে। ঐ কঠিন মুহূর্তে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাশরের ময়দানে কাউসার দান করা হবে। জান্নাতী নহর কাউসারের সাথে এই হাউযের সংযোগ থাকবে। যা হাউযকে পূর্ণ করবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে এই হাউয থেকে পানি পান করাবেন।

কিছু মানুষকে হাউযে কাউসার থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আমার উম্মত ঐ কঠিন গরমে হাউযে কাউসারের পাড়ে আসবে এবং পানি পান করবে। একবার যে পান করবে সে আর পিপাসায় কষ্ট পাবে না। কিন্তু কিছু লোক হাউযে কাউসারের নিকট আসতে থাকবে। তখন ফিরিশতারা তাদের ধমকে পিছনে হটিয়ে দিবে। তারাও আমার উম্মত। আমি ফিরিশতাদের বলবো, এরাতো আমারই উম্মত। এরপরও তোমরা তাদেরকে হাউযে কাউসার থেকে তাড়িয়ে

দিচ্ছ? উত্তরে ফেরেশতারা বলবে انك لاتدرى ما احدثوا بعدك আপনি জানেন না, আপনার পর এরা কী সব করেছে। তারা আপনার বিদায়ের পর কুফরী করেছে। নিফাকে লিপ্ত থেকেছে। যদিও তারা আপনার উম্মতেরই সদস্য, তবে তারা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গিয়েছিল, কাফের হয়ে গিয়েছিল। তারা মুনাফেকি করেছিল, তাই তাদেরকে হাউযে কাউসারে আসতে বাধা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানকে এ থেকে হেফাজত করুন।

এই দোআ করা দরকার

হাদীসের শব্দ তো এমন যে, আপনি জানেন না, আপনার পর এরা কোন মত গ্রহণ করেছে। মূলত এটা (দুনিয়া) বিপদসঙ্কুল স্থান।

এজন্য আমাদের উচিৎ আল্লাহর কাছে দু'আ করা, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এই মন্দ পরিণতি থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ তা'আলা কুফর ও শিরক থেকে, নিফাক থেকে এবং সকল খারাপ কাজ থেকে রক্ষা করুন। যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউযে কাউসারের কাছে যাওয়ার প্রতিবন্ধক হবে। আমীন।

হাশরের ময়দানে হুযূরের নাম

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, আমি আপনাকে এই কাউসার দান করেছি। আর এই কাউসার দান করার দ্বারা এই কথা প্রমাণ করেছি যে, আপনার নাম শুধু কেয়ামত পর্যন্ত নয় বরং কেয়ামতের পর হাশরে এবং নশ্বর পৃথিবীতে বারবার উচ্চারিত হতে থাকবে। এই কাফের মুশরিকরা হাজার বার বলুক যে, আপনার পর আপনার নাম নেয়া হবে না। কিন্তু আমি বলছি, নেয়া হবে। অবশ্যই নেয়া হবে।

আপনি আপনার ইবাদতে নিমগ্ন থাকুন

সামনের আয়াতে বলেছেন فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ যেহেতু আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি, এজন্য আপনি নেয়ামতের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ স্বীয় প্রতিপালকের জন্য নামায আদায় করুন। কোরবানি করুন। কেননা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে হাউযে কাউসারের মত মহা নেয়ামত দান করেছেন। আরো দান করেছেন প্রচুর প্রাচুর্য। অর্থাৎ অসংখ্য পুণ্য আমি আপনাকে দান করেছি। এত কল্যাণ যে কেয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মত আপনার প্রশংসা, গুণগ্রহিতা, ফাযায়েল ও পূর্ণতার আলোচনা করতে থাকবে। এজন্য আপনি আল্লাহর

নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ নামায পড়ুন এবং কোরবানি করুন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি আপনার রবের ইবাদতে নিয়োজিত থাকুন। দুশমনের কথায় কর্ণপাত করবেন না। শত্রু যাই বলুক সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবেন না। আপনি আপনার কাজ করুন।

কোরবানির আদেশ কেন দিয়েছেন

ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নামায। তাই নামাযের আদেশ করা হয়েছে। আর কোরবানীর কথা এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকরা দেব-দেবীর নামে কোরবানী করত। এ কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি আপনার প্রতিপালকের নামে কোরবানি করুন। যাতে এর মাধ্যমে দুনিয়াবাসীর সামনে সঠিক পন্থা, পথ ও পদ্ধতি তুলে ধরা যায়। মানুষ যখন কোরবানি করবে তখনই এই দু'আ পড়া সুন্নত–

قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○

আমার নামায ও কোরবানি, আমার জীবন মরণ বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই। –(সূরা আন'আম : ১৬২)

ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্য

এই আয়াত থেকে দুটি বিষয় বোঝা যায়। একটি এই যে, মানুষ যে ইবাদতই করবে তা আল্লাহর জন্য করবে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করবে। তাতে লোক দেখানো, নাম ছড়ানো, লৌকিকতা থাকবে না। বরং ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হবে। অল্প আমল হোক কিন্তু ইখলাসের সাথে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হবে। তখন ঐ সামান্য আমলই কাজে আসবে। আল্লাহর দরবারে দামী হবে। কিন্তু ঐ আমল যদি আল্লাহর জন্য না হয় বরং লোক দেখানো, যশ ও খ্যাতির উদ্দেশ্যে হয় কিংবা দুনিয়াবী কোন লক্ষ্যে থাকে তাহলে তার বিশাল আমল আল্লাহর কাছে মূল্যহীন। এটা নামাযের ব্যাপারেও, কোরবানির ব্যাপারেও।

যশ ও খ্যাতির কোরবানি অনর্থক

যদি কোন ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী একটি ছোট পশুও কোরবানি করে কিন্তু তার লক্ষ্য হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি, তাহলে এই ছোট পশুই আল্লাহ তা'আলার নিকট অনেক দামী। আর যদি লাখ টাকার পশু কিনে। কিন্তু উদ্দেশ্য থাকে মানুষ তাকে বাহবা দিবে। বলবে মাশাআল্লাহ অনেক ভালো পশু নিয়ে এসেছো। বড়

দামী মাল। আল্লাহ হেফাজত করুন। যদি উদ্দেশ্য হয় নাম ফুটানো তাহলে লাখ টাকার কোরবানিও অনর্থক এবং বেকার। এ কাজের মাধ্যমে কোন ফায়দা নাই।

মৌখিক শোকরের সাথে সাথে কাজের মাধ্যমে শুকরিয়া করুন

এই আয়াত থেকে দ্বিতীয় যে বিষয়টি বুঝা যাচ্ছে তা এই যে, যেমন বলেছেন– فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ যেহেতু আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। এজন্য নামায পড়ুন। এর মাধ্যমে এই শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, মানুষ যখন কোন বড় ধরণের নেয়ামত লাভ করবে তখন তার শোকরিয়া শুধু মুখে করলেই হবে না। আমলের মাধ্যমেও করতে হবে। এমন কোন সময় নাই যখন আল্লাহ তা'আলার কোন নেয়ামত মানুষের উপর বর্ষিত হয় না। আমরা বেঁচে আছি– এটাও অনেক বড় নেয়ামত। আমরা সুস্থ আছি। কোন রোগ নাই– এটাও নেয়ামত। চোখ দিয়ে দেখছি, নেয়ামত। কান দিয়ে শুনছি, নেয়ামত। এই সকল নেয়ামতের উপর মুখে শোকর আদায় করতে থাকুন। এবং বলুন, اللهم لك الحمد ولك الشكر আর যখন কোন বড় নেয়ামত অর্জিত হয় তখন তার মৌখিক শোকর ছাড়াও আমলী শোকর হল নামায পড়া।

শুকরিয়া স্বরূপ নফল আদায় করা

কোন লাভ হয়েছে, কিংবা কোন নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছেন তো সর্বপ্রথম আপনার উচিত, যে মালিকের পক্ষ থেকে নেয়ামত লাভ হয়েছে তার সামনে দাঁড়িয়ে কমপক্ষে দুই রাকাত শুকরিয়া নফল আদায় করুন। এরপর বলুন, হে আল্লাহ! আপনি নিজ ফযল ও করমে এই নেয়ামত দান করেছেন। এজন্য আমি আপনার শোকর আদায় করছি এবং শোকরিয়া হিসেবে দুই রাকাত নামায পড়ছি। যাই হোক শুকরিয়ার নামাযও অনেক বড় ইবাদত। আর যেই নেয়ামতের উপর শুকরিয়া নামায পড়বেন আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা ঐ নেয়ামতে আরো সমৃদ্ধি দান করবেন।

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ○ (سورة إبراهيم ٧)

যদি তোমরা শোকর আদায় করো তাহলে তোমাদের নেয়ামতকে আমি আরো সমৃদ্ধি দান করবো। এজন্য শোকরগুজার বান্দা হন। আর শোকরগুজার বান্দা হওয়ার সর্বোত্তম তরীকা হলো যে, যখন কোন লাভ হবে, কিংবা নেয়ামত প্রাপ্ত হবেন তখন আল্লাহর সামনে দাঁড়ান, নামায পড়ুন। তাহলে দ্বিতীয় শিক্ষা হলো প্রতিটি নেয়ামতের উপর আল্লাহর শোকর আদায় করা। আর শোকর আদায়ের মহান পন্থা নামায পড়া।

আপনার শত্রুর বংশ নির্মূল

সর্বশেষ বলেছেন, إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ আপনি আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকুন। আর এরা যা বলেছে যে, আপনি-মাআযাল্লাহ-'আবতার'! অর্থাৎ- নির্বংশ। আপনার 'নসল' ও বংশ এত বিস্তার লাভ করবে যে, অন্য কোন বংশ এত বিস্তার লাভ করবে না। যদিও আপনার শত্রুরা এহেন অপপ্রচার চালাচ্ছে। বরং তাদের বংশ এমনভাবে নির্মূল হবে যে, ভবিষ্যতে তাদের নাম মুখে আনার মত কেউ থাকবে না।

এখন দেখুন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ কীভাবে বহাল রয়েছে। যদিও তার প্রসার ঘটেছে কন্যাদের ঘর থেকে। মুসলমানগণ আজ তাঁর বংশধরকে সায়্যেদ বলে সম্বোধন করে। সায়্যেদ অর্থ নেতা, সর্দার। মুসলিম বিশ্ব তাদের সম্মান করে বলে ইনি সায়্যেদ। আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এভাবে তাদেরকে তাদের মর্যাদা দান করা হয়। তারা আমাদের মাথার মুকুট।

হুযূরের সুমহান আসন

অপরদিকে রূহানী বংশধারা এমনভাবে অব্যাহত রয়েছে যে, পৃথিবীতে কোন বক্তা বা সংগঠক, কোন নেতা নেই যার এত অনুসারী আছে। পৃথিবীর এমন কোন প্রান্ত নাই যেখানে اشهد أن محمدا رسول الله ধ্বনিত হচ্ছে না। চব্বিশ ঘন্টার এমন কোন মুহূর্ত নাই যখন أشهد ان محمدا رسول الله যমীনে গুঞ্জরিত হচ্ছে না اشهد أن محمدا رسول الله কখনো ফজরের আযানে। কখনো আছরের আযানে। আছর, মাগরিব কিংবা এশার আজানে। প্রত্যেক নামাযের নতুন সময় আসে, আজান হয়। এমন কোন সময় নাই যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতার গুণগান গাওয়া হয় না। আল্লাহ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে সুমহান মর্যাদা দান করেছেন, জগতের কোন সৃষ্টিরই তা নছীব হয়নি।

শত্রুরা নির্মূল আর আপনার গুণগান চিরস্থায়ী

নিন্দুক তো কত কথাই বলে এবং হুযূরের শানে বেয়াদবি করে- আল্লাহ পানাহ- নিজের মুখ নষ্ট করে, আখেরাত বরবাদ করে। কিন্তু আল্লাহ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন মর্যাদা দান করেছেন যা দুনিয়াতে তো অবিনশ্বর থাকবেই, আখেরাতে থাকবে চির অম্লান। তাঁর প্রশংসা, তাঁর মাহাত্ম্য সুমহান মর্যাদা থাকবে চির অক্ষয়। পক্ষান্তরে শত্রুর নাম নিশানাও নাই। যে

হতভাগা এই কথা বলেছিল ওর নাম আস বিন ওয়াইল। আজকের পৃথিবী জানেনা কে ছিল আস বিন ওয়াইল। যদি নাম বাকি থেকেছে তো থেকেছে নিন্দিত হয়ে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের উসিলায় মানুষ তাঁর নাম জেনেছে। অন্যথায় ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে কেউ খুঁজেও পেতনা তার নাম। যখন সে এই কথা (বংশ নির্মূল) বলেছিল তখন তাকে মানুষ নেতা বলত। তার নেতৃত্বের গুণ প্রশংসা গাইতো। মনে হতো তারা কখনো অস্তমিত হবে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী ছিল নগণ্য ও অসহায় কমজোর, মুশরিকদের রোষানলে পতিত। লুকিয়ে লুকিয়ে নামায পড়ত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ভবিষ্যতবাণী করেছেন যে, ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং তার নাম নিশানা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম কেয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে। আলহামদুলিল্লাহ! হুযূরের নাম এখন আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফযল ও করমে আমাদেরকে জনাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়াতে আগমন এই নেয়ামতের কদর করার তাওফীক দান করুন। এবং তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

মেরাজের ঘটনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَآ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرَى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِيْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهٗ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ ○ (سورة الإسراء) آمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

মেরাজের তারিখ জানা নেই। রজব মাসের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা হলো হুযুর সা. এর মেরাজের ফযীলত অর্জিত হওয়া। ব্যাপকভাবে এটাই প্রসিদ্ধ যে, রজব মাসেই মেরাজ হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এ বক্তব্যটি সম্পূর্ণ প্রমাণিত নয়। অর্থাৎ কিছু রেওয়ায়েত দ্বারা এটা প্রমাণিত নয় যে, অমুক তারিখ শবে মেরাজ ছিল। রেওয়ায়েতগুলোর মাঝে এ ব্যাপারে বিস্তর বিরোধ বৈপরীত্ব রয়েছে যে, কোন্ তারিখে মেরাজ হয়েছিল এবং মাসের ব্যাপারেও মতপার্থক্য রয়েছে। তাই এটা নিশ্চিত বলা যায় না। কোন্ রাতে হুজুর সা. কে মেরাজের সফরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? যাই হোক, কোনো এক তারিখেই এই ঘটনা ঘটেছিল। মানব ইতিহাসে এটি একটি বিরাট ঘটনা ছিল। পূর্বেও এই ঘটনার কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নি এবং নবী সা. এর পরেও কারো ভাগ্যে এই মর্যাদা লাভ হয়নি।

রমযান মাসের পূর্বাভাস এবং রজব মাস

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভায়েরা! এখন রজব মাস চলছে। আর দুই মাস পর রমযান মাস। রজব আর রমযানের মধ্যবর্তী মাস হলো শা'বান মাস। এজন্য

রজব মাস রমযানুল মোবারকের পূর্বাভাস দান করে। হাদীস শরীফে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রজব মাসের চাঁদ দেখতেন তখন এই দো'আ পাঠ করতেন। اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا رمضنان হে আল্লাহ! আমাদের জন্য রজব এবং শা'বান মাসে বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে রমযান মাসে উপনীত করুন। অর্থাৎ আমাদেরকে আসন্ন রমযান মাস পর্যন্ত হায়াত নসীব করুন। কেননা মানুষ জানে না কবে তার মৃত্যুর ডাক এসে যাবে। একজন দেখতে শুনতে খুব সুস্থ সবল। কিন্তু জানা নেই পরমুহূর্তে কী ঘটবে। এজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ করতেন, আয় আল্লাহ! রমযানের আর মাত্র দুই মাস বাকি। অতএব, আমাকে এতটুকু হায়াত দান করুন যাতে রমযান মাসে উপনীত হতে পারি এবং রমযানের ফয়েজ ও বরকতে 'মালামাল' (পূর্ণ) হতে পারি। এ থেকে বুঝা যায় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিতে রমযান মাস কত সম্মানিত ও অমূল্য ছিল।

হুজুর সা.-কে একান্ত সান্নিধ্য দান

আল্লাহ জাল্লা শানুহুর আযীব ফায়সালা যে আম্বিয়া আ. এর ধারাবাহিকতা হযরত আদম আ. থেকে চলে এসেছে, প্রায় এক লাখ চব্বিশ হাজার আম্বিয়া আ. পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন। প্রত্যেকে স্ব-স্বগোত্রের জন্য হেদায়াতের বাণী নিয়ে এসেছেন। কিন্তু ঐ স্বর্ণ শৃঙ্খলের সর্বশেষ কড়া ছিলেন খাতামুল আম্বিয়া সায়্যিদুল মুরসালীন আহমদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে নবুয়াতের ধারাবাহিকতা। আর যেহেতু পূর্ণতা লাভ করেছে এবং এ যাবৎ আম্বিয়া আ. এর কাছে বার্তা পৌঁছেছে ফিরিশতাদের মাধ্যমে কিংবা কিতাবের মাধ্যমে। সেহেতু আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেছেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করেছেন। অর্থাৎ স্ব শরীরে আল্লাহর দরবারে তলব করেছেন। আর এমন 'শওকতের সাথে তলব করেছেন যে, এক রাতের সামান্য সময়ে প্রিয় বান্দাকে মক্কা মোকাররমা থেকে বাইতুল মাকদিসে পৌঁছে দিয়েছেন। বাইতুল মুকাদ্দাসে সকল নবীদের রূহ মোবারকের সমাগম ঘটিয়েছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ইমাম বানিয়ে তাদেরকে নামায পড়িয়েছেন। এরপর বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে সপ্তম আসমানে। সেখান থেকে 'সিদরাতুল মুনতাহা, কুল বৃক্ষ পর্যন্ত। এরপর এমন এক স্থানে পৌঁছলেন যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, আর সামনে অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার সাথে সরাসরি কথা বলার মর্যাদা লাভ করেন।

আল্লাহ তা'আলার সাথে গোপন কথোপকথন

সেখানে কী কথা হয়েছে? কী আলোচনা হয়েছে? কী গোপন কথা হয়েছে?

میاں عاشق و معشوقرا رمزیست

کراماکاتبین راہم خبر نیست

প্রেমিক প্রেমাস্পদের গোপন খবর

হায়! কিরামান কাতীবিন বে-খবর

আল্লাহ তা'আলা এবং তার মাহবুব হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে কি আলোচনা হয়েছিল তা ঐ ফিরিশতাও জানেন না যারা আমল নামা লেখার জন্য সদা প্রস্তুত থাকেন। কারণ, তিঁনি এমন মাকামে পৌঁছেছেন যেখানে ফেরেশতা যেতে অক্ষম। যেখানে ফিরিশতাদের ডানা পুড়ে যায়। কী কথা হয়েছে? আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

নামায উম্মতের জন্য উপঢৌকন স্বরূপ

এমন মনে হয় আল্লাহই ভাল জানেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হয়েছেন তখন সম্ভবত এই আরয করেছিলেন যে, ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে তো এই মর্যাদা দান করেছেন। কিন্তু আমার উম্মতের কী হবে? আমার উম্মত যাদের চিন্তা প্রতিমুহূর্তে প্রতিক্ষণে আমাকে পেরেশান রাখে। এত ভাবনা যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আপনি কি উম্মতের চিন্তায় নিজের জানকে কোরবান করে দিবেন? এই উম্মতের জন্য আমি কী নিয়ে যাবো? তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি আপনার উম্মতকে এমন এক বস্তু দিব যার মাধ্যমে আপনার উম্মত মেরাজের মর্যাদায় উপনীত হবে। তা এই যে, আপনি আপনার উম্মতের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের হাদিয়া নিয়ে যান। এই নামাযের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, الصلاة معراج المؤمن অর্থাৎ নামায মুমিনের মে'রাজ। অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত আল্লাহ তা'আলার দরবারে তার দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব নিয়ে দাঁড়ায়, সিজদাবনত হয় জমিনে কপাল ঠেকায় তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, বান্দা এখন আমার সবচেয়ে নিকটে।

সিজদা চূড়ান্ত নৈকট্যের মাধ্যম

হাদীস শরীফে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اقرب مایکون العبد الی اللہ تعالی فی السجود ۔

আল্লাহ তা'আলার সাথে মানুষের সবচেয়ে বেশী নৈকট্য অর্জিত হয় সিজদার অবস্থায়। কোরআনে কারীমে সর্ব প্রথম যে সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, সূরা আলাক, اقرأ তার সর্বশেষ আয়াত সিজদার আয়াত। ঐ আয়াত তিলাওয়াত করার পর কিংবা শুনার পর সিজদায়ে তিলাওয়াত করা ওয়াজিব। মুহাব্বাতের সাথে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– اسجد واقترب সিজাদ করো এবং আমার কাছে আস। এর মাধ্যমে একথা বলেছেন যে, যদি তুমি আমার কাছে আসতে চাও, আমার নৈকট্য হাসিল করতে চাও তাহলে সিজদা কর। আল্লাহ তা'আলা সব মুমিনকে মে'রাজের একটা ঝলক দান করেছেন যে, সিজদা করো। আমার সাথে কথা বলো। আমার সামনে উৎসর্গ ও অসহায়ত্বের প্রকাশ ঘটাও। যত বেশী করবে ততবেশী আমার নৈকট্য লাভ হবে। এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের হাদিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে'রাজের রজনীতে লাভ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাকে ভালবেসেছেন

আসল কথা হলো, যখন আমরা সিজদা করি তখন সিজদার হাকীকতের দিকে লক্ষ করিনা যে, এই সিজদা কী জিনিস? ব্যাস একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। ঐ অভ্যাস মোতাবেক কপাল মাটির উপর রেখে দেই। আবার উঠাই। কিন্তু এর হাকীকত নিয়ে কখনো ভাবি না। যারা এই সিজদার হাকীকত বুঝেছে তারা তার স্বাদ অনুভব করেছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, সিজদার কী স্বাদ। হযরত গঞ্জ মুরাদাবাদী র. বড় মাপের বুযুর্গ ছিলেন। ৮০ কিংবা ৯০ বছর আগে তিনি ইন্তে কাল করেছেন। বেশী দিন হয় নি। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী র. ও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। যখন হযরত থানবী র. তাঁর যিয়ারতে গেলেন, গঞ্জ মুরাদাবাদী বড় মাযযূব ব্যক্তি[৩] ছিলেন। তিনি বলেন, মিয়া আশরাফ আলী তোমাকে কী বলব। যখন আমি সিজদায় যাই তখন আমার মনে হয় যে, আল্লাহ আমার প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েছেন। সুতরাং যদি সিজদাকে সিজদার মত করা হয়, ধ্যানের সাথে করা হয় চাই যে কোন চৌকাঠের উপর মাথা রাখুন, তখন ঐ সিজদার এমন অবস্থা হয় যেমনটা হযরত শাহ সাহেব বলেছেন, আমাদের হযরত খাজা আযিযুল হাসান মাযবূর (রহ.) বলতেন,

جب میں سجدہ میں سر رکھ دوں
زمین کو آسمان کردوں

---

[৩] যিনি স্বর্গীয় ধ্যানে নিমজ্জিত।

অর্থাৎ যখন এই কপাল আল্লাহর দুয়ারে রাখি
তখন এই জমিনকে আসমান মনে হয়

سر بر قدم حسن قدم بر کلاہ و تاج

যখন শির রেখেছি মহানের চরণে।

এখানে حسن [৪] দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার সত্তা। কেননা প্রকৃত সৌন্দর্য তো আল্লাহ তা'আলার সৌন্দর্য। যখন সে তার মাথা রেখেছে আল্লাহর কদমে তাঁর দুয়ারে তখন ঐ সিজদাকারীর কদম পড়ে বাদশাদের মুকুট এবং সিংহাসনে।

سر بر قدم حسن قدم بر کلاہ و تاج

دیوانہ بڑی شان سے دیوانہ بنا ہے

যখন শির রেখেছি মহানের চরণে।
পাগলপারা ব্যক্তি, উচ্চমর্যাদার কারণেই পাগলপারা হয়েছে।

সিজদার স্বাদ কীভাবে অর্জিত হবে

আসল কথা হলো, আমরা সিজদার মর্যাদা বুঝি না। সিজদার হাকীকত জানিনা। সিজদাকে সিজদার মত আদায় করিনা। যার কারণে সিজদার লায্যাত স্বাদ অনুভূত হয় না। সিজদার প্রভাব পড়ে না। যদি একবার যমীনের উপর মাথা রেখে খুব খেয়াল করে বলেন سبحان ربی الأعلی 'পবিত্রতা আমার রবের। যিনি সুমহান-সমুন্নত। তখন সিজদার স্বাদ অনুভব করবেন।
তার কুদরতি কদমে মাথা রেখেছি

দেখুন! আমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, সিজদার অবস্থায় বলুন سبحان ربی الأعلی এবং রুকুতে বলুন سبحان ربی العظیم কেননা রুকুতে মানুষ যমীন থেকে উঁচু থাকে। পক্ষান্তরে সিজদার মধ্যে মানুষ একেবারে যমীনের সাথে মিশে যায়। সিজদা হলো বিনয় ও বিনম্রতা প্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম। এই বিনম্র অবস্থায় বলা হয় سبحان ربی الأعلی পবিত্রতা আমার রবের, যিনি সু-উচ্চ সুমহান। আমি কপাল ঠুকেছি ঐ মহান সত্তার কুদরতি কদমে। যখন ঐ মহান সত্তার কদমে রেখেছি শির তখন তা হবে না অর্থহীন।

---

[৪] সৌন্দর্য।

সিজদায় দু'আ করা

এজন্য বলা হয়েছে নফল নামাযের সিজদায় ঐ সব দু'আ করো যে সকল দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা যে সকল দু'আ কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন–

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

এছাড়াও অন্যান্য দু'আ সিজদা অবস্থায় পড়া উচিত। কেননা সিজদায় দু'আ করার স্বাদই আলাদা। এজন্য আল্লাহ তা'আলা শবে মেরাজে উম্মতে মোহাম্মদীর মর্মে সিজদাকে উপঢৌকন স্বরূপ পাঠিয়েছেন যে, সিজদা করো এবং আমার সান্নিধ্য লাভ করো। শবে মেরাজ থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সু-মহান মর্যাদাকে কে আয়ত্ত করতে পারে। কে তা লাভ করতে পারে? কিন্তু তিনি উম্মতের জন্য যে উপহার নিয়ে এসেছেন তাহল নামায এবং সিজদার উপহার। আমার ভাইয়েরা! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজ থেকে যে উপহার নিয়ে এসেছেন, তার কদর করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সেজদার কদর বুঝে সিজদাকে সিজদার মত করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

এমন লোকেরা সিজদা করতে পারবে না

কোরআনুল কারীমের একটি আয়াত আছে, যার বিভিন্ন তাফসীর করা হয়েছে।

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔

এই আয়াতের শাব্দিক অর্থ হলো, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পায়ের গোছা অনাবৃত করবেন এবং মানুষকে সিজদা করার প্রতি আহ্বান জানাবেন। তখন ঐ কাফেরদেরকে সিজদার প্রতি আহ্বান করা হবে, যারা দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করেনি তারা তখন সিজদা করতে চাইবে। কিন্তু তাদের কোমরকে কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় শক্ত করে দেয়া হবে। যার ফলে তারা সিজদা করতে পারবে না। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে যাদের সিজদা করার অভ্যাস ছিল তারা দুনিয়াতে সিজদার তুলনায় হাজারো প্রশান্তি ও স্বাদ নিয়ে আল্লাহ তা'আলার সামনে সিজদা করবে।

মুফাসসিরিনে কেরাম এই আয়াতে কারীমার তাফসীরে লিখেন, বান্দা যখন সিজদা করে তখন মূলত আল্লাহ তা'আলার পায়ের গোছায় সিজদা করে। আল্লাহ তা'আলার পায়ের গোছা কেমন আমরা জানিনা। কে জানে, আল্লাহ

তা'আলার 'পিণ্ডলী' অর্থাৎ পায়ের গোছা দ্বারা কী উদ্দেশ্য? কিন্তু এটা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার একটি 'তাজাল্লি' বা দ্যুতি। এই তাজাল্লিরই সিজদা হয়। পৃথিবীতে এই দ্যুতি দৃষ্টিগোচর হয় না এবং সর্বসাধারণের তা অনুভূতও হয় না। তবে এই সিজদাকারী যখন আখেরাতে পৌছবে তখন ঐ তাজাল্লীকে তার সামনে ফেলা হবে এবং সে ঐ তাজাল্লী বা দ্যুতিকে সিজদা করবে। সেই সিজদার স্বাদই হবে আলাদা।

এই এক সিজদা যাকে আপনি ভারী মনে করেন

এই ঘটনা থেকে এই শিক্ষা লাভ হচ্ছে যে, মে'রাজের উপঢৌকনের মূল্য বোঝা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলার সামনে সিজদায় পড়ে যান। নিজেকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর রূপে প্রকাশ করুন। আহ! আমরা এই সিজদা করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ি। এই সিজদাকে ভারী মানে করি। কিন্তু আপনার জানা নেই এই এক সিজদার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কত সিজদা থেকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছেন। মরহুম আল্লামা ইকবাল বলেন–

یہ ایک ہے جس تو گراں سمجھتا ہے
ہزار سجدے دیتا ہے آدمی کو نجات

আল্লাহ দরবারে সিজদা করুন। এরপর অন্যকারো সামনে সিজদা করার প্রয়োজন নেই। আর যদি আল্লাহ তা'আলার সামনে সিজদা করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে আল্লাহই জানেন কোথায় কোথায় আপনাকে সিজদা করতে হবে। কখনো শাসকের সামনে। কখনো বা বিত্তশালীদের সামনে, কখনো নেতাদের সামনে সিজদা করতে হবে। কিন্তু যে কপাল একবার আল্লাহ তা'আলার সামনে ঝুঁকে, সে কপাল আর কারও জন্য কোথাও ঝুঁকতে পারে না। সে জানে সব কাজের শেষ পরিণতি ঐ পবিত্র সত্তারই হাতে। না কোন সম্পদশালীর ক্ষমতায় কোন কিছু আছে। না আছে কোন অফিসারের হাতে। যা কিছু আছে সব তারই হাতে। এজন্য আমার কপাল ঝুঁকবে তো তাঁরই সামনে ঝুঁকবে। অন্যকারো সামনে ঝুঁকতে পারে না। মেরাজের ঘটনায় আমাদের জন্য রয়েছে এ মহান শিক্ষা।

দ্বিতীয় উপহার হলো শিক্ষা এবং বিধান

এরপর দেখুন! কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা 'ইসরা' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল করেছেন। যার প্রথম আয়াত আমি এখন আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি,

سُبْحَانَ الَّذِىْ أَسْرَى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى.

পবিত্র সত্তা তিনি যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিকালে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় ভ্রমণ করিয়েছেন। এই আয়াতে মে'রাজের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। এরপর এই সূরায় বিভিন্ন বিধান দেয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মে'রাজ তোমাদের জন্য এই সকল পয়গাম নিয়ে এসেছে। এই সূরায় অনেক বিধি-বিধান রয়েছে। যেমন, পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করো। পিতা মাতাকে কষ্ট দিওনা। প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো। আমানতের খেয়ানত করো না। প্রায় অর্ধেক সূরা এই বিধান ও শিক্ষা দিয়ে পূর্ণ। যেন মে'রাজে প্রথম উপহার দেয়া হয়েছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের। দ্বিতীয় উপহার বিভিন্ন শিক্ষা ও বিধানাবলী।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'বান্দা' সম্বোধন

এখানে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়, এক. এই সূরার প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মেরাজের লম্বা চওড়া ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে عَبْد বান্দা বলে ঘটনার সূত্রপাত করছেন।

سُبْحَانَ الَّذِىْ أَسْرَى بِعَبْدِهٖ অর্থাৎ ঐ মহান সত্তা যিনি স্বীয় বান্দাকে নৈশ ভ্রমণ করিয়েছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বীয় বান্দা বলেছেন। অথচ কোরআনে কারীমের অন্যত্র হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্ন শব্দে সম্বোধন করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا ○ وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ○

(سورة الأحزاب)

অর্থ : নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী হিসেবে, সু-সংবাদ দাতা রূপে। সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী হিসেবে এবং আলোকজ্জ্বল প্রদীপ বানিয়ে।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ○ (سورة الأنبياء ٠)

আমি আপনাকে জগতবাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেমন গুণ বর্ণনা করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। কিন্তু মে'রাজের ঘটনায় এসকল ছিফাতের পরিবর্তে একথা বলেছেন,

ঐ সত্তা যিনি স্বীয় বান্দাকে ভ্রমণ করিয়েছেন। এর মাধ্যমে এদিকে ইশারা করেছেন যে, মানুষের পূর্ণতর মে'রাজ হলো সে আল্লাহর বান্দা হয়ে যাবে।

মানুষের সর্বোচ্চ মর্যাদা হলো বন্দেগী

বন্দেগী একটি সর্বোচ্চ ও সুমহান মর্যাদা যা প্রতিটি মানুষের অর্জিত হতে পারে। এরচেয়ে সুউচ্চ কোন মর্যাদা নেই। এরচেয়ে মহান কোন মর্যাদা নেই। যে বান্দা আল্লাহ তা'আলার সামনে যত বেশী বন্দেগী প্রকাশ করবে সে বান্দা আল্লাহ তা'আলার কাছে তত বেশী সম্মানিত ও মহান। তার মর্যাদা তত বুলন্দ। বন্দেগীর অর্থ হলো স্বীয় জীবনকে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের তাবে'দার বা অনুগত বানিয়ে নেয়া।

عاشقی چیست؟ بگو بندہ جاناں بودن

دل بدست دیگرے دادن و حیراں بودن-

প্রেম কী জিনিস? তার উত্তরে বলো যে, প্রেমাস্পদের দাস হয়ে যাওয়া
আপন দেহ মনকে অন্যের সোপর্দ করে পেরেশান হয়ে যাওয়া

এটাই হলো বন্দেগী, স্বীয় অস্তিত্বকে আপন খালেক, মালিকের সমীপে সোপর্দ করা। তিনি যেভাবে চান সেভাবে করা। আমাকে নির্দেশ করবেন, আমি তাঁর প্রতিটি কর্মে তুষ্ট। তিনি যে হুকুম দিতে চান আমি তাঁর হুকুম পালনে সদা সচেষ্ট। এরই নাম বন্দেগী, আর এটাই হলো মানুষের সর্বোচ্চ মর্যাদা। এরচেয়ে বড় কোন মর্যাদা হতে পারে না। এ জন্যই মে'রাজের ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'বান্দা, বলে সম্বোধন করেছেন।

বন্দেগী হলো পূর্ণ আনুগত্যের নাম

দ্বিতীয় বিষয় হলো এই যে, যেমনটা আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছিলাম যে, মে'রাজের ঘটনা হলো মানব ইতিহাসে সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। তবে আমরা আমাদের দ্বীনকে 'ইফরাত, (শিথিলতা) 'তাফরীত' (বাড়াবাড়ি) থেকে রক্ষা করেছি এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছি। এজন্য আমাদের ধর্মে বলা হয়েছে, বন্দেগীর উদ্দেশ্য হলো, যা কিছু বলা হয়েছে তারই উপর আমল করা। নিজ থেকে কোন কিছু উদ্ভাবন না করা। আর যে বিষয় যে স্তরের তাকে সে স্তরে রাখা। কমও না করা বেশীও না করা। শবে মে'রাজ যাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঊর্ধ্বকাশে গমন করেছেন তা সবচেয়ে সম্মানিত রাত। মর্যাদাময় রাত। তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে

কেরামের গোটা সীরাতে তায়্যিবার প্রতি লক্ষ্য করুন। কোথাও এমন কোন ঘটনা পাবেন না যেখানে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, অমুক তারিখে 'শবে মে'রাজ' হয়েছে, তাই 'শবে মেরাজ' পালন করতে হবে। এই রাতে আলোকসজ্জা করতে হবে। বিশেষ ইবাদত বন্দেগী করতে হবে।

এই রাতে বিশেষ কোন আ'মল সাব্যস্ত নেই

আমি প্রথমে বলেছিলাম, কোন রাতে 'শবে মে'রাজ' সংঘটিত হয়েছে এটা নিশ্চিতভাবে জানা নেই। আর যদিও ধরে নেয়া হয় যে, অমুক রাতে 'শবে মে'রাজ' সংঘটিত হয়েছে। তাহলে এই রাতে বিশেষ কোন আমলকে সুন্নত মনে করা জায়েয নেই। এমন কর্মকাণ্ডকে বিদ'আত বলে। হ্যাঁ যে রাতে আল্লাহ তা'আলা তাওফিক দান করেন, সে রাতে বেশী বেশী নামায পড়ুন, বা তিলাওয়াত করুন। নফল পড়ুন, সিজদা করুন। সিজদায় দো'আ করুন। এটা আল্লাহ তা'আলার বড় অনুগ্রহ। তবে কোন রাতকে নির্দিষ্ট করা ঠিক নয়।

রজবের রোযা সাব্যস্ত নেই

এমনিভাবে রজব মাসের রোযা রাখা, এ ব্যাপারে কোন সহী হাদীস সাব্যস্ত নেই। বরং হযরত ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, যদি তিনি কাউকে রজব মাসে রোযা রাখতে দেখতেন তখন তিনি তাঁকে জোর পূর্বক খাইয়ে রোযা ভাঙ্গাতেন। তিনি বলতেন, তোমরা মনে করছ এটা সুন্নত। অথচ এটা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত নয়। হ্যাঁ যে কোন দিনে রোযা রাখেন, কোন গুনাহই নেই। তবে সুন্নত মনে করে নয়। যদি রাত জাগেন, রাতভর ইবাদত করেন কোন গুনাহই নেই। তবে সুন্নত মনে করে নয়। প্রতিটি মুসলমানের একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে থাকা চাই। যে গণ্ডি বা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম এবং এরচেয়ে আগে বাড়া মানে সীমা অতিক্রম করা। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফযল ও করমে আপন অনুগ্রহে আমাদের সকলকে সীমাতিক্রম করা থেকে হেফাজত করুন এবং মেরাজের যে শিক্ষা রয়েছে তা আত্মস্থ করে ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করে তার উপর আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ—

শা'বান মাসের ফযিলত

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ، اٰمَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ- وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

রজব মাসের চাঁদ দেখে মাসনূন[৫] দু'আ পড়া

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! শা'বান মাস চলছে। শরয়ী আহকামের বিবেচনায় এই মাস রমযানুল মোবারকের ভূমিকা। কেননা এই মাসের পরেই রমযান মাসের আগমন ঘটবে। রমযান মাসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু বিশেষ আমল ছিল যা তিনি এই মাসেই পালন করতনে। ইতোপূর্বে আমি বলেছিলাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা আমল ছিল, যখন তিনি রজব মাসের চাঁদ দেখতেন তখন তিনি এই দু'আ করতেন– اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا رمضان হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য রজব এবং শা'বান মাসে বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে রমযান মাসে উপনীত করুন। অর্থাৎ আমাদেরকে রমযান পর্যন্ত হায়াত দান করুন যাতে তার বরকত, রহমত পরিপূর্ণরূপে লাভ করতে পারি। সুতরাং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা আমল ছিল এই দু'আ করা এবং তিনি শা'বান মাসে অধিক পরিমাণে রোযা রাখতেন।

মনে করুন এই রোযা রাখা রমযান মাসের প্রস্তুতি কিংবা তার অনুশীলন অথবা অভ্যর্থনা জ্ঞাপন। যাই হোক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মাসে অধিক নফল রোযা রাখতেন। এই রোযা ফরযও না ওয়াজিবও না। তবে শা'বান মাসের রোযা অন্যান্য মাসের রোযা থেকে অধিক ছাওয়াব, ফযিলত ও আজরের দাবি রাখে। কোন সংখ্যা কিংবা দিন নির্দিষ্ট নেই। বরং যেদিন আল্লাহ তাওফিক দান করেন ঐ দিনই নফল রোযা রাখা যাবে।

---

[৫] হাদীসে বর্ণিত দু'আ।

শা'বান মাসে কাযা রোযা রাখা

হযরত আয়েশা রা. বলেন, রমযান মাসে অপারগতার কারণে যে সকল রোযা কাযা হয়ে যেত শা'বান মাসে তার কাযা রাখতাম। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই মাসে অধিক নফল রোযা রাখতেন। তো আমার জন্যও রোযা রাখা সহজ হয়ে যেত। যেহেতু হুযূর রোযা রাখতেন। এই হাদীস থেকে শা'বান এর রোযার ফযিলত বোঝা যায়।

রমযানের দুই দিন আগে রোযা না রাখা

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সব সময় এই কথা বলতেন যে, রমযানের একদিন কিংবা দুই দিন আগে রোযা রাখবে না। ওলামায়ে কেরাম এর দুইটা কারণ বর্ণনা করেন। একটা কারণ হলো, রমযানকে বরণ করতে গিয়ে যেন উদ্যম হারিয়ে না যায় এবং শারীরিকভাবে দুর্বল না হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় কারণ, যা এর চেয়ে গুরুতর। দ্বীন হলো মানার নাম। আল্লাহর হুকুম জানা। রাসূলের তরীকা মানা। প্রবৃত্তির দাসত্ব করা, আবেগে উদ্বেলিত হওয়ার নাম দ্বীন নয়। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হুকুমের পূর্ণ আনুগত্য করার নামই হলো দ্বীন।

রমযানের রোযায় বৃদ্ধি ঘটবে

এজন্যই বিদআ'তকে গোমরাহী এবং ভ্রষ্টতা বলা হয়েছে। কেননা বিদআ'ত এমন কাজ যা মানুষ প্রবৃত্তি ও চাহিদা মোতাবেক আঞ্জাম দিয়ে একেই দ্বীন মনে করে। দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে। যেহেতু এর সাথে শরীয়তের কোন সম্পর্ক নেই সেহেতু এর মাধ্যমে আল্লাহর হুকুমের কোন আনুগত্য হয় না। ফলে শরীয়ত হুকুম দিয়েছে যে, রমযানের একদিন আগে রোযা রেখো না। কেন রাখবে না? এ কারণে যে, যদি রমযানের এক দুই দিন আগে কেউ রোযা রাখে তাহলে সে যেন নিজের পক্ষ থেকে রমযানের রোযায় বৃদ্ধি করলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনার উপর ২৯ কিংবা ৩০ রোযা ফরয করেছেন। আপনি শা'বানের শেষ দুই রোযাও এর সাথে মিলিয়ে দিলেন তাহলে তো রমযানের রোযা ৩১ কিংবা ৩২ হয়ে গেল। এটা হবে আপনার পক্ষ থেকে রমযানের রোযাকে বৃদ্ধি করা।

আর শরীয়তও এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয বিধান সমূহে সংযোজনও করবে না সংশোধনও করবে না। এ কারণেই শা'বান মাসের শেষ দুই দিন রোযা রাখা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

সাহরী শেষ সময়ে খাওয়া

আশা করি আপনি শুনে থাকবেন যে, আখেরী ওয়াক্তে অর্থাৎ শেষ সময়ে সাহরী খাওয়া মুস্তাহাব। দুই তিন ঘন্টা আগে সাহরী খাওয়া কোন উচিত নয়। আর এটা সঙ্গত কাজও নয়। কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার সময় নির্ধারণ করেছেন। এখন আপনি যদি সাহরীর সময় হওয়ার দু'ঘন্টা আগ থেকে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেন তাহলে এটা হবে আপনার পক্ষ থেকে রোযার নির্দিষ্ট সময়ের সাথে আরো দুই ঘন্টা যোগ করা। এজন্য সবচে মুনাসিব হলো, শেষ সময়ে সাহরী খাওয়া।

ইফতারি তাড়াতাড়ি করা

এমনিভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতারির ব্যাপারে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, যখন সূর্য ডুবে যাবে এবং নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে সূর্য ডুবে গেছে তখন দ্রুত ইফতারি সেরে ফেলো। বিলম্ব করো না। এখন যদি আপনি বিলম্ব করেন তাহলে এটা হবে আপনার পক্ষ থেকে রোযার নির্ধারিত সময়কে বৃদ্ধি করা। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা রাখতে বলেছেন। আর আপনি সূর্যাস্ত থেকে বিলম্ব করেছেন। এটা হলো মনগড়া ইবাদত। আর মনগড়া ইবাদতের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।

মূল কাজ হলো আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা

উপরোক্ত বিধানের মাধ্যমে এই শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, উদরপূর্তিতে কোন কীর্তি নেই। উপবাস থাকাতেও কোন পূর্ণতা নেই। আসল কীর্তি হলো আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ আনুগত্যে। যখন তিনি বলবেন অনাহারে থাক তখন অনাহারে থাকবেন। যখন তিনি বলবেন ক্ষুধা নিবারণ করো তখন ক্ষুধা নিবারণ করবেন। তখন খাওয়াটাই হলো ইবাদত, ফযিলত। কারণ তাঁর নির্দেশে খাও। আর শা'বান মাসের শেষ দুই দিনের আমল এটাই। এখান থেকে অনুমান করুন, শরীয়ত কত সূক্ষ্ম ব্যাপারে লক্ষ রেখেছে। শরীয়তের কোন বিধানে বর্ধন না করে। নিজ থেকে দ্বীনের মাঝে কোন কিছু অন্তর্ভুক্ত না করে। চাই তা বাহ্যত ভাল মনে হোক, ইবাদতের মত দেখা যাক। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সুনির্ধারিত বিধানের বিপরীত। তাই তা নিন্দনীয়, অপছন্দনীয় ও গর্হিত। যাই হোক এটা হলো শা'বান মাসের সাথে সম্পৃক্ত দ্বিতীয় বিধান।

শবে বরাতের ইবাদত

শা'বানের সাথে সম্পৃক্ত তৃতীয় বিধান হলো এই যে, শা'বান মাসের ১৪ এবং ১৫ তারিখের মধ্যবর্তী রাতকে আমাদের এখানে 'শবে বরাত' বলা হয়। এই রাতেরও কিছু বিধান রয়েছে। এটা এমন একটা রাত যার ফযিলত অসংখ্য রেওয়ায়াতের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। বলা হয়েছে এই রাতের ইবাদতের ছাওয়াব অন্যান্য রাতের ইবাদতের তুলনায় অনেক অনেক বেশী। আজকাল অনেক হযরত বলেন, শবে বরাতের কোন ভিত্তি নেই। সহী হাদীসের মাধ্যমে এর কোন আমল সাব্যস্ত নেই। তাদের এই কথা সঠিক নয়। বাস্তবে শবে বরাতের ফযিলত সম্পর্কে সত্তর জন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, এই রাতে ইবাদত করা বড় ফযিলতপূর্ণ। তবে সনদের বিবেচনায় কিছু রেওয়ায়াত বা বর্ণনা দুর্বল। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সকল রেওয়ায়াত ভিত্তিহীন ও অবাস্তব নয়। এজন্য মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য এটাই যে, শবে বরাতের বিশেষ গুরুত্ব ও ফযিলত রয়েছে। অতএব এ রাতে খুব বেশী ইবাদত করা এবং নফল নামায পড়া উচিত।

এই রাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আহ্বান

কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে যে, এই রাতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, الآ من مستغفر فاغفرله শোন! কেউ কি আছে, যে স্বীয় গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো? الآ من مبتلى فاعافيه আছে কী কোন বিপদগ্রস্ত যাকে আমি বিপদ থেকে উদ্ধার করবো? রাতভর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এই ঘোষণা হতে থাকে। এজন্য এরাতে জাগরণ করা এবং ইবাদতে মশগুল থাকা অন্য সাধারণ রাতের তুলনায় অনেক ফযিলতপূর্ণ। তবে শর্ত হলো এই ইবাদত এমনভাবে করতে হবে যেমনভাবে ইবাদত করেছেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এখানেও নিজের পক্ষ থেকে কমবেশী করার অবকাশ নেই। কারণ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار ঐ সকল নতুন বিষয় যা মানুষ দ্বীনের মাঝে সংযোজন করে তাই হলো বিদআত। আর সকল বিদআত ভ্রষ্টতা। আর সকল ভ্রষ্টতা ভ্রষ্ট ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

শবে বরাতে হালুয়া রুটি

শয়তান তো মানুষের পিছনে লেগে আছে। যখন সে দেখল যে এই রাত বড় ফযিলতওয়ালা রাত। এই রাতে মানুষ আল্লাহমুখি হয়, ইবাদত বন্দেগী করে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে তো আমার ক্ষতি হয়ে যাবে। তাই শয়তান এমন এমন পথ বের করলো যাতে মানুষ ইবাদত ছেড়ে এই পথ ধরে। যার ফলশ্রুতিতে এই রাতে মানুষ যে নেকী লাভ করতে পারতো তা করতে পারে না। কেননা শয়তান বুঝিয়েছে যে, নামায পড়ো আর না পড়ো কিন্তু শবে বরাতে অবশ্যই অবশ্যই হালুয়া রুটি পাকাবে। কারণ হালুয়া রুটি বানানো আবশ্যক, ফরয। যদি কোন ব্যক্তি এই কাজ না করে তাহলে সে নিন্দার যোগ্য। ভাই! ওর ঘরে তো শবে বরাতে হালুয়া রুটি পাকায় না। ও তো ওহাবী, কৃপণ, কাঞ্জুস।

এখন আপনি বলুন! কোরআন হাদীসের কোথাও কী হালুয়া রুটির কথা উল্লেখ আছে। না সাহাবায়ে কেরাম থেকে এমন কোন কাজ পাওয়া যায়। আর না হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। না সাহাবায়ে কেরামের কোন কাজকর্মে এর নির্দশন ফুটে উঠে। কিন্তু শয়তান এই কাজের প্রচার প্রসার করেছে, এবং একে ফরয ওয়াজিবের চেয়ে বেশী আবশ্যকীয় সাব্যস্ত করেছে। যদি কাউকে বলা হয় যে হালুয়া পাকিয়ো না। এটা বেদআত কাজ। তখন জবাব দেয় হালুয়া পাকানোতে কী সমস্যা? হালুয়া কোন হারাম বস্তু? আরে ভাই আপনি প্রতিদিন হালুয়া পাকান। কিন্তু শবে বরাতে বিশেষ করে হালুয়া রুটি পাকানো, একে ফরয মনে করা, কেউ না করলে তাকে নিন্দা করা এগুলো তো নিজের পক্ষ থেকে দ্বীনে বর্ধিত করা, সংযুক্ত করা, যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে স্বীকৃত নয়।

শবে বরাতে আতশবাজি

দ্বিতীয় তো হলো যে শয়তান মানুষকে হালুয়া রুটি থেকে আরো খতরনাক কাজে লিপ্ত রেখেছে। শবে বরাতে আতশবাজী হতে হবে। অথচ এর মাধ্যমে লাখো টাকা আগুনে জ্বলে যায়। কেননা, এই আতশবাজী না জানি কত নিষ্পাপ প্রাণ হনন করছে। এই আতশবাজী আজ অসংখ্য ধ্বংসাত্মক কাজের সাক্ষী হয়ে আছে। যখন কোরআন হাদীসে এবং সাহাবাদের কোন আমলে এই আতশবাজীর প্রমাণ নেই তখন শয়তান নিজের পক্ষ থেকে শবে বরাতে মানুষের মন-মস্তিষ্কে আতশবাজির প্রবণতা জাগ্রত করেছে। হালুয়া রুটি তো অন্যান্য দিনে জায়েয আছে। কিন্তু এই আতশবাজী তো অন্যান্য দিনেও হারাম। সুতরাং এই বরকতময় রাতে যখন আল্লাহ তা'আলা মাগফেরাত কামনার আদেশ করেন,

প্রার্থনা করার হুকুম দেন তখন এ জাতীয় ন্যাক্কারজনক কাজ কত বড় গুনাহের। সুতরাং এ ধরনের কর্মকাণ্ড বর্জনীয় হওয়া উচিত।

এই রাতে ইবাদতের তরীকা

তৃতীয় তো হলো এই, মুবারক রাত যাতে জাগরণ ও ইবাদতের আদেশ করা হয়েছে। তাতে ইবাদত করার সঠিক পদ্ধতি হলো, মানুষ তার প্রতিপালকের সাথে সম্পর্ক জুড়বে। একাকী নির্জনতায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হবে। ব্যাস এখন শুধু আমি আর আমার আল্লাহ। এই রাতে অধিক নফল নামায পড়বেন, সিজদা করবেন, বেশী বেশী তিলাওয়াত করবেন। আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। যতবেশী নির্জনতা অবলম্বন করবেন ততবেশী আল্লাহর নৈকট্য ও সুদৃঢ় সম্পর্ক কায়েম হবে। 'আজর ও ছাওয়াবে 'সমৃদ্ধ' হয়ে যাবেন, এবং দো'আ কবুলের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হবেন।

এই রাতে শুধু অনর্থক কাজ হয়

কিন্তু আজকাল আমরা এই রাতে আচার অনুষ্ঠানের ধারা চালু করে দিয়েছি। এই মোবারক রাতে রান্না বান্নার ধুম পড়ে যায়। দাওয়াত নামার হিড়িক লাগে। যার ফলশ্রুতিতে যে রাতের প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান সে রাতে শুধু অনর্থক ও বেহুদা কাজ হয়।

আরে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক কায়েম করুন। নফল নামায পড়ুন। লম্বা লম্বা কেরাত পড়ুন। দু'আ করুন, যত মুনাজাতে মাসনুন আছে সে গুলো পড়ে দু'আ করুন। নিজের জন্য দু'আ করুন। মুসলিম জাতি আজ কঠিন পরীক্ষা অতিক্রম করছে। বিশেষ করে আমাদের দেশ (পাকিস্তান) কে অপশক্তির আগ্রাসন ও প্রহসন চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। এজন্য দু'আ করুন। আল্লাহ কাছে কাকুতি-মিনতি করুন। এরাতে শুধু এমন কাজই করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফযল ও করমে আমাদের সবাইকে তাওফিক দান করুন আমীন।

১৫ শা'বানের রোযা রাখা

এর পরের দিন ১৫ শা'বান এ দিনে রোযা রাখার ব্যাপারে কোন হাদীস সহী সনদের সাথে সাব্যস্ত নেই। প্রচলিত আছে যে, শাবান মাসের ১৫ তারিখের রোযা বড় ফযিলতপূর্ণ। তবে এই রোযা সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সনদ অনেক দুর্বল। অবশ্য আমি যেমনটা বলেছিলাম যে, গোটা শা'বান মাস হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক রোযা রাখতেন। সুতরাং ঐ ফযিলত যেমন অন্যান্য দিনে হাসিল হয় তেমিন শা'বানের ১৫ তারিখেও হাসিল হবে।

কিন্তু বিশেষভাবে শা'বানের ১৫ তারিখের রোযাকে ফযিলতপূর্ণ মনে করা ঠিক নয়। পুরো মাসে সুযোগ পেলে যেমন রোযা রাখবেন এমনিভাবে শবে বরাতেও রোযা রাখবেন। বিশেষ কোন কারণে নয়।

এই রাতে ক্ষমার আধিক্য

এক হাদীসে আছে, এই রাতে আল্লাহ তা'আলা এত মানুষকে ক্ষমা করেন, কাবিলায়ে বনী কালবের মেষ পালের গায়ে যে পরিমাণ পশম আছে। আরবের বনী কালব গোত্র অনেক বড় গোত্র ছিল। তাদের মেষ পালও ছিল বিরাট। প্রতিটি মেষের গায়ে থাকে অগণিত পশম। পুরো গোত্রের যত মেষ আছে এগুলোর গায়ে যত পশম এই পরিমাণ মানুষকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন।

অন্তরে বিদ্বেষ পোষণকারীর ক্ষমা নেই

সাথে সাথে এও বলেন যে, এই রাতে দু' ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না। এক ঐ ব্যক্তি যে অন্য মুসলমানের ব্যাপারে শত্রুতা বা বিদ্বেষ পোষণ করে। 'বিদ্বেষ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, কোন কারণ ছাড়াই তার অনিষ্ট কামনা করা। তাকে খারাপ ভেবে কষ্ট দেয়া। তাকে অপদস্থ করার সুযোগ খোঁজে। এমন ব্যক্তির ঐ রাতে ক্ষমা নেই। এজন্য সর্বদা এদিকে লক্ষ রাখা উচিত যে, কোন মুসলমানের প্রতি আপনার অন্তরে যেন ঘৃণা না থাকে। আরে ভাই! কোন মুসলমানের ভুল প্রকাশ পেয়ে গেলে আপনি তার ভুল শুধরে দিন। তার ব্যাপারে আপনার কোন অভিযোগ থাকলে আপনি তার সাথে মোআ'মালা সাফ করে নিন। শরীয়ত আপনাকে এই অধিকার দিয়েছে যে, কোন ব্যক্তি আপনার যে পরিমাণ ক্ষতি করবে আপনাকে কষ্ট দিবে আপনিও তার সে পরিমাণ ক্ষতি করুন। কিন্তু মনের মধ্যে ক্ষোভ রাখা, এরপর ঐ ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করা, অপদস্থ করা, তার ক্ষতি করার সুযোগ খোঁজা এটা এত বড় গুনাহের কাজ যে এই রাতে তাকে মাফ করা হবে না।

টাখনুর নিচে সিলওয়ার পরিধানকারীদের ক্ষমা করা হবে না

দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যে তার পায়জামা, লুঙ্গি বা প্যান্ট টাখনুর নিচে পরিধান করে। আজকাল তো টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা ফ্যাশন হয়ে গেছে। আত্মমর্যাদার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ হাদীস শরীফে এসেছে এটা তাকাব্বুর বা অহংকারের নিদর্শন। আর অহংকার এমন বিষয় যা আল্লাহ তা'আলা কখনোই বরদাশত করতে পারেন না। এক হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, বড়াই তো আমার চাদর। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে আমার সাথে

বিবাদ করবে আমি তার ঘাড় মটকে দিব। সুতরাং অহংকার বড় খারাপ বিষয়। আর টাখনুর নিচে কাপড় পড়া এটা অহংকারেরই আলামত। এ কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। একটু চিন্তা করে দেখুন, টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে কী লাভ? কোন লাভ নেই। তবে এতটুকুই যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা এবং আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের সম্মুখীন হবে।

এই রাতে কবরস্থানে যাওয়া

সর্বশেষ যে কথাটা বলবো সেটা হলো, এই রাতে গোরস্থানে যাওয়ার ব্যাপারে একটা বর্ণনা আছে যে, গোটা হায়াতে তায়্যেবায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু একবার জান্নাতুল বাকীর কবরস্থানে গিয়েছেন। সনদের দিক থেকে রেওয়ায়াতটি অত মজবুত না। সেখানে কেবলামুখী হয়ে দোআ করেছেন। গোটা জীবনে শুধু একবারই এ ঘটনা ঘটেছে। প্রতিবছর যাওয়ার কোন 'মা'মুল' ছিল না। সুতরাং কেউ যদি এই নিয়তে কবরস্থানে যায় যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কবরস্থানে গিয়েছিলেন তাই আমিও যাচ্ছি তাহলে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু একে মুস্তাকিল (স্বতন্ত্র) সুন্নাত মনে করে প্রতি বছর যাওয়াকে আবশ্যকীয় মনে করার কোন অবকাশ নেই। এভাবে কোন ব্যক্তি যদি কবরস্থানে গিয়ে নিজের মৃত আত্মীয় স্বজনের জন্য দোআ করে, নিজের জন্য দোআ করে তাহলে কোন সমস্যা নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ –

রমযান মাস

যাকাত ও সদকা আদায় করার মাস

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَآ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ ○ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

সূচনা

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রমযানুল মোবারকের সুশীতল ছায়া দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তার ফযলে এই বরকতময় মাস থেকে ফায়দা উঠানোর তাওফিক দান করুন আমীন।

রমযান শুরু হওয়ার পূর্বে আমি একটি হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলাম যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসের শেষ দিন সাহাবায়ে কেরামের সামনে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। ঐ ভাষণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানুল মোবারকের ফযিলত ও তার বরকত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

রমযানে ফরয আমলের সাওয়াব সত্তর গুণ

ঐ ভাষণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা রমযান মাসকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। কোন ব্যক্তি যদি এই

রবকতময় মাসে কোন নফল ইবাদত করে তাহলে ঐ নফল ইবাদতের সাওয়াব একটি ফরয ইবাদতের সমান। আর কেউ যদি এই মাসে ফরয ইবাদত করে তাহলে আল্লাহ এর সাওয়াব সত্তরগুণ বাড়িয়ে দেন। অর্থাৎ যদি এক ওয়াক্ত নামায পড়ে তাহলে ঐ এক ওয়াক্ত নামায সত্তর ওয়াক্ত নামাযের বরাবর। আর যদি একটি রোযা রাখে তাহলে তার সাওয়াব সত্তরটি রোযার সাওয়াব পরিমাণ। তাই যত ফরয ইবাদত করবে তার সাওয়াব এই মাসে সত্তর গুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে। এই খোতবায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই একটি বিষয় বলেছেন।

রমযান সহমর্মিতার মাস

দ্বিতীয় যে বিষয়টি বলেছেন সেটা হলো, এই রমযানুল মোবারক হলো 'শাহরুল মুআসাত' অর্থাৎ অন্যের প্রতি সহমর্মিতার মাস। সহানুভূতির মাস। অর্থাৎ এই মাসে মুসলমানদের বিশেষভাবে এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া উচিত যে, একে অন্যের প্রতি সহমর্মী হবে, সহানুভূতিশীল হবে। মুসলমানদের সার্বক্ষণিক একটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে,

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

'মুসলমান তো ঐ ব্যক্তি যার হাত এবং মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে। না মুখে কাউকে কষ্ট দিবে না হাত দিয়ে কাউকে আঘাত করবে। যদি আপনার হাত মুখ দ্বারা কাউকে কষ্ট দেন তাহলে আপনি প্রকৃত মুসলমান নন।

দান খয়রাতের মাধ্যমে সহমর্মিতা

আরেকটি হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه.

এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, না সে তার ভাইয়ের উপর যুলুম করবে, আর না তাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করবে।

বরং যেখানে তার সাহায্যের প্রয়োজন সেখানে তাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করা এক মুসলমানের কাজ হতে পারে না। সুতরাং অন্যান্য মাসেও সহমর্মিতার আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিশেষভাবে রমযানুল মোবারক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটা সহমর্মিতার মাস। এই মাসে অন্যের প্রতি যত বেশী সহমর্মিতা ও সহানুভূতি দেখাবেন আল্লাহ তা'আলা আপনাকেও ততবেশী নেক দান করবেন। এটা আপনার গুনাহের মাগফেরাতের কারণ হবে। এর উদ্দেশ্য

হলো এই যে, এই বরকতময় মাসে দান সদকা যত বেশী হবে ততই আল্লাহর প্রিয় পাত্র হবেন। আর রমযানুল মোবারকের নূর ও বরকত অর্জন করার বড় একটি মাধ্যম হলো, এই মাসে দান সদকা করা। দান সদকা ছাড়াও নিকটাত্মীয় ও আপন জনদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা এবং তাদেরকে হাদিয়া তোহফা দেয়া এবং আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় কাজ করা এই মাসের গুরুত্বপূর্ণ আমল বা সহানুভূতির সর্বোত্তম তরীকা।

রমযানে অবারিত বায়ু প্রবাহের ন্যায় দান করা

হাদীসে আছে, রমযান মাসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দান সদকার গতি বায়ু প্রবাহের গতি থেকেও বেড়ে যেত। সারা বছর তো হুযূরের আমল ছিল যে, তার কাছে যা কিছু আসত তিনি তা বন্টন করে দিতেন। কিন্তু রমযান মাসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানশীলতা ছিল বায়ু প্রবাহের ন্যায় অবারিত। অর্থাৎ এই মাসে মানুষের জন্য বেশী থেকে বেশী ব্যয় করতেন। হাদিয়া দিতেন। এটা ছিল তার বিশেষ আমল। যাই হোক এই মাসে সওয়াব দ্বিগুণ হয়। যত বেশী হামদর্দি ও সহানুভূতি দেখাবেন তত বেশী সওয়াব পাবেন।

রমযান যাকাত আদায়ের মাস

এই জন্য মানুষের এই আমল চলে আসছে যে, তারা রমযানুল মোবারকে যাকাত আদায় করে। এই চিন্তা করে আদায় করে যে, যদি রমযান মাসে একটা যাকাত দেয় তাহলে এর বিনিময়ে সত্তরগুণ সওয়াব লাভ করবে। যদি একশত টাকা দান করে তাহলে সাতহাজার টাকার সওয়াব লাভ হবে। মানুষ রমযান মাসে যাকাত আদায় করে। এই জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, রমযান মাস যাকাত আদায়ের মাস।

যাকাত কার উপর ফরয

যাকাতের ব্যাপারে দুটি বিষয় আরয করবো। যা বড় জরুরী। অধিকাংশ মানুষ এ ব্যাপারে অজ্ঞ। প্রথম কথা হলো, যাকাত কার উপর ফরয? এবং কিসের উপর ফরয? এই মাসয়ালা অনেক মানুষই জানে না। অনেকের উপর যাকাত ফরয হয়েছে কিন্তু তারা জানেই না যে, তাদের উপর যাকাত ফরয হয়েছে। যাকাত ঐ সকল ব্যক্তির উপর ফরয যাদের কাছে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা কিংবা তার সমমূল্যের টাকা থাকে। কিংবা সমমূল্যের স্বর্ণ থাকে। বা অলংকার অথবা এই মূল্যের ব্যবসায়িক পণ্য বর্তমান থাকে। তার উপর যাকাত

ফরয। এখন বাজারে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার দাম প্রায় ২২ হাজার রূপী[৬]। এজন্য কোনো ব্যক্তির কাছে যদি নগদ ২২ হাজার রূপী থাকে। যা তার দৈনন্দিন খাবার খরচের অতিরিক্ত কিংবা এই মূল্যের স্বর্ণ বা রূপার অলংকার থাকে। অথবা সমমূল্যের ব্যবসায়িক মাল বিদ্যমান থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয। এজন্য ঐ ব্যক্তি শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে যাকাত আদায় করবে।

কোন তারিখে যাকাত আদায় করবেন?

দ্বিতীয় যে বিষয়টি বোঝা উচিত তা হলো, যাকাত তো মালের উপর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ফরয হয়। কিন্তু এই কথার উদ্দেশ্য মানুষ বোঝে না। উদ্দেশ্য বোঝা আবশ্যক। যাকাত মূলত ঐ তারিখে ফরয হয় যে তারিখে আপনি সাহেবে নিসাব হওয়ার পর এক বছর পূর্ণ হয়। সাহেবে নিসাব হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যেই দিন বা যেই তারিখে আপনার মালিকানায় ২২ হাজার রূপী বর্তমান থাকবে, কিংবা এই মূল্যের স্বর্ণ বা রুপার অলংকার আপনার মালিকানায় থাকবে ঐ তারিখ আপনার উপর যাকাত ফরয হওয়ার তারিখ। মনে করুন রজব মাসের ১ তারিখে আপনি ২২ হাজার রূপীর মালিক হয়েছেন। সুতরাং রজব মাসে আপনার যাকাতের তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। এখন আগামী বছর যখন রজব মাসের এক তারিখ হবে তখন আপনার উপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে।

সব মালের উপর বছর অতিক্রান্ত হওয়া আবশ্যক নয়

যাকাত এভাবে ওয়াজিব হবে যে, যখন রজব মাসের ১ তারিখ হবে, তখন আপনার মালিকানায় যত অর্থ থাকবে, চাই পঁচিশ হাজার হোক, কিংবা ত্রিশ হাজার হোক কিংবা চল্লিশ হাজার হোক বা এর চেয়ে বেশী হোক রজবের পহেলা তারিখে এ পূর্ণ সংখ্যার উপর যাকাত দেয়া ওয়াজিব হবে। এটা মনে রাখবেন যে, সব অর্থের উপর এবং প্রতিটি ব্যবসা পণ্যের উপর এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া আবশ্যক নয়। বরং যে তারিখে আপনি প্রথমবার সাহেবে নিসাব হবেন ঐ তারিখে আপনার কাছে নিসাবের বেশী যত অর্থ থাকবে তার উপর যাকাত আসবে, কেউ কেউ বলেন যে, আমার বছর তো পহেলা রজবে পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এই দশ হাজারের উপর বছর পূর্ণ হয়নি। অতএব এর উপর যাকাতও ওয়াজিব হবে না। এমন কথা অমূলক। কেননা বছর অতিক্রান্ত হবে

---

৬ আমাদের মুদ্রায় টাকায় এর পরিমাণ আরেকটু বেশী।

নেছাবের উপর। বছরের মাঝে যে অর্থ আসবে, যাবে, কমবে বাড়বে তার কোন হিসাব নেই। অর্থাৎ রজবের ১৩ তারিখে আপনার কাছে যে পরিমাণ অর্থ সম্পদ থাকবে তার উপরই যাকাত ওয়াজিব হবে।

যাকাত আদায় করার জন্য রমযানের অপেক্ষা করবেন না

তৃতীয় কথা হলো, যাকাত সে তারিখে ওয়াজিব হবে যে তারিখে আপনি নিসাবের মালিক হয়েছেন। কোন কোন সময় মানুষ এমনটা করে যে, পহেলা রজবে যাকাত ফরয হয়েছে। কিন্তু সে যাকাত আদায় না করে রমযানের অপেক্ষায় বসে থাকে এই ভেবে যে যখন রমযানুল মোবারক আসবে তখন আমি যাকাত আদায় করবো। কেন? এ কারণে যে রমযানুল মোবারকে যাকাত আদায় করলে সত্তরগুণ বেশী ছাওয়াব অর্জিত হবে। আরে ভাই! আপনার উপর পহেলা রজবে যাকাত ওয়াজিব হয়েছে। এক ব্যক্তি ক্ষুধার্ত, তার এখন খাদ্য প্রয়োজন। আর আপনি এই মনে করে বসে আছেন যে রমযান এলে যাকাত দিব। জেনে রাখুন, নিঃসন্দেহে আপনি অধিক আজর লাভ করবেন। কিন্তু তার চেয়ে বেশী ছাওয়াব পাবেন যদি প্রয়োজনের মুহূর্তে আপনি একজন প্রয়োজনগ্রস্ত মুসলমানের প্রয়োজন পূর্ণ করে আপনার যাকাত প্রদান করে। ইনশাআল্লাহ আপনি অনেক অনেক বেশী ছাওয়াব অর্জন করবেন। সুতরাং যাকাত আদায়ের জন্য রমযানের অপেক্ষায় বসে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। বরং তার আগেই যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তখনই আদায় করে দেয়া উত্তম।

এখন রমযানের কোন তারিখকে যাকাতের জন্য নির্ধারণ করে নেয়া

অনেক মানুষেরই জানা থাকে না যে, প্রথমবার কখন আমি নেছাবের মালিক হয়েছি। যখন জানা নেই তখন এর আসল পদ্ধতি হলো, অনুমান করে কিংবা চিন্তা ভাবনা করে একটা তারিখ নির্ধারণ করুন। কিন্তু চিন্তা ভাবনার পর যদি কোন দিনের কথা মনে না আসে তাহলে রমযানের কোন একটা তারিখ নির্ধারণ করে নিন। যেমন, ১ম রমযান কিংবা ২য় রমযানকে নির্ধারণ করে নিন। নির্ধারণ করার পর নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী পুরো বছর হিসাব করুন। হিসাব করার উদ্দেশ্য হলো, আপনার যত সম্পদ আছে তার হিসাব করুন। এরপর দেখুন যে, আমার যিম্মায় কী পরিমাণ সম্পদের যাকাত আসে। যেমন ব্যবসায়ীদের একটা হিসাব আছে। একটা নির্দিষ্ট তারিখ আছে। তারা ঐ তারিখে সমস্ত সম্পদের হিসাব করে দেখে তাদের কাছে কী পরিমাণ সম্পদ মজুদ আছে? কতটুকু মাল এখনো অপ্রস্তুত রয়েছে? কী পরিমাণ অঙ্ক উসূল হয়েছে? কী পরিমাণ আদায়

হয়েছে? কত লাভ হয়েছে? কত লোকসান হয়েছে? এভাবে যাকাতের জন্য আপনি যে তারিখ নির্ধারণ করেছেন এ তারিখকে আপনি হালখাতা বানিয়ে নিন। ঐ দিনে যাকাতের হিসাবও করে নিন।

তিন ধরনের সম্পদের উপর যাকাত আসে

তিন প্রকারের সম্পদের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়। এক. নগদ অর্থ চাই সেটা আপনার ঘরে থাকুক কিংবা ব্যাংক একাউন্টে থাকুক। দুই. ব্যবসাপণ্য। তিন. অলংকার চাই সেটা স্বর্ণের অলংকার হোক কিংবা রুপার অলংকার হোক। অলংকারের বাজার মূল্যের উপর যাকাত আসবে। আর মালের মধ্যে ঐ মাল, যা বিক্রির জন্য প্রস্তুত রাখা আছে। কিংবা এখনো যে মাল সম্পূর্ণ তৈরী হয়নি এবং ঐ মালও অন্তর্ভুক্ত যা এখনো প্রস্তুতির পর্যায়ে রয়েছে। এসব মালের উপর তার অবস্থা অনুযায়ী মূল্য ধার্য হবে। কেউ যদি কম্পানির শেয়ার কিনে রাখে তাহলে তার উপরও যাকাত আসবে। ঐ শেয়ারের বর্তমান বাজার দরের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। দেখুন সমস্ত মালের সর্বমোট অর্থ মূল্য কত। যদি আপনার যিম্মায় ঋণ থেকে থাকে তাহলে এ ঋণকে মোট মূল্য থেকে আলাদা করুন। এখন দেখুন কত বাকি আছে। অবশিষ্টাংশের ৪০ ভাগের একভাগ অথবা শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত আদায় করবেন। এটা হলো যাকাত আদায়ের সহজ পদ্ধতি। ঐ নির্দিষ্ট তারিখে হিসাব নিকাশ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। যেটা যাকাতের তারিখ হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে।

অনুমান করে যাকাত দেয়া না জায়েয

অনেক মানুষই যাকাত দেয়। যাকাত রমযানুল মোবারকেই দেয়। কিন্তু কোন হিসাব নিকাশ করে না। বরং এভাবে অনুমান করে দেয় যে, আমার যিম্মায় এত টাকা যাকাত আছে। মনে রাখবেন। এই যাকাত আল্লাহ তা'আলার ফরয বিধান। এটা শুধু অনুমান করে আদায় করার বস্তু নয়। বরং সম্পূর্ণ হিসাব নিকাশ করে আদায় করা উচিত। অনেকে বলে, আমরা হিসাব করি না। বরং অনুমান থেকে সতর্কতামূলক বেশী প্রদান করি। আরে ভাই আপনি কী করে বেশী দেন? আপনি তো হিসাবই করেন নি। আপনি কী করে বুঝলেন বেশী দিয়েছেন না কম দিয়েছেন। মনে রাখবেন! যতটুকু যাকাত ওয়াজিব হয়েছে তা থেকে যদি এক পয়সাও কম দেন, তাহলে এর অর্থ হবে এই যে, এক পয়সা যা যাকাত হিসাবে ওয়াজিব হয়েছিল তা আপনার সম্পদের সাথে মিশে গেছে।

আর হাদীস শরীফে আছে, ما خلطت الزكوة مالا إلا أهلكته যে সম্পদে যাকাত মিশে তা ঐ সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়। অর্থাৎ কারো উপর যাকাত

ওয়াজিব হয়েছে আর সে যাকাত দেয় নি। এক পয়সাও কম দিয়েছে তাহলে এই যাকাতের এক পয়সা তার মালকে ধ্বংস করে দিবে কিংবা তাকে ধ্বংস করে দিবে যে যাকাতে কম করেছে। এজন্য বড় গুরুত্বের সাথে, ভালোভাবে হিসাব নিকাশ করে পূর্ণ সতর্কতার সাথে যাকাত আদায় করা উচিত।

যাকাতের বিশদ বিবরণের জন্য রিসালা দেখুন

যাকাতের মাসায়েল আমি এজন্য উল্লেখ করেছি যে, এখন রমযান মাস চলছে যাতে সকল মুসলমান নিয়মতান্ত্রিকভাবে যাকাত আদায় করতে পারে। বিশদ বিবরণের জন্য আমার একটি ছোট পুস্তিকা আছে। যার নাম 'যাকাত কীভাবে আদায় করবো'? এতে বিশদ বিবরণ রয়েছে। এমনিভাবে আমার বড় ভাই মাও. মুফতী রফি সাহেব দা. বা. এর একটি ছোট পুস্তিকা আছে 'আহকামে যাকাত' নামে। তাতেও বিস্তারিত বিবরণ আছে। সকলের উচিৎ যাকাতের মাসআলাগুলো ভালোভাবে বোঝা। আল্লাহ তা'আলা একে অনেক বড় নেয়ামত হিসেবে নির্ধারিত করেছেন।

যাকাত গরীবের হক্ব

আর এটা মনে করবেন না যে, এই যাকাত দিয়ে আপনি গরিব অসহায় প্রয়োজনগ্রস্তদের প্রতি অনুগ্রহ করছেন। আর এটা অনুগ্রহ নয়। বরং এটা তো গরীবের হক্ব। কোরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○ (سورة الذاريات ١٩)

এক মুসলমানের সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত এবং বঞ্চিতদের হক্ব। এটা নয় যে আপনি কাউকে যাকাত দিয়েছেন সুতরাং আপনি তার প্রতি ইহসান করেছেন। আপনি দায়বদ্ধকে অনুগ্রহ করেছেন। এমনটা নয়। দেখুন আপনার কাছে যে সম্পদ আছে তা অন্য কারো দান। যে সত্তা কর্তৃক প্রদত্ত সে সত্তা আপনার উপর ফরয করেছেন যে, তোমার মালের এ অংশটুকু তোমার নয়। বরং এই অংশটুকু ঐ লোকদের যাদের সম্পর্কে আমি বলেছি–

إنما الصدقات للفقراء والمساكين۔

অর্থাৎ সদকা সকল দরিদ্র ও অসহায়ের জন্য। এ অংশ তাদের হক্ব। যদি না দেন তাহলে এটা এমন হবে যেমন আপনি কারো পাওনা টাকা পরিশোধ করেন নি কিংবা আপনি চুরি করেছেন। সুতরাং যাকাত দিয়ে অনুগ্রহ করার কোন সুযোগ নেই। বরং এসকল অভাবগ্রস্তের হক্ব রয়েছে আপনার সম্পদে। তা তাদেরকে প্রদান করতে হবে। এজন্য গুরুত্ব সহকারে বড় সম্মানের সাথে

যাকাত হকদারের নিকট পৌছে দেয়া উচিত। এমনভাবে না দেয়া যার ফলে সে নিজেকে হীন ও অপদস্থ ভাবে।

যাকাতকে উপহার এবং হাদিয়া বলে দেয়া

এ কারণে ফোকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, যখন কাউকে যাকাত দিবেন তখন যাকাত শব্দ উল্লেখ করা আবশ্যক নয় যে, আমি তোমাকে যাকাত দিচ্ছি। বরং বলবে ভাই আমি তোমাকে সামান্য হাদিয়া দিচ্ছি। যাতে কারো সম্মানহানি না হয়। কেউ মনে আঘাত না পায়।

নিকটাত্মীয়কে যাকাত প্রদানে দ্বিগুণ ছাওয়াব

নিকট আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত প্রদানে অধিক ছাওয়াব। শুধু দুই শ্রেণীর নিকট আত্মীয়কে যাকাত প্রদান করা যাবেনা। এক. স্বামী স্ত্রীকে যাকাত দিতে পারবে না। স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে না। দুই. মা-বাবা সন্তানকে দিতে পারবে না। সন্তান মা-বাবাকে যাকাত দিতে পারবে না। এছাড়া সকল আত্মীয় স্বজন যদি যাকাতের হক্বদার হয় তাহলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে। এজন্য ভাইকে, বোনকে, মামাকে, চাচাকে, খালাকে, ফুফুকে, ইত্যাদি সকলকে যাকাত দেয়া যাবে। বরং এ ধরনের নিকটাত্মীয়দেরকে যাকাত প্রদানে অধিক ছাওয়াব রয়েছে। যাকাত আদায়ের ছাওয়াব এবং আত্মীয়তা রক্ষার ছাওয়াবও। যাই হোক! এই সকল মাসয়ালার প্রতি ভালভাবে লক্ষ রেখে যাকাত আদায়ের চেষ্টা করা।

জায়গা যমীনের যাকাত

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, জায়গা যমীন এবং দালান কোঠার উপর যাকাত আছে না নেই? উত্তর যে সকল জায়গা যমীন বিক্রি করার উদ্দেশে ক্রয় করা হয় তার মালিকানার উপর যাকাত ওয়াজিব। কিন্তু কোন বাড়ী বা জায়গা বসবাসের জন্য কিংবা ভাড়া দেয়ার জন্য যদি ক্রয় করা হয় তাহলে তার মালিকানার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

আল্লাহ তা'আলা তার ফযল ও করমে এবং স্বীয় অনুগ্রহে সঠিক পদ্ধতিতে তাঁর 'মরযি মোতাবেক' এই ফরয আমলকে আদায় করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ –

বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَآ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ آمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ - وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

সূচনা

দীর্ঘ দিন পর আজ এই মজলিসে আপনাদের সাথে মোলাকাতের সুযোগ হয়েছে। মাঝে কিছুদিন সফরে ছিলাম। বিভিন্ন সমস্যাও দেখা দিয়েছিল। যার কারণে এই মজলিস হয়নি। আজ আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফযল ও করমে তাওফিক দান করেছেন। যেহেতু এটা বছরের প্রারম্ভ, তাই সূচনাতেই এই বিষয় আরজ করবো যে, এই মজলিসের উদ্দেশ্য না ভাষণ দেয়া, না কোনো ওয়াজ করা আর না রসমি বা প্রথাগত আলোচনা পর্যালোচনা করা। বরং এই মজলিসের উদ্দেশ্য হলো, আমরা এক সাথে নিজেদের সংশোধনের কোনো ফিকির করবো। আল্লাহ তা'আলার সুন্নত হলো, যখন আল্লাহর বান্দারা সততা এবং একনিষ্ঠতার সাথে এই কাজের জন্য একত্রিত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফযল ও করমে আমাদেরকে লক্ষ্য অর্জনে সফল করুন। আমীন।

বর্তমান নাজুক পরিস্থিতি

ঘটনাক্রমে বর্তমানে যে পরিস্থিতি চলছে তা বড়ই নাজুক। মনে হয় এমন কোন মুসলমান নেই যার অন্তরে বর্তমান পরিস্থিতির কারণে অস্থিরতা নেই, ব্যথা নেই। সকলেই এই অবস্থার কারণে অস্থির পেরেশান। সকলের মুখে এই প্রশ্ন, কী হচ্ছে? কী হবে? সারা দেশে যেখানেই দু'চারজন মিলিত হচ্ছে সেখানেই এই

আলোচনা হচ্ছে, বিভিন্ন খবর আসছে তার উপর আলোচনা হচ্ছে, পর্যালোচনা হচ্ছে, এর কারণ বিশ্লেষণ হচ্ছে, প্রত্যেকে স্বীয় রায় এবং খেয়াল পেশ করছে। আর মজলিসগুলোতেও এই আলোচনা পর্যালোচনায় পূর্ণ এক হতাশাব্যঞ্জক ও নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সকলের মুখে একই কথা, না আমাদের জানমালের নিরাপত্তা আছে, না আমাদের মান সম্মান সুরক্ষিত আছে। কদমে কদমে বিপদের আশঙ্কা। রাষ্ট্রব্যবস্থা অগোছালো। কোনো ব্যক্তি কোনো কাজ করতে চায় তো তার কাজ হয় না। জালিম শাসক চেপে বসেছে। মানুষের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। সুদের বাজার ঘুষের বাজার রমরমা। অধস্তন থেকে ঊর্ধ্বতন সকলে গোগ্রাসে হারাম গিলছে। মোটকথা যেদিকেই তাকাবেন আপনার চোখে পড়বে শুধু অরাজকতা আর অরাজকতা।

ইসলাম আমাদেরকে কী শিখিয়েছে?

প্রশ্ন জাগে, আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে কি এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে? দেখার বিষয় হলো, এই সকল পরিস্থিতিতে ইসলাম আমাদেরকে কী শিখিয়েছে? আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফযল ও করমে আমাদেরকে এমন দ্বীন দান করেছেন যাতে কোন পরিস্থিতিতে কী করণীয় সব বলে দেয়া হয়েছে। এটা এমন ধর্ম নয় যা জগাখিচুড়ি, যার কোনো বাস্তবতা নেই। বরং এটা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত ধর্ম এবং জনাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত ধর্ম। আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ধর্ম।

এই পরিস্থিতি সম্পর্কে আল্লাহ অবগত

কেয়ামত পর্যন্ত ঘটমান সকল বিষয়ে আল্লাহর জ্ঞান রয়েছে। সকল পরিস্থিতির চূড়ান্ত ফলও তাঁর জানা আছে। তিনি আপন বান্দাদের সম্পর্কে ভাল করে জানেন যে, আমার বান্দারা কোন হালতে আছে।

وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ○ (سورة آل عمران)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে ভাল করেই জানেন।

সূরা মুলকে আল্লাহ তা'আলা কেমন মুহাব্বত করে বলছেন :

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ○ (سورة الملك)

আমাদের বুযুর্গদের মধ্য থেকে হযরত শাহ আব্দুল গনী ফুলপুরী (রহ.) তাঁর এক ওয়াযে এই আয়াতের বড় সুন্দর তরজমা করেছেন। তিনি বলেন, আরে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি জানবেন না? অর্থাৎ যিনি গোটা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং সমগ্র মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন। তিনি কি জানবেন না যে,

আমার সৃষ্টির কী অবস্থা? তার কী হাকীকত? তার মানসিকতা -কী? তার ধ্যান ধারণা কী? তার আবেগ অনুভূতি কেমন? অথচ তিনি সূক্ষ্মদ্রষ্টা এবং সম্যক অবগত।

সকল পরিস্থিতির জন্য পথ বিদ্যমান রয়েছে

এটা কী অদ্ভুত কথা হবে যদি বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে অনবগত, বে-খবর। এটা কী করে হতে পারে স্রষ্টা সৃষ্টি সম্পর্কে অজ্ঞ। যাই হোক আল্লাহ তা'আলা তার ফযল ও করমে আমাদেরকে এমন দ্বীন দান করেছেন যা কোনো বানোয়াট ধর্ম নয় এবং তার মাঝে সত্য মিথ্যার কোনো সংমিশ্রণ নেই। বরং এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত ধর্ম। যে ধর্মে সকল পরিস্থিত সম্পর্কে দিক নির্দেশনা রয়েছে। যদি জাতি বিনির্মাণে কোনো ভূমিকা না রাখেন। জাতির হিতকামনার ফিকির না করেন, কালের আবর্তে অন্ধকারের ঘূর্ণিপাকে হারিয়ে যান, তাহলে তো এ পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হবে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা সকল পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় বাতলে দিয়েছেন সুস্পষ্টভাবে।

আল্লাহ তা'আলা থেকে নিরাশ হওয়া গোমরাহি

এখানে কয়েকটা বিষয় বুঝার আছে। প্রথম কথা হলো এই যে, এই জাতীয় পরিস্থিতিতে মানসিকভাবে যে হতাশা বিরাজ করে, জানি না সামনে কী হবে? হতাশার কালো মেঘ আশার সূর্যকে ঢেকে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে মানুষ আশা-নিরাশার আলো আঁধারিতে হাবুডুবু খায়। তাই সর্বপ্রথম অবশ্যকরণীয় হলো হতাশা দূর করা। কারণ নিরাশা এক প্রকারের ভ্রষ্টতা। আর যার আল্লাহ আছে, যিনি 'রহমান-রহীম সে কীভাবে নিরাশ হতে পারে? কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ○ (سورة الزمر)

"হে আমার ঐ বান্দারা! যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ এবং বাড়াবাড়ি করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। পরিষ্কার ভাষায় আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন।

এটা দুনিয়া, জান্নাত নয়

সর্ব প্রথম আপনার অন্তর থেকে এই গোমরাহি দূর করা চাই যা মানুষকে নৈরাশ্যের দিকে ঠেলে দেয়। তা হলো এটা দুনিয়া, জান্নাত নয়। জান্নাতকে আল্লাহ তা'আলা এমন জায়গা বানিয়েছেন যেখানে কোনো পেরেশানি নেই,

কোনো দুঃখ নেই, কোনো কষ্ট নেই, শান্তি ও স্বস্তির পরিবর্তে কোনো কাজ নেই। যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জান্নাত দান করেন এবং আমরা সেখানে পৌঁছি, তাহলে আমাদের কোনো দুঃখ কষ্ট থাকবে না, থাকবে না কোনো চিন্তা ও পেরেশানি। পক্ষান্তরে এটা তো দুনিয়া। আল্লাহ তা'আলা একে এমনভাবে বানিয়েছেন যেখানে উভয়টাই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এতে সুখও আছে দুঃখও আছে। কষ্টও আছে শান্তিও আছে। এখানে মানুষ দুঃখে ভারাক্রান্ত হয় আবার আনন্দে উল্লসিত হয়। এটা এমন জগত যেখানে কখনো রোদ-বৃষ্টি, কখনো দিন, কখনো রাত, কখনো গ্রীষ্ম কখনো শীত, কখনো আলো, কখনো অন্ধকার। এ দুনিয়া কখনো এক অবস্থার উপর স্থির নয়। বড় বড় পয়গাম্বরের দিকে লক্ষ করুন। তাঁরা শুধু আরাম আয়েশ করে জীবন কাটিয়ে দেননি। বরং তারা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। ত্যাগ স্বীকার করেছেন। দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন। অন্যায়-অত্যাচার মাথা পেতে নিয়েছেন। কোন নবীকে করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। কোনো নবীকে হত্যা করা হয়েছে। আম্বিয়া কেরাম (আ.) আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা হওয়া সত্ত্বেও যখন বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন তখন আমি আপনি তো গণনার বাইরে।

দুঃখ কষ্ট ক্ষণস্থায়ী

এজন্য কষ্ট তো আসবে। কখনো এ আকৃতিতে আসবে, কখনো ঐ আকৃতিতে আসবে, যদি দুনিয়াতে কষ্টের সম্মুখীন না হয়, দুঃখ যাতনা ভোগ না করে তাহলে এটা কিসের দুনিয়া, এটা তো জান্নাত। তাই দুনিয়ায় অবশ্যই কষ্ট আসবে। তবে দুনিয়ায় যেমন দুঃখ আছে, তেমনি সুখও আছে। যেমন শান্তি আছে তেমনি অশান্তিও আছে। এটা আল্লাহ তা'আলার বিধান। মানুষ যে সকল অবস্থার সম্মুখীন হয় এবং তা থেকে উৎরে যায় আল্লাহ তা'আলা প্রতিনিয়ত তা অবলোকন করেন। সূর্য অস্ত যায়, আঁধার নেমে আসে, গোটা পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। কিন্তু এ আঁধার চিরস্থায়ী নয়। বরং পূর্ব দিগন্তে রক্তিম সূর্যের উজ্জ্বল আলোর বিকিরণে রাতের অবসান ঘটে। আঁধারের বুক চিরে আলোর মিনার গড়ে উঠি। গোটা জগত হয় উজালা। আল্লাহ তা'আলা প্রতিনিয়ত এ দৃশ্য অবলোকন করেন।

মুক্তির সূর্য উদিত হবে

অতএব এখন যদিও আন্তর্জাতিক প্রোপাগাণ্ডা, রাজনৈতিক প্রহসন এবং রাষ্ট্রীয় অরাজকতার কালো মেঘ জমে আছে, এই দুরাবস্থা বেশীক্ষণ থাকবে না ইনশাআল্লাহ। কারণ আল্লাহর ফযলে তার আড়ালে সূর্য হাসছে। মুসলমানদের

ইতিহাস পড়ে দেখুন। দেখবেন মুসলমানগণ শুধু নিগৃহীত হয়েছেন, বর্বরতা ও পাশবিকতার শিকার হয়েছেন। কিন্তু একটা সময় এমন এসেছে যখন মুক্ত বাতাসে বিজয়ের পতাকা পতপত করে উড়েছে। চারদিকে বেজেছে বিজয় ডংকা। শোষিত শাসক হয়েছেন, অর্ধজাহান শাসন করেছেন। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেছেন। জগতকে ইসলামী হুকুমতের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু সূর্য ডোবার সাথে সাথে দিন অন্ধকারে হারিয়ে যায়। অন্যরা বিজয় লাভ করে মুসলমান নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হতে থাকে। শিকার হয় দুঃখ যাতনার। কিন্তু এ অবস্থাও বেশীদিন বিরাজ করেনি। পুনরায় বিপ্লব ঘটেছে এবং আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছেন। গোটা ইসলামী ইতিহাস এর সাক্ষী। আজ মুসলমানগণ যদিও পেরেশান, নানা সমস্যায় জর্জরিত। কিন্তু এ জন্য নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

জনৈক কবি বড় সুন্দর কথা বলেছেন–

ظلمتوں کا جو بول بالا ہے ✪ کوئی سورج نکلنے والا ہے

অন্ধকারের কথোপকথন হতেই কোনো সূর্যের আগমন

এই অন্ধকারই সংবাদ দিচ্ছে এক সূর্যোদয়ের। এরপর ইনশাআল্লাহ এক আলোয় আলোকিত হবে বিশ্বজগত। এ জন্য বিরাজমান হতাশা এবং নৈরাশ্যকে মনে ঠাঁই দেয়ার প্রয়োজন নেই এবং একথা মনে করার দরকার নেই যে, এ সমস্যা স্থায়ী তার কোনো সমাধান নেই। ইনশাআল্লাহ চলমান পরিস্থিতি অনুকূলে আসবে এ ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি আশা রাখুন।

পেরেশানির কারণ আমাদের কৃতকর্ম

দ্বিতীয় কথা হলো, মানুষ যে কারণে পেরেশান হয় সে সম্পর্কে কোরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ○

(سورة الشورى ٣٠)

তোমাদের যে বিপদ আপদ ঘটে তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। আর তিনি তোমাদের অনেক পাপ ক্ষমা করে দেন।

উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা তো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত না জানি কত ভুল করেছ। কত পাপ করেছ। কত অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে লিপ্ত থেকেছ। আর আল্লাহ তা'আলা বারবার ক্ষমা করে দিয়েছেন। আবার ভুল করেছ ক্ষমা করে দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে বারবার মাফ করতে থাকেন। অন্যথায় আল্লাহ যদি পাকড়াও করতেন যেমনটা তিনি অন্যত্র বলেছেন :

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ○ (سورة فاطر)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যদি মানুষকে তার প্রতিটি কর্মের জন্য পাকড়াও করেন অর্থাৎ যে কোনো ভুলের জন্য পাকড়াও করেন তাহলে এই পৃথিবীতে কোনো বিচরণকারী জীবিত থাকবে না। কিন্তু আল্লাহ অধিকাংশ কর্মকে ক্ষমা করে দেন। অবশ্য যখন কোনো কাজ, নাফরমানি বদ আমল সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন আমি পাকড়াও করি। যার ফলশ্রুতিতে সে বিপদাপদ, বালামুসিবত এবং পেরেশানির শিকার হয়।

ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া

একবার যদি মনে একথা বসে যায় যে, যা কিছু হচ্ছে মূলত এগুলো আমাদের কৃতকর্ম এবং আমাদের কর্মফল। যেমন আমাদের শায়েখ ডা. আব্দুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন, আল্লাহ তা'আলা এই দুনিয়াকে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার জায়গা বানিয়েছেন। অর্থাৎ যখনই কোনো ক্রিয়া হয় তখন ঐ কাজের প্রতিক্রিয়াও হয়। যদি একথা আমাদের মস্তিষ্কে বসে যায় যে, যা কিছু হচ্ছে তা আমাদের বদ আমলের কারণেই হচ্ছে। তাহলে না মানুষের মাঝে হতাশা জাগবে আর না মানুষ ভুল পথে চলবে।

বাহ্যত কোনো যোগসূত্র নেই

কখনো এমন হয় যে, দুটি ঘটনা ঘটে। বাহ্যত উভয়ের মাঝে কোনো যোগসূত্র দেখা যায় না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার হিকমত এবং কুদরতে উভয়ের মাঝে যোগসূত্র থাকে। মনে করুন মিথ্যা কথা বলছে, কিংবা গীবত করছে, অথবা কোন পাপ কর্মে লিপ্ত আছে, কিন্তু তার সাথে বিদ্রোহ এবং গৃহযুদ্ধের কী সম্পর্ক? বাহ্যিক দৃষ্টিতে এখন যদিও কোনো যোগসূত্র দেখা যাচ্ছে না কিন্তু আল্লাহর কাছে প্রতিটি বস্তুর মাঝেই যোগসূত্র ও সম্পর্ক আছে। চাই সুকর্ম হোক কিংবা কুকর্ম।

নামায এবং রাজ্য জয়ের সাথে তার সম্পর্ক

যেমন আপনি নামায পড়ছেন, কিন্তু নামায পড়ার সাথে রাজ্য জয়ের কোনো সূত্র আপনার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। এজন্য যে নামায তো পড়া হয় আত্মিক উন্নয়ন ও আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য। এই নামায পড়ার দরুণ কি কোনো দুর্গ বিজিত হবে না কোনো দেশ জয় হবে? এই নামায ও রাজ্য জয়ের মাঝে বাহ্যত যদিও কোনো যোগসূত্র দৃষ্টিগোচর হয় না কিন্তু উভয়ের মাঝে যোগসূত্র আছে।

কায়সার কিসরার প্রাসাদের সুসংবাদ

খন্দক যুদ্ধে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধেছিলেন। কঠিন মুহূর্ত ছিল। শত্রুর ভয় ছিল। পরিখা খননে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরিক ছিলেন। পরিখা খননের সময় সাহাবায়ে কেরাম একটি পাথর খণ্ড পান। শত চেষ্টা করেও কোনো ক্রমেই তা ভাঙ্গতে পারছিলেন না। বিফল হয়ে সর্বশেষ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই প্রস্ত রখণ্ড ভাঙ্গছে না। তিনি বললেন, আমাকে দেখাও ওটা কোথায়? হুযুর সেখানে গেলেন এবং কোদাল নিয়ে ওই পাথরের উপর আঘাত করলেন। তৃতীয় আঘাতে ঐ পাথর ভেঙ্গে যায়। বর্ণনায় আছে, যখন তিনি প্রথমবার কোদাল মারলেন তখন সরকারে দো'আলমকে কায়সারে রোমের প্রাসাদ দেখানো হয়েছে, এবং সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, এই প্রাসাদ আপনার পদানত হবে। আপনি সেটা বিজয় করবেন। যখন দ্বিতীয়বার আঘাত করলেন তখন তাকে কিসরার প্রাসাদ দেখানো হয়েছে। যখন তৃতীয় আঘাত করলেন তখন তাঁকে ইয়ামেনের সানআর প্রাসাদ দেখানো হয়েছে। মুনাফিকদের কাছে যখন এই খবর পৌছল তখন তারা বলতে লাগলো, এতো দেখি বড় অদ্ভুত লোক। ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধেছে। শত্রুর মোকাবেলায় পরিখা খনন করছে, আর সে স্বপ্ন দেখছে কায়সার কিসরার প্রাসাদ জয় করার। তারা তামাশা করেছে, মজা লুটেছে। তাদের উক্তির উপর আয়াত নাযিল হয়েছে–

مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ إِلَّا غُرُوْرًا ○ (سورة الأحزاب ١٢)

এরপর আল্লাহ তা'আলা এই ঘটনাকে সত্যরূপে দেখিয়েছেন, কিসরার প্রাসাদ, কায়সারের প্রাসাদ এবং ইয়ামানের সানআর প্রাসাদ মুসলমানদের করতলগত হয়েছে।

কোদাল চালানোর সাথে প্রাসাদ বিজয়ের সম্পর্ক

জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি বলেন, কোদাল চালিয়েছেন খন্দকে আর দেখছেন কায়সার কিসরার প্রাসাদ, বাহ্যত যদিও কোদালের সাথে কায়সার কিসরার কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু বাস্তবে সম্পর্ক ছিল। আর তা এভাবে যে, যখন আল্লাহর রাহে ত্যাগ স্বীকার করা হবে তাঁর পথে একনিষ্ঠভাবে দুঃখ কষ্ট সহ্য করা হবে তখন আল্লাহ তা'আলা বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবেন। মূলত যোগসূত্র এটাই।

শাসকবর্গকে গালি দিও না

এ জন্য যত পরিস্থিতি আসুক, চাই শাসক জালিম হোক, কিংবা ফাসিক হোক। যুলুম নির্যাতন, হত্যা, লুণ্ঠন যে কোনো বিপদই আসুক তার যোগসূত্র আমাদের কর্মের সঙ্গে। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শাসকদের গালি দিও না। তাদেরকে খারাপ বলো না। আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু করো, কারণ সকল শাসকের মন আল্লাহ তা'আলার করায়ত্তে, যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করতে পারো তাহলে আল্লাহ তা'আলা শাসকদের মন নরম করে দিবেন সুতরাং কোনো দুর্যোগ আসুক কিংবা বিপদ ঘটুক, আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হয়ে স্বীয় মন্দ কর্ম থেকে তাওবা ইস্তেগফার করুন।

নামায এবং সমস্যা দূর হওয়ার মাঝে সম্পর্ক

হাদীস শরীফে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, যখনই কোনো সমস্যা দেখা দিতো তখনই তিনি নামাযের প্রতি মনোনিবেশ করতেন; আল্লাহ তা'আলার দিকে অভিমুখী হতেন। যদিও বাহ্যত নামাযের সাথে সমস্যা সমাধানের কোনো যোগসূত্র পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হওয়ার দরুন আল্লাহ তা'আলা বিপদ আপদ দুঃখ কষ্ট সবকিছু দূর করে দিয়ে সমস্যার সমাধান করে দিবেন।

নিজেকে পরখ করে আত্মসংশোধনে ব্রতী হোন

যাই হোক এই দ্বিতীয় কথার খোলাসা হলো, বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের বদ আমলেরই ফলস্বরূপ। এই অনুভব অনুভূতি আমাদের থাকা উচিত। মুখে এই কথা বলা অনেক সহজ যে, এগুলো আমাদের বদ আমলেরই ফল। কিন্তু মনে এই কথা কোনো প্রভাব ফেলে না। আমাদের কর্মের ফল একথা বলার পর আমরা কি আমাদের কাজকে যাচাই করে দেখেছি? আমাদের কর্ম পরিবর্তনের কোন চেষ্টা কি করেছি? যদি না করে থাকি তাহলে এটা হবে তোতা পাখির অনর্থক বুলি আওড়ানোর মতো। যার কোনো অর্থ এবং উদ্দেশ্য নেই। কেননা যদি এগুলো আমাদের কুকর্মের কারণে হয়ে থাকে তাহলে সব চিকিৎসার নিরন্তন তদবীর করুন। একটু নিজেকে পরখ করে দেখুন যে, দৈনন্দিন জীবনে কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে। এর সংশোধনে সচেষ্ট হোন। যদি না করা হয় তাহলে এর উদ্দেশ্য হবে শুধু বাক্য ব্যয় যার কোনো বাস্তবতা নেই।

বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই আল্লাহমুখী হয়ে তাওবা ইস্তেগফার করুন

তৃতীয় কথা যা মূলত দ্বিতীয় কথারই অন্তর্ভুক্ত। তা এই যে, এই পরিস্থিতিতে আলোচনা পর্যালোচনা সেমিনার ইত্যাদি না করে আল্লাহমুখী হওয়ার প্রতি গুরুত্ব

দিন। ইতোপূর্বে একবার দেশের পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছিল। মানুষের মন ভেঙ্গে গিয়েছিল। এরকম হতাশা ছেয়ে গিয়েছিল। সর্বত্র এর গুঞ্জন চলছিল যে, কী ঘটে গেল? কীভাবে হলো? এর কারণ কী? কে ভুল করল? সবখানে এই আলোচনা পর্যালোচনা চলছে। এক মজলিসে আমিও বসেছিলাম। এই বিষয়ে আলোচনা চলছিল। যখন আলোচনা শেষ হলো তখন আমার শায়েখ আরেফ বিল্লাহ হযরত ডা. আব্দুল হাই সাহেব (রহ.) জিজ্ঞাসা করলেন কেন ভাই! এই ঘটনার উপর পর্যালোচনা করলে? কী কারণ উদ্ঘাটন হয়েছে? এর কি কোন সমাধান মিলেছে? তখন আমাদের কাছে এর কোন জবাব ছিল না। কেননা এই আলোচনার কোনো ফলাফল ছিল না। বরং শুধু পেরেশানি ও ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সময় নষ্ট হয়েছে। আলোচনা তুঙ্গে উঠেছে কিন্তু প্রাপ্তি শূন্য। এরপর হযরত বললেন, যতক্ষণ সময় ধরে আলোচনা করেছ এ সময়ে যদি আল্লাহর দিকে রুজু হতে, আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করতে, আল্লাহর কাছে আপন গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করতে, তাওবা ইস্তেগফার করতে তাহলে কিছু ফায়দা হতো। শুধু আলোচনা করে কী লাভ? কোন লাভ নেই। এজন্য এই আলোচনা ছেড়ে আল্লাহর দিকে রুজু হও এবং ইস্তেগফার করো।

অধিক ইস্তেগফারের কারণে নেয়ামতের বারি বর্ষিত হয়

হযরত নূহ (আ.) এর কথা নকল করে আল্লাহ তা'আলা কোরআনে বলেন :

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ○ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ○
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ○

(سورة نوح ١٠-١٢)

আরে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ইস্তেগফার করো নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর আসমান থেকে অবারিত রহমতের বারি বর্ষণ করবেন এবং সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য উদ্যান ও নদী তৈরী করবেন– এজন্য আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হয়ে তাওবা ইস্তেগফার করুন।

নিজের বদ আমলের কথা চিন্তা করুন

এজন্য প্রথম কথা হলো, আল্লাহ তা'আলার প্রতি নৈরাশ্যকে দূর করুন। কেননা কখনো কোনো অবস্থা বা পরিস্থিতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হতাশার কারণ হতে পারে না। দ্বিতীয় কথা হলো, প্রত্যেকে এই কথা খেয়াল করুন যে, আমার বদ আমলের কারণেই এসব কিছু হচ্ছে। কারণ যখন আমরা

একথা বলি যে, আমাদের বদ আমলের ফলে এমনটা হচ্ছে। তখন আমাদের চিন্তা অন্যের দিকে যায় যে, আমার কারণে নয় বরং অন্যের বদ আমলের কারণে আমাদের উপর আযাব গযব আপতিত হচ্ছে। এ খেয়াল আসে না যে, আমি কোনো বদ আমলে লিপ্ত আছি। কোনো গুনাহের কাজে লিপ্ত আছি। এজন্য নিজের বদ আমলের কথা ভাবুন, এবং তা পরিত্যাগ করার চিন্তা করুন।

আমার কারণেই এই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে

হযরত যুন্নুন মিসরী (রহ.) বড় মাপের বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে লেখা হয় যে, একবার তাঁর এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। অনাবৃষ্টি এবং খরা চলছিল। মানুষজন হযরত যুন্নুন (রহ.) এর কাছে বলল, হযরত দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। বৃষ্টি হচ্ছে না, মানুষ চরম দুর্দশায় আছে। আপনি দু'আ করুন যেন বৃষ্টি হয়। হযরত যুন্নুন (রহ.) বললেন, দু'আ তো করবো কিন্তু মনে হচ্ছে, এই সব আপদ আমার কারণেই দেখা দিয়েছে। আমার গুনাহের কারণেই ঘটছে। তাই আমি এই জনপদ ছেড়ে অন্যত্র যাব। আশা করি এরপর আল্লাহ তা'আলা রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। কেননা আমার মনে হচ্ছে, আমার গুনাহ-ই মূলত দুর্ভিক্ষের কারণ।

সর্বোত্তম ভুলকারী

আজ আমাদের আচরণ পুরো উল্টো। আমরা মুখে তো এই কথা বলি যে, আমরা আমাদের আমলের কারণে এহেন পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছি। কিন্তু মনে আসে যে, যারা পাপ কাজে লিপ্ত তাদের কারণেই এসব হচ্ছে। এই চিন্তা আসে না যে, আমি অন্যায় করছি। আমি গুনাহে লিপ্ত আছি। এভাবে যখন প্রতিটি মানুষ চিন্তা করবে যে, এই বিশৃঙ্খল অরাজকতা আমারই গুনাহের কারণে তখন অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার এবং তাওবা করবে। এভাবে সকলে অধিক তাওবা ইস্তেগফার করবে চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে, যখনই দুশ্চিন্তা হবে তখনই বলবে–

استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه ـ

হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

كلكم خطاؤ ، وخير الخطائين التوابون ـ

'তোমরা সবাই বড় ভুলকারী, আর ভুলকারীদের মধ্যে বড় উত্তম ঐ ব্যক্তিগণ যারা তাওবা করে এবং আল্লাহমুখী হয়।

এজন্য তাওবা ইস্তেগফারের আধিক্যকে আপনার কাজ বানিয়ে নিন। যে সময়টুকু আলোচনা পর্যালোচনায় কাটাবেন, সে সময়টুকু তাওবা ইস্তেগফারে মশগুল থাকুন। আয় আল্লাহ আপনার অসীম রহমতে আমাদের পাপ মার্জনা করুন।

এ সকল শব্দে ফরিয়াদ করুন

আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করুন–

رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔

আয় আল্লাহ আমি নিজের উপর অনেক জুলুম করেছি এবং বলুন–

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ○

'আয় আল্লাহ! আমরা নিজেদের উপর অনেক জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তাহলে আমরা বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবো।

আরো বলুন, আয় আল্লাহ এ অবস্থা সহ্য হচ্ছে না, অস্থিরতা বিরাজ করছে, আর যা কিছু হচ্ছে আমাদের বদ আমলের কারণেই হচ্ছে। আয় আল্লাহ, এই বদ আমলকে আপনার ফযল ও করমে মাফ করে দিন এবং সংশোধনের তাওফিক দান করুন। এভাবে প্রার্থনা করুন, অনুনয় বিনয় করে প্রার্থনা করুন। যদি সমগ্র জাতি একনিষ্ঠভাবে এই কাজ করে এবং আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে, তাহলে একশভাগ নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি, আমাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার বিধান এটাই।

ইউনুস (আ.) এর সম্প্রদায় থেকে কেন আযাব হটে গেল

হযরত ইউনুস (আ.) এর সম্প্রদায়কে দেখুন। সব ধরনের নাফরমানি করেছে। আল্লাহর রাসূলকে মিথ্যা বলেছে। কুফুরি করেছে, এমনকি নবী একথা বলে এলাকা ছেড়ে গেছেন যে, নাফরমানির কারণে তোমাদের উপর আযাব আসন্ন। কিন্তু যখন আযাবের নিদর্শন পরিলক্ষিত হচ্ছিল তখন সম্প্রদায়ের টনক নড়ল, আরে ইউনুস (আ.) যা বলেছেন তা তো সত্যই বলেছেন। এতো নিঃসন্দেহে আযাবের আলামত। এখন আযাব পাকড়াও করবে। এই নাজুক মুহূর্তে গোটা সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে তাওবা কর না। সকলে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে কাকুতি-মিনতি করে প্রার্থনা কর যে, আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। আমাদের নবীকে মিথ্যা বলেছি। হে আল্লাহ! আমরা তাওবা ইস্তেগফার করছি। আপনার ফযল ও করমে এই আযাব অপসারণ করুন। ইতিহাসে এই একটি ঘটনাই পাওয়া যায় যে, আযাবের নিদর্শন আসার পরও আযাবকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّا اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ○ (سورة يونس)

অর্থাৎ শুধুমাত্র হযরত ইউনুস (আ.)-এর কওমেই এমন ছিল। যারা সর্বশেষ তাওবা করেছে তখন আল্লাহ তাদের আযাব দূর করে দিয়েছেন। আর এটাই আল্লাহ তা'আলার বিধান।

বেশী বেশী সায়্যিদুল ইস্তেগফার পড়ুন

আর যদি আমরা তাওবা ইস্তেগফারের দিকে অগ্রসর হই এবং এই বাণী সকলের কাছে পৌঁছে দেই যে, তাওবা ইস্তেগফারের দিকে অগ্রসর হোন তাহলে বেশী দূরে নয় দেখবেন অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। সম্পূর্ণ চিত্রই পাল্টে গেছে। আর সায়্যিদুল ইস্তেগফার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এটা সকল মুসলমানের মুখস্থ করে নেয়া উচিত এবং ওযীফা বানানো চাই। সায়্যেদুল ইস্তেগফার হলো :

اللهم أنت ربي لا اله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك و وعدك ماستطعت، أعوذبك من شر ما صنعت، أبوءلك بنعمتك على وأبوء بذنبي، فاغفرلي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ـ (صحيح بخاري)

হে আল্লাহ! আপনিই আমার প্রতিপালক, আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দা, যে পর্যন্ত আমি অক্ষম ও ক্লান্ত হবো না, সে পর্যন্ত আপনার সাথে কৃত ঈমানীচুক্তি ও প্রতিশ্রুতি এবং আনুগত্যের ওয়াদার উপর অটল থাকবো। আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে। আমি স্বীকার করছি যে, আপনি আমাকে অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন আমি স্বীকার করছি যে, আমি আপনার নাফরমানি করেছি এবং গুনাহ করেছি। হে আমার মালিক ও মাওলা, আমাকে মাফ করুন। আমার গুনাহ ক্ষমা করুন। আপনি ব্যতীত আর কেউ নেই মার্জনাকারী।

কোনো ব্যক্তি যত বড় গুনাহের ভাণ্ডার নিয়ে আসুক, এই ইস্তেগফারের বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দেন। এই ইসতেগফারকে আপনার ওযীফা বানান। চলতে ফিরতে উঠতে বসতে এবং প্রত্যেক নামাযের পর এই ইস্তেগফারকে যিকির বানিয়ে নিন। অন্যকে দাওয়াত দিন।

সংশোধনের ফিকিরে মগ্ন হোন

চতুর্থ কথা হলো, যখন আমরা একথা বলছি যে, এগুলো সব আমাদের বদ আমালের কারণে তখন ঐ বদ আমলকে দূর করার জন্য এমনভাবে চিন্তা করুন যেমন কোনো অসুস্থ ব্যক্তি তার আরোগ্য লাভের চিন্তায় মশগুল। যতক্ষণ পর্যন্ত চিকিৎসা না করাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার স্বস্তি মিলে না। যেমন কারো পেটে ব্যথা করছে, তো যতক্ষণ পর্যন্ত ঔষধ না খায় এবং চিকিৎসা না করে তার শান্তি লাগে না, ব্যথায় ছটফট করে। এভাবে যখন আমাদেরকে বদ আমল করার রোগে ধরেছে তো ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের স্বস্তি না আসা উচিত যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সংশোধনের পথে অগ্রসর হবো। যেমন রুগ্ন ব্যক্তি তার দূরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসায় অগ্রসর হয়।

আপনার নামাযের যাচাই করুন

সংশোধনের পদ্ধতি হলো, দৈনন্দিন জীবনে একটু পরখ করে দেখুন কোথায় কোথায় পাপ কর্মে লিপ্ত আছেন এবং কোন কোন ইবাদতে অলসতা করছেন? যেভাবে নামায পড়া উচিত সেভাবে হচ্ছে কিনা? জামাতের সাথে নামাযের পাবন্দি করা হচ্ছে, কি হচ্ছে না? নামাযে খুশুখুযুর প্রতি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে কি হচ্ছে না? এভাবে পর্যবেক্ষণ করুন এবাদতেও ভুলের সমাহার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। সুতরাং সংশোধনের খুব ফিকির করুন।

স্বীয় লেনদেন ও সামাজিক আচার আচরণকে যাচাই করুন

এরপর আপনার লেনদেনের বিষয়টি যাচাই করে দেখুন, যা উপার্জন করছেন তা হালাল না হারাম। অবৈধ পথে কোনো টাকা আসছে নাতো, এরপর আপনার সামাজিক আচার-আচরণকে পরখ করে দেখুন আপনার মা বাবার সাথে তেমন উত্তম আচরণ করছেন যেমনটা কোরআন বলেছে। কিংবা যার নির্দেশ দিয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নাকি সদাচরণে অবহেলা করছেন। যদি করে থাকেন তাহলে তাকে দূর করার চেষ্টা করুন। বিবি-বাচ্চার সাথে, ভাই বোনের সাথে কেমন আচরণ করছেন? তাদের যা প্রাপ্য তা আদায় করছেন কী না? অন্য মুসলমান ভাইয়ের সাথে ব্যবহার কেমন? আমি কাউকে তো কষ্ট দিচ্ছি না? আমার সম্পদের উপর আল্লাহ তা'আলা যে হক নির্ধারণ করেছেন, যেমন– যাকাত, সদকা ইত্যাদি ঠিকভাবে আদায় করছি তো? এ সকল বিষয় মনে মনে চিন্তা করুন এবং নিজেকে পরখ করুন।

নিজের গুনাহের তালিকা করে একটা একটা করে দূর করুন

আমাদের হযরতওয়ালা বলতেন, যখন তোমরা যাচাই করবে তখন তোমাদের সামনে ভুলগুলো প্রকাশ পাবে। তোমরা একটা তালিকা করো যে,

আমার মাঝে এই এই খারাবি আছে। আমাকে তা দূর করতে হবে। এর পর তা দূর করার নিরন্তর চেষ্টা করুন। একটু অগ্রসর হোন, যদি আমি মিথ্যা বলি, গীবত করি, কিংবা কষ্টদায়ক কোন কথা বলি, বা কোথাও ভুল বর্ণনা করি; বা তাহকীক ছাড়া কোনো কথা বলি। এজন্য যে, তাহকীক (যাচাই-বাছাই) ছাড়া কথা বলাও এক প্রকার মিথ্যা বলা। একেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। বিশেষ করে আমাদের মহলে তো আজ বানোয়াট কথার ঝড় উঠে। একজন একটা কথা বললো, আর আপানি চিন্তা-ভাবনা যাচাই-বাছাই ছাড়াই আগে চলতে দিলেন। এটা তো হারাম।

সাথে সাথে আল্লাহর কাছে দু'আ করুন

যে সকল গুনাহের কাজ আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে সেগুলোর একটা তালিকা করুন এবং তা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আও করুন যে, আয় আল্লাহ! আমাকে এ থেকে নিস্কৃতি দান করুন। এটা হলো চার নাম্বার কাজ। যা সবচে গুরুত্বপূর্ণ আমরা সকলে এখানে একত্র হয়েছি এই উদ্দেশ্যেই একত্র হয়েছি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মন্দ বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত এবং সতর্ক করেন আর নিজেদের মাঝে সংশোধনের ফিকির তৈরী হয়।

আল্লাহ তা'আলার আযাব দূর করার জন্য এই কাজ করতে হবে

এসব কথা আমি বলছি। আপনারা শুনছেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে শোনা পর্যন্তই শেষ। আমাদের আমলি যিন্দেগীতে যখন পা রাখি তখন সব কিছু ভুলে যাই। আমার ভাইয়েরা! এখন আর অবকাশ নেই। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আগত আযাবকে দূর করতে হলে এই কাজগুলো করতে হবে। নিজের কাজকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। গুনাহ থেকে বাঁচতে হবে। এই চোখ আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত। অনেক বড় নেয়ামত এর উপর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ আছে যে, নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে স্বাদ অনুভব করার উদ্দেশ্যে একে ব্যবহার না করা। এখন একটু চিন্তা করুন, কী পরিমাণ ভুল দর্শনে একে ব্যবহার করেছেন। যদি ব্যবহার করে থাকেন তাহলে এখনই ক্ষান্ত হোন। কানের ভুল ব্যবহার। যবানের ভুল ব্যবহার। যদি ভাল করে লক্ষ করেন তাহলে দেখবেন অসংখ্য পাপ কর্মে আমরা নিমগ্ন।

কবি বড়ই চমৎকার বলেছেন–

دل کو چیرا تو بہت کام رفو کا نکلا

অর্থাৎ প্রথমে তো মনে হচ্ছিল সামান্য কিছু হবে। কিন্তু দিল চিরে দেখি অনেক কিছু বেরিয়ে এসেছে। কাম-রিপু আর কুকীর্তি দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এজন্য যখন আমরা সূক্ষ্মভাবে নিজেকে যাচাই করবো এবং আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের উপর আমল করার জন্য ভালোভাবে পরখ করবো তখন অনেক কিছুই প্রকাশ পাবে। এরপর তার পরিশুদ্ধির পরিকল্পনা করতে হবে।

হাদীস শরীফে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন ফিৎনার সময় আসে, যার বিশদ বিবরণ হাদীসে এভাবে এসেছে যে–

إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً ، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِى رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ -

(أبو داؤد، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهى)

অর্থাৎ যখন তুমি দেখবে, মানুষ সম্পদের (ভালবাসার) পিছনে ছুটছে এবং প্রবৃত্তি হচ্ছে (মানুষের) পথ প্রদর্শক এবং প্রতিটি কাজ হচ্ছে প্রবৃত্তির চাহিদা মোতাবেক। (মানুষ) দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিচ্ছে, প্রত্যেক মানুষ নিজের রায়কে অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং অন্যের রায় শুনতে অপ্রস্তুত। ফিৎনার সময়েরও চারটি আলামত বর্ণনা করেছেন। এমন মনে হচ্ছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্তমান অবস্থার চিত্র দেখিয়েছেন। আজ মানুষ সম্পদের পিছু ছুটছে। খায়েশাতের অনুগমন করছে। ইহকালকে পরকালের উপর প্রাধান্য দিচ্ছে। আখেরাত মিলুক বা না মিলুক। কিন্তু দুনিয়ার কিছু উপকার হবে। প্রত্যেক মানুষ স্বীয় সিদ্ধান্তের ব্যাপারে দাম্ভিকতা প্রদর্শন করছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন এই চারটি নিদর্শন প্রকাশ পাবে ঐ মুহূর্তে নিজের সংশোধনের ফিকির করো এবং অন্যের দিকে তাকানো বর্জন করো।

প্রদীপ থেকে প্রদীপ জ্বলে

কেননা এমন পরিস্থিতিতে মানুষ অন্যের মন্দ চর্চা করতে থাকে এবং নিজের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। যার ফলে সামাজিক জীবনে শুধু বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতাই সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই অবস্থায় যদি মানুষ নিজের সংশোধনের প্রতি মনোনিবেশ করে এবং নিজে নিজেকে ঠিক করার ফিকির করে। তো একজন মানুষও যদি সংশোধিত হয়ে যায় তাহলেও একটি প্রদীপ জ্বলে উঠল। আর আল্লাহ তা'আলার সুন্নত এটাই যে, প্রদীপ থেকে প্রদীপ জ্বলবে এবং তা শিখা ছড়াবে। ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হবে। এজন্য অন্যের চিন্তা ছেড়ে নিজের চিন্তা করুন। বর্তমান কালের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী এটাই।

যাই হোক, চতুর্থ কথা হলো এই যে, প্রত্যেকে নিজের সংশোধনের ফিকির করবে এবং তার পদ্ধতি হলো সামান্য সময়ের জন্য নিজেকে যাচাই করবে এরপর যেখানে যেখানে সমস্যা পরিলক্ষিত হবে তাকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করবে।

বেশী বেশী এই আয়াত তিলাওয়াত করুন

পঞ্চম কথা হলো, বেশী বেশী দু'আ করুন এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহমুখী হোন। চলতে ফিরতে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর দিকে রুজু হোন। তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন, তাঁর কাছে দু'আ করুন।

لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ـ

অধিক হারে এই আয়াতে কারীমা যিকির করুন। আমাদের শায়েখ হযরত আরেফ বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহু বলেন, কোরআনে কারীম এভাবে বলেছে তখন যখন হযরত ইউনুস মাছের পেটে চলে গিয়েছিলেন, এখন চিন্তা করুন, কোনো জীবন্ত মানুষ মাছের পেটে চলে গিয়েছিল। তখন তার কি অবস্থা হয়েছিল? ঘোর অন্ধকার, দুর্গন্ধময় স্থান। এই নাজুক পরিস্থিতিতে হযরত ইউনুস (আ.) আমাকে ডেকেছিল কোন ভাষায় ডেকেছিল?

لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ আয় আল্লাহ আপনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। আপনি সকল দোষ থেকে পবিত্র। আমি জালিমদের দলভুক্ত ছিলাম। আর আমিই নিজের উপর জুলুম করেছিলাম। যার ফলে আমি এখানে শাস্তি ভোগ করছি। কোরআন কারীম বলছে–

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ○ (سورة الأنبياء)

অর্থাৎ আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছি, এরপর আমি তাকে দুর্গন্ধময় গুমোট বদ্ধ স্থান থেকে মুক্তি দিয়েছি।

সকল মুমিনই কী মাছের পেটে যাবে?

সামনে আল্লাহ তা'আলা একটি অদ্ভুত বাক্য বলেছেন–

وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ○ (سورة الأنبياء)

এভাবেই আমি সকল মুমিনকে নাজাত দেই। আমাদের হযরত বলেন, আল্লাহ এটা কী বললেন যে সকল মুমিনকে আমি এভাবে নাজাত দেই। অন্যান্য মুমিনগণও কি মাছের পেটে যাবে? বাহ্যত সকল মুমিন মাছের পেটে যাবে না

বরং উদ্দেশ্য হলো এই যে, যেভাবে হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে দুর্গন্ধময় গুমোট অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে আটকা পড়েছিলেন এমনিভাবে দুনিয়াতে তোমরা না জানি কোনো অন্ধকার বিপদসংকুল জায়গায় পড়ে যাও। কখনো বাতিলের অন্ধকার, কখনো গোমরাহির অন্ধকার। কখনো গৃহযুদ্ধের অন্ধকার। এ সকল অন্ধকারে তোমার ওজিফা এটাই হওয়া উচিত,

لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ـ

এই শব্দে আল্লাহকে ডাকলে অবশ্যই ভবিষ্যতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে মুক্তি দিবেন। এজন্য নিজের বদ আমলের কথা স্বীকার করে অধিকহারে এই আয়াত তিলাওয়াত করুন। আল্লাহ তা'আলার দিকে ফেরার প্রতি গুরুত্ব দিন। তো ইনশাআল্লাহ ছুম্মা ইনশাআল্লাহ দিন বদলে যাবে। অবশ্যই পরিবর্তন হবে। আল্লাহ তা'আলার রহমত এবং সুন্নতের প্রতি এটাই আশা। আর এই আশা করা উচিত।

আমরা আমাদের কাজ করেছি

অন্যথায় ন্যূনতম এতটুকু তো হলো যে, এই পরিস্থিতিতে যেভাবে আমল করাটা আমাদের থেকে কাম্য আমরা তা আদায় করেছি। অন্তত আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে এতটুকু বলা যাবে যে, আয় আল্লাহ! এই পরিস্থিতিতে আপনার পক্ষ থেকে যে হেদায়াত ছিল আমরা তার উপর আমল করার চেষ্টা করেছি। ফলাফল তো আপনার হাতে। মানুষের হাতে কোন কিছু নেই। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফযল ও করমে আমাদের সকলকে আমল করার তাওফিক দান করুন।

দু'আ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ○ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

ইয়া আরহামার রহীমিন! আপনার ফযল ও করমে আমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিন। ছোট বড় গোপন, প্রকাশ্য, সামনের পেছনের সব ধরনের গুনাহ মাফ করে দিন। ইয়া আল্লাহ! আমাদের বদ আমলগুলো আপনার ফযলে দূর করে দিন। আয় আল্লাহ! আমাদেরকে আত্মশুদ্ধির তাওফিক দান করুন। আয় আল্লাহ! আমাদের আমল আখলাক পরিশুদ্ধ করুন। আয় আল্লাহ! আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। তার উপর আমল করার তাওফিক দান করুন।

তার উপর ইস্তিকামাত দান করুন। আয় আল্লাহ! আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর সুন্নতের পূর্ণ আনুগত্য করার তাওফিক দান করুন। হে আল্লাহ! দ্বীনের আযমত ও মোহাব্বত আমাদের অন্তরে সুদৃঢ় করুন। আয় আল্লাহ! আপনার রাসূলের ভালবাসা সকল ভালোবাসার উপর 'গালেব, করুন। আয় আল্লাহ! আপনার অনুগ্রহে আপনার আনুগত্য করার সাহস ও উদ্দীপনা দান করুন। গুনাহ থেকে বাঁচার তাওফিক দান করুন। আমরা ভিতু, সাহস দান করুন। আমরা নিরাশ, আশা দান করুন। হে আল্লাহ! সব ধরনের ফিৎনা এবং অনিষ্ট থেকে আমাদের পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব এবং যারা আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখে সবাইকে হেফাজত করুন। আমাদেরকে গর্হিত হীন কার্য থেকে বাঁচার তাওফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! উপস্থিত সকলকে এবং অন্যান্যদেরকে জায়েয উদ্দেশে সফলতা দান করুন। হে আল্লাহ! সকল পেরেশানির অবসান করুন। সকলের সমস্যার সমাধান করুন। হে আল্লাহ! আমাকে, সকলকে আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হালতে রোগ থেকে শেফায়ে কামেলা আজেলা (দ্রুত পূর্ণ আরোগ্য) দান করুন। যারা ঋণগ্রস্ত তাদের ঋণ পরিশোধ করুন। যারা পেরেশান তাদের পেরেশানী দূর করে দিন। হে আল্লাহ! আমাদের দেশে যে অরাজকতা এবং গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি হয়েছে স্বীয় অনুগ্রহে ও আপন ফযল ও করমে তা অপনোদন করুন। হে আল্লাহ! শান্তি ও নিরাপত্তা দান করুন। সুস্থতা নসীব করুন। হে আল্লাহ! সর্বপ্রকার ফিৎনা ও অনিষ্ট থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন। হে আল্লাহ! আপনার ফযল ও করমে ন্যায়পরায়ণ শাসক দান করুন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ –

আল্লাহওয়ালাদের পরিচয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ. وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَآ شَرِيْكَ لَهٗ. وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ اَمَّا بَعْدُ عن اسماء بنت يزيد قالت : اقال النبى صلى الله عليه وسلم الا خيركم؟ قول بلى : قال الذين اذا رءوا ذكر الله . أفلا اخبركم بشراركم؟ قالوا بلى : المشائون بالضميمة، المفسدون بين الا جنة، الباغون البرآء العنت۔ آمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

সর্বোত্তম লোক কে?

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ একজন সাহাবীয়া ছিলেন। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলব না যে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম কে? তখন সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ অবশ্যই বলুন। তখন রাসূল সা. বললেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।

আল্লাহ জাল্লা শানুহুর বন্ধুগণ যারা আল্লাহর ওলী, তাদের হালত এমনই যে তাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। আর এই অবস্থা কোনো এক কালের সাথে নির্দিষ্ট নয়, শুধু সাহাবায়ে কেরামের যামানা পর্যন্ত স্থির ছিল না। বরং কেয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ এমন লোক বাকি থাকবে যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হবে।

এই অবস্থা এইভাবে তৈরী হয় যে যখন কোন আল্লাহর বান্দা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে। অধিক পরিমাণে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার যিকির করে। সকাল সন্ধ্যা, উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে। তখন তার বাহ্যিক অবয়বে, তার চাল চলনে, এবং তার নড়া চড়ায় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার যিকির বসে যায়। আর যখন তা বসে যায় তখন যে ব্যক্তি তাকে দেখবে তারও আল্লাহর কথা স্মরণ হবে।

সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা

সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহ তা'আলা আলাইহিম আজমাইন এর মধ্যে তো একেক জনের হালত এমন ছিল যে, তাকে দেখে আল্লাহর কথা স্মরণ হতো। না জানি এমন কত দৃষ্টান্ত আছে যে মানুষ তাদেরকে দেখেই মুসলমান হয়ে গেছে। কারণ চারিত্রিক মাধুর্যে তারা ছিলেন শ্রেষ্ঠতর। আর তা তাদের চেহারায় পরিলক্ষিতও হতো, ফলে যেই তাদেরকে দেখতো সে বুঝতে পারত এরা আল্লাহওয়ালা। আল্লাহর যাকের, তারও আল্লাহর কথা স্মরণ হতো। সাহাবায়ে কেরামের সকলের অবস্থা প্রায় এমনই ছিল। পরবর্তীতে তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন এবং আওলিয়া কেরাম এর মাঝেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। আল হামদুলিল্লাহ আমাদের পর্যন্ত এ সিলসিলা চলে এসেছে। আল হামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'আলা এমন লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করিয়েছেন যাদের দেখলে আল্লাহকে মনে পড়ে।

এই লোক মিথ্যাবাদী হতে পারে না

আমাদের হযরত মাওলানা ক্বারী তৈয়্যব সাহেব র. যিনি দেওবন্দের মোহতামিম ছিলেন। লাহোরের এক জায়গায় তার ওয়াজ ছিল। ঐ সকল লোক যারা ওলামায়ে দেওবন্দকে (আল্লাহ হেফাজত করুন) খারাপ বলে, বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করে। কাফের পর্যন্ত বলে ফেলে। তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি মনস্থ করেছে যে, চলো আজ তাঁর ওয়াজ শুনে আসি। দেখি সে কী বলে? তারই মতাদর্শের এক ব্যক্তি বলল, মিয়া কোন বদদ্বীনের কাছে যাচ্ছেন। সেখানে গেলে তো আপনার আক্বীদাও নষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনার দ্বীনের ক্ষতি হবে। তার কাছে যাবেন না। কিন্তু সম্ভবত আল্লাহ তার মঙ্গল চেয়েছেন। সে বলল ঠিক আছে সে তো বদদ্বীন। তার কথা শুনতে চাই দেখি সে কী বলে। স্বয়ং ঐ ব্যক্তি ঘটনা বর্ণনা করেছে যে, আমি শোনার জন্য এসেছি। আমার মনেও ছিল যে কোন কাফের নাস্তিক বদদ্বীন মার্কা লোক আসবে। বাতিল আক্বীদা নিয়ে কথা বলবে। বলেছে যে, যখন হযরত ক্বারী মুহাম্মাদ তৈয়্যব র.

এসে ওয়াজ করার জন্য বসলেন তখন মানুষ বলতে লাগল ইনিই। ঐ লোক বলেছে, তাঁকে দেখার সাথে সাথেই আমার মন একথা বলল যে, এ মানুষ তো মিথ্যাবাদী হতে পারে না। তাকে দেখে তো আল্লাহকে মনে পড়ছে। ইনি মিথ্যাবাদী হতে পারেন না। তখন আমি ওয়াজ শোনার জন্য বসলাম এবং আমার মন থেকে সমস্ত কালিমা ধুয়ে মুছে গেল। আল্লাহ তা'আলা বিদআত শিরক থেকে তওবার তওফিক দিলেন।

এই নেয়ামত অর্জিত হয় কোনো আল্লাহওয়ালার সোহবতে তাঁর সাথে সাক্ষাতে। কোন কোন সময় মানুষের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, যাকে দেখে আল্লাহকে মনে পড়ে সে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।

নফল ইবাদত আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের মাধ্যম

হাদীস শরীফে আছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বাণী বর্ণনা করছেন। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। নফল ইবাদত বড় মহান জিনিস। এটা সাধারণ বিষয় নয়। আমরা কোনো কোনো সময় এই চিন্তা করে ভ্রূক্ষেপ করি না যে, ভাই কোনো ফরয ওয়াজিব তো নয়, নফলই তো।

নফলের পরিচয় হলো, যা আদায় করার দ্বারা ছাওয়াব অর্জিত হয়, আদায় না করলে কোনো গুনাহ নেই। অর্থাৎ যদি কোনো নফল ইবাদত না করে তাহলে কেয়ামতের দিন সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে না যে তুমি কেন নফল পড়তে না? অমুক নফল ইবাদত কেন করোনি। তাই আমরা এই চিন্তা করি যে, এটা তো কোন ফরয ইবাদত নয়। যদি না করি, তাহলে গুনাহও নেই। এজন্য তার গুরুত্ব অনুধাবন করি না। আর গুরুত্ব অনুধাবন না করার কারণে না পরওয়া হয়ে গেছি। কিন্তু ভালো করে বোঝা উচিত, নফল ইবাদত বড় মর্যাদার বস্তু। আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে মানুষকে উন্নতি দান করেন। হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা নফল ইবাদতসমূহের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। আর যখন অধিক পরিমাণে নফল পড়তে থাকে এবং নফল ইবাদতসমূহ আদায় করতে থাকে তখন বান্দা আমার নৈকট্যের এমন স্তরে উন্নীত হয় যে, আমি তার চক্ষু হয়ে যাই যার দ্বারা সে দেখে। আমি তার যবান হয়ে যাই যার দ্বারা সে কথা বলে। আমি তার হাত হয়ে যাই যার দ্বারা সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই যার দ্বারা সে চলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তার চোখ যা কিছু দেখে আমার ইচ্ছা মোতাবেক দেখে। তার যবান যা কিছু বলে আমার

মর্জি মোতাবেক বলে, তার হাত যেদিকে অগ্রসর হয়, তার পা যেদিকে চলে, এসব আমার ইচ্ছা মাফিক চলে।

যখন কারো অবস্থা এমন হয়ে যাবে যে তার হাত উঠেই না আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া, তার পা আগে বাড়ে না আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া। তার চোখ পলক ফেলে না আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া, তার যবান খুলে না আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া। যখন তার হালত এমন হয়ে যাবে তখন বলুন তাকে দেখে কি আল্লাহর কথা স্মরণ হবে না? এই মর্যাদা অর্জিত হয় নফল ইবাদতের আধিক্যের কারণে।

নফল ইবাদত আল্লাহ তা'আলার ঘনিষ্টতম হওয়ার উপায়

নফল ইবাদতের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর হলো নফল নামাযের। এ কারণে যে, নামায ছাড়া আল্লাহ তা'আলার ঘনিষ্টতম হওয়ার আর কোনো উপায় নেই।

হাদীস শরীফে হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা আল্লাহ তা'আলার অধিক নিকটতম তখনই হয় যখন সে সেজদায় পড়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার সামনে বান্দা যখন কপাল রাখে তখন আল্লাহ তা'আলার যে নৈকট্য লাভ করে অন্য কোনো সময় তা অর্জিত হয় না। এ কারণে সূরা আলাকের সর্বশেষ আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ বড়ই স্বাদের বাক্য। পুরা কালামুল্লাহ-ই এমন। কিন্তু কত আদর করে মুহাব্বত করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সিজদা করো এবং নৈকট্য হাসিল করো। এটা সিজদার আয়াত সবাই সিজদা করে নিবেন। আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে বলছেন, হে আমার বান্দা তুমি কোথায়, আমি কোথায়? কিন্তু পথ বাতলে দিচ্ছি যখন তুমি সেভাবে কাজ করবে তখন তুমি আমার কাছে চলে আসবে এবং আমার সান্নিধ্য লাভ করবে। আর তা হলো যে সিজদা করো এবং আমার সান্নিধ্যে আস। এই মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা সিজদাতে দিয়েছেন।

নামায মুমিনের মেরাজ

যখন আল্লাহ তা'আলা প্রিয় বন্ধু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেরাজে আহ্বান করেছেন তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর দূরত্ব অতিক্রম করে সপ্ত আসমানের সীমা পেরিয়ে এমন সম্মানিত ও মর্যাদাময় স্থানে পৌঁছেছেন যেখানে জিবরাঈল (আ.) বলে দিয়েছেন আমি আর আগে বাড়তে পারবো না। আমার সীমা শেষ। এখন আপনিই শুধু যেতে পারেন। যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজ থেকে ফিরে আসছিলেন তখন

সম্ভবত মুখে বলেছিলেন যে, আয় আল্লাহ! আপনি তো আমাকে মেরাজ এবং আপনার নৈকট্য দান করেছেন। কিন্তু আমার উম্মত কি এই মর্যাদা লাভ করবে? তখন আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা উপহারস্বরূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামায দিয়েছেন। এটা নিয়ে যান, এর ফায়দা হলো, আপনার উম্মতের নর-নারী যেই এই নামায পড়বে, অতঃপর নামাযে সেজদা করবে তখন সে তার সামর্থ্য অনুযায়ী তার মে'রাজ লাভ হবে। এ কারণেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الصلوٰة معراجُ المؤمنين নামায মুমিনের মেরাজ।

یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجود سے دیتا ہے آدمی کو نجات

এই এক সিজদা যাকে তুমি বোঝা মনে করছো।

(অথচ) হাজারো সিজদা থেকে মানুষকে মুক্তি দিচ্ছে।

যখন এই কপাল আল্লাহর সামনে রেখেছি তো এই কপাল অন্য কারো সামনে রাখতে পারি না। এই মর্যাদা তো সিজদাকে দেয়া হয়েছে।

সিজদার কাছে সব স্বাদই বিস্বাদ

হযরত খাজা মাযযুব সাহেব (রহ.) হযরত থানবী (রহ.) এর খলিফা ছিলেন এবং বড় মাপের কবি ছিলেন। তিনি বলেন, যখন সিজদায় মাথা রাখি তখন আসমানকে জমিন করি, অর্থাৎ যখন সিজদায় মাথা রেখে আল্লাহর কাছে মুনাজাতের সিলসিলা শুরু হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনার সিলসিলা শুরু হয়ে যায়। তখন এই জমিন আসমান হয়ে যায়। যখন আল্লাহর সামনে মাথা রাখা হয়, তখন এই জমিন আসমান হয়ে যায়। যখন আল্লাহর সামনে মাথা রাখা হয়, তো এর হাকীকত হলো যাকে এই সিজদার কারণে আল্লাহ তা'আলা বন্ধু বলেছেন তার কাছে সিজদার পরিবর্তে অন্য কিছুর স্বাদ বিস্বাদ হয়ে যায় এজন্য নফল এবং নফল নামায যাতে সিজদা লম্বা হবে এবং বেশী হবে তা মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের সর্বোত্তম মাধ্যম।

নফল ইবাদত কাকে বলে?

নফল ইবাদতসমূহ নামাযের সাথেই খাস নয় বরং প্রত্যেক ঐ কাজ যা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পছন্দনীয় তা নফল ইবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শরীফে আছে যে, কেউ কোনো মুসলমানের সাথে হাসি মুখে কথা বলল তো এটা একটা সদকা। এজন্য আপনি যদি কারো সাথে উত্তম আচরণ করেন এবং হাসি মুখে কথা বলেন এই নিয়তে যে, আমি এই কাজ করছি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং হুযুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে তখন এর মাধ্যমেও সান্নিধ্য লাভ হবে ইনশাআল্লাহ। একজন মুমিনের জন্য আনুগত্য অপরিসীম। কেননা তার কোন সংখ্যা নেই। যদি মানুষ সুন্নাতের ছাঁচে জীবনকে গড়ে তোলে তাহলে একেকটি মুহূর্ত তার জন্য আনুগত্য হবে। কোন মুহূর্ত আনুগত্য থেকে খালি নয়। এমনকি ঘরে বসে খাচ্ছেন পান করছেন এটাও আনুগত্য। ঘরের লোকদের সাথে কথা বলছেন এটাও আনুগত্য। যখন এই সকল বিষয় আনুগত্য তখন এগুলোর মাধ্যমেও আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হবে।

নফল ইবাদতকারীর অবয়বই দাওয়াত

নফল ইবাদত এবং আনুগত্যের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তা'আলার যত নিকটতম হয় তার মাঝে কাইফিয়্যাত বা বিশেষ অবস্থা তত বেশী গালিব হয়। যে তাকে দেখে তার আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। আর তাকে দেখলে যখন আল্লাহর কথা স্মরণ হয় তখন তার অবয়বই দাওয়াত এবং শিক্ষা। কারণ তাকে দেখলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্বীনের দাওয়াত এবং দ্বীনের শিক্ষাকে চেনা যায়। তার আমল নামায় অন্যদের নেক আমল যুক্ত হতে থাকে।

এমন হওয়ার চেষ্টা করুন

যে কথা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তা শুধু একটি ঘটনা বর্ণনা করার জন্য নয় বরং আমাদের সকলকে এই শিক্ষা প্রদান উদ্দেশ্য যে, এমন হওয়ার চেষ্টা করো। আর চেষ্টার পথ এটাই যা সম্পর্কে আমি আলোচনা করলাম। অর্থাৎ অধিক নফল এবং অধিক আনুগত্য এবং আল্লাহ তা'আলার নৈটক্য লাভের বিভিন্ন মাধ্যমকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা। এরপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে?

আমি কি তোমাদের বলব না, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলেন, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে? রাসূল বললেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হলো চোগলখোর। যে এখানকার কথা ওখানে গোপনে বলে দেয় এবং পরস্পরের মাঝে সমস্যা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ যারা একে অপরকে ভালবাসে এমন দুজনের মাঝে ফিৎনার বীজ বপন করে অথবা এমন কথা বলে যার কারণে একে অপরের শত্রু হয়ে যায় এবং মানসিক কদর্যতা দেখা দেয়। যার ফলে সম্পর্কে ফাটল ধরে।

আর ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট যে নির্দোষ ভাল মানুষের মাঝে দোষ খুঁজে বেড়ায়। অর্থাৎ যে বেচারা ভাল মানুষ, সহজ সরল, এই লোক চায় যে, এর দুর্নাম হোক বা মানুষ তাকে খারাপ জানুক। এরপর তার নামে এমন কিছু রটনা করে যার কারণে ঐ ভাল মানুষটা মানুষের মাঝে ঘৃণার পাত্র হয়ে যায়।

কূটনামী করা শরাব পান এবং যিনা থেকেও নিকৃষ্ট

দেখেন! অনেক গুনাহই তো আছে, মদ পান করাও গুনাহ। যিনা করাও গুনাহ। শূকর খাওয়াও গুনাহ। মিথ্যা বলা, ঘুষ খাওয়া, সুদ খাওয়া এগুলোও গুনাহ। কেননা মদপান যিনা ইত্যাদি মারাত্মক গুনাহ আল্লাহ সকল মুমিনকে হেফাজত করুন, তবে এর প্রভাব শুধু ব্যক্তির উপরই সীমাবদ্ধ থাকে। এক ব্যক্তি আল্লাহ হেফাজত করুন, নেশা করে। নেশা করা কবীরা গুনাহ। কিন্তু এর খারাবী ব্যক্তির উপরই সীমাবদ্ধ থাকে। আল্লাহ পানাহ– কেউ অপকর্মে লিপ্ত এটা জঘন্য গুনাহ, আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে হেফাজত করুন। কোরআন কারীম বলেছে যে, মানুষ এর কাছেও যেন না বসে। কিন্তু যা কিছু হবে তা ব্যক্তি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। কেউ শূকর খায়। (নাউযুবিল্লাহ) তো তার পাপ তারই উপর।

পক্ষান্তরে চোগলখোরী করা এবং একজনকে আরেকজনের বিরুদ্ধে উসকে দেয়া এবং এখানের কথা সেখানে, সেখানের কথা এখানে বলা যাতে উভয়ের মাঝে বিভেদ দেখা দেয়। একজনের প্রতি অন্যজনের মনোকষ্ট হয়। এগুলো নিচু লোকদের কাজ। একটু চিন্তা করেন, এটা ঐ বস্তুই যা আমাদের সমাজে বিভেদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে এই অরাজকতা সেই সৃষ্টি করেছে। ভাল মানুষ সম্পর্কে মানুষের কাছে এমন কথা বলা যার কারণে মানুষের মনই ভেঙ্গে যায়।

পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সন্ধির জন্য মিথ্যা বলাও জায়েয আছে।

হযরত শায়েখ সায়ীদ (রহ.) বলেছেন–

دروغ مصلحت آمیز بہ از راشیہ فتنہ انگیز۔

যদি দুইজন মুসলমানের মাঝে সমঝোতার জন্য মিথ্যা বলতে হয় তাহলেও উত্তম। এমন সত্য কথা বলা থেকে যার দরুন ফিৎনা সৃষ্টি হয়। এমনও পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, যদি দু'জন মুসলমানের বিরোধ থাকে, কিংবা পরস্পরের মাঝে তিক্ততা থাকে তো এই তিক্ততা দূর করার জন্য এমন ব্যবহার জায়েয আছে যার মাধ্যমে অন্যের প্রতি মানুষের মন খুশি হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ ফোকাহায়ে কেরাম বলেন, তুমি তাকে বলো, যার সাথে তোমার ভালো ভাব আছে। সে তোমার জন্যে দু'আ করে। আর মনে মনে এই নিয়ত করে যে, প্রত্যেক

মুসলমানই তো নামাযে- السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين বলে। তো এই বাক্যে সবার জন্যই দু'আ করা হয়েছে। যখন সবার জন্য দু'আ করা হয়েছে, তখন তার জন্যও দু'আ করা হয়েছে। তো আপনি যখন তাকে বললেন যে, সে তো তোমার জন্য দু'আ করে। তখন তার মনে নাড়া দিবে। আরে আমি তো তাকে খারাপ ভাবি আর সে আমার জন্য দু'আ করে। তখন মনে তার জন্য ভালবাসা জন্মাবে। পক্ষান্তরে অন্যের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করার জন্য সত্য কথা বলাও গুনাহ। কথা যদিও সত্য। কিন্তু এর উদ্দেশ্য হলো সম্প্রীতি নষ্ট করা। সে ভাল চায় না বরং খারাপ বানানো যায় কী করে তাই কামনা করে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন এ সবচেয়ে খারাপ মানুষ। কিছু কিছু মানুষের স্বভাবই এমন আল্লাহ মাফ করুন। দু'জনের মাঝে মুহাব্বত দেখে সহ্য হয়না। যেখানেই দেখে দু'জন মানুষের মাঝে মুহাব্বত দেখে সহ্য হয় না। যেখানেই দেখে দু'জন মানুষের সাথে সম্পর্ক সেখানেই এমন এক সমস্যা বাঁধাবে বা এমন কথা বলবে যে, মুহূর্তেই চির অচেনা হয়ে যায়, হয়ে যায় জনম জনমের শত্রু। আল্লাহ রক্ষা করুন।

ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা জায়েয

কিন্তু কেউ যদি কারো ক্ষতি করতে চায় তখন ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা জায়েয আছে। এতে গোনাহ নেই। এটা গীবত ও না। এটা গীবতও না চোগলখোরিও না। যেমন, আপনি জানতে পারলেন যে, কেউ ষড়যন্ত্র করছে কারো ঘরে চুরি করবে কিংবা ডাকাতি করবে। কিংবা তার বড় ধরনের কোন ক্ষতি করবে। তখন এই ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিলে ছাওয়াবের কাজ হবে। এতে কোন গুনাহ নেই। এটা না গীবত, না চোগলখোরি, না মিথ্যা না অপবাদ। কোন কিছুই না। একেবারে জায়েয। বরং ওয়াজিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন মুমিনের ভাই। মুসলমান ভাইয়ের উপর না যুলুম করে, না তাকে যুলুমের মুখে অসহায় ভেবে ছেড়ে দেয়। এজন্য যখন জানা যাবে যে কেউ মুসলমান ভাইয়ের উপর যুলুম করতে যাচ্ছে তখন তাকে আগাম সতর্ক করা ওয়াজিব। একে চোগলখোরি বলে না। চোগলখোরি তো তখন হবে যখন উদ্দেশ্য হবে ক্ষতি থেকে রক্ষা না করা। বরং উদ্দেশ্য হবে সম্পর্কে চিড়-ধরানো। পরস্পর লড়াই বাঁধানো। যদি অন্যের লোকসান উদ্দেশ্য হয় তখন এটা হবে চোগলখোরি যার উপর কঠিন শাস্তি অবধারিত রয়েছে। মহান আল্লাহর পানাহ চাই।

শয়তানের চেলাদের কাজ

এ কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি জুমলা বলেছেন, প্রথম জুমলা হলো, যে চোগলখোরি করে এবং চোগলখোরি করাকে কর্ম বানিয়ে নেয় এবং দুই প্রিয় ব্যক্তির মাঝে দ্বন্দ্ব লাগায়। বিশেষ করে স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিভেদ ছড়ায়। অর্থাৎ স্বামীর মনে স্ত্রীর প্রতি কু-ধারণা সৃষ্টি এবং স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি কু-ধারণা তৈরী করে। এটা সবচেয়ে ভয়াবহ। এর জন্য কঠিন শাস্তির হুমকি এসেছে। হাদীসে আছে, ইবলিস শয়তানের কাজ হলো, মানুষকে প্ররোচিত করা এবং তার সকল চেলারা সারা দুনিয়ায় এই উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়ায় যে, মুসলমানকে তার পথ থেকে বিচ্যুত করা, প্রতারিত করা, ভুল পথে নিয়ে যাওয়া এবং গোমরাহ করা। তার বিরাট এক বাহিনী এই কাজের জন্য ছুটে বেড়ায়। কিছু শয়তান আছে জ্বীন শয়তান আর কিছু আছে মানবরূপী শয়তান যারা এ ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে। আল্লাহ হেফাজত করুন।

সমুদ্রের উপর শয়তানের জলসা করা

হাদীসে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, শয়তান কিছু দিন পর পর সমুদ্রের উপর জলসা করে। তার সকল চেলাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ইবলিস একটি সিংহাসনে বসে। তার চারপাশে চেলারা একত্রিত হয়। তখন শয়তান একেক করে সবাইকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কী কাজ আঞ্জাম দিয়েছ? একজন একজন করে দাঁড়িয়ে কাজের বর্ণনা দেয়। কেউ বলে অমুক নামাযে যাচ্ছিল তখন আমি তার মনে কুমন্ত্রণা দিয়েছি ফলে সে নামায পড়েনি। শয়তান বলে ভাল করেছ। দ্বিতীয় একজন দাঁড়িয়ে বলে, অমুক ব্যক্তি যিকির করতে চাচ্ছিল তখন আমি তাকে এমনভাবে দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত রেখেছি যে, সে যিকিরের কথা বেমালুম ভুলে গেছে। শয়তান বলে তুমি ঠিক কাজ করেছ। তৃতীয় একজন দাঁড়িয়ে বলে, এক ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করতে চাচ্ছিল তখন আমি তাকে বিচ্যুত করেছি এবং অন্য কাজে লাগিয়ে দিয়েছি। শয়তান বলে তুমি ঠিক কাজ করেছ। যখন সবাই সবার কারগুজারি শেষ করে, তখন এক চেলা দাঁড়িয়ে বলে, এক দম্পতি খুব সুখ শান্তিতে আনন্দে আহলাদে দিন কাটাচ্ছিল। তখন আমি গেলাম এবং দু'জনের মাঝে এমন বিভেদ সৃষ্টি করলাম যে, দুজনের কথা বলাই বন্ধ হয়ে গেল। মনে হয় খুব শীঘ্রই তালাক হয়ে যাবে। তখন শয়তান তার সিংহাসন থেকে উঠে তার সাথে গলা মিলায় এবং বলে তুমিই আসল কাজ করেছ। অন্যরা সাধারণ কাজ করেছে কিন্তু আমার মনের মত কাজটা তুমিই করেছ। এই হাদীসটি মেশকাত শরীফে বর্ণিত আছে।

নিকৃষ্ট বিবাদ হলো স্বামী স্ত্রীর মাঝের মনোমালিন্য

এ থেকে এটাই বুঝা গেল যে, যত বিবাদ আছে সেগুলো নিজ নিজ জায়গায় খারাপ। সবচে নিকৃষ্ট বিবাদ হলো, স্বামী স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্য সৃষ্টি করা। এজন্য বুযুর্গরা এই শিক্ষা দেন যে, স্বামীর কথা স্ত্রীর কাছে এবং স্ত্রীর কথা স্বামীর কাছে খুব সতর্কতার সাথে বলা উচিত। এমন না হয়ে যায় যে, আপনার মুখ থেকে এমন কথা বের হয় যার কারণে উভয়ের মাঝে মনোমালিন্য দেখা দেয়। এটা তো শয়তানেরই চাল।

অন্যের দোষ অন্বেষণ করা

আর দ্বিতীয় এ বাক্যটি বলেছেন যে, যে লোক অন্যের দোষ খোঁজার চেষ্টা করে। অথচ বেচারা বেগুনাহ মা'ছুম মানুষ। তার মাঝে কোন খারাবি নেই। কিন্তু এই ব্যাটা সব সময় এই ধান্ধায় থাকে যে, যদি তার কোন দোষ পাওয়া যায়। আমি তার কোন খারাবি জানতে পারি তাহলে দুনিয়া বাজিয়ে ফেলবো। এ হলো সবচেয়ে বদতমীয লোক। দুনিয়ার নিকৃষ্টতম মানুষ।

আমরা আজ কেন লাঞ্ছিত হচ্ছি

এখন আপনি চিন্তা করুন, শরীয়ত মোআশারাত (পারস্পরিক আচার-আচরণ) সম্পর্কে যে বিধান দান করেছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কত গুরুত্ব দিয়েছেন। অথচ আমরা এগুলোকে দ্বীন থেকেই বের করে দিয়েছি। আমরা মনে করি, নামায পড়লাম, রোজা রাখলাম, বিশেষ কিছু আচার অনুষ্ঠান পালন করলাম তো আমি দ্বীনদার হয়ে গেলাম। কিন্তু আখলাক কেমন, লেনদেন কেমন। মানুষের সাথে আচার-আচরণ কেমন। ফাসাদ বিভেদ এবং তার নিরসনে আমার কর্ম পদ্ধতি কেমন। দ্বীনের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জীবনের প্রতিটি দিকে নির্দেশনামূলক হেদায়াত দান করেছেন। কিন্তু আমরা আজ লাঞ্ছিত অপদস্থ। তার প্রকৃত কারণ হলো আমরা রাসূলের শিক্ষাকে ছিড়ে দিয়েছি। যার ফলে সর্বত্র আমরা মার খাচ্ছি। সকাল সন্ধ্যা প্রতারিত হচ্ছি। নিজেদের সংশোধনের পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করছি। হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, একের প্রতি অন্যের মন বিদ্বেষে ভরপুর। এর ফল আমরা ভোগ করছি। আল্লাহ তা'আলা তার ফযল ও করমে আমাদের সকলকে হেদায়াত দান করুন।

অশ্লীলতা ছড়ানো নিকৃষ্ট গুনাহ

হযরত আলী রা. বলেন যে ব্যক্তি অশ্লীল কথা বলে এবং যে তা প্রচার করে উভয়েই সমান গুনাহগার। যেমন অশ্লীল কথা বলা, কাউকে গালি দেয়া গুনাহ। এমনিভাবে তা প্রচার করা যে, অমুক ব্যক্তি মিথ্যা বলছে এটাও গুনাহ। মনে রাখবেন, যে সকল বস্তুর মাধ্যমে সমাজে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে। যেমন অশ্লীল গল্প, উপন্যাস, নাটক যা আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এর প্রকাশক, পরিবেশক, ক্রেতা, বিক্রেতা সকলেই সমান গুনাহগার। কেননা, তাদের কাজের কারণেই বেহায়াপনার সয়লাব হচ্ছে। তাদের সম্পর্কে কোরআনে কারিম বড় কঠোর ভাষায় বলেছে,

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ ○ (سورة النور ١٩)

অর্থাৎ যারা মুসলমানদের মাঝে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় স্থানে যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি রয়েছে।

এইড্‌স ব্যাধি অশ্লীলতার কারণ

সারা দুনিয়ায় এইডসের যে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে, তা অশ্লীলতা ও বেহায়াপনারই কুফল। যা আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়েছেন। এক হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোন সম্প্রদায়ের মাঝে বে-হায়াপনা অবাধ যৌনাচার ছড়িয়ে পড়বে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের এমন এমন ব্যাধিতে আক্রান্ত করবেন যার নাম তাদের চৌদ্দপুরুষও শুনে নি। চৌদ্দশত বছর পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ভবিষ্যত বাণী করেছেন। এইড্‌সের নাম আমাদের বাপ দাদারা শুনে নি। এইড্‌স নামে কোন ব্যাধি আছে তার কল্পনাও ছিল না। এইডস আবার কী জিনিস। কিন্তু এখন এই রোগ সু-পরিচিত। আর আল্লাহ না করুন কোথাও যদি কোন ঘটনা ঘটে যায় তাহলে সেটাকে গোপন করা আবশ্যক। যাতে করে তার চর্চা না হয়। কারণ এ জাতীয় বিষয় আলোচিত হবে এটা আল্লাহ এবং তার রাসূলের পছন্দ নয়। যদি কেউ ভুল করে ফেলে তাহলে তা গোপন রাখো। কেননা চর্চার কারণে সমাজে তার মন্দ প্রভাব পড়ে। এজন্য বলা হয়েছে। অশ্লীলতায় লিপ্ত ব্যক্তির যে পরিমাণ গুনাহ তার চর্চাকারীরও সে পরিমাণ গুনাহ।

বেহায়াপনার মাধ্যমগুলো বন্ধ রাখুন

আমাদের সমাজে টিভি, ভিসিডি, কম্পিউটার আল্লাহ জানেন আর কত মাধ্যম আছে যার মাধ্যমে অশ্লীলতার বাজার রমরমা। এর কারণে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধ্বংস হচ্ছে। আল্লাহর স্বীয় অনুগ্রহেই এই আযাব থেকে আমাদের মুক্ত রাখুন। যদি কোন অশ্লীল কথা শুনেই ফেলেন তাহলে ঐ পর্যন্তই ক্ষান্ত হোন। এর প্রচার প্রসারে উদ্যোগী হবেন না এবং রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করবেন না। কেননা এর মাধ্যমে অশ্লীলতা ছড়াবে। এর চর্চা হবে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফযল ও করমে আমাদের সকলকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদের উপর আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ –

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ফীল-এর প্রেক্ষাপট

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهُ. وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَآ شَرِيْكَ لَهُ. وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ ○ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيْلٍ ○ وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ○ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ○ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ○ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

ভূমিকা

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! গত সপ্তাহ থেকে আমি এই ধারাবাহিকতা শুরু করেছি যে, কোরআনে কারীমের যে সকল সূরা আমরা বেশি বেশি পাঠ করি এবং শ্রবণ করি তার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা ও তাফসীর আপনাদের সামনে পেশ করবো যাতে করে যখন আমরা এই সূরাগুলো কোরআনে কারীমে পাঠ করবো, কিংবা নামাজে তিলাওয়াত করবো অথবা শুনবো। তখন কমপক্ষে যেন তার সার সংক্ষেপ এবং তা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা আমাদের স্মৃতিতে ভেসে উঠে। এর ফলে নামাযে খুশু খুযু বৃদ্ধি পায়। যেহেতু আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করমে ইতোপূর্বে সূরা ফাতিহা, সূরা ফালাক এবং সূরা নাসের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আপনাদের সামনে পেশ করেছি। তাই আজ আপনাদের সামনে এমন একটা সূরা তিলাওয়াত করেছি যার নাম সূরাতুল ফীল। অধিকাংশ মুসলমানেরই এই

সূরা মুখস্থ আছে। যারা একাকী তারাবীর নামাজ পড়ে, কিংবা যেখানে জামাতে খতমে কোরআন হয় না সেখানে মানুষ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ থেকে নিয়ে কোরআনের শেষ দশটা সূরা তিলাওয়াত করে। এর মাধ্যমে তারাবী হতে ফায়দা লাভ করে।

সূরা ফীলের তরজমা

প্রথমে আমি এই সূরার তরজমা করছি। পরে এর প্রেক্ষাপট, এবং ব্যাখ্যা পেশ করবো ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা এই ছোট সূরায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন–

اَلَمْ تَرَ আপনি কি দেখেননি? كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيْلِ আপনার প্রতিপালক আসহাবে ফীল অর্থাৎ হস্তী বাহিনীর সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন। اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ কি এমন হয়নি যে, আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা তাদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছেন। وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ এবং তাদের উপর এমন পাখি ছেড়ে দিয়েছেন যার আকৃতি আবাবীল পাখির ন্যায়।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করে দেন। অর্থাৎ তারা সকলে ধ্বংসও বরবাদ হয়ে গেছে।

এই সূরার প্রেক্ষাপট

এই সূরার প্রেক্ষাপট হলো, কোরআনে কারীম যে ঘটনার দিকে এই সূরায় ইশারা করেছে। সেটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের আগমন এবং তার পবিত্র জন্মগ্রহণের পূর্বের ঘটনা। আর এই ঘটনাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের মু'যিযার অন্তর্ভুক্ত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু মু'যিযা এমন আছে যেগুলো হুজুরের আগমনের পরে ঘটেছে। আর কিছু মু'যিযা এমন আছে যেগুলো হুজুরের আগমনের পূর্বে ঘটেছে। তার দৃষ্টান্ত হলো এমন, যখন সূর্য উদিত হবে। এখনও উদিত হয়নি। কিন্তু তার আগেই পূর্ব দিগন্তে রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়ছে। দিগন্ত লালিমা এই পয়গাম দিচ্ছে যে, সূর্য এখন উদয়ের পথে। ঠিক তেমনি আল্লাহ তা'আলার কোন মহান পয়গাম্বর দুনিয়াতে তাশরীফ আনবেন, তার আগে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াবাসীকে, তাঁর কুদরতের কিছু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করান। যা এই কথারই পূর্বাভাস দেয় যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় ফযল ও করমে একজন নবী পাঠাচ্ছেন। যিনি এই পৃথিবীতে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাবেন। নবী আলাহিস সালামের আগমনের পূর্বে যে সকল মু'যিযা প্রকাশিত হয়েছে তাকে পরিভাষায় ইরহাক 'ارحاق' বলে। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের আগমনের পর যে সকল ঘটনা ঘটেছে তাকেই মু'জিযা বলে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের নিদর্শনাবলী

'ইরহাক, আল্লাহ তাআলা হুজুর আলাইহিস্ সালাম আগমনের পূর্বে বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছিলেন। সেগুলোর মধ্যে একটা হলো, হঠাৎ করে কিসরার প্রাসাদের চুন সুরকি খসে পড়েছিল। যা এই কথার ভবিষ্যদ্বাণী করছিল এবং এই কথার নিদর্শন ছিল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ধরার বুকে আগমন করবেন। তখন কায়সার এবং কিসরার অহংকার ধুলির সাথে মিশে যাবে। শত সহস্র বছর ধরে পারস্যে যে অগ্নিশিখা জ্বলছিল, মানুষ যার পূজা করত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে হঠাৎ একদিন তা নির্বাপিত হয়ে যায়। এটাও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'ইরহাক, সমূহের মধ্য থেকে একটি মু'জিযা ছিল। আরেকটি মু'জিযা যা আল্লাহ তা'লা এই সূরার মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

বাইতুল্লাহর প্রয়োজন

আপনি জানেন কাবা আল্লাহর ঘর। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফযল ও করমে দুনিয়াতে এমন ঘর বানিয়েছেন যাকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন এই বলে এটা আমার ঘর। অথচ আল্লাহ তা'লা কোন ঘরের মুখাপেক্ষী নন। এমন না যে তিনি ঐ ঘরে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা তো পুরা আলমকে বেষ্টন করে রেখেছেন। তার তো কোন ঘরের প্রয়োজন নেই। তার কোন বাসস্থানের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যেহেতু মানুষ আল্লাহকে দেখেনা। আর মানুষের স্বভাব হলো, যখন সে আল্লাহকে ডাকে তখন তার সামনে এমন কিছু থাকা চাই যাই ছুঁয়ে বা যার অনুসরণ করে মানুষ যেন আল্লাহকে ডাকতে পারে, এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আল্লাহ তা'আলা বাইতুল্লাহ বিনির্মাণ করেছেন। এই বাইতুল্লাহ হযরত আদম (আঃ) থেকে নির্মিত হয়ে আসছে। হযরত আদম (আঃ) সর্বপ্রথম এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কিছুকাল পর দুনিয়াতে বিভিন্ন নবীদের আগমন ঘটে। তাঁরা এই ঘরের তাওয়াফ করেন। ইবাদত করেন। কালের দুর্বিপাকে এই ঘর টিকে থাকেনি। বিভিন্ন বর্ণনাতে আছে যে, হযরত নূহ (আঃ) এর প্লাবনের সময় বাইতুল্লাহ ধসে পড়ে।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং বাইতুল্লাহ বিনির্মাণ

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন দুনিয়ায় আগমন করেন তখন বাইতুল্লাহর কাঠামো বিদ্যমান ছিল না কিন্তু তার ভিত বাকি ছিল এবং সীমানাও ছিল সুনির্দিষ্ট। কিন্তু ইমারত ছিল না। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দিয়েছেন তার পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে সাথে নিয়ে

বাইতুল্লাহ নির্মাণ করার। তখন তারা নির্মাণ করেছেন এবং কোরআন ও তার উল্লেখ করেছে।

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○ (سورة البقرة ١٢٧)

"ঐ সময়কে স্মরণ কর যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং ইসমাঈল (আঃ) বাইতুল্লাহ ভিত স্থাপন করছিলেন। এই আয়াতে এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, নতুন ভিত্তি-প্রস্তর করেন নেই বরং ভিত্তি আগে থেকেই ছিল। ইব্রাহীম এবং ইসমাঈল (আঃ) মিলে ঐ ভিত্তিপ্রস্তর উপরে উঠিয়েছেন। এবং "এই দো'আ করছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ খেদমতটুকু আপনার দরবারে কবুল করে নিন। মোটকথা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কাবা নির্মাণ করেছেন।

মানুষের মাঝে হজ্বের ঘোষণা

আল্লাহ তা'লা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে নির্দেশ দিয়েছেন,

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ○ (سورة الحج ٢٧)

তুমি কা'বা নির্মাণ করেছ। এখন মানব জাতির উদ্দেশ্যে ঘোষণা কর যে, বাইতুল্লাহ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এখন তোমরা হজ্ব করার জন্য এবং সেখানে ইবাদত করার জন্য আস। এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) একটি টিলায় আরোহণ করেছেন এবং উচ্চস্বরে চিৎকার করে ঘোষণা দিয়েছেন, হে আদম সন্তান! হে মানব সকল! আল্লাহর ঘর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। তার নিকটে ইবাদত করার জন্য, হজ্ব করার জন্য তোমরা এখানে আসো। হযরত ইব্রাহীম এই ঘোষণা দিলেন। আপনি দেখবেন, কোন হাজী কিংবা কোন উমরাকারী যখন ইহরাম বাঁধে তখন বলে, لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك এর অর্থ, বান্দা হাযির। এটা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর আহ্বানের সাড়া প্রদান। যা তিনি আল্লাহর নির্দেশে দিয়েছিলেন। لبيك اللهم لبيك আয় আল্লাহ! বান্দা হাযির। আপনার হুকুম পালনার্থে হাযির। لاشريك لك لبيك আপনি ছাড়া কোন শরীক নেই। আপনি ব্যতীত কোন খোদা নেই। আমি হাযির। আল্লাহ তা'আলা সাড়া দুনিয়ায় এই আওয়ায পৌঁছে দিয়েছেন। এর সাড়া দানে প্রতি বছর মানুষ হজ্বের জন্য আসে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সময় থেকে কা'বায় মানুষের আগমন অব্যাহত রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ হজ্বের জন্য আগমন করে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) থেকে এ ধারার কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।

জাহেলী যুগ এবং বাইতুল্লাহর গুরুত্ব

পরবর্তীতে আরবে প্রতিমা পূজার সূচনা হয়। আরবরাও প্রতিমা পূজায় আত্মনিয়োগ করে। কিন্তু বাইতুল্লাহ্‌র হজ্ব করার ধারা অব্যাহত ছিল। অর্থাৎ জাহেলী যুগেও যখন মানুষ শিরক করত, প্রতিমা পূজা করত তখনও বাইতুল্লাহর সম্মান বজায় রাখত। বাইতুল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিত। আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার জন্য বাইতুল্লাহর কাছে আসত। প্রতি বছর হজ্ব করত। জাহেলী যুগেও হজ্ব পালন হতো। বাইতুল্লাহর কারণে মক্কা মোকাররমা এবং মক্কাবাসীকে আল্লাহ তা'আলা এক মহান সম্মান দান করেছেন। আরবের সব গোত্র হজ্ব করার জন্য মক্কায় আসত। যেহেতু কোরাইশের লোকজন বাইতুল্লাহর. মোহাফেজ ছিল। বাইতুল্লাহর দেখভাল করত, এজন্য মানুষ কোরাইশের লোকদের সম্মান করত। যার ফলাফল এই দাঁড়াতো যে, প্রতি বছর গোটা আরবের লোকজন বাইতুল্লাহ চত্বরে একত্রিত হতো। সেখানে সংঘবদ্ধ ঐক্যের দৃশ্য ফুটে উঠত। কোরাইশের লোকদের সম্মান ও মর্যাদার বহির্প্রকাশ ঘটত। যুগ যুগ ধরে এভাবেই চলে আসছিল।

আব্‌রাহার মনে হিংসা

আরবের আরেকটি বড় রাষ্ট্র ছিল ইয়ামান। যা আজও আছে, এবং ইয়ামান নামে সুপরিচিত। ইয়ামান আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। সে যামানায় এটি একটি বড় সালতানাত ছিল। সেখানকার বাদশা ছিল আবরাহা। সে দেখল গোটা আরবের লোকজন এমনকি সুদৃঢ় ইয়ামান থেকেও লোকজন হজ্বের মৌসুমে হজ্ব করার জন্য বাইতুল্লাহ গমন করে। যার ফলে মক্কা মোকাররমা বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে এবং কোরাইশের লোকদের সম্মান করা হয়। তাই সে হিংসার আগুনে দগ্ধ হতে লাগল, গোটা আরবের লোকজন মক্কা মোকাররমাকে নিজেদের মারকায বানিয়েছে। সেখানে গিয়ে ইবাদত করে। এতে কোরাইশরা লাভবান হয়। তাহলে কেন আমরা ইয়ামানে একটি ঘর বানাবো না। অবশ্য সে ছিল খৃস্টান বাদশা। তাই ইয়ামনে একটি আলীশান গির্জা তৈরি করে। বাইতুল্লাহকে যদি আপনি দেখেন, দেখবেন শুধু পাথর দিয়ে তৈরি। কোন প্লাস্টার বা চুনকাম নেই। উপরে যদিও গিলাফ চড়ানো হয়েছে কিন্তু বাইতুল্লাহর কাঠামোটা শুধু পাথরের সংযুক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। সাদা-মাটা কোন প্লাস্টারও নেই চুনকামও নেই।

এদিকে আবরাহা ইয়ামানে বহু অর্থ ব্যয় করে একটি আলীশান গির্জা নির্মাণ করে। যার মেঝে ছিল মর্মর পাথরের। যার সৌন্দর্য ছিল নান্দনিক। আবরাহা

ইয়ামানের লোকদের হুঁশিয়ার করে বলল, খবরদার! আজকের পর থেকে হজ্ব করার জন্য কেউ মক্কায় যাবে না। সবাই এই গির্জায় হজ্ব করবে। যখন আবরাহার এই ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ল যে, 'আমি কা'বা বানিয়ে দিয়েছি। লোকদের উচিত এর তাওয়াফ করা'। তখন স্বাভাবিক ভাবেই আরবদের মাঝে ক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) থেকে কাবার সম্মান-মর্যাদা সবার কাছে সমাদৃত। তার ইহতেরাম অনস্বীকার্য। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এখানে হজ্ব করতে আসে। আর আবরাহা হঠাৎ করে ইয়ামানে একটি ঘর বানিয়ে ফেলল। প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল।

গির্জা অপবিত্র করা

বর্ণনায় আসে যে, মক্কা মোকাররমা থেকে কিছু লোক ইয়ামান গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে সেখানকার গির্জা নাপাক করে আসে। কোন কোন রেওয়ায়াতে আসে, সেখানে তারা মলত্যাগ করেছিল। আরেক রেওয়ায়াতে আছে তারা গির্জায় আগুন লাগানোর চেষ্টা করেছিল। আবরাহা যখন এই সংবাদ শুনলো তখন সে কসম খেল, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবো না যতক্ষণ পর্যন্ত মক্কার বাইতুল্লাহ নিজ হাতে গুঁড়িয়ে না দিব। এই উদ্দেশ্যে সে সৈন্যদল প্রস্তুত করা শুরু করে যারা মক্কার উপর আক্রমণ করবে, আল্লাহ্ পানাহ্– বাইতুল্লাহ গুঁড়িয়ে দিবে।

হস্তীবাহিনী

আবরাহা এক বিশাল হস্তীবাহিনী প্রস্তুত করে। সে নিজে বড় একটি হাতির উপর আরোহণ করে। বাইতুল্লাহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সে হস্তীবাহিনী নিয়ে রওয়ানা করে। বড় শান শওকতের সাথে, অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বীরবিক্রমে এগিয়ে চলে। পথিমধ্যে কিছু আরব গোত্র তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আবরাহার বাহিনীর সামনে তারা বাঁধভাঙ্গা পানিতে খড়কুটার ন্যায় ভেসে গিয়েছিল। তারা অগ্রসর হয়ে তায়েফ পর্যন্ত পৌঁছে। তায়েফ মক্কা থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। আজ তো মানুষ এক ঘণ্টা ড্রাইভ করে সেখানে পৌঁছে যায়। সে যুগে দু'ই তিনদিন লেগে যেত। তার দৃঢ় সংকল্প ছিল, সে বাইতুল্লাহ্র উপর হামলা করবে।

সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, ঘটনা এখনো বাকি আছে। কিছু কথা বলার ছিল। সময় স্বল্পতার কারণে আজকের জন্য এখানে পরিসমাপ্তি টানছি। আল্লাহ হায়াতে বাঁচিয়ে রাখলে আগামী জুমায় এর পূর্ণ বিবরণ পেশ করবো।

অমুসলিমদের ইবাদত খানার সংরক্ষণ

এতটুকু বিষয় এখানে আরয করবো যে, কোরাইশরা যে গির্জায় আগুন লাগিয়েছিল এটা জাহেলী যুগের প্রথা। তারা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে এমনটা করেছিল। কিন্তু আমাদের ধর্ম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে যে, যারা অমুসলিম, আমাদের দেশে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করছে, কোন ধরনের নাশকতামূলক কাজে জড়িত না। তাদের জান, মাল, তাদের ইজ্জত আব্রু, ইবাদত খানা সংরক্ষণের দায়িত্ব মুসলমানদের। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যারা ইসলামী হুকুমতের অধীনে চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকে তাদেরকে যিম্মি বলে। অর্থাৎ তাদের দায় দায়িত্ব মুসলমানদের। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তারা যদিও অমুসলিম। কিন্তু আল্লাহ ও তার রাসূল তাদের জানমাল হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। এজন্য যে ব্যক্তি এই যিম্মাদারীর বিরুদ্ধাচরণ করবে সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী।

হযরত ফারুকে আ'যমের সর্বশেষ অসিয়ত

হযরত উমর ফারুক (রা.) তার পরবর্তীদের সর্বশেষ যে অসিয়ত করেছিলেন সেই অসিয়তে একথাও অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, যত যিম্মি আছে, অর্থাৎ আমাদের দেশে যত অমুসলমান বাস করে, আমরা তাদের জান, মাল ইজ্জত আব্রুর হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছি। এ ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন থাকবে যেন এই যিম্মাদারির কোন বিরুদ্ধাচরণ না হয়। কোনভাবেই যেন তাদের জান, মাল ও ইজ্জতের উপর হামলা না আসে। এটা সম্পূর্ণ না জায়েয। তাদের নিজস্ব যে সকল ইবাদতখানা আছে ঐগুলোতে হাত দেয়াও মুসলমানদের জন্য ঠিক হবে না। শুনেছি করাচিতে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে। কিছু লোক গির্জার উপর হামলা করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ভাল করে বুঝে নিন দ্বীনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এমনটা করা শরীয়াত কস্মিনকালেও বৈধ বলে না। যারা এমন কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে তারা শরীয়তের বিরোধিতা করেছে। আমরা তাদেরকে নিন্দা জানাই। মুসলমানদের উচিত, এ ব্যাপারে দ্বীনের সঠিক শিক্ষা নিজেও বুঝা এবং অন্যকে বুঝানোর চেষ্টা করা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূরা ফীল-এর পেক্ষাপট

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ ○ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيْلٍ ○ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ ○ تَرْمِيْهِم بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ○ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ ○ آمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

ভূমিকা

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! আমি আপনাদের সামনে কোরআনে কারীম থেকে সূরা ফীল তিলাওয়াত করেছি। কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা প্রদান মনস্থ করেছি। এই সূরায় আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা কুদরতের মহান নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের কিছুদিন পূর্বে প্রকাশ পেয়েছিল। এটা সে সময়কার ঘটনা যখন রাসূলের দাদা আ. মোত্তালিব কে মক্কা মোকাররমার সর্দার মনে করা হতো। ঘটনা ছিল এই যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কাবা নির্মাণ করেছেন। আল্লাহ তাআলার নির্দেশে মানুষের মাঝে প্রচার করেছেন এটা আল্লাহর ঘর। প্রতি বছর হজ্ব করার জন্য মানুষ তার নিকটে আসবে এবং সেখানে আল্লাহর ইবাদত করবে। তাই আরব উপদ্বীপের লোকেরা প্রতি বছর হজ্ব করার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে মক্কায় আগমন করত।

ইয়ামানের গভর্নর আবরাহার হিংসা

অন্য দিকে ইয়ামানের লোকজনের ভাষাও ছিল আরবী। তারা আরবীতে কথা বলত। কিন্তু তাদের শাসক ছিল একজন খৃস্টান, যার নাম ছিল আবরাহা। সে মূলতঃ হাবশার বাদশা নাজ্জাসির পক্ষ থেকে গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিল। আবরাহা দেখলো গোটা আরবের লোকজন প্রতিবছর মক্কা মোকাররমায় যায় এবং তারা সেখানে উপাসনা করে, প্রার্থনা করে। যার কারণে মক্কা একটি কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। আর মক্কা মোকাররমা আরবের প্রধান শহর হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। লোকজন যখন সেখানে যায় তখন আরবরা ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হয় এবং আর্থিক মুনাফা লাভে সক্ষম হয়। এমতাবস্থায় সে ইয়ামানের বড় শহর সানআয় এমন একটি ইবাদতখানা বানানোর দৃঢ় সংকল্প করল যা হবে সেকালের স্থাপত্যশিল্পের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। মানুষ আকৃষ্ট হবে এবং সে মানুষকে স্বীয় ইমারতে ইবাদত করার প্রতি আহবান করতে পারবে। সে জাঁকজমকপূর্ণ শানদার একটি গির্জা নির্মাণ করে। যা এত উঁচু ছিল যে নিচে দাঁড়িয়ে তার চূড়া দেখা ছিল কষ্টসাধ্য। যখন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হল তখন সে তার প্রজাদের উপর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল যে, আজ থেকে কোন ব্যক্তি মক্কায় হজ্ব করতে যেতে পারবে না। এখানে হজ্ব পালন করবে। কিছুসংখ্যক প্রজা খৃস্টান ছিল না তারা বাইতুল্লাহর সম্মান ও মর্যাদার ঘোষক ছিল। আবরাহা তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল যে, তারা হজ্ব ব্রত পালনে মক্কা গমন করতে পারবে না।

কোরাইশদের মাঝে দুশ্চিন্তা ক্রোধের শিখা

যখন কোরাইশের লোকজন– যারা বাইতুল্লাহর মোহাফেজ ছিল এই সংবাদ শুনলো তখন তারা ক্রোধে ফেটে পড়ল। মানুষকে আল্লাহর ঘরে আসতে বাধা দেয়া হচ্ছে। অথচ গোটা আরবের এমনকি ইয়ামানের লোকজন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ঘরের তা'যীম করে। আল্লাহর ঘরকে নিজেদের ইবাদতখানা মনে করে। আল্লাহর দরবারে হাযির হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। এজন্য আবরাহার এই ঘোষণা তাদের মনে আঘাত করে এবং ক্ষোভের সঞ্চার করে। কিছু লোক প্রতিশোধ স্পৃহায় ইয়ামানে সফর করে। কোন রেওয়াতে আছে এক ব্যক্তি গির্জায় মলমূত্র ত্যাগ করেছিল। কোন বর্ণনায় আছে, আগুন লাগিয়েছিল। আল্লাহ ভাল জানেন।

বাইতুল্লাহর উপর হামলার প্রস্তুতি

আবরাহা যখন এই সংবাদ শুনলো তখন সে কসম খেল যে, কাবাপ্রেমিক কিছু দুষ্ট লোক আমার গির্জা অপবিত্র করেছে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত আমি কাবার প্রতিটি ইট আলাদা না করবো এবং তাকে মাটির সাথে মিশিয়ে না ফেলব ততক্ষণ পর্যন্ত আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলব না। এরপর সে কাবার উপর হামলা করার প্রস্তুতি শুরু করে। সে উদ্দেশ্য এক বিশাল হস্তীবাহিনী প্রস্তুত করে। তার নিজের একটা হাতি ছিল। যার নাম ছিল মাহমুদ। বলা হয়ে থাকে তার হাতিটি ছিল বিরল প্রজাতির একটি বন্য হাতি। তার দেহে ছিল প্রচণ্ড শক্তি। এ সময় আবরাহা বাদশা নাজ্জাসির কাছে চিঠি লেখে যে, আমি কাবার উপর হামলা করতে চাচ্ছি। এজন্য আপনি আমার সাহায্যার্থে হস্তীবাহিনী পাঠান। তখন হাবশা থেকে তার কাছে হাতির একটা ফৌজ পাঠানো হয়। এরপর সে এভাবে পরিকল্পনা করে যে, সেখানে কতিপয় শক্তসমর্থ হাতির পায়ে শিকল বেঁধে দিবে। এরপর কাবাগৃহে শিকল পেঁচিয়ে হাতিকে সামনে হাঁকাবে। –নাউজুবিল্লাহ এতে করে কাবা ঘরের পাথরগুলো খুলে খুলে পড়বে এবং কাবাঘর শহীদ হয়ে যাবে। সে এই পরিকল্পনা করে বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে ইয়ামান থেকে কাবার পথে যাত্রা করে। সে সময় নাজ্জাশি বড় শক্তিধর বাদশা ছিল। তার সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত ছিল। এজন্য মানুষ ভেবেছিল এই বিশাল ফৌজের মোকাবেলা করা সহজসাধ্য নয়। এরপরও আরবের বিভিন্ন গোত্র কাবার সম্মানে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। আবরাহা তাদের পর্যুদস্ত করে সামনে অগ্রসর হয় এবং একের পর এক বিজয়মাল্য গ্রহণ করে।

তায়েফবাসীর সন্ধিস্থাপন

এক পর্যায়ে যখন আবরাহা তায়েফ গিয়ে উপস্থিত হলো– তায়েফ হল মক্কার নিকটবর্তী একটি শহর। পাহাড়ি এলাকা। এখন মটর গাড়িতে সর্বোচ্চ এক ঘণ্টা লাগে। কিন্তু তখন তিন দিনের দূরত্ব অতিক্রম করতে হতো। তায়েফবাসী দেখল এরা সবাইকে পরাজিত করে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে আসছে এখন আমরা যদি এদের প্রতিরোধ করি তাহলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবো সাথে সাথে মারাও পড়ব। এজন্য তায়েফের লোকজন তাদের সাথে সন্ধি করে। এবং পথ দেখানোর জন্য তাদের সাথে একজন লোক পাঠিয়ে দেয়। ঐ ব্যক্তি তাদেরকে নিয়ে মক্কার অদূরে এমন এক জায়গায় পৌঁছে যেখানে মক্কাবাসী উট চরাতো। সেখানে রাসূলের দাদা (আঃ) মুত্তালিবের ২০০টি উট ছিল। তৎকালে উটের বড় কদর ছিল। উটের মালিককে ধনী বলে মনে করা হতো। আবরাহার বাহিনী সর্বপ্রথম যে কাজটা করল, সেটা হল তারা সবগুলো উট লুটে নিল।

মক্কাবাসীকে বার্তা প্রেরণ

এরপর তারা মক্কাবাসীর কাছে বার্তা প্রেরণ করল হে মক্কাবাসী! আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চাই না। তোমাদেরকে হত্যা করারও কোন ইচ্ছা আমাদের নেই। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, আমরা বাইতুল্লাহকে ধূলিসাৎ করে দিব। কাবাকে গুঁড়িয়ে দিবো। যদি তোমরা বাধা না দাও তাহলে তোমাদেরকে আমরা কিছু বলব না। তোমরা চুপ করে বসে থাক, আমরা বাইতুল্লাহ ধ্বংস করে চলে যাবো। এই বার্তা নিয়ে এক ব্যক্তি যখন হযরত আব্দুল মোত্তালিবের কাছে গেল যিনি ছিলেন রাসূলের দাদা এবং মক্কার সরদার। তখন আব্দুল মোত্তালিব বলল, দেখ ভাই! যাদের সাথে লড়াই করব এরা তো বিরাট বাহিনী, আমরা তাঁদের মোকাবেলা করে পারবো না। যদি তারা এই নিশ্চয়তা চায় যে, আমরা মোকাবেলা করবো না তাহলে আমি তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি। ঠিক আছে আমরা মোকাবেলা করব না। তবে এটা ভাল করে বুঝে নাও যে, এই ঘর আমার তোমার ঘর নয়। এটা আল্লাহর ঘর। আল্লাহর আদেশে নির্মিত হয়েছে। আমি সতর্ক করছি যে, যদি এই ঘরের উপর হামলা করা হয় তাহলে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এই ঘরের হেফাজত করবেন। আমাদের হেফাজতের কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ আমাদের হেফাজতের মুখাপেক্ষী নন। এর কারণে যদি কোন আযাব আসে তাহলে এ ব্যাপারে আমাদের কোন দায়-দায়িত্ব নেই। ঠিক আছে আমরা মোকাবেলা করবো না। যে ব্যক্তি এই পয়গাম নিয়ে গিয়েছিল সে বলল, আমি সরাসরি আবরাহাকে আপনার মত জানাবো। তার সাথে আপনার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবো। আব্দুল মোত্তালিব আবরাহার নিকটে গেল। তখন আবরাহা দেখলো জ্যোতির্ময়, ভাবগম্ভীর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এক ব্যক্তি আগমন করেছেন। তাঁকে দেখে আবরাহা প্রভাবান্বিত হয় এবং বলে আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করে অনেক প্রভাবিত হয়েছি। আমি আপনাকে বলতে চাই যে আমি এই কাজের জন্য এসেছি। এই কাজ সম্পন্ন করে চলে যাবো। আপনি যদি আমাদের মোকাবেলা না করেন তাহলে আমি আপনাদের সকলকে নিরাপত্তা দিচ্ছি যে, কারো গায়ে আঁচড়ও লাগবে না। তবে আমরা বাইতুল্লাহ ধূলিসাৎ করবো তাতে আপনি কোন বাধা দিবেন না।

আমি আমার উটের ফিকির করছি

আব্দুল মোত্তালেব বললেন, আমি আপনাকে শুধু একটি কথা বলার জন্য এসেছি। এছাড়া আমার কোন কথা নেই। আর তা হলো আপনি আমার এবং আমার বন্ধুদের যে উটগুলো আটকে রেখেছেন, সেখানে আমার ২০০টি উট

আছে আর বাকিগুলো আমার বন্ধুদের। আমাদের ফিরিয়ে দিন উটগুলো। এরপর আমরা আপনাকে কিছু বলব না। আবরাহা বলল, আপনাকে প্রথমে যখন দেখেছি তখন আপনি আমার মনে সম্মানের আসন গেড়ে নিয়েছেন। আপনি সম্ভ্রান্ত লোক। কিন্তু আপনার একথা শুনে আমি নিরাশ হলাম। আপনি তো দেখি নিজের উটের ধান্ধায় আছেন।

এটা আল্লাহর ঘর

আর যেই ঘরকে আপনি আল্লাহর ঘর বলছেন এবং যাকে ইবাদতখানা মানছেন তার জন্য আপনার কোন চিন্তা নেই। তার সম্পর্কে আপনি আমার কাছে একটি শব্দ ও উচ্চারণ করেন নি যে, এর উপর হামলা করো না। এর উদ্দেশ্য এটাই যে, কাবা থেকে আপনার কাছে উট বেশি প্রিয়। এর থেকে বুঝা যায় আপনি দুনিয়াদার মানুষ। আপনার খোদার, আপনার ধর্মের, কোন ফিকির আপনার নেই। প্রথমে তো আমি আপনাকে অনেক ধর্মপ্রাণ মনে করেছিলাম। এখন বুঝলাম আপনি বড় স্বার্থান্ধ মানুষ। আব্দুল মোত্তালিব বললেন, কথা সত্য, আপনি যে ঘরের উপর হামলা করতে এসেছেন এটা আমার ঘর নয়। কোন মানুষের ঘর নয়। এটা আল্লাহর ঘর। এজন্য তাকে হেফাজত করার কোন ফিকিরের প্রয়োজন নেই। এর জন্য আপনার কাছে মিনতি করারও দরকার নেই যে, আপনি একে রক্ষা করুন। যার ঘর, স্বয়ং তিনিই তাকে রক্ষা করবেন। একারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন আযাব আসলে আপনিই তার লক্ষ্যবস্তু হবেন। আমার মালিকানায় উট ছিল তাই আমি উটের বিষয়ে আপনার সাথে কথা বলার জন্য এসেছি। উট ফেরৎ দেয়ার পর আপনি গিয়ে হামলা করে দেখুন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হেফাজত করা হয় কিনা, হবেই। এজন্য কাবার সম্পর্কে আমার কথা বলার প্রয়োজন নেই। আব্দুল মুত্তালিবের এই কথায় আবরাহা প্রভাবিত হয়। অবশেষে উট ফেরৎ দিয়ে দেয়। আব্দুল মোত্তালিব তার উট নিয়ে চলে আসেন।

কাবা আঁকড়ে দো'আ করা

এ সময় কাবা শরীফের চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে দো'আ করেন, ইয়া আল্লাহ! এত বড় সৈন্যবাহিনীর মোকাবেলা করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা এদের সামনে অসহায়। আপনি আপনার ফযল ও করমে আপনার কুদরতে কামেলার প্রকাশ ঘটান। এই বাহিনীর অপশক্তি ধূলোয় মিশিয়ে দিন। আপনি আপনার ফযল ও করমে কা'বার হেফাজত করুন। দো'আ করার পর কোরাইশরা মক্কা

মোকাররমার আশেপাশের পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। কেননা এ বিষয় তো নিশ্চিত ছিল যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আযাব আসবে। আর যখন আযাব আসে তখন সবাই এর লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়। এজন্য সবাই ঘর বাড়ি ছেড়ে পাহাড়ে অবস্থান নেয়।

আবরাহা বাহিনীর উপর আযাব

এদিকে আবরাহা মক্কার দিকে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা করল, মাহমুদ নামে যে হাতির উপর সে বসেছিল, সে যখন তাকে সামনের দিকে হাঁকাচ্ছিল তখন সেটি বসে পড়ছিল। কোড়া দিয়ে আঘাত করা হল কিন্তু হাতি কিছুতেই উঠল না। এমন কি লোহার শিক দিয়ে আঘাত করা হল তা সত্ত্বেও হাতি উঠে দাঁড়াল না। মানুষ হাজারো চেষ্টা করে মক্কা অভিমুখী করাতে পারবে না। ডানে মোড় নিলে চলত। বামে মোড় নিলে চলত। কিন্তু কাবার দিকে না যেতে অনড়। কোনক্রমেই রাজি হচ্ছিল না। এই অবস্থার মাঝে সমুদ্রের দিক থেকে এক ঝাঁক পাখি উড়ে আসে। আর পাখিগুলোও উদ্ভূত ধরনের, জগতবাসী ইতিপূর্বে না এমন পাখি কখনো দেখেছে না পরবর্তীতে দেখেছে। বর্ণিত আছে পাখির আকৃতি ছিল কবুতর থেকে কিছুটা ছোট, আর চড়ুই থেকে কিছুটা বড়। সমুদ্র থেকে পুরো এক ঝাঁক পাখি উড়ে আসে। প্রতিটা পাখির ঠোঁটে মসুর দানার মতো একটা করে কংকর ছিল। পাখির ঝাঁক সৈন্যদের উপর এসে কংকরগুলো নিক্ষেপ করতে শুরু করে। মসুরির দানার মতো ছোট ছোট কংকর ছোড়া শুরু করে। যার এত শক্তি ছিল যে, যার মাথার উপর পড়েছে সেটা শরীর ভেদ করে পা দিয়ে বেরিয়ে যেত। যার শরীরে এই পাথর লাগত, গুলির চেয়ে দ্রুততর গতিতে তার শরীর ফেঁড়ে ফেলত। ফলাফল এই দাঁড়ালো যে বড় বড় হাতির জন্য একটা নুড়ি পাথরই যথেষ্ট ছিল। তার মধ্যে কিছু হাতি ছুটে পালিয়েছে। গোটা সৈন্যবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ লোক পাথরের আঘাতে মরেছে। কিছু সৈন্য বেঁচেছে, কিন্তু কঠিন যন্ত্রণার শিকার হয়ে রাস্তাতেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। আর আবরাহা, আল্লাহ পাক তাকে কঠিন সাজা দিয়েছেন। সে তৎক্ষণাৎ মরেনি। কিন্তু যখন রওয়ানা করেছে তখন পথিমধ্যে ভয়ংকর যন্ত্রণার শিকার হয়েছিল। তার দেহ থেকে গোস্ত খসে খসে পড়ছিল। এভাবে যখন সে এক জায়গায় পৌঁছল যেটা ছিল তার দারুল হুকুমাত (শাসনাধীন এলাকা) তখন তার গোস্ত গলে পড়া শেষ হয় এভাবে সে মৃত্যুমুখে পতিত হল।

দুইজন প্রাণে বাঁচে

তাদের মধ্য থেকে দু'জন প্রাণে বেঁচে যায়। এমনভাবে বেঁচে যায় যে, তারা অন্ধ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। না চলাচলের যোগ্য ছিল। না দেখার বা শোনার ক্ষমতা ছিল। হুজুরের 'আহলিয়া, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেন। আমি ঐ দু'ব্যক্তিকে মক্কাতে দেখেছি। তারা ছিল অন্ধ এবং বিকলাঙ্গ। মানুষের দুয়ারে ভিক্ষা খুঁজে ফিরত। এ দুজন ছাড়া বাকি সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের অবস্থা ছিল খুবই করুণ।

এই সূরার তরজমা

এই ঘটনাকে বলা হয় 'আসহাবুল ফীলের ঘটনা। যার আলোচনা আল্লাহ তা'লা এই সূরায় করেছেন। أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ আপনি কি দেখেন নি আপনার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন। أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ আল্লাহ তা'আলা কি তাদের ষড়যন্ত্রকে বিফল করে দেন নি। وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ এবং তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছেন। আবাবিল অর্থ ঝাঁকে ঝাঁকে। تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ যে পাখি হস্তীবাহিনীর উপর প্রস্তর বর্ষণ করে। মাটি দিয়ে গোল করে যে গুলি বানানো হয় তাকে সিজ্জীল বলে। فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ আল্লাহ তা'আলা ঐ বাহিনীকে যারা গোটা আরববাসীকে পরাজিত করে অগ্রসর হচ্ছিল, যারা জনপদে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল আল্লাহ তা'আলা তাদের এমন বানিয়েছেন যেন চর্বিত তৃণ, যা চতুষ্পদ প্রাণী খায়। তো এগুলো যেমন প্রাণহীন তেমন তাদের অবস্থাও তদ্রূপ। এটাই এই সূরার তরজমা ও প্রেক্ষাপট।

প্রকৃত ক্ষমতা আল্লাহরই

এটা বলা উদ্দেশ্য যে, এই জগতে প্রকৃত শক্তি বা ক্ষমতা শুধু একটাই আর তাহলো আল্লাহ জাল্লা শানুহুর ক্ষমতা। যখন আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন তার শক্তির প্রকাশ ঘটানোর তখন দুনিয়ার পরাশক্তি, তার সামনে চর্বিত তৃণ সদৃশ হয়ে যায়। হ্যাঁ যদি আল্লাহ তা'আলা কাউকে অবকাশ দেন তাহলে কোরআনে কারীমের ভাষায়,

فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ○ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ○ (سورة القلم ٤٤-٤٥)

কোনো সময় যখন আমার ইচ্ছা হয় দুশমনকেও অবকাশ দেই। করতে থাক যা তোমার বুঝে আসে। তাকে ঢিল দেই। كَيْدِيْ مَتِيْنٌ আমার কৌশল সুদৃঢ়। কিছুকাল পর্যন্ত সে চক্রান্ত করে। কিছুকাল সে শক্তি সঞ্চয় করে। কিন্তু সর্বশেষ এমন একটা সময় আসে যখন আল্লাহ তা'আলা তার সকল শক্তিকে ধুলিসাৎ করেন। পৃথিবীর ইতিহাস এর সাক্ষী। পরাশক্তির অধিকারী ও ক্ষমতাশীলরা যুগে যুগে তাদের বিজয়ের ডংকা বাজিয়েছে। পার্থিব ঐশ্বর্য ও বিলাসিতার পাহাড় গড়েছে। জনমনে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। কিন্তু একটা সময় আল্লাহ তা'আলা অবকাশের সুযোগ শেষ করে দিয়েছেন। এমনভাবে পাকড়াও করেছেন, এমনভাবে ধ্বংস করেছেন যেন চর্বিত তৃণ। আল্লাহ তা'আলা তার ফযল ও করমে, আপন অনুগ্রহে আমাদের সকলকে আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলার কুদরত এবং হিকমতের উপর পরিপূর্ণ ঈমান আনার তাওফিক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা কোরাইশ এবং শোকরের শিক্ষা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لِاِيْلَافِ قُرَيْشٍ ○ اِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ○ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ○ اَلَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ○ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

ভূমিকা

সম্মানিত দ্বীনি ভাইয়েরা! গত জুমায় আমি সূরা 'ফীলের, কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলাম। আজ সূরা ফীলের পরবর্তী সূরা যাকে সূরা কোরাইশ বা সূরা ইলাফিও বলে। আজ তার যৎসামান্য ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করব যা আমি এখন আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি।

সূরা ফিলের সাথে সূরা কুরাইশের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা আরববাসীকে বিশেষ করে কোরাইশকে– যারা মক্কা মোকাররমার অধিবাসী ছিল, স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়েছেন। ইয়ামেনের বাদশা আব্রাহার বিশাল হস্তীবাহিনীর আক্রমণ থেকে আল্লাহ তা'আলা তার ফযল ও করমে কাবাকে হেফাযত করেছেন এবং মক্কাবাসীকে তাদের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। শত্রুবাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং তাদের নাম-নিশানা মুছে দিয়েছেন। এখন এই সূরায় কোরাইশকে (যাদেরকে বলা হতো কাবার মুহাফেজ) আল্লাহ তা'আলা যে নেয়ামত দান করেছেন তার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

সূরার তরজমা

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ - إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ যেহেতু কোরাইশ গোত্রের লোকদের এই অভ্যাস ছিল যে, তারা শীতকালে এক সফর করতো এবং গরমকালে এক সফর করতো। فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ সুতরাং তাদের উচিত তারা যেন বাইতুল্লাহর রবের ইবাদত করে। الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ যিনি তাদেরকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আহার দান করেছেন। وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ এবং ভয়ংকর পরিস্থিতিতে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছেন।

খুন খারাবি ও লুটতরাজ ছিল চরমে

এ সূরা মূলত এদিকে ইশারা করছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে গোটা আরব ভূমি খুন খারাবি ও লুটতরাজের কেন্দ্র ছিল। কারো জানমাল, ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা ছিল না। দিবালোকে প্রকাশ্যে ডাকাতি হতো। কেউ এক শহর থেকে অপর শহরে সফর করতে পারতো না। কোন বণিক দলের সাথে সফর করতে হতো। কেননা সব সময় এই আশংকায় থাকতে হতো যে, কখন যেন ডাকাতের হাতে পড়ে মাল খোয়া যাবে বা তাজাপ্রাণ খোয়াবে। গোত্রীয় লড়াই ও সংঘাত ছিল আরবদের চিরাচরিত রীতি এক গোত্র ছিল অন্য গোত্রের প্রাণের শত্রু। খুনের পিপাসা লেগেছে, রক্তের নেশা ধরেছে তো শত্রু গোত্রের কোন লোক কিংবা কাফেলা পাওয়া গেল তখন তাদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালাত, লাশের পর লাশ ফেলত। তাদের মাল লুটে নিত। মোটকথা সমগ্র আরব উপদ্বীপ ছিল লুটতরাজ ও খুন খারাবির চর্চাকেন্দ্র। সুতরাং কোন ব্যক্তি কোন কাফেলা নিয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে ব্যবসায়িক কাফেলা। যাতে রয়েছে ব্যবসায়িক পণ্য। তো তা রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুবই ক্ষীণ। কেননা পথে যদি কোন শত্রু কাফেলার সামনে পড়ে যায় তাহলে তারা মাল লুটে নিয়ে যাবে। সারা আরবে উড়ছিল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

কোরাইশ গোত্রের স্বাতন্ত্র্য

কিন্তু অজ্ঞতার যুগে কোরাইশ গোত্র ছিল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কেননা তারা ছিল কাবার পড়শি, বাইতুল্লাহর দ্বাররক্ষী, তার কার্যাদি পরিকল্পনাকারী। তাদের এই বিশেষত্বের কারণে আরবের অন্যান্য গোত্র তাদেরকে সম্মান করতো। তাদেরকে সুনজরে দেখতো। কেননা আরবে যত গোত্র ছিল তারা যদিও বর্বরতা ও পাশবিকতায় জড়িয়ে ছিল কিন্তু তাদের অন্তরে বাইতুল্লাহর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা সর্বদা বিরাজমান ছিল। এজন্য যদি কোরাইশদের কোন কাফেলা কোথাও যেত

কেউ তাদের পথ রোধ করত না। কোন গোত্র কিংবা জনপদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতো তখন শত্রু তাদের সঙ্গ দিত। কারণ এরা কোরাইশের লোক। যেহেতু কোরাইশরা আল্লাহর ঘরের মুহাফিজ ছিল। তাই কোন নিকৃষ্ট শত্রুও তাদের কাফেলার উপর আক্রমণ করত না। অথচ আরবের অন্যান্য গোত্রগুলো সফর করতে ভয় পেত। কোথাও সফর করার প্রয়োজন হলে পেরেশান হতো। পক্ষান্তরে কোরাইশের লোক যখন কোন কাফেলা নিয়ে সফর করতো তখন নির্ভয়ে সফর করতো, শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে সফর করতো এবং নিরাপদে ফিরে আসত। কেননা কোরাইশরা মক্কার অধিবাসী।

মক্কা অঞ্চল পানিশূন্য অনাবাদি

আপনারা জেনে থাকবেন, মক্কা মোকাররমায় না আছে কোন ক্ষেত খামার না আছে সবুজের ছায়া। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেছিলেন–

رَبَّنَا إِنِّيْ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ○

(سورة إبراهيم ٣٧)

হে পরওয়ারদেগার! আমি আমার সন্তানকে এমন এক উপত্যকায় রেখে যাচ্ছি যেখানে কোন ফসল জন্মায় না। আপনার সম্মানিত গৃহের নিকট। এটা আল্লাহ তা'আলার কুদরতের এক মহান নিদর্শন যে, ঐ এলাকাকে আল্লাহ তা'আলা একেবারে শুষ্ক রেখেছেন। না আছে কোন উদ্যান, না আছে সবুজের সমাহার না নয়নাভিরাম দৃশ্যের বাহার। যদি সবুজ শ্যামল, দৃষ্টিনন্দন, নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা হতো তাহলে তা দেখার জন্য মানুষ ভ্রমণে বের হতো। কিন্তু পানি শূন্য অনুর্বর উপত্যকা। কংকরময় ভূমি। প্রস্তরখণ্ডের বিরাট পাহাড়বেষ্টিত মক্কাভূমি এবং তার মাঝে অবস্থিত আল্লাহর ঘর। এ সত্ত্বেও আপনি পৃথিবীর সকল সুন্দরতম অঞ্চলগুলো পরিদর্শন করুন এবং আল্লাহর ঘর অবস্থিত অঞ্চলটাও পরিদর্শন করুন। প্রত্যেক মুসলমান এবং প্রত্যেক ঈমানদারের অন্তরে আল্লাহর ঘরের মুহাব্বত ও আজমত এতো বেশী যে তার সামনে পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যায়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দো'আ করেছিলেন যে, আয় আল্লাহ! আপনার ঘরকে এমন বানিয়ে দিন, যা মানুষের অন্তরকে তার দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসবে। দেখুন কীভাবে তা মানুষকে আকর্ষণ করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আল্লাহর আর 'বাইতুল্লাহর' দিকে কীভাবে মানুষ দলে দলে ছুটে আসছে।

ব্যবসাই ছিল উপার্জনের মাধ্যম

মোটকথা ঐ অঞ্চলটা ছিল পানিশূন্য অনুর্বর। কোন ক্ষেত খামার নেই। কোন চাষাবাদ নেই। তাহলে সেখানকার লোকদের উপার্জনের মাধ্যম কী হবে? কোন ফ্যাক্টরি নেই। কোন ফার্ম নেই। কীভাবে তাদের জীবিকা অর্জিত হবে? তো গোটা মক্কাবাসীর আয়ের একমাত্র উৎস ছিল ব্যবসা। ব্যবসাও কোত্থেকে করবে। এখানে কোন জিনিস উৎপন্ন হতো তাহলে তা বাইরে নিয়ে বিক্রি করতো। এজন্য তাদের ব্যবসা ছিল আমদানি ও রপ্তানি নির্ভর। অর্থাৎ এখানকার পণ্যসামগ্রী বাহিরে নিয়ে বিক্রি করতো, আর বাহিরের পণ্য এখানে এনে বিক্রি করতো। এই লক্ষ্যে কাফেলা ইয়ামান এবং শামে যেত। তৎকালে ইয়ামান ও শাম ছিল সবুজ পরিবেষ্টিত অঞ্চল। সেখানে অনেক ফসল উৎপন্ন হতো। এবং বিভিন্ন পণ্য দ্রব্য উৎপাদিত হত। তাই মানুষ এমন করতো যখন গ্রীষ্মকাল আসতো তখন শামে সফর করতো। কেননা গ্রীষ্মকালে শামের আবহওয়া ছিল ঠাণ্ডা। আল্লাহ তা'আলা শামের অঞ্চলগুলোকে বানিয়েছেন সবুজ শ্যামল। তার পরিবেশকে করেছেন স্নিগ্ধ। শীতকালে শামদেশে প্রচণ্ড শীত পড়তো। এজন্য শীতকালে মানুষ ইয়ামেনে যেত। অর্থাৎ তাদের নিয়ম ছিল গ্রীষ্মকালে শামে যেত এবং সেখান থেকে ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে আসত অতঃপর সমগ্র আরবে রপ্তানি করত এবং বিক্রি করত। আর শীতকালে ইয়ামেনে যেত এবং সেখান থেকে মাল এনে বিক্রি করত। তাদের কাফেলাও হতো বিরাট বিরাট। যেমন ছিল আবু সুফিয়ানের কাফেলা। কোরআনে যার আলোচনা এসেছে। যার কারণে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ঐ কাফেলায় এক হাজার উট ছিল। প্রতিটি উটে পণ্য বোঝাই করে শাম থেকে আসছিল। একেকটি কাফেলা হাজারো উটের বহর নিয়ে চলতো। আর তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান ও একমাত্র মাধ্যম ছিল এই ব্যবসা ও তিজারত। তারা শাম থেকে মক্কায় মাল আমদানি করত এরপর আরবের অন্যান্য অঞ্চলে রপ্তানি করতো। যখন তারা অন্যান্য এলাকায় ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে যেত তখন কেউ তাদের বাধা দিত না। বড় নিশ্চিন্তে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যেত।

বাইতুল্লাহর কারণে আরেকটি ফায়দা

অন্যদিকে বাইতুল্লাহর কারণে তাদের আরেকটি লাভ হতো, সেটা হচ্ছে হজ্বের মৌসুমে গোটা আরবের লোকেরা মক্কা মোকাররমায় সমবেত হতো। উমরা ও তাওয়াফ করার জন্য সারাবছর মানুষের ভিড় লেগে থাকতো। যখন বাহির থেকে লোকজন আসত তখন তারা তাদেরকে সাথে নিয়ে ইয়ামান ও শামের যেসব পণ্য নিয়ে আসত তারা তাদের কাছ থেকে সেসব পণ্য কিনে

রাখত। এভাবে বাইতুল্লাহর কারণে তাদের শহরটি সমগ্র আরবের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। লোকজন তাদের কাছ থেকে ব্যবসায়িক পণ্য কিনে নিয়ে যেত। যার ফলে কোরাইশরা বড় খোশহাল ও সচ্ছল ছিল।

শুকরিয়া স্বরূপ বাইতুল্লাহর রবের ইবাদত করো

কোরআনুল কারীম বলছে, একটু চিন্তা করো এই স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ অবস্থা কোথেকে এসেছে? কার কারণে অর্জিত হয়েছে? তোমাদের মাঝে এমন কী যোগ্যতা ছিল। যেখানে গোটা আরবে বর্বরতা ও নিরাপত্তাহীনতার আগুন জ্বলছিল সেখানে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেছেন।

যেহেতু কোরাইশদের অভ্যাস ছিল শীত গ্রীষ্মে সফর করা তাই তাদের উচিত এই গৃহের রবের ইবাদত করা। উদ্দেশ্য এটাই যে, যে নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা তোমাদের কপালে জুটছে, এবং তোমরা যে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপন করছ এটা তো এই ঘরের বরকতেই। কেননা তোমরা বাইতুল্লাহর মোহাফিজ। এই কারণে আল্লাহ তোমাদেরকে এত নেয়ামত দান করেছেন। সুতরাং এই নেয়ামতের শুকরিয়া তো এটা হওয়া চাই যে, তোমার এই গৃহের মালিক এক খোদার ইবাদত করবে। অন্য কারো দিকে ঝুঁকবে না। কিন্তু তোমরা কী করছো, যেই সত্তা তোমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেছেন, তার ঘর কা'বাকে দেব-দেবী দিয়ে পূর্ণ করেছ। সেগুলোর পূজা করছ। আল্লাহর সাথে শরীক করছ। অসংখ্য অগণিত দেব দেবতাকে নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করছ এবং সেগুলোর পূর্ণ আনুগত্যে নিজেদেরকে নিরত রেখেছ।

আরববাসী আমাদের শত্রু হয়ে যাবে

এক আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোরাইশের লোকদেরকে যখন একত্ববাদের দাওয়াত দিতেন এবং বলতেন ভাই প্রতিমা পূজা ছাড়। আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলার ইবাদত করো। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না–

لا اله الا الله محمد رسول الله ـ

এর উপর ঈমান আনো। তখন কোন কোন সময় তারা উত্তরে বলতো, আমরা কী করবো। যদি আমরা তোমার কথা মেনেই নিই তাহলে সমগ্র আরববাসী আমাদের শত্রু হয়ে যাবে। মানুষ আমাদেরকে যে সম্মান করে, যে মর্যাদা দান করে, আরবে আমাদের যে সুনাম সুখ্যাতি রয়েছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। কারণ সমগ্র আরববাসী প্রতিমাপূজারী। সুতরাং আমরা যদি প্রতিমা পূজা ছেড়ে দেই এবং একত্ববাদের ঘোষক হয়ে যাই তো গোটা আরব আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে এবং আমাদের শত্রুতে পরিণত হবে।

তাওহিদের পর কি তিনি তোমাদেরকে একা ছেড়ে দিবেন

কোরআনে কারীমের এক আয়াতে জবাব দেয়া হয়েছে–

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ○

(سورة العنكبوت ٦٧)

তোমরা কি দেখনি যে, আমি তাদেরকে নিরাপত্তা দান করছি। আর তা এই হারামের কারণেই। আর হারামকে বানিয়েছি নিরাপত্তাদানকারী। হারামের আশে পাশে যারা ছিল তারা অরক্ষিত, অন্যায়ভাবে মারা পড়ত, লুণ্ঠিত হতো তাদের সম্পদ। পক্ষান্তরে তোমরা শিরক করছ তবুও আল্লাহ তোমাদেরকে এই সকল নেয়ামত দান করেছেন। যখন তোমরা শিরক ছেড়ে দিবে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে তখন কি তিনি তোমাদেরকে অসহায়ভাবে ছেড়ে দিবেন? তোমাদের কি অনিরাপদ রাখবেন? সারকথা হলো, আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা উক্ত সূরায় কোরাইশদেরকে বিশেষ করে এই দিকে ফিরিয়েছেন যে, দুনিয়াতে যত নেয়ামত লাভ করেছ তা একমাত্র আল্লাহর ঘরের কারণেই। কাবার স্মরণে তো তোমাদের উচিত এই গৃহের রবের ইবাদত করা, প্রতিমা বানিয়ে পূজা শুরু না করা। শিরকের পাপ শুরু না করা।

দ্বীনের কারণেও নেয়ামত লাভকারীদের শিক্ষা

যেহেতু কোরআনে কারীম শুধু আরববাসীর জন্য অবতীর্ণ হয়নি, বরং তা কেয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা সকল মানুষের হেদায়াতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এজন্য এতে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যে সকল মানুষের অবশ্য কর্তব্য হলো আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলার ইবাদত করা। তাকে ছাড়া অন্য কাউকে মা'বুদ না মানা। তাঁর বিধানাবলী সর্বান্তকরণে মেনে নেয়া। কিন্তু বিশেষ করে যারা আল্লাহর দ্বীনের কারণে কোন নেয়ামত লাভ করেছে। তাদের এ ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা উচিত, কীভাবে আল্লাহর দ্বীনের পূর্ণ আনুগত্য করা যায়। দুনিয়াতে যখন কোন নেয়ামত লাভ হয়েছে তা দ্বীনের কারণেই লাভ হয়েছে। তাই নেয়ামত লাভকারীর কর্তব্য হলো, সর্বান্তকরণে আল্লাহ তাআলার দ্বীন মেনে নেয়া।

আলেমের গুনাহ্-এ লিপ্ত হওয়া

উদাহরণস্বরূপ একজন আলেম। যদি কেউ তাকে সম্মান করে তো কেন করে? অন্যদের সামনে তাকে শ্রদ্ধা করে, কেন করে? এ কারণে সম্মান করে যে, মানুষ মনে করে তার কাছে দ্বীনি ইলম আছে। দ্বীনের কারণে তাকে সম্মান

করে। আলেম যদি হোঁচট খায় এবং নিজের মাঝে বাবুয়ানা চিন্তা চলে আসে যে, জগতবাসী আমাকে সম্মান করছে। সে অহংকারে পতিত হয় এবং নিজে দ্বীনের বিধান লঙ্ঘন করে তাহলে এটা হবে সাধারণ মানুষের পদচ্যুত হওয়ার চেয়ে গুরুতর। মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। এমন ব্যক্তি যে ইলমের সাথে সম্পর্ক রাখে– আল্লাহ হেফাযত করুন– সে পাপাচারে লিপ্ত হবে কিংবা অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়বে– অন্য মানুষ থেকে এত বেশি আশা করা যায় না কিন্তু দ্বীনের সাথে যারা সম্পর্ক রাখে তাদের এমনটা করা বড়ই মর্মান্তিক। কাউকে মানুষ ভাল মনে করে এবং তার ব্যাপারে নেক ধারণা রাখে। সে যদি কোন গুনাহের কাজ করে, না জায়েয কাজ করে তাহলে এটা সাধারণ মানুষের নাজায়েয কাজ থেকে আরো বেশী ভয়ংকর এবং এর চেয়ে সে পাকড়াওয়ের অধিক উপযুক্ত।

আলেমের মাধ্যমে জাহান্নাম প্রজ্বলিত করা হবে

হাদীস শরীফে আলেমের বড় ফযিলতের কথা এসেছে। সাথে সাথে এক হাদীসে এমনও এসেছে– আল্লাহ হেফাজত করুন। কল্পনা করলেও লোম দাঁড়িয়ে যায়। সর্বপ্রথম যখন জাহান্নাম প্রজ্বলিত করা হবে তখন তা একজন আলেমের মাধ্যমে প্রজ্বলিত করা হবে।-নাউযুবিল্লাহ– আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আশ্রয় দান করুন। আলেম তো ছিল। তার কাছে ইলমও ছিল। কিন্তু সে ইলম অনুযায়ী আমল করেনি। নাজায়েয ও গুনাহের কাজে লিপ্ত ছিল। এ কারণে সর্বপ্রথম তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। তো দ্বীনের উসিলায় যে নিয়ামত হাসিল হয়েছে, যদি তার নাকদরি ও অবমূল্যায়ন করা হয় তাহলে আল্লাহর আযাব বড়ই কঠিন। আল্লাহ হেফাজত করুন।

ইসলামের নামের উপর পাকিস্তান অস্তিত্ব লাভ করেছে

দেখুন আমাদের এই পাকিস্তান রাষ্ট্র, কিসের উপর ভিত্তি করে অর্জিত হয়েছে। দুনিয়াতে এখনো এমন লোক আছে যারা পাকিস্তানের সূচনা দেখেছে। সে সময়কার প্রেক্ষাপটও তাদের মনে আছে। রাজপথ মুখরিত স্লোগানগুলো আজও তাদের কানে গুঞ্জরিত হচ্ছে। স্লোগানের ভাষা ছিল।

پاکستان کا طلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔

অলিতে গলিতে মানুষের মুখে মুখে ফিরছিল এই সু-মধুর ধ্বনি। আল্লাহ তা'আলা পাকিস্তানকে এই নেয়ামত দান করেছেন। কেননা পাকিস্তানের জন্ম লগ্নে হিন্দুরা আমাদের শত্রু ছিল। শিখেরাও ছিল আমাদের শত্রু। ইংরেজরাও ছিল আমাদের শত্রু। একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে কেউই ছিলনা। কিন্তু

এই তিন শত্রুর বহ্নিনলে আল্লাহ তা'আলা গায়েব থেকে স্বীয় ফযল ও করমে আমাদেরকে এই নেয়ামত দান করেছেন। এজন্য বলা হয় .... পাকিস্তান আল্লাহ প্রদত্ত রাষ্ট্র। এ নেয়ামত আমাদের অর্জিত হয়েছে। কিসের বদৌলতে অর্জিত হয়েছে। দ্বীনের নামের উপর অর্জিত হয়েছে। لا اله الا الله এর নামে অর্জিত হয়েছে। মুসলমান হওয়ার কারণে লাভ হয়েছে। মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তা'আলা পৃথক ভূখণ্ড দান করেছেন। এমন নেয়ামত দান করেছেন, যে যদি প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের দিকে লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখবেন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ দান করেছেন অন্যান্য রাষ্ট্রে তা পাওয়া কঠিন। যে পরিবেশ দান করেছেন তা অন্যান্য দেশে বিরল কী না আছে, আমাদের। আছে পাহাড়ের উচ্চতা, আছে সবুজের শ্যামলতা, আরো আছে মরুর শুষ্কতা, সমুদ্রের তরঙ্গময়তা। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে পূর্ণ একটি রাষ্ট্র আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন এবং দ্বীনের নামের উপর দান করেছেন। দ্বীনের নামে আমরা যে নেয়ামত লাভ করেছি, এখন যদি আমরা তার অমর্যাদা করি, দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণ করি। ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করি তাহলে বলুন আল্লাহর আযাব আসবে কি আসবে না?

পাকিস্তান আল্লাহর মহান নেয়ামত

এটাও আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত যে, আজ ষাট বছরের চেয়ে অধিক সময় অতিবাহিত হয়েছে। না জানি এর উপর দিয়ে কী পরিমাণ ঝড় বেয়ে গেছে? মনে হতো দেশটা বিলীন হয়ে গেল। এর উপর না জানি কত কঠিন কঠিন পরিস্থিতি এসেছে। কত নাজুক মুহূর্ত অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করমে আমাদের দেশটি টিকে আছে। না জানি কত বুযুর্গের দো'আ ছিল, কত মুসলমানের কোরবানি ছিল, যার ফলশ্রুতিতে এ সকল পরিস্থিতি থেকে আল্লাহ তা'আলা উৎরে নিয়েছেন। দুরবস্থা আসে, কেটে যায়। সমস্যা আসে, দূর হয়ে যায়। ৬০ বছরের পূর্ণ ইতিহাস দেখুন, দেখবেন আমাদের ইতিহাসে বিরামহীন দুঃসময় চলছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এখনো বহাল রেখেছেন। কেউ একজন বলেছেন কেউ যদি আল্লাহকে অস্বীকার করে সে যেন পাকিস্তানে এসে খোদাকে দেখে নেয়। যদি মানুষ পাকিস্তানকে পরিচালনা করতো তাহলে কবেই এর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহই এই দেশকে চালাচ্ছেন। এ কারণে আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত এখনো বিদ্যমান আছে। আল্লাহ অনেক বড় নেয়ামত আমাদেরকে দিয়ে রেখেছেন।

বড় আশংকাজনক অবস্থা

কিন্তু যে গতিতে আমরা বদদ্বীনির দিকে এগুচ্ছি। যেভাবে আমরা আল্লাহ এবং তার রাসূলের নাফরমানিকে আমাদের অভ্যাস বানিয়ে নিচ্ছি, তা বড়ই আশংকাজনক। এখন সোয়াতে উত্তর প্রদেশের উপজাতীয়দের মধ্যে দাউ দাউ করে অগ্নিশিখা জ্বলছে। ঐ অগ্নিতে মুসলমান মুসলমানের গলা কাটছে, মুসলমান মুসলমানের উপর হামলা চালাচ্ছে। একে অপরের লাশ ফেলছে। যে শক্তি শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যয় করা উচিত ছিল সে শক্তি একে অপরকে মারার পেছনে ব্যয় হচ্ছে। এটা এ কারণেই হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের নামে আমাদেরকে রাষ্ট্র দান করেছেন আর আমরা দ্বীন থেকে দূরত্ব অবলম্বন করছি। আমাদের উচিত ছিল আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত না করা। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্য না মানা। কিন্তু আমাদের খবর নেই আমরা কত উপাস্য বানিয়ে রেখেছি। আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া বড় বড় ক্ষমতাধর রাষ্ট্র। কাজকর্মে আমরা তাদেরকে মা'বুদ বানিয়ে রেখেছি। তাদেরকে খুশী রাখার জন্য সকল চেষ্টা চলছে। তাদের খোশামদির জন্য সব কাজ হচ্ছে। নিজের ধর্ম ও রাষ্ট্রের সফলতা ও কামিয়াবিকে জলাঞ্জলি দিচ্ছি। তাদের সামনে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। ভিক্ষা দেয়ার পূর্বে হাজারো শর্ত আরোপ করে। এবং নিজেদের দূরভিসন্ধি কার্যকর করে। যার পরিণতি আমরা দেখতে পাচ্ছি...।

মৌলিক শিক্ষা

এই সূরায় আমাদের প্রত্যেকের জন্য মৌলিক শিক্ষা হলো, আল্লাহ তাবারকার নেয়ামতের মর্যাদা বুঝে আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু করা। আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহের জন্য ক্ষমা চাওয়া। আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবা করা।

গোটা সমাজ বদদ্বীনির শিকার

এখন পুরো সমাজ বদদ্বীনির শিকার। দুর্নীতি, হারামখোরী, একে অন্যের প্রতি যুলুম করা, ভোগ বিলাসে গা ভাসিয়ে দেওয়া। একে অন্যের প্রতি অপবাদ দেয়া। নগ্নতা ও অশ্লীলতা, ঘরে ঘরে টিভি ও ডিশের মাধ্যমে নগ্নতা ও বেহায়াপনার একেকটি কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। যে দৃশ্য দেখার কখনো কোন সুযোগ হতো না তা আজ ঘরে বসে প্রতি মুহূর্তে প্রতি সেকেন্ডে দেখা যাচ্ছে। এই ভয়াবহ অবস্থা সত্ত্বেও আল্লাহ রহম করছেন। অন্যথায় না জানি কখন কোন আযাব নাযিল হয়। তবে আমাদের এ সকল কীর্তির কারণে আমরা চতুর্মুখী বিপদে। আজ প্রতিটি মুসলমান মনক্ষুণ্ন এবং ক্রন্দনরত। এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জায়গায় বসে নিজের ইসলাহের

ফিকির করো। ঘরের পরিবেশকে ঠিক করো। আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআলার বিধি বিধান মেনে চলো। আল্লাহ তা'আলার সামনে কাকুতি মিনতি করে কান্না কাটি করো। তাওবা ইস্তেগফার করো। নিজের এবং সকল মুসলমানের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করো। হারামখোরি বর্জন করো। সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু করো। এছাড়া সমস্যার বিকল্প কোন সমাধান নেই।

এক যামানা ছিল, যখন এমন অবস্থা সৃষ্টি হতো, তখন মানুষ আল্লাহর দিকে মু'তাওয়াজ্জিহ, হতো। ঘরে ঘরে কোরআন খতম হতো। দো'আর মাহফিল হতো, কান্নার রোল পড়ে যেত। কিন্তু আজ সে পরিবেশ নেই। এখন পর্যালোচনা হচ্ছে। গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা হচ্ছে। এর পিছনে যে সময় ব্যয় হচ্ছে। গল্পগুজব করে যে সময় নষ্ট হচ্ছে, সে সময়টুকু দো'আ, মুনাজাত, তাওবা ইস্তেগফার, করে অতিবাহিত করুন। সেই দিন বেশী দূরে নয়, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফযল ও করমে আমাদেরকে কালের করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করবেন।

শাসক তোমাদের আমলের আয়নাস্বরূপ

এক হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের শাসক তোমদের আমলের আয়নাস্বরূপ। যদি তোমরা ঠিক হয়ে যাও তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর উত্তম শাসক নিযুক্ত করবেন। এবং আল্লাহ তা'আলার রহমত ও বরকত নাযিল হবে। ভাই! প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয এই বাণী একে অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়া। এখন সময় এসেছে তাওবা করার। আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হওয়ার। সাধ্য অনুযায়ী একে অন্যের কাছে পৌঁছে দিন এবং খুব বেশি চেষ্টা করুন। আল্লাহ তা'আলা তার ফযল ও করমে আমাদেরকে তাওফিক দান করুন। এবং কালের দূর্বিপাক থেকে আমাদেরকে মুক্তি দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

গীবত করা হারাম

সূরা হুমাযার তাফসীর

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَآ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ○ اَلَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ ○ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ ○ كَلاَّ لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ○ وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ ○ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ○ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ○ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ○ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِىُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

সূরার শানে নুযূল

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! এটা সূরা হুমাযা যা আমি এখন আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি। এটা মক্কী সূরার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ঐ সূরা সমূহের অন্তর্ভুক্ত যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। এই সূরার শানে নুযূল সম্পর্কে মুফাস্‌সীরীনে কেরাম লিখেছেন, যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু (আঃ) মক্কা মোকাররমায় ইসলাম প্রচার শুরু করেন, এবং মানুষের মনে ইসলামের সত্যতা দৃঢ় হতে থাকে এবং অনেক মানুষ মুসলমান হতে থাকে। তখন কোরাইশের যারা বড় বড় সর্দার ছিল তাদের এই আশংকা হলো যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মানুষের ঝুঁকে পড়ার কারণে তাদের নেতৃত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে। এজন্য তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে সব ধরনের বিরোধিতা, শত্রুতা, হঠকারিতা ও প্রোপাগাণ্ডা চালাতে লাগলো।

কাফের এবং মুশরিকদের হাসি-ঠাট্টা

এদের মধ্য থেকে কতিপয় লোকের নাম রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়। যেমন আখনাস বিন শুরাইক এবং ওয়ালীদ বিন মুগিরা প্রমুখ। এরা তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিন্দা সমালোচনা করত। সাহাবায়ে কেরাম যারা হুজুরের প্রতি ঈমান এনেছিলেন তাদের নিন্দা করতো। আর যদি কখনো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা সাহাবায়ে কেরাম সামনে পড়ে যেতেন তখন বিভিন্নভাবে তাদেরকে কষ্ট দিত এবং দম্ভভরে বলত আমাদের কাছে মাল দৌলত আছে। আমরা নেতৃত্বদান করি। আমরা বিত্তশালী। আমরা যা ইচ্ছা করতে পারি। আমাদের কোন কিছু খোয়া যাবে না। তুমি তো সম্পদের নেশায় এমনটা করছো। তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অগোচরে কুৎসা রটাত এবং সামনেও বিভিন্ন অপবাদ দিত। এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা ব্যাপক শব্দে তাদের কর্মকাণ্ডের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

সূরার তরজমা

প্রথমে আমি এই সূরার তরজমা করছি। এরপর এর কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা প্রদান করবো। আল্লাহ তা'আলা তার সন্তুষ্টি মোতাবেক বয়ান করার তাওফিক দান করুন আমীন। وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ধ্বংস ঐ সকল ব্যক্তির জন্য যারা মানুষের পিছনে মানুষের দোষ বলে এবং মুখে আঘাত করায় অভ্যস্ত। الَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ যে ব্যক্তি সম্পদ জমা করে এবং সব সময় সেগুলো গণনা করে। -- সে মনে করে তার সম্পদ সর্বদা বহাল থাকবে। এ ধরনের মানুষের বরবাদি আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, كَلاَّ কক্ষনো না لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ অবশ্যই অবশ্যই তাদেরকে চূর্ণ বিচূর্ণকারী আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। অর্থাৎ হাড্ডি ছিন্ন ভিন্ন করে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ আপনি কি জানেন চূর্ণবিচূর্ণকারী কী জিনিস। نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ তা আল্লাহ তা'আলার প্রজ্বলিত আগুন। الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ এটা সেই আগুন যা মানুষের হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছবে। إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ এবং এই আগুনকে তাদের উপর বন্ধ করে দেয়া হবে। অর্থাৎ তারা আগুন থেকে বের হওয়ার কোন পথ পাবে না। فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ আগুন লম্বা লম্বা খুঁটির ন্যায় মানুষকে ঘিরে রাখবে। যেখান থেকে তারা নিষ্কৃতি পাবে না। এটা হলো সূরার তরজমা।

মর্মগ্রাসী আগুন

এই সূরার মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শা'নুহু ঐ সকল কাফেরদের দিকে বিশেষ করে ইশারা করেছেন যারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিন্দা করত। গীবত করত এবং তাকে কষ্ট দিত। এবং এটা বলে দিয়েছেন যে, এই লোকেরা দুনিয়াতে যত খুশি তামাশা করুক। তাদের ধন-দৌলত সর্বদা থাকবে না। বরং এমন একটা সময় আসবে যখন এরা সব কিছু ছেড়ে দুনিয়া ত্যাগ করবে। তখন তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এই আগুনের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, এমন আগুন হবে যা তাদের হৃদপিণ্ডে পৌছে যাবে। যখন দুনিয়াতেই এই পরিণতি হয় যে, যখন কারো গায়ে আগুন লাগে, তখন প্রথমে চামড়া পুড়ে, তারপর গোস্ত পুড়ে, হাড় পুড়ে। সর্বশেষ হৃদপিণ্ডে গিয়ে পৌছে। কিন্তু হৃদপিণ্ডে পৌছার আগেই মানুষ মৃত্যুর দোর গোড়ায় পৌছে যায়। দুনিয়ার আগুনের এই হালত। আর আখেরাতের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, এ আগুনে দহনের ফলে মানুষের মৃত্যু হবে না। বরং এ আগুন হৃদপিণ্ডকে এমনভাবে দগ্ধ করবে যে, মানুষ জীবিত থাকবে এবং দহনযন্ত্রণা হৃদপিণ্ডে গিয়ে পৌছবে, যা মানুষ ভাল করে অনুধাবন করবে।

আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন

হযরত শাহ আব্দুল আযীয (রহঃ) ছিলেন বড় মাপের বুযুর্গ এবং শাহ ওলী উল্লাহ (রহ.)-এর সাহেবজাদা। তিনি তার তাফসীরে একথা লিখেছেন যে, দেখো, আল্লাহ তা'আলা যখন বলেছেন, 'আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন, আগুন সম্পর্কে তো সবাই জানে যে আগুন কেমন হয়। কিন্তু এখানে যখন আল্লাহ তা'আলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন, وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ আপনি কি জানেন, অর্থাৎ আপনার এই আগুনের ক্ষমতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেই। তা আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন যা অন্তকরণ পর্যন্ত পৌছে যাবে।

তাপ তিন প্রকার

হযরত শাহ আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আগুনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে এই বাক্য এ জন্য বলেছেন যে, দুনিয়াতে আমরা যে গরম অনুভব করি তা তিন ধরণের। এক গরম আগুনের তাপ, দ্বিতীয় গরম সূর্যের রশ্মির, সূর্য যখন কাছে চলে আসে তখন মানুষ গরম অনুভব করে তীব্রভাবে।

যেমন আজকাল প্রচণ্ড গরম পড়েছে। যদিও এখন আগুন জ্বলছে না। বরং সূর্যের তাপে আবহাওয়া উত্তপ্ত।

তৃতীয় প্রকার গরম হলো, মানুষের দৈহিক উষ্ণতা। যেমন, জ্বরের গরম, কারো জ্বর এসেছে তখন তার গরম অনুভূত হয়। কিন্তু ঐ গরম না আগুনের কারণে সৃষ্টি হচ্ছে, না সূর্য কাছে চলে আসার কারণে সৃষ্টি হচ্ছে। বরং মানুষের দেহে এক প্রকার দহন ও উষ্ণতা সৃষ্টি হয় যা তাকে অস্থির করে তোলে। যাই হোক, এই তিন প্রকারের গরম মানুষ তার জীবনে অনুভব করে।

চতুর্থ প্রকার তাপ

আল্লাহ তাআলা বলেন, জাহান্নামের যে তাপ, তা এই তিনপ্রকারের কোনটারই অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটা চতুর্থ প্রকারের তাপ। যা আল্লাহ প্রজ্বলিত করেছেন। মানুষের হৃদপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এর মাধ্যমে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, জাহান্নামের গরম প্রকৃতপক্ষে এই তিন প্রকার থেকে আলাদা। কিন্তু এর মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে জ্বরের কারণে সৃষ্ট তাপের সাথে। বাহ্যত যদিও আগুন দেখা যায় না। কিন্তু জ্বরের কারণে ঐ আগুন দেহের ভেতর অনুভূত হয়। এই প্রকারের তাপের সাথে কিছু সাদৃশ্য হবে।

এই তাপ থেকে বের হওয়ার কোন রাস্তা থাকবে না

কিন্তু জ্বরের তাপে এমনটা হয় যে, যখন জ্বর প্রচণ্ড রূপ নেয়, তখন ভিতরে ভিতরে গরম প্রজ্বলিত হতে থাকে। কিছুক্ষণ পর ঐ গরম লোমকূপের মধ্য দিয়ে শরীর থেকে বের হতে শুরু করে। যার কারণে ঘাম বের হয়। এরপর গরমের অনুভূতি কমে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, জাহান্নামের গরম অন্তর পর্যন্ত পৌঁছবে। কিন্তু ঐ গরম থেকে বের হওয়ার কোন পথ পাওয়া যাবে না। বরং إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ঐ গরম তাদের ভিতরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, জ্বরের গরম যেমন ভিতরে আটকে থাকে না। বরং লোমকূপ দিয়ে বের হয়ে যায়। এবং ঘাম বের হয়। জ্বর নেমে যায়। কিন্তু সেখানে এমনটা হবে না বরং ঐ গরমি ভিতরে আটকে থাকবে। فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ আর ঐ উত্তাপ অগ্নিশিখার অবয়বে চতুর্দিক থেকে স্তম্ভের ন্যায় মানুষকে ঘিরে রাখবে এবং সেখান থেকে নিস্কৃতি লাভের কোন উপায় থাকবে না। মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তা'আলা সকলকে ঐ আগুন থেকে উদ্ধার করুন।

কাফেরদের গুণ বর্ণনা

যেমনটা আমি সূচনাতেই বলেছিলাম যে, এই সূরা মূলত ঐ কাফেরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যারা সর্বদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিন্দা করত। তাঁকে কষ্ট দিত। তাঁর সাথে ধন-দৌলতের বড়াই করত। কিন্তু ঐ কাফেরদের না নাম নেয়া হয়েছে। না তাদের কোন আলোচনা করা হয়েছে। বরং তাদের গুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের এই এই গুণ আছে। নিন্দা করা, কষ্ট দেয়া, ধন সম্পদের গর্ব করা এবং এটা মনে করা যে, তাদের সম্পদ তাদেরকে চিরস্থায়ী জীবন দান করবে।

তিনটি দোষ থেকে বেঁচে থাকুন

এটা এজন্যই করা হয়েছে যাতে মুসলমানরাও সতর্ক হয়ে যায় যে এগুলো মূলত কাফেরদের বৈশিষ্ট্য। মুসলমানদের এ সকল বৈশিষ্ট্য থেকে একেবারে পূত পবিত্র থাকা উচিত। এজন্য এ ধরনের শাস্তি বা আযাব ঐ ব্যক্তিরও হতে পারে যে মুসলমান। কিন্তু মন্দ কাজে লিপ্ত। বিশেষ করে তিনটি মন্দগুণ উল্লেখ করা হয়েছে যা থেকে এই সূরায় মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যাতে করে তারা তাদের জীবনকে এ মন্দগুণগুলো থেকে পবিত্র রাখে

নিন্দার ব্যাপারে কঠোরতা

প্রথম বিষয় হচ্ছে– هُمَزَةٍ এর অর্থ, ঐ ব্যক্তি যে পরচর্চায় অভ্যস্ত অর্থাৎ কারো অনুপস্থিতিতে তাকে মন্দ বলে। একে গীবত বলে। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, ঐ ব্যক্তির জন্য বড় খারাবি আছে। এতে মুসলমানদেরকেও সতর্ক করা হয়েছে, সে যেন নিজেকে গীবত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। গীবত এমন গুনাহ, কোরআনে কারীমে গীবত এমন সব শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে যা অন্য কোন গুনাহের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়নি। কোরআনে কারীমে সূরা হুজুরাতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ○ (سورة الحجرات ١٢)

অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যেন অন্যের গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে সে তার মৃত ভায়ের গোস্ত খাবে। একে তো মানুষের গোস্ত খাওয়া, আল্লাহ হেফাজত করুন, যে মানুষের গোস্ত খায় তাকে বলে মানুষ খেকো। মানুষ খাওয়া তো সৃষ্টি জীবের সবচেয়ে নিকৃষ্ট দোষ। আর কোন

মানুষের লাশ। আপন মৃত ভায়ের লাশ! কে আছে? যে তার মৃত ভাইয়ের লাশকে নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেড়ে খেতে পছন্দ করবে। তোমরা কেউই তো মৃত ভাইয়ের গোস্ত খেতে পছন্দ কর না। তো গীবত এমন বিষয় যেন নিজের মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া। মৃত ভাইয়ের দৃষ্টান্ত এ কারণে যে, মৃত ভাই সামনে উপস্থিত নেই। আর পিছনে পিছনে তার দোষ চর্চা করা বড় শক্ত গুনাহ।

গীবত যিনা থেকেও নিকৃষ্ট

এক হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

الغيبة اشد من الزنا او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ

"গীবত যিনা থেকেও নিকৃষ্ট এবং কঠিন গুনাহ"। একে যিনা থেকে বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আফসোস, এই গীবত কতো বড় গুনাহ। কিন্তু আমাদের সমাজে এটাকে মামুলি মনে করে সবাই এটাকে নিজেদের ব্যস্ততা বানিয়ে নিয়েছে। সম্ভবত এমন কোন মজলিস নেই যেখানে গীবত করা হয় না। বড়ই দুঃখজনক বিষয়। আর এই সূরায় বলা হয়েছে যে, গীবতকারীর জন্য বড় খারাবি রয়েছে এবং তাকে ভয়াবহ আযাবের হুমকি দেয়া হয়েছে।

গীবতের সংজ্ঞা

এক সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! গীবত কী! হুজুর ইরশাদ করলেন :

ذكرك اخاك بمايكره ـ

অর্থাৎ, গীবত বলা হয়, কোন ভাইকে এমনভাবে স্মরণ করা, যদি সে জানতে পারে তাহলে সে অপছন্দ করবে। ভাই দ্বারা উদ্দেশ্য কোন মুসলমান ভাই। তার অনুপস্থিতিতে তার সমালোচনা করছেন। এই চিন্তা করেই করছেন যে, যদি সে জানতে মনে পারে তাহলে কষ্ট পাবে। তার খারাপ লাগবে যে, আমার মন্দ নিয়ে আলোচনা করেছে। এটাই গীবতের সংজ্ঞা।

গীবত এবং অপবাদ

ঐ সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরেকটি প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি বলেছেন, গীবত বলা হয় কোনো ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার এমন বিষয় আলোচনা করা যা তার নিকট অপছন্দনীয়। সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন- ان كان فى اخى ماقول ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার ভাইয়ের যে দোষ বর্ণনা করছি, যদি বাস্তবেই তার মাঝে তা বিদ্যমান থাকে তাহলেও কি আমার

এই মন্দ বলাকে গীবত বলা হবে? এবং আমার গুনাহ হবে? হুজুর উত্তরে বললেন, إن كان فى أخيك ما تقول فقد اغتبته وإلا فقد بهته রাসূল (স.) বলেন, বাস্তবেই যদি তার মাঝে ঐ দোষ থেকে থাকে, এবং যা বলেছ ভুল বলনি বরং সঠিকটাই বলেছ, তখন এটা হবে গীবত এবং গুনাহও হবে। আর ঐ দোষ যদি তার মাঝে না থাকে। খামাখাই তুমি মিথ্যা ও বানোয়াট কথাবার্তা তার দিকে সম্পৃক্ত করছো তাহলে এটা তো গীবত হবেই এবং অপবাদও হবে। যার জন্য দ্বিগুণ গুনাহ হবে। অর্থাৎ আপনি কারো এমন দোষ বর্ণনা করছেন বাস্তবে তার মাঝে ঐ দোষ নেই। মনে করেন, আপনি কারো ব্যাপারে বললেন ঐ ব্যাটা ঘুষ খায়। বাস্তবে সে ঘুষ খায় না। তাহলে এতে দু'টি গুনাহ! এক গীবত করার গুনাহ, দুই অপবাদ গুনাহ। দ্বিগুণ গুনাহ। যদি ঐ দোষ তার মাঝে বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ বাস্তবেই সে ঘুষ খায় এই অবস্থায় অপবাদ হবে না কিন্তু গীবত ঠিকই হবে।

এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়

হ্যাঁ শুধুমাত্র এক অবস্থায় গীবত হবে না। যেমন, এক ব্যক্তি সরকারি কর্মচারী। সে ঘুস গ্রহণ করে। আপনার প্রবল ধারণা এই যে, আপনি যদি তার অফিসারকে এ ব্যাপারে অবগত করেন তাহলে সে তার ঘুস নেয়া বন্ধ করে দিবে। তার ঘুস গ্রহণের কারণে মানুষ যে হয়রানির শিকার হতো তাও বন্ধ হবে। যদি এই উদ্দেশ্যে কোন দায়িত্বশীল অফিসারকে গিয়ে বলেন, দেখুন সে তো ঘুস গ্রহণ করে। আপনি তাকে বাধা দিন। তাহলে এ অবস্থায় গীবত হলেও জায়েয আছে। কেননা এখানে তাকে কষ্ট দেয়া উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য তাকে সংশোধন করা যাতে সে সংশোধিত হয়ে যায় এবং অন্যরা যেন তার অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারে। আপনি যদি শুধু আলোচনার খোরাক এবং মানসিক প্রফুল্লতার জন্য বলে থাকেন অমুক ব্যক্তি ঘুস নিয়ে থাকে তাহলে গীবত হবে, নাজায়েয ও হারাম হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যদি কারো মাঝে খারাপ দোষ পাওয়া যায়। তখন তার অনুপস্থিতে এ নিয়ে কথা বলা যা সে অপছন্দ করে এটাও গীবতের অন্তর্ভূক্ত। না জায়েয এবং হারাম।

গীবত থেকে বাঁচা সম্ভব

আমি, আপনি এখন নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি, আমরা আমাদের মজলিসগুলোতে নিজেদের আলোচনায় কতবার এ গুনাহতে লিপ্ত হয়েছি। আর

যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ গুনাহের মন্দত্ব অন্তরে না বসবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ গুনাহের পরিণতি দেমাগে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা থেকে বেঁচে থাকা বড় মুশকিল। আজ মানুষ বলছে বাঁচবো কি করে সব মজলিসেই গীবত চলছে। অথচ এর থেকে বাঁচা যদি অসম্ভব হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিতেন না। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ○ (سورة البقرة ٢٨٦)

আল্লাহ তা'আলা কাউকে এমন কষ্ট দিতেন না যা তার সাধ্যের বাহিরে। এ কারণে এ থেকে বাঁচার ক্ষমতা অবশ্যই আমাদের আছে। আমরা যেহেতু গীবত শোনা এবং গীবত করায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, সেহেতু একে বর্জন করা আমাদের কাছে দুঃসাধ্য মনে হচ্ছে। কিন্তু মানুষ যদি প্রতিজ্ঞা করে এবং এ ব্যাপারে সংকল্প বদ্ধ হয় যে গীবত করবো না তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে।

শয়তান কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়

শয়তান বড় খারাপ, সে মানুষকে ভ্রষ্ট করে, কোন কোন সময় কোন মানুষের ভাল দিক নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তো শয়তান এক দমে মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এই মানুষটা তো আসলেই ভাল তবে তার একটা অভ্যাস খুবই খারাপ। ব্যাস্ গীবত শুরু হয়ে গেল। আল্লাহ আমাদেরকে শয়তানের অনিষ্ট ও ভ্রষ্টতা থেকে হেফাজত করুন আমীন।

তখন আপনার কেমন লাগবে

আমি একবার গীবতের বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। ঐ প্রবন্ধ পড়ে আমার এক বন্ধু চিঠি লিখেছে যে, আপনি তো এমন কথা লিখেছেন যার কারণে আমাদের জীবনের সব স্বাদ বিস্বাদ হয়ে যায়। কেননা আমরা যখন মজলিসে বসি তখন তাতে সব ধরনের আলোচনা হয়। আপনি তো আমাদের মজলিসের মজাই নষ্ট করে দিলেন। আমি তাকে বললাম। ভাই! অন্যের দোষ চর্চা করে আপনি মজা পাচ্ছেন। আপনি যদি জানতে পারেন, অন্য মানুষ আপনার দোষ চর্চা করে মজা পায় তখন আপনার কেমন লাগবে।

দুটি মানদণ্ড

আমরা মূলত দুটি মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছি। আপনার জন্য এবং অন্যের জন্য। যদি কেউ আমার গীবত করে আর আমি জানতে পারি যে, অমুক ব্যক্তি আমার অগোচরে আমার দোষ চর্চা করেছে। তখন আপনার মনের কী অবস্থা

হবে? বলুন, কত আফসোস হবে, কষ্ট পাবেন। দুঃখ হবে। কিন্তু অন্যের দোষ চর্চার সময় একথা মনে পড়ে না যে, তারও কষ্ট হতে পারে। সে দুঃখ পেতে পারে। এজন্য যখন কারো আলোচনা করেন তখন নিজেকে তার স্থানে দাঁড় করিয়ে দিন। যদি কোথাও আমার সম্পর্কে এমন আলোচনা হয় তখন আমার কেমন লাগবে। আল্লাহ তা'আলা তার ফযল ও করমে আমাদের সকলকে সকল প্রকারের গীবত-শেকায়েতের খারাবি থেকে হেফাজত করুন এবং বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

রিসালাতের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখুন
সূরা হুমাযার তাফসীর (২)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ○ اَلَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهٗ ○ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗ اَخْلَدَهٗ ○ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ○ وَمَا اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ○ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ○ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ○ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ○ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

হুমাযার অর্থ

আমি এখন আপনাদের সামনে সূরা হুমাযা তিলাওয়াত করেছি। এর বিশদ বিবরণ গত জুমায় শুরু করেছিলাম। মনে করিয়ে দেয়ার জন্য এই সূরার তরজমা আরেকবার করছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ বড় ধ্বংস ও বরবাদি ঐ ব্যক্তির জন্য যে মানুষের অগোচরে তার দোষ বর্ণনা করে। এবং মানুষের মুখের উপর তার নিন্দা করে। هُمَزَةٍ এর অর্থ হলো, ঐ ব্যক্তি যে গীবত করে অভ্যস্ত। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যে মানুষের অগোচরে তার দোষ চর্চা করে মজা নেয়ার জন্য, এবং মজলিসের খোরাক যোগানোর উদ্দেশ্যে নিজেকে বড় মনে করে অন্যের দোষ তুলে ধরে।

لُمَزَةٍ লুমাযার অর্থ

আর 'লুমাযা, অর্থ ঐ ব্যক্তি যে সামনাসামনি নিন্দা করে। দেখুন, একতো হলো যে, কোন ব্যক্তির কল্যাণার্থে তার ভুল ধরিয়ে দেওয়া যাতে সে শুধরে নেয় এটা তো ঠিক আছে। কিন্তু মুখের উপর নিন্দা করা। খোঁচা মারা। এতে মানুষের মন ভেঙ্গে যায়। মানুষ কষ্ট পায়। এটা অনেক বড় গুনাহের কাজ। আর 'লুমাযা, এমন ব্যক্তি কে বলে الَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ যে সম্পদ জমা করে রাখে এবং গুনতে থাকে যে এ পরিমাণ মাল আমার আছে। يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ সে মনে করে তার ধন-সম্পদ সর্বদাই বহাল থাকবে। অর্থাৎ আমার ধন দৌলত আমাকে মৃত্যু থেকে নিস্কৃতি দিবে। আমি এই সম্পদের বিনিময়ে অমর হয়ে থাকবো।

এমন ব্যক্তির পরিণতি

كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ আল্লাহ তা'আলা বলেন, এটা কস্মিনকালেও হবে না। বরং ঐ ব্যক্তি যে গীবত করে, পরনিন্দা করে, ধন-সম্পদ জমা করে। তার উপর যে "হুকুম ও ফারায়েয" আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন তা আদায় করে না তাকে অবশ্যই এমন আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, যা হাড় মাংস চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলবে। এরপর বলেন, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন আপনি কি জানেন চূর্ণবিচূর্ণকারী আগুন কেমন। نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ তা হলো আল্লাহ কর্তৃক প্রজ্বলিত আগুন। الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ যা মানুষের হৃৎপিণ্ডকে গ্রাস করে নিবে। এতটুকু হলো এই সূরার তরজমা।

সূরার শানে নুযুল

এ সূরা এই প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মোকাররমায় যখন ইসলাম প্রচার শুরু করেন তখন অনেক মানুষ তাঁর শত্রু হয়ে যায়। এবং শত্রুতার সীমা অতিক্রম করে। শত্রুতার একটা নমুনা এমন ছিল যে, তারা হুজুরের অগোচরে তার দোষ চর্চা করতো, তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতো। আর সামনে পড়ে গেলে তাকে কটুকথা বলতো।

মুহাম্মদ-এর পরিবর্তে-মুযাম্মাম-বলে ডাকা

হাদীস শরীফে এসেছে, কাফেররা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দিত। তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেকে বিভিন্ন নাম সম্বোধন করত। নাউযুবিল্লাহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম

তো ছিল মোহাম্মদ। তাঁর বাবা মা রেখেছেন। আর মোহাম্মদ অর্থ, প্রশংসিত ব্যক্তি। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি সকলে যার প্রশংসা করে। প্রকৃতপক্ষে এ নাম রেখেছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। এমন নাম যে নামের মাঝেই প্রশংসা নিহিত। অর্থাৎ ঐ সত্তা সকলে যার প্রশংসা করে তিনি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কিন্তু কোরাইশ কাফেররা তাদের হিংসার কারণে তাঁকে মোহাম্মদ এর পরিবর্তে মুযাম্মাম বলতো। মুযাম্মাম এর অর্থ মোহাম্মদের পুরো উল্টো। অর্থাৎ ঐ সত্তা যার নিন্দা ও খারাবি বর্ণনা করা হয় তাকে মুযাম্মাম (নিন্দিত) বলে। কুফ্ফারে কোরাইশদের এটা মুখের বুলি ছিল। তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম খুব কমই নিত। এছাড়া তারা হুজুরের জন্য বদদো'আ করত। তাঁর জন্য অশালীন শব্দ ব্যবহার করতো। কখনো বা অভিসম্পাত করতো।

আল্লাহ্ আমাকে বাঁচিয়েছেন

একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বলেছেন, কীভাবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাদের অভিসম্পাত ও বদদোয়া থেকে বাঁচিয়েছেন। তারা যখন অভিশাপ দিত তখন বলত, মুযাম্মামের উপর লা'নত। আর আমি মোহাম্মদ। তারা অভিশাপ দেয় মুযাম্মামকে। আমি তো মুযাম্মাম নই। মা-বাবার পক্ষ থেকে এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমার নাম রাখা হয়েছে মোহাম্মাদ। এজন্য তার উপর লা'নত আমার উপর না। আল্লাহ তা'আলা এভাবে আমাকে বাঁচিয়েছেন। মোট কথা তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়ার সকল উপায় গ্রহণ করেছিল। তার মধ্যে একটা ছিল যে, হুজুরের পিছনে তার দোষ চর্চা করত। আবার সামনা সামনিও কষ্ট দিত। যার উপর ভিত্তি করে এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।

ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলা

যাই হোক, প্রাচীনকাল থেকে এই ধারাবাহিকতা চলে আসছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যুগেও এমন নিকৃষ্ট স্বভাব ও নিচুমনা লোক ছিল। যাদের কাছে তাদের দাবি সাব্যস্ত করার মত কোন প্রমাণ ছিল না। যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওত, তাঁর রিসালাত, তাঁর সততা, তাঁর আমানতদারি এবং দ্বীনদারির ব্যাপারে জগতবাসী সাক্ষী তখন এই নিকৃষ্ট, নিচুমনা ইসলামের শত্রুদের কাছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা খণ্ডন করার মতো কোন পথ ছিল না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, আল্লাহ এক, এই যে পাথরের প্রতিমা যেগুলো তোমরা

নিজ হাতে বানিয়েছো, যার স্রষ্টা তোমরাই, সেগুলোকে তোমরা তোমাদের রব এবং উপাস্যরূপে মেনে নিয়েছ? এটা এমন কথা ছিল যা খণ্ডন করার মত তাদের কোন উত্তর ছিল না। তাদের বিশ্বাস ছিল, অমুক দেবতা আমাদের খাবার দান করে। অমুক দেবতা আমাদেরকে সন্তান দান করে। অমুক প্রতিমা আমাদের বাসনা পূর্ণ করে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন। কে এসে তোমাদের একথা বলে দিয়েছে যে অমুক দেবতা খাবার দান করে? অথচ এই রিযিকদানকারী দেবতা তোমরা নিজেদের হাতে গড়েছ। ঐগুলো তোমাদের কি করে রিযিক দিবে? এগুলো তোমাদেরকে কীভাবে সন্তান দান করবে? ঐ সত্তা যিনি যমীন সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ সৃষ্টি করেছেন, যিনি নদীকে করেছেন প্রবহমান, যিনি বর্ষণ করেন বৃষ্টি, তিনিই প্রকৃত স্রষ্টা এবং মালিক। তিনিই ইবাদতের যোগ্য। এসবের কোন যৌক্তিক উত্তর তাদের কাছে ছিল না।

পরাজিত বিড়াল

যখন মানুষ যুক্তি তর্কে হেরে যায় তখন সে একগুঁয়ে হয়ে যায়। যেমন ঃ আমাদের এখানে একটা প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য আছে,

کھیانی بلی کھمبا نوچ

লজ্জিত বিড়াল পিলারে আঁচড় কাটে। যখন সে বলার মত কোন কিছু না পায় তখন গালি গালাজ করে অশালীন বাক্য ব্যবহার করে। আঘাত করে কথা বলে। যখন আল্লাহ তা'আলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় এবং তৎপরবর্তী যুগে ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তি দান করেছেন, তখন যারা ইসলামের সামনে শক্তিমত্তায় এবং বাকবিতণ্ডায় পরাভূত হয়েছে, তারা হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং সত্য মিথ্যা প্রচার শুরু করে।

আধুনিক সভ্যতার পতাকাবাহীদের অবস্থা

আজও আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির দাবিদার যারা স্বীয় 'তাহযীব তামাদ্দুনের, ডংকা বাজায়। যারা এই ডংকা পিটায় যে, আমরা মানুষের অধিকার আদায়ের পতাকাবহী দল। এদের মাঝে আর ঐ হীনমনা কাফেরদের মাঝে বিন্দু মাত্র পার্থক্য নেই। আজ তাদের কাছে ইসলামের বিরুদ্ধে কোন দলীল নেই। যুক্তিতর্কের ময়দানে এরা শোচনীয় মার খেয়েছে। আল্লাহর ফযল ও করমে ইসলামের সত্যতা সারা দুনিয়ায় মজবুতির সাথে অটুট রয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে বেয়াদবি করে চাঁদে থুতু মারার চেষ্টা করা ছাড়া ইসলামের শত্রুদের আর কোন উপায় নেই। তারা আজ এ চেষ্টা করেই যাচ্ছে।

নিচুমনাদের হীন ষড়যন্ত্র

এটা মূলত তাদের পরাজিত ও পরাভূত হওয়ার প্রমাণ। যুক্তিতর্কের ময়দানে পেশ করার মত কোন কিছু তাদের কাছে নেই। এ কারণে তারা তাদের ক্রোধ, হিংসা এবং ক্ষোভের প্রকাশ ঘটায় হীন চক্রান্তের মাধ্যমে– 'আল্লাহ পানাহ' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে বেয়াদবি করা শুরু করে। কখনো কখনো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কার্টুন ও ব্যঙ্গ চিত্র বানানো শুরু করে।

যুক্তিতর্কের ময়দানে পরাজয়

এ সকল কাজ মূলত যুক্তিতর্কের ময়দানে পরাজয় বরণের নিদর্শন। যার কাছে প্রমাণ থাকে সে কখনো গালি দেয় না। সে কখনো অন্যের নিন্দা করে না। সে যুক্তির সাথে কথা বলে এবং যুক্তির সাথে নিজের কথা অন্যকে বুঝায়। যুক্তির মাধ্যমে অন্যের কথা খণ্ডন করে। কিন্তু যার কাছে দলীল নেই। সে হীন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। কখনো তার কুৎসা রটায়, কখনো তার ব্যঙ্গ চিত্র প্রকাশ করে। কখনো কার্টুন বের করে। এতো তাদের পক্ষ থেকে একথার স্বীকার করা যে, আমাদের কাছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রমাণের কোন উত্তর নেই , নিজেদের ক্রোধের আগুন হীন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ঠাণ্ডা করা ছাড়া। তারা এমনটাই করছে। বাস্তবে এটা পরাজয় বরণেরই পরোক্ষ স্বীকারোক্তি।

মুসলমানদের আত্মসম্ভ্রমবোধকে চ্যালেঞ্জ

অন্যদিকে মুসলমানদের আত্মমর্যাদার চ্যালেঞ্জও এটা, যে লোক মুসলমানদের নাম নিয়েছে, যে ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালবাসার দাবিদার। সে এই হীনচক্রান্তের জবাবে কী করবে। এটা একটা চ্যালেঞ্জ। আমি মনে করি পুরো উম্মতের ঈমানি গাইরতের (মর্যাদা) সাথে এই চ্যালেঞ্জ মুকাবেলা করা উচিত। পুরো উম্মতে মোহাম্মাদী এই কথা প্রকাশ করবে যে, আমরা নবী মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান রক্ষার্থে জান কোরবান করতে প্রস্তুত।

হুজুর (সা.) এর ভালবাসা কোন্ স্তরের হবে?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه ووالده وولده والناس اجمعين-

তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না। যতক্ষণ আমি তার কাছে তার নিজের প্রাণ, মা-বাবা, সন্তান থেকে এবং সারা দুনিয়ার সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় না হব। হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) এই বাণী শুনে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আলহামদুলিল্লাহ! আপনি আমার নিকট আমার মা-বাবা থেকে অধিক প্রিয়, আমার সন্তান-সন্ততি থেকে অধিক প্রিয়। দুনিয়ার সকল মানুষ থেকে বেশী প্রিয়। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, কখনো তো এমন হয়নি নেই, আমি আপনাকে আমার নিজ সত্তা থেকে বেশী ভালবেসেছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সীনার উপর হাত রাখলেন এবং বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের থেকে বেশী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুমিন হবে না। এরপরই হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) এর মাঝে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ﷺ এখন আমার বিশ্বাস আমি আপনাকে নিজের থেকে বেশী ভালবাসি।

হুজুর (সা.) এর মুহাব্বতের নমুনা

সাহাবায়ে কেরাম-রিদওয়ানুল্লা তা'আলা আলাইহিম স্বীয় কথা ও কাজে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বত ও ভালবাসার এমন নজির ছিলেন যে, জগতে কোন সম্প্রদায়ের কোন জাতির ইতিহাসে স্বীয় নেতাকে, স্বীয় নবীকে এবং পথপ্রদর্শককে ভালবাসার এমন নজির নেই। হযরত আবু মাখদুব একজন সাহাবী ছিলেন। শৈশবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মাথায় হাত মোবারক রেখেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তাকে ঈমান আনার তাওফিক দিয়েছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে স্থানে হস্ত মোবারক রেখেছিলেন তিনি সারা জীবনে কোনদিন ঐ জায়গা থেকে চুল কাটেন নি। কারণ এগুলো ছিল সেই চুল যার উপর হুজুরের হাতের ছোঁয়া লেগেছে।

আজ মুসলমানদের পরীক্ষা

আমার ভাইয়েরা! আজ ছোট একটি পরীক্ষা যে, আপনারা রবিউল আওয়াল মাসে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালবাসার দাবীও করেন। তো আজ আপনাদের ছোট একটি পরীক্ষা আছে, যে লোক পোড়া কপাল নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানের উপর কালিমা লেপন করার চেষ্টা করছে। তাদের ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কী? এরপরও কি তাদের সাথে সম্পর্ক রাখবেন? এরপরও তাদেরকে সামাজিক সুবিধা লাভের সুযোগ দিবেন?

ফেসবুক বয়কট করুন

আজ জানা গিয়েছে যে, যেই ফেসবুকে এই অপবিত্র লড়াই হচ্ছে। আল্লাহর শোকর! সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জানা নেই এই ষড়যন্ত্র কত দিন অব্যাহত থাকবে। প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তি যদি মনে করেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দ্বিতীয়বার কেউ সেই কুচক্রান্তে মেতে উঠবে তাহলে ঈমানের দাবি হলো সেই অপবিত্র দিকটিকে বর্জন করা, যাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে বেয়াদবি করা হয়েছে। ফেসবুকের এই সাইট সম্পর্কে শুনেছি তরুণ তরুণীরা এই দিকটি ব্যবহার করে একে অন্যের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে এবং স্বীয় ধর্মের শিক্ষাকে এর মাধ্যমে পদদলিত করে। এদিক থেকে এই সাইটটি বন্ধ করার যোগ্য।

টাকার মার মারো

যেমনটা কোরআনে কারীম সূরা হুমাযায় বলেছে, নিন্দাকারী, গীবতকারী ঐ ব্যক্তি যে সম্পদ জমা করে গুণে গুণে রাখে। তাদের অবস্থাও এমন যে তাদের সবচে প্রিয়, সবচেয়ে বড় খোদা হলো টাকা। যদি একবার টাকা মার খেয়ে যায় তখন তাদের দেমাগ ঠিক হয়ে যাবে। জানা গিয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি একবার ফেসবুকের সাইটটি খুলে তখন তাদের আড়াই ডলার লাভ হয়।

তার লাভ হতে দিবেন না

আমার ভাইয়েরা! যে ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে গোস্তাখি করছে, আপনি কি তার সাইটে গিয়ে তাকে আড়াই ডলার পুরস্কার দিবেন? আপনি কি তার উপকার করবেন? আজ সারা দুনিয়ায় শত কোটির বেশি মুসলমান। যদি সারা দুনিয়ার মুসলমান এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, ঐ সকল ওয়েবসাইটকে বয়কট করবে। তাহলে কিছুদিনের মধ্যে তারা দেখতে পাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে বেয়াদবির পরিণাম কি হয়।

হুজুর (সাঃ)-এর মর্যাদা সমুন্নত

দেখুন! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের প্রশংসা, আমাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা থেকে নির্মুখাপেক্ষী। তার শানে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ আমি আপনার আলোচনাকে সমুন্নত করেছি। দেখুন! এমন উঁচু মাকাম দান করেছেন যে, ২৪ ঘণ্টার এমন কোন মুহূর্তও অতিবাহিত হয় না যখন দুনিয়ার কোথাও না কোথাও اشهدان محمد رسول الله এর ধ্বনি সুউচ্চ

স্বরে ধ্বনিত হয় না। প্রতিটি মুহূর্তে সুউচ্চ আওয়াজে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা তার মার্যাদাকে এত উঁচু করেছেন। এ লোকেরা যত প্রোপাগান্ডা চালাক, কিন্তু গোটা বিশ্ব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণকীর্তণ করে চলেছে এবং অনবরত দরুদ প্রেরণ করছে।

ان الله وملائكته يصلون على النبى -

আল্লাহ জাল্লা শানুহু তার উপর শান্তি বর্ষণ করেন। ফিরিশতারা তার উপর দরুদ পাঠ করে। তাঁর আমার আপনার দরুদের কোন প্রয়োজন নেই। না কোন প্রয়োজন আছে আমার আপনার প্রশংসা করার। না প্রয়োজন আছে দুঃশ্চরিত্র লোকদের কোন প্রশংসার। তারমহান সত্তা তো তা থেকে পবিত্র এবং সমুন্নত। সকল প্রশংসার উর্ধ্বে।

জন্মলগ্ন থেকেই প্রশংসা

তাঁকে তো জন্মলগ্ন থেকেই আল্লাহ মুহাম্মদ স্বীকৃতি দিয়েছেন। অর্থাৎ যার প্রশংসা করা হয়েছে। যার প্রশংসা আসমান-যমীনে, যার প্রশংসা ফিরিশতাদের মাঝে, যার প্রশংসা বিশ্ব জগতে। সেই সত্তার আমার আপনার প্রশংসার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু একজন মুসলমানের সৌভাগ্য, সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বত, তাঁর প্রশংসা, সম্মান ও মর্যাদা এবং পবিত্রতা রক্ষার জন্য এমন অগ্রণী ভূমিকা রাখে যার মাধ্যমে ঐ কুচক্রীদের চরম ক্ষতি সাধিত হয়।

ঈমানী গায়রত থাকলে এ কাজ ছেড়ে দিন

কমপক্ষে এতটুকু হোক যেন তাদের আর্থিক লোকসান হয়। একবার বুঝতে পারে যে মুসলমানদের আত্মমর্যাদা এখনো বিলীন হয়ে যায়নি। বিশেষ করে আমি তরুণদের আবেদন করবো, আজকাল চারদিকে ইন্টারনেট ব্যবহারের সয়লাব, যা বিনোদনের একটি মাধ্যম হিসেবে মানুষ গ্রহণ করছে। তোমরা কি সামান্য কোরবানি পেশ করতে পারবে না যে, বিনোদনের এই মাধ্যমকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানের খাতিরে ছেড়ে দিবে। তোমাদের থেকে জান চাওয়া হচ্ছে না। তোমাদের থেকে কোন মালও চাওয়া হচ্ছে না। শুধু এতটুকুই বলা হচ্ছে, নিজেদের একটি কর্মকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানে কোরবানি করো। এটুকুই করবে তো! ইনশাআল্লাহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যারা ভালবাসে তাদের তালিকায় তোমাদের

নাম লিখা হবে। আখেরাতে আল্লাহ তাআলার সামনে আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারবে আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসম্মানকারীদের বয়কট করেছি। যদি এই আন্দোলন এগিয়ে নেয়া যায় তাহলে দেখবেন, ইনশাআল্লাহ তাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়। আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে আমাদের সবাইকে তাওফিক দান করুন। আমীন।

আখেরাতে এরা ধ্বংস হবে

সূরা হুমাযায় আল্লাহ তা'আলা এমন লোকদের সম্পর্কে বলেছেন, وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস। আজ এই লোকেরা আনন্দিত হবে, কেননা তারা তাদের মিশনে সফল হয়েছে। এতে তৃপ্তি পাবে। কিন্তু তাদের পরিণতি ধ্বংস ও বরবাদি। সে বরবাদি হলো لَيُنۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ তাদেরকে ঐ আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, যা হাড়কে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলবে। وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ আপনি কি জানেন সে আগুন কী? نَارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ এটা আল্লাহ তা'আলার প্রজ্বলিত আগুন। যাতে এরা প্রবেশ করবে। যে আগুন তাদের হৃৎপিণ্ডকে গ্রাস করবে। এটা আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা। আমার পক্ষ থেকে কোন ঘোষণা নয়। কোন বান্দা কোন মানুষের পক্ষ থেকে নয়। এটা অবশ্যই ঘটবে, যে পাপিষ্ঠরা এ কাজ করছে। ঐ পাপিষ্ঠরা তাদের পরিণতি তাদের সামনে দেখতে পাবে। এই দুনিয়ায় চাই তারা বিজয়ের পতাকা উড়াক। বিজয় উল্লাসে মেতে থাকুক। কিন্তু আখেরাতে অবশ্যই এ ঘোষণা বাস্তবায়িত হবে। আল্লাহ তা'আলা তার ফযল ও করমে আমাদেরকে এই দায়িত্ব পালন করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা 'শামছ, বিপদ থেকে রক্ষার উপায়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ إِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَآ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ○ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ○ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّهَا ○ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ○ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ○ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ○ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ○ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ○ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ○ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ○ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ○ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ○ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ○ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا ○ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا ○ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ○

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

ভূমিকা

হযরত ওলামায়ে কেরাম, মেরে মুহতারাম দোস্ত ও বুযুর্গ! এটা আমার জন্য বড় সৌভাগ্য যে, আজ আপনাদের শহরে, এই মোবারক মসজিদে, আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'লা দান করেছেন। এটা আমাদের ইতিহাসের বড় আকাবিরদের মসজিদ। আমাকে বলা হয়েছে, এই

মসজিদে শাইখুল ইসলাম হযরত আল্লামা শিব্বির আহমদ উছমানি সাহেব (রহঃ), আমীরে শরিয়ত শাইখুল ইসলাম সায়্যেদ আ'তা উল্লাহ শাহ বোখারি (রহঃ), হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) (কুদ্দিসা সিররুহু) আল্লাহ তাকে সম্মানিত করুন– এসকল আকাবিরে উম্মত (জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা) তাশরীফ এনেছিলেন এবং এখানে আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআলার দরবারে সিজদাও করেছেন। মাওয়ায়েযে হাসানা (উত্তম আলোচনা) দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেছেন।

আজ এই মসজিদে ভাই আম্মার সাহেবের পিতার শোক সভা উপলক্ষে এই বিশাল সমাগম। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফযল ও করমে তাকে মাগফেরাত নসীব করেন এবং উচ্চ মর্যাদা দান করেন। তার মহান কাজগুলোকে কবুল করেন। তার আত্মীয় স্বজনকে ধৈর্য ধরার তাওফিক দান করুন এবং উত্তম প্রতিদান দান করুন।

মৃত ব্যক্তিদের জন্য দো'আ করা

কোন ব্যক্তির স্মরণ সভা করে তার প্রশংসা করা মৃত ব্যক্তির কোন কাজে আসেনা। একটি কাজই তার উপকারে আসবে। তাহলো তার জন্য দো'আ করা। মানুষ সাধারণত মনে করে যে, ইছালে ছাওয়াবই একটি উপায় যার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তি উপকৃত হতে পারে।

কিন্তু হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, ইছালে ছাওয়াব থেকে সবচে বেশী ফায়দা হলো দুনিয়া থেকে গমনকারী ব্যক্তির জন্য দো'আ করা। কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষ যখন মরে যায় তখন তার সব আমল শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটা কাজ এমন, যেগুলো মৃত্যুর পরও তার কাছে ফায়দা পৌঁছতে থাকে। তার মধ্যে একটি হলো নেক সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দো'আর কথা বলেছেন। এ জন্য তার উপকারও বেশী। যখন তার কাজের কথা মনে পড়ে তখন মুসলমানের দায়িত্ব হলো তার মাগফেরাতের জন্য দো'আ করা। এবং উঁচু মর্যাদার জন্য প্রার্থনা করা। এই শোক সভার উদ্দেশ্য হলো আমরা এখান থেকে কোন শিক্ষা লাভ করবো এবং আমাদের বাস্তব জীবনে তা কাজে লাগাবো। আমি জনাব আম্মার সাহেবের শোকরিয়া আদায় করছি তিনি বড় মোহাব্বতের সাথে এখানে আসার দাওয়াত দিয়েছেন। আর মাওঃ ক্বারী হানীফ সাহেব, আল্লাহ তা'লা তার হায়াতে, ইলমে আমলে বরকত দান করুন, আমীন। বিশেষভাবে তার শোকরিয়া আদায় করছি, তিনি আমার

মতো নগন্য বান্দাকে এখানে আসার ব্যাপারে বারবার অনুরোধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তার জযবাকে কবুল করুন এবং এই অধমকেও কবুল করুন, আমীন।

নিজ দেশে ভীনদেশী

এই প্রেক্ষাপটে আপনাদের সামনে কী বলব। আমার মনে হচ্ছে আজ পাকিস্তানে এমন কোন মুসলমান নেই যার অন্তর দেশের উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে পেরেশান নয়। কোথায় যাবো। সোয়াতে এবং আমাদের উত্তর প্রদেশের এলাকা গুলোতে গৃহযুদ্ধের কী আগুন জ্বলছে। যে শক্তি, যে অস্ত্র ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতো আজ তা মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে ব্যবহার হচ্ছে। দু-দিকেই মুসলমানদের লাশ পড়ছে। এর পুরো সুবিধা ভোগ করছে ইসলামের শত্রুরা। যে হাতিয়ার কুফুর এবং শিরকের বিরুদ্ধে ব্যবহার হওয়ার কথা ছিল, তা মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। কালেমায়ে তাওহিদ পাঠকারী পঁচিশ লাখ মুসলমান নিজ দেশে ভীনদেশী হয়ে ঘরবাড়ী হারিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। এমন পরিস্থিতিতে কোন মুসলমান আছে যার মন পেরেশান নয়।

এক মহিলার হুজুর (সা.)-কে স্বপ্নে দেখা

এই প্রেক্ষাপটে আমাদের কী করা উচিত? এ সম্পর্কে একজন নেককার মহিলা স্বপ্ন দেখেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ হয়েছে। ঐ মহিলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মোবারকে অস্থিরতা ও পেরেশানির ছাপ দেখেছেন এবং এও দেখেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাকিস্তানের বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তিনি বলেছেন, পাকিস্তানের উপর আযাবের আশংকা আছে। যদি এই আযাব থেকে বাঁচতে হয় তাহলে মুসলমানদের উচিত, সূরা দোহা وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا বেশি বেশি পাঠ করা। স্বপ্নের অবলোকনকারী মহিলা এও বলেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৭৫ হাজার বার পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বাহ্যত এর উদ্দেশ্য হলো কয়েকজন মিলে ৭৫ হাজার বার পড়ে নিবে। অনেক উলামায়ে কেরাম এর সত্যায়ন করেছেন এবং আমিও এই মহিলা থেকে সরাসরি শুনে সত্যায়ন করেছি।

স্বপ্ন শরীয়তের আলোকে দলীল নয়

এখানে আমি প্রথমে এ কথা বলবো যে, স্বপ্ন শরীয়তের দলীল নয়। এজন্য স্বপ্নের মাধ্যমে এমন কোন বিষয় সাব্যস্ত হতে পারেনা যা বিনিদ্র অবস্থায় সাব্যস্ত

হয় না। কোন বিষয় যা পূর্বে ফরয, সুন্নত ওয়াজিব ও মুস্তাহাব ছিল না স্বপ্নের কারণে তা ফরয, সুন্নত, ওয়াজিব বা মুস্তাহাব হতে পারে না। যে জিনিস প্রথমে নাজায়েয এবং হারাম ছিল না, স্বপ্নের কারণে তাকে নাজায়েয এবং হারাম বলা যেতে পারে না। শুধু আম্বিয়া (আঃ)দের স্বপ্নই শরিয়ত। কারণ তাদের স্বপ্ন ছিল ওহী। কিন্তু আম্বিয়া (আঃ) ছাড়া কারো স্বপ্নই দলীল নয়। এর মাধ্যমে কোন নতুন বিধান সাব্যস্ত হতে পারে না। আজকাল এই এক গোমরাহি ছড়িয়ে পড়েছে যে, স্বপ্নকে দ্বীনের প্রমাণ সাব্যস্ত করে নতুন নতুন বিধান জারি হচ্ছে। শরীয়তে এর কোন অনুমতি নেই।

স্বপ্নে হুজুর (স.) -এর যেয়ারত এবং তার হুকুম

কেউ যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখে এবং তাঁর হুলিয়া মোবারক (দৈহিক গঠন) ভালোভাবে দেখে তাহলে তার সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : যে স্বপ্নে আমার যেয়ারত লাভ করবে সে আমাকেই দেখবে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করে ধোঁকা দিতে পারে না। যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যেয়ারত লাভ হয় এবং তিনি এমন কোন কথা বলেন যা শরীয়তের খেলাফ নয় তাহলে মুসলমানদের এর উপর আমল করা উচিত। এজন্য স্বপ্নে যে কথা বলা হয়েছে যে, এই পরিস্থিতিতে সূরা وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا বেশী বেশী তেলাওয়াত করো। মুসলমানদের উচিত এর গুরুত্ব দেয়া এবং অন্যকে এই বাণী পৌছে দেয়া।

এই সূরায় এগারোটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ করে এই সূরা তিলাওয়াত করতে বলেছেন এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে এই সূরায় সম্ভবত কোন বিশেষ বার্তা রয়েছে। যা উম্মতকে পৌছানো উদ্দেশ্য। এ জন্য খেয়াল হয়েছে যে, আজ এই মজলিসে আপনাদের খেদমতে এই সূরার যৎ সামান্য ব্যাখ্যা পেশ করবো। এ উদ্দেশ্যে এই সূরা আমি আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি। এটা তো নিশ্চিত যে কোরআনের প্রতিটি সূরা, আয়াত গভীর মর্মপূর্ণ এবং হোদায়াত বহনকারী। কিন্তু প্রতিটি সূরার একটি স্বাতন্ত্র ও স্বতন্ত্র ধারা রয়েছে। পক্ষান্তরে এই সূরার একটি অদ্ভুত বিষয় রয়েছে। এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা এগারোটি বস্তুর শপথ করেছেন। এগারোটি বস্তুর শপথ করে একটি বাক্য বলেছেন। একটা কথা আপনি চিন্তা করুন, কোনো কথাকে নিশ্চিত প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলার শপথ করার কি প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলার লফজ বা শব্দ বড় সত্য। আর যে ঈমান রাখে তার

জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা একথা বলেছেন। কিন্তু আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা অতিরিক্ত গুরুত্ব বুঝানোর জন্য, এবং তাতে জোর সৃষ্টি করার জন্য কোনো কোনো সময় বিভিন্ন বস্তুর শপথ করেছেন কোরআনে কারীমে। একটা বস্তুর শপথ করেছেন, দুইটা বস্তুর শপথ করেছেন। তিনটার শপথ করেছেন। বরং প্রথমেই এগারোটি বস্তুর শপথ করেছেন। এরপর একটি জুমলা ইরশাদ করেছেন, যা বাস্তবেই সমস্ত উম্মতের জন্য বাণী। আর শপথ অদ্ভুত রকমের।

সূরা শামছের তরজমা

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا শপথ সূর্যের ও তার কিরণের। وَالْقَمَرِ إِذَا تَلٰهَا শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে। وَالنَّهَارِ إِذَا جَلّٰهَا শপথ দিবসের যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে। وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰهَا শপথ রাতের যখন তা সূর্যকে আচ্ছাদিত করে। وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا শপথ আকাশের এবং তাঁর যিনি তা নির্মাণ করেছেন। وَالْأَرْضِ وَمَا طَحٰهَا শপথ যমীনের এবং যিনি তা বিছিয়েছেন। وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰهَا শপথ মানবাত্মার এবং শপথ ঐ সত্তার যিনি এই আত্মাগুলোকে সঠিক আন্দাযে বানিয়েছেন। فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوٰهَا এবং যথার্থরূপে বানিয়ে মানুষের অন্তরে গুনাহের প্রতি আসক্তি এবং তাকওয়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এই এগারোটি শপথ আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা করেছেন।

এগারোটি শপথের উত্তরে একটি বাক্য

অতঃপর এ বাক্য বলেছেন قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا সফলতা সেই পেয়েছে যে স্বীয় আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে। وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا আর ব্যর্থ হয়েছে সেই যে নিজের আত্মাকে ফাঁসিয়েছে। অর্থাৎ গুনাহে ফাঁসিয়েছে। এগারোটি শপথ করে একথা বলেছেন যে, কামিয়াব এবং সফল ঐ ব্যক্তি যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর ব্যর্থ ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় আত্মাকে গুনাহে জর্জরিত করে দোযখের হকদার হয়েছে।

কেন এসকল বিষয়ে শপথ করেছেন

প্রথমে একটু বোঝার বিষয় আছে। আল্লাহ তা'আলা যে শপথ করেছেন, সূর্যের এবং তার কিরণের এবং চন্দ্রের যা সূর্যের অনুগমন করে এবং দিনের যা সূর্যকে প্রকাশ করে এবং রাতের যা সূর্যকে আচ্ছাদিত করে। আল্লাহ তা'আলার এই শপথ সম্পর্কে মুফাস্সিরীনে কেরাম বলেন, প্রতিটি শপথের কোন না কোন

রহস্য আছে, এখানে বিশেষভাবে এই শপথ কেন করেছেন। মুফাস্সিরীনে কেরাম বলেন, এখানে যে শপথ করেছেন তা একথার প্রতি লক্ষ্য করে যে, দেখুন আল্লাহ তা'আলা যিনি এই বিশ্ব ব্যবস্থাপনা কায়েম রেখেছেন, তার কিছু ব্যবস্থাপনা এমন যে, পৃথিবী আলোকিত হবে, আবার অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। একটা সময় সূর্যের দেখা মিলবে, রোদ ছড়িয়ে পড়বে, জগত আলোকিত হবে। আবার একটা সময় সূর্য অস্ত যাবে, আলোর বিকিরণ শেষ হবে। আঁধারের আগমন ঘটবে। আঁধারের বুকে, সূর্যের স্থলে আল্লাহ তা'আলা চাঁদের আলো ফেলবেন। সূর্য বিদায় নেয় চাঁদ আগমন করে। একসময় ভোরের আলো ফোটে, আলোকোজ্জ্বল দিনে সূর্যের দেখা মেলে। বার, চৌদ্দ ঘণ্টা পর আবার সূর্য অস্ত যায়। আঁধার এসে সূর্যকে ঢেকে ফেলে। এখনো চাঁদের উদয় হয়নি, চারদিকে ধূসর অন্ধকার।

এই শপথ সমূহে দুনিয়ার আবর্তনের প্রতি ইঙ্গিত

এই শপথ সমূহে দু'টি বিষয়ের দিকে ইশারা করা হয়েছে। একটি হলো দুনিয়ার উত্থান-পতন, আবর্তন-বিবর্তন ঘটে যাবে এবং অন্যটি শীত গ্রীষ্মের গমনাগমন। যদি কোন মানুষের কাছে অন্ধকার মনে হয়, অন্ধকার পরিস্থিতির অনুভূতি সৃষ্টি হয়, মনে হয় যেন অন্ধকার ছেয়ে গেছে, তখন তার নিরাশ না হওয়া উচিত। এজন্য যে, আল্লাহ তালার সুন্নতই হলো আঁধারের পর আলো আসা।

اے ظلمت حالات سے جی دھوڑنے ولو
پو پھٹتی ہے ہر روز اسی سینہء شمس سے

হে আঁধারে আত্মবিসর্জন কারী
প্রতিদিন এই বুক চিঁরে প্রস্ফুটিত হয় আলোদানকারী (সূর্য)

একে তো আল্লাহ তা'লা এসব শপথের মাধ্যমে এদিকে ইশারা করেছেন যে, এই দুনিয়া যা আলো আঁধারের জগত। কখনো আলো কখনো অন্ধকার। তাই কোন বিপদে পতিত হলে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া।

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ○ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (سورة الشرح ٦)

সকল কষ্টের পর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে স্বস্তি আসে।

একটি কষ্ট আর দুটি স্বস্তি

বুযুর্গানে দ্বীন বলেন, এই আয়াতে কারীমায় একথা বলা হয়েছে যে, কষ্ট আসে একবার কিন্তু স্বস্তি আসে দু'বার। তো বর্তমান পরিস্থিতিতে নিরাশ হবেন

না। তবে কখনো কখনো মনে নিরাশা দেখা দেয়। আল্লাহ হেফাজত করুন কোন কোন সময় তাকদিরের (ভাগ্যের) উপর মনে অভিযোগ সৃষ্টি হয়। এটা কি হচ্ছে, শত্রু ছড়ি ঘুরাচ্ছে, শত্রুর উত্থান হচ্ছে আর মুসলমানের পতন হচ্ছে। মুসলমানদের পদস্খলন পরিলক্ষিত হচ্ছে। কোন কোন সময় মানুষের অবচেতন মন ভাগ্যকে দোষারোপ করে। আল্লাহ হেফাজত করুন, তখন কিন্তু ঈমানের ঝুঁকি দেখা দেয়। তাই কোরআন বলছে, জনাব এই দুনিয়া জান্নাত নয়।

তিনটি জগত

আল্লাহ তা'আলা তিনটি জগত সৃষ্টি করেছেন। একটি জগত যেখানে শুধু আনন্দ আর প্রশান্তি। আর এটা হলো জান্নাত। আরেকটা জগত আছে যেখানে দুঃখ কষ্ট ছাড়া আর কিছুই নেই সেটা হলো জাহান্নাম। আরেকটা জগত আছে যেখানে দুঃখ কষ্ট, শান্তি-প্রশান্তি উভয়টাই আছে সেটা হলো দুনিয়া। দুনিয়াতে অবশ্যই কষ্টভোগ করতে হবে। কেউ যদি মনে করে যে, দুনিয়ায় শুধু আরাম আয়েশ করবো, আনন্দ উল্লাসে মেতে থাকবো। এমনটা কখনো হতে পারে না। বড় থেকে বড় কোন শাসক, কিংবা বাদশা, বা বড় কোন মালদার, সম্পদশালী এমন কেউ নেই যে কষ্ট ভোগ করে না। দুঃখ যাতনা সহ্য করেনা। এটা দুনিয়া। এখানে আছে রাতের আগমন, দিনের গমন। আলো-আঁধারের সম্মিলন। এই শপথের মাধ্যমে এদিকে ইঙ্গিত করা আল্লাহ তা'আলার একটা উদ্দেশ্য।

এই দুনিয়ায় তোমার করণীয় কী?

আর দ্বিতীয় ইশারা হলো, এই সূরায় এই বার্তা দেয়া হয়েছে যে, জনাব! আলো-আঁধারে আর ঠাণ্ডা গরমে প্রভাবিত না হয়ে এই ভাবো। যে এই দুনিয়ায় তোমার করণীয় কী। এখানে বিপদের ঝড় উঠবে, সমস্যার পাহাড় সৃষ্টি হবে, আনন্দের ফোয়ারা বইবে। তোমার কী করণীয়? এ বিষয়কে আল্লাহ তা'আলা দুটি বাক্যে বলেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ○ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ○

তোমাকে আল্লাহ তা'লা যে আত্মা দান করেছেন সেটাকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করো। আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত রাখ। অবাধ্যতা এবং পাপকাজে জড়িও না। এ কাজ করো। আমি তোমার অন্তরে দুই প্রকারের আগ্রহ দিয়ে রেখেছি। আমি তোমাকে গুনাহ করার যোগ্যতাও দিয়েছি আবার ভাল কাজ করার শক্তিও দিয়েছি।

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ○

তোমাদের অন্তরে গোনাহের প্রতি যে আসক্তি এবং খোদাভীতির প্রতি যে আগ্রহ সৃষ্টি হয় তাও আমিই সৃষ্টি করি। যেভাবে রাত দিনকে সৃষ্টি করি, আলো-আঁধারকে সৃষ্টি করি এভাবে তাকওয়ার আলোও তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি করি। অবাধ্যতা এবং গুনাহের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাকে আমার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে দলিত মথিত করে আনুগত্যের রূপ দান করে। তাহলে তোমার মর্যাদা ফিরিশতাদের চেয়ে উঁচু হয়ে যাবে।

ফিরিশতাদের বৈশিষ্ট্য

ফিরিশতা আমি এজন্য বানিয়েছি যে, সে একমাত্র আমার-ই-আনুগত্য করবে। আর আমার যিকির করতে থাকবে। আমার গুণ ও প্রশংসা বর্ণনা করতে থাকবে। তার না পিপাসা লাগে। আর না সে ক্ষুধার্ত হয়। না তার মনে কোন প্রকার কামনা বাসনা জন্ম নেয়। তার মনে গুনাহের প্রতি কোন আগ্রহও জন্মায় না। এ কারণে যদি সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে তাহলে এর মাঝে কোন পূর্ণতা নেই। তার কোন কৃতিত্ব নেই যে সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। আমি তাকে এই কাজের জন্য সৃষ্টি করেছিলাম। তার মাঝে গুনাহের কোন চাহিদা আমি সৃষ্টি করি নি।

কিন্তু আদম সন্তানের মাঝে উভয় চাহিদাই দিয়ে রেখেছি। গুনাহের ক্ষমতা দিয়েছি এবং তাকওয়া অর্জনের যোগ্যতাও দান করেছি। যাতে যখন গুনাহের চাহিদাকে দাবিয়ে রেখে তাকওয়ার দিকে অগ্রসর হবে এবং আমার আনুগত্য করবে, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে তখন তার মর্যাদা ফিরিশতাদের থেকে বেড়ে যাবে। ফিরিশতাদের থেকে উন্নীত হয়ে যাবে।

হযরত ইউসুফ আঃ

দেখুন! হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ঘটনা সকলেই জানেন। কোরআনে কারীমে এসেছে এক নারী তাকে গুনাহের প্রতি আহ্বান করেছে। দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। দরজায় তালা লাগিয়ে বলেছে আস! গুনাহের জন্য আস! হযরত ইউসুফ (আঃ) রক্তমাংসে গড়া মানুষ, শক্ত সমর্থ যুবক। তদুপরি নির্জন স্থান। দরজায় তালা দেয়া। নফসও তাড়না দিচ্ছে, কোরআনের ভাষায়–

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا

যোলেখার মনে তো গোনাহের দৃঢ় সংকল্প ছিল। কোরআন বলছে, হযরত ইউসুফের মনেও মানবিক ইচ্ছা জেগেছিল। কেননা তিনি আদম সন্তান, মানুষ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা মনে আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। এজন্য তার মনেও

ইচ্ছা জন্মেছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলছেন, সে যদি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন না দেখত তাহলে সেও গুনাহে লিপ্ত হয়ে যেত। কেননা আল্লাহ তা'আলা অন্তরে পাপের সাথে খোদাভীতিও সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এ কারণে হযরত ইউসুফ (আঃ) দুইটা কাজ করেছেন। এক হলো আল্লাহমুখী হয়েছেন। হে আল্লাহ! আমি ফেঁসে গেছি। আমাকে এই বিপদ থেকে আপনার ফযল ও করমে মুক্তি দান করুন। আল্লাহর কাছে দো'আ করেছেন এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। দরজা পর্যন্ত গিয়েছেন অথচ তিনি জানতেন দরজায় তালা ঝুলছে। সামনে যাওয়ার কোন পথ নেই। তবে তিনি চিন্তা করেছেন, আমার সাধ্য আছে দরজা পর্যন্ত যাওয়ার। এরপর আল্লাহর কাছে দো'আ করলেন, আমার এতটুকু যাওয়ার ক্ষমতা ছিল। এখন দরজা খোলা আপনার কুদরতে। হে আল্লাহ! আপনার রহমতের মাধ্যমে এ থেকে আমাকে উদ্ধার করুন। দরজা পর্যন্ত পালিয়েছেন। তো পালানোর ফলে এটা হয়েছে যে, যখন দরজা পর্যন্ত পৌঁছেছেন তখন শুধু তালাই খুলেনি বরং ঐ মহিলার স্বামীকে দরজার বাইরে উপস্থিত পেয়েছেন। আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা এই কারিশমা দেখিয়েছেন। এটা ছিল ইউসুফ (আঃ) এর পূর্ণতা। যদি কোন ফেরেশতা হতেন এবং তার মনে গুনাহের প্রবৃত্তি সৃষ্টি না হতো এবং গুনাহ এর প্রতি আহ্বানকারী না থাকতো তাহলে এতে কোন পূর্ণতা থাকত না। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আঃ) এর মনে খায়েশ সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা তাকে গুনাহ থেকে বাঁচার তাওফিক দান করেছেন। যাই হোক, যখন কেউ নিজেকে বাঁচিয়ে তাকওয়ার পথ গ্রহণ করে তাহলে আল্লাহ তাআ'লা তার মর্যাদা ফিরিশতাদের চেয়ে উঁচু করে দিবেন।

ঈমানের হালত

এজন্য হাদীসে আছে, যদি কোন মানুষের মনে কোন বেগানা নারীর দিকে তাকানোর আগ্রহ জাগে এবং সুযোগও থাকে। আর এটা এমন ফিৎনা যা খুব ব্যাপক। অর্থাৎ পরনারীর খুব ছূরত আকৃতি দেখার আগ্রহ মনে সৃষ্টি হয়। আমি তাকে দেখবো এবং আত্মতৃপ্তি লাভ করবো। যদি কোন আল্লাহর বান্দা প্রবৃত্তির চাহিদাকে দমন করে স্বীয় দৃষ্টিকে সরিয়ে নেয় তখন তাকে আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা ঈমানের এমন স্বাদ ও মিষ্টতা দান করেন যার সামনে অন্যসব বিষয়ই তুচ্ছ হয়ে যায়।

নফস তো ভাঙ্গার জন্য

এই নফস তো আল্লাহ তা'আলা এজন্য বানিয়েছেন যে, তাকে আঘাত করে করে আল্লাহর তাজাল্লির (জ্যোতির) স্থান বানাবেন। মরহুম আল্লামা ইকবাল, কোন কোন সময় বড়ই বিজ্ঞতার সাথে বলতেন,

نو بچا بچانہ رکھ اسے کر یہ آئینہ ہے وہ آئینہ
چو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں

আয়না, আয়না বলে তাকে তুমি আগলে রেখো না,
আয়না সদৃশ দৃষ্টিতে এই প্রিয় হয়েছে যা ভেঙ্গেছে।

এই দিল যা আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'লা সৃষ্টি করেছেন এবং তুমি এ জন্যই তা নিরাপদ রাখতে চাচ্ছো যাতে তাতে চোট না লাগে, কষ্ট না আসে। অথচ এটাকে তো এই জন্যই বানানো হয়েছে যে, এর উপর যত চোট লাগবে, এর উপর যত আঘাত করা যাবে, এটা যত ভাঙ্গবে ততই আয়না সদৃশ হবে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে মহান হবে।

এখন যে ব্যক্তি এভাবে নফসকে ভাঙ্গে। অর্থাৎ খাহেশাতকে আল্লাহ সন্তুষ্টির লক্ষ্যে দলিত মথিত করে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফযল ও করমে তার অন্তরকে তাজাল্লির (জ্যোতির্ময়) স্থান বানান।

আরেকটি কবিতা

আমার শায়েখ হযরত আরেফী-আল্লাহ তার মর্যাদা বুলন্দ করুন– একটি কবিতা পড়তেন। প্রথমে কখনো তার উদ্দেশ্য বুঝে আসে নি। হযরত বলার পর বুঝে এসেছে।

یہ کہ کاسہ سازنی پیالہ پیخ دیا
اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے

যখন কুমার পেয়ালা বানায় এবং বানিয়ে ভেঙ্গে ফেলে। কেন ভাঙ্গলে? তখন সে বলে, এগুলো ভেঙ্গে এখন অন্য কিছু বানাবো। যখন এগুলো ভেঙ্গে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে তখন একটি নতুন ডিজাইন তৈরি হবে। এর উপর কারুকার্য থাকবে, সৌন্দর্য ফুটে উঠবে। এভাবে মনও আল্লাহর তাজাল্লির জায়গা হবে। আমিও কখনো কবিতা বলতাম। তো এই বিষয়ে একটি কবিতা বলেছিলাম,

درد دل دے کہ مجھے اس نے یہ ارشاد کیا
اب ہم اس گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا

মর্মব্যথা নিয়ে সে আমাকে বলল,
আমি এখন সে ঘরে থাকব যে ঘরকে সে গুঁড়িয়ে দিয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন আমিই মন বানিয়েছি এজন্য যে, তুমি তাকে যত বেশি ভাঙ্গবে এবং প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কাজ করে তাকে বিপন্ন করবে, আমিও তাকে তত বেশি আমার ঘর বানাবো। আমি সেই ঘরেই থাকবো যে ঘরকে সে বরবাদ করলো।

আল্লাহ ভগ্ন হৃদয়ের পাশে আছেন

হাদীসের মর্মার্থ এটাই–

ان الله مع المنكسرة قلوبهم-

আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের পাশে আছেন যাদের হৃদয় ভেঙ্গে গিয়েছে। যারা স্বীয় অন্তকরণকে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ভাঙ্গে। গুনাহের বাসনা তাদেরকে হাতছানি দেয় কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তাকে পদদলিত করে। এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নৈকট্য দান করেন। আল্লাহ তা'আলা তার সঙ্গী হয়ে যান। সুতরাং ভাই এটাই এই সূরার পয়গাম বা বার্তা।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পয়গাম

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে যদি এটা বলেন, এ সূরা পড় তাহলে এর মাধ্যমে এ বার্তা দিয়েছেন যে, আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই সুতরাং, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ ঐ সকল লোকদের দলভুক্ত হয়ে যাও যারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে স্বীয় আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। আর এ গুনাহই তো আযাব ডেকে আনে। এ পাপই তোর রাগ বাড়িয়ে দেয়। অন্যায় কাজ আল্লাহর ক্রোধ উসকে দেয়। তোমরা তো চাও ঐ কাজে, লিপ্ত থাকতে যার কারণে পূর্ববর্তী উম্মতরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ আপনাদের উপর রহমত নাযিল করুন। কোরআন বলছে তোমরা নিজেদেরকে গুনাহ থেকে পুত পবিত্র রাখ। وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ব্যর্থ সেই ব্যক্তি যে নিজেকে গুনাহে জর্জরিত করে ফাঁদে ফেলেছে। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে কারীমায় এই পায়গাম দিয়েছেন।

কওমে ছামুদ থেকে শিক্ষা লাভ করুন

এরপর নমুনাও বলে দিয়েছেন যে, দেখ, কওমে ছামুদ হযরত সালেহ (আঃ) এর সম্প্রদায়। তারা অবাধ্যতা এবং সীমালঙ্ঘনের পথ বেছে নিয়েছিল। তার ফল কি হয়েছিল, সর্বশেষ কোরআন বলছে।

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا-

তাদের প্রতিপালক তাদের গুনাহের কারণে সব ধ্বংস করে একাকার করে ফেললেন। যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন সূরা 'ওয়া শশামসি, পড়। এমনি তো তিলাওয়াতের কারণে বিরাট আজর ও ছাওয়াব রয়েছে। কিন্তু আমি এতে এই পয়গাম দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহর বান্দা! রাত দিন বসে বসে যা দেখছে, সভা সেমিনার করছে, আলোচনা-পর্যালোচনা হচ্ছে, অমুক এটা করেছে, তমুক ওটা করেছে, বলুন, এই আলোচনা করে কী লাভ? যত সময় এর পিছনে ব্যয় করছেন সে সময়টুকু আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হয়ে স্বীয় গুনাহের জন্য তাওবা ইস্তেগফার করুন। উম্মতের পূর্ববর্তী আমলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহর কাছে উম্মতের দুরবস্থার জন্য দো'আ করুন।

আপনি কি নিজেকে যাচাই করেছেন

যদিও আমরা মুখে বলছি এটা আমাদের গুনাহের ফল। আমাদের মন্দ আমল, আমাদের গুনাহের অনিবার্য পরিণাম এই আযাব। আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন, যা বলছেন, আমাদের গুনাহের কারণে এই আযাব, তো কোন গুনাহ ছাড়ার জন্য সংকল্প করেছেন? কোন গুনাহের কাজ বর্জন করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছেন? কখনো কি এভাবে নিজেকে যাচাই করে দেখেছেন? যে, আমার জীবনে কোন কোন গুনাহ হচ্ছে। আর আমি এগুলো থেকে যেটা ছাড়তে পারবো। ছেড়ে দিব। কখনো নিজেকে যাচাই করে দেখেছেন। যদি না দেখেন তখন শুধু? যে এটা হবে কথার কথা, আমাদের গুনাহের শাস্তি, এটা আমাদের গুনাহের আযাব।

কোরআন কারীম এহেন পরিস্থিতিতে বলছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ○

(سورة المائدة ١٠٥)

হে ঈমানদারগণ! নিজের ফিকির করো, নিজের খবর নাও। প্রতিটি মানুষ নিজেকে যাচাই করে দেখবে যে, সকাল সন্ধ্যার জীবনে আমার থেকে কোন কোন গুনাহের কাজ প্রকাশ পেয়েছে? কতবার মিথ্যা বলেছি, কতবার গীবত করেছি? কতবার অপাত্রে দৃষ্টি ফেলেছি? কতবার কানকে না জায়েয কথা শোনায় ব্যবহার করেছি? কতবার যবানের অপব্যবহার করেছি? এর যাচাই করে যদি "তুমি নিজের চিন্তা করো তাহলে যারা ভ্রষ্টতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

মশাল থেকে মশাল জ্বলে

এমনই হয়, যখন এক ব্যক্তি নিজের সংশোধন করল তখন একটি প্রদীপ জ্বলল। আল্লাহ তা'আলার বিধানই হলো মশাল থেকে মশাল জ্বলবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা আলোকে ছড়িয়ে দেন। এজন্য প্রিয় ভাই, ও বুযুর্গ! এই সূরার পয়গাম অনুযায়ী আজ আমরা সকলে এই সংকল্প করে উঠব যে, এই আযাবকে দূর করার জন্য, বিপদসংকুল পরিস্থিতি থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলার অভিমুখী হয়ে নিজের গুনাহের জন্য ইস্তেগফার করব এবং তাওবা করব। আমি সবাইকে অনুরোধ করবো, আমরা সবাই গিয়ে তাওবার নিয়তে দু'রাকাত নামাজ পড়ে পূর্বের সকল গুনাহের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবো। ইস্তেগফার করবো। ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলার কাছে অঙ্গীকার করবো, হে আল্লাহ! এখন আমি আপনার দ্বীন অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করতে চাচ্ছি এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সুদৃঢ় সংকল্প করছি। আপনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে তাওফিক দান করুন। এ দো'আ করার পর আপনি আপনার সংকল্পকে দৃঢ় করে সকল প্রকার গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকার চিন্তা করুন। তাহলে বেশি দূরে নয় যে, আঁধার টুটে সূর্য উঠে আলোর বন্যা বইয়ে দিবে। আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে ঈমানের নূর, ইসলামের নূর, আনুগত্যের নূর দান করুন। নিরাপত্তা বলয়ে আবিষ্ট রাখুন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফযল ও করমে আমাকে আপনাকে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

রমযান বিদায় নিচ্ছে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ إِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَآ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا تُوْبُوْا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ○ (التحريم : ٨) آمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

সূচনা

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করম যে, তিনি আমাদেরকে রমযানুল মোবারকের এই পবিত্রতম মুহূর্তটি দান করেছেন। তদুপরি আজ জুমার দিন। এটা জুমাতুল বিদাও হতে পারে। কেননা আগামী জুমায় ঈদুল ফিতর হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যদি ঊনত্রিশের চাঁদ না হতো তাহলে আগামী জুমা হতো সর্বশেষ জুমা। আর সর্বশেষ জুমার ব্যাপারে মানুষের মাঝে কিছু আহকামও প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। বাস্তবতা হলো জুমাতুল বিদা সম্পর্কে কোরআন হাদীসে বিশেষ কোন আলোচনা নেই। বরং রমযানুল মোবারকের প্রতিটি দিনই সম্মানিত এবং বরকতময়। বিশেষ করে যদি জুমার দিন হয় তাহলে তার সম্মান আরো বেশি। আর সর্বশেষ জুমার পর রমযানুল মোবারকে আর কোন জুমা আসে না। এ কারণে সর্বশেষ জুমার গুরুত্ব ও মর্যাদা আরো বেড়ে যায়।

রমযানুল মোবারকের সর্বশেষ জুমা

কিন্তু রমযানুল মোবারকের সর্বশেষ জুমাকে কোন কিছু মনে করা এবং এর সম্পর্কে কোন বিশেষ বিধান নির্ধারণ করা যেমন জুমাতুল বিদায় বিশেষ দুই রাকাত নামাজ পড়া, কিংবা এই অমুক ইবাদত করা। কোরআন এবং হাদীসে এমন কোন বিধান সাব্যস্ত নেই। হ্যাঁ রমযানুল মোবারকের প্রতিটি দিন ও প্রতিটি মুহূর্ত মহামূল্যবান। বিশেষ করে জুমার দিন। আর আখেরি জুমা তো আরো বেশি মূল্যবান। কারণ এরপর অন্য কোন জুমা রমযানুল মোবারকে আসবে না।

আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত

অবশ্য এটা বাস্তব কথা যে, যখন রমযানুল মোবারকের সর্বশেষ জুমা আসে তখন তা এ কথারই নির্দেশ করে যে, রমযান শেষ হয়ে যাচ্ছে। মানুষের তখন দুটি কাজ করা উচিত। এক হলো, তখন আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করা যে, আল্লাহ তা'আলা আপন অনুগ্রহ ও করুণায় আমাকে রমযানুল মোবারকের মূল্যবান সম্পদ দান করেছেন এবং একথার ও শুকরিয়া আদায় করা যে, আল্লাহ তা'আলা এই মাসে তার দরবারে উপস্থিত হওয়ার তাওফিক দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তার ফযল ও করমে রোজা রাখার ও তাওফিক দান করেছেন। নামাজ পড়ার, তারাবি আদায় করার সুযোগ দিয়েছেন। এ জন্যও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত যে, তিনি কোন না কোন ইবাদত করার তাওফিক দান করেছেন।

এগুলো সব আল্লাহর তাওফিকে হয়েছে

অন্যথায় এমন কত ঘর রয়েছে যার বাসিন্দারা জানেই না কবে রমযান এসেছে কবে রমযান গিয়েছে। না আছে রোজার গুরুত্ব। না আছে নামাজের গুরুত্ব। অন্য সব মাসের মত এমাস অতিবাহিত করে। আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করম যে, তিনি আমাদেরকে এমন লোকদের দলভুক্ত করেন নি। বরং রোজা রাখার, নামাজ পড়ার এবং তারাবী আদায় করার তাওফিক দিয়েছেন। এটা আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ। এই আশা রাখা উচিত যে, ইনশাআল্লাহ এই ইবাদত সমূহ তাঁর দরবারে কবুল হবে। আমাদের অবহেলা সত্ত্বেও আমাদের দুর্বলতা সত্ত্বেও আল্লাহ দয়ার আচরণ করবেন। আল্লাহ তাআ'লার রহমতের প্রতি সকল মুমিনের এই আশা রাখা উচিত।

তাওবা ইস্তেগফার করা উচিত

দ্বিতীয় হলো, তাওবা ইস্তেগফার করা উচিত। এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফযল ও করমে ইবাদত করার তাওফিক দান করেছেন। কিন্তু আমরা কীভাবে ইবাদত করেছি। না জানি কত অলসতা, কত ভুল ও বেখেয়ালিভাব ছিল। তাই আল্লাহর দরবারে ইস্তেগফার করা উচিত। কোরআনে কারীমে আছে

كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ○ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ○

(سورة الذاريات ١٧-١٨)

আল্লাহর নেক বান্দা তারা, যারা রাতে কম ঘুমায়। বরং রাতের বেলা আল্লাহর ইবাদত করে। দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে, রুকু করে, সিজদা করে, কিন্তু ভোর বেলায় ইস্তেগফার করে।

হক আদায় করতে না পারার কারণে ইস্তেগফার

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইস্তেগফার তো কোন গুনাহের কারণে হয়। যখন মানুষ কোন গুনাহ করে ফেলে তখন সে ইস্তেগফার করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু এখানে তো অবস্থা এই যে, রাতভর ইবাদত করছে আর সকালে ইস্তেগফার করছে। এরা কিসের ইস্তেগফার করছে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে ইস্তেগফার এ কারণে করছে যে, আয় আল্লাহ! আপনার ইবাদতের যে হক ছিল সে হক যথার্থরূপে আদায় হয়নি।

ماعبدناك حق عبادتك ماعرفناك حق معرفتك۔

হে আল্লাহ! আপনার ইবাদতের যে হক ছিল তা আমরা আদায় করতে পারিনি। হে আল্লাহ! আপনার মা'রেফাত ও পরিচয়লাভের যে হক ছিল তা আমরা আদায় করতে পারিনি।

প্রত্যেক ইবাদতের পর আল্‌হামদুলিল্লাহ! এবং আস্‌তাগফিরুল্লাহ্

আল্লাহ প্রদত্ত তাওফিকের উপর শোকরিয়া আদায় করো যে, তিনি আমাদেরকে ইবাদত করার তাওফিক দান করেছেন এবং ঐ ইবাদত সমূহ পালন করতে গিয়ে আমাদের থেকে যে ভুল ভ্রান্তি হয়েছে সে জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। রমযানুল মোবারকের শেষ দশকের কর্মসূচি এটাই। হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) বলেন, যখন কোন ইবাদত করার তাওফিক হয় তখন দু'টি করণীয়। এক আলহামদুলিল্লাহ বলা দুই, আস্তাগফিরুল্লাহ বলা।

আল হামদুলিল্লাহর মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা এবং শোকর আদায় করা যে, তিনি ইবাদতের তাওফিক দান করেছেন। আর আস্তাগফিরুল্লাহ এজন্য যে, যেভাবে ইবাদত করার কথা ছিল সেভাবে ইবাদত করা হয়নি।

বড় কঠিন হুমকি

তৃতীয় বিষয় হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস আছে যা সকল মুমিনের স্মরণ রাখা উচিত। তা এই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন এবং জিব্রাঈল আমীন (আঃ) এর দো'আর উপর আমীন বললেন। পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কোন কথার উপর আমীন বলেছেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি যখন মিম্বরে আরোহণ করছিলাম তখন আমার সামনে জিব্রাঈল আমীন আসলেন, তিনি দো'আ করলেন, আমি তার দো'আর উপর আমীন বললাম। (তিনি দো'আ করেছেন, ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি যে পুরো রমযান মাস পেয়েও নিজের গুনাহ মাফ করাতে পারেনি। -নাউযুবিল্লাহ। আপনি চিন্তা করে দেখুন কত কঠিন কথা, জীবরাঈল আমীন দো'আ করছেন। কোথায় দো'আ করছেন? মসজিদে নববীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বারের কাছে। দো'আর উপর আমীন কে বলছেন? নবী করীম, সারওয়ারে দো'আলম, মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এই দো'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা। এটা আসলে দো'আ না বরং বদ দো'আ। ধ্বংস ঐ ব্যক্তি যে পুরো রমযানুল মোবারক পেয়েও নিজের গুনাহ মাফ করাতে পারে নি।

আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকে

ভাই! রমযানুল মোবারক অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে এই হাদীসকে মনে রাখা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ বদদো'আ থেকে হেফাজত করুন। আমীন, তার কারণ হলো রমযানুল মোবারকে আল্লাহ তা'আলা প্রতি কদমে কদমে রহমত এবং মাগফিরাতের ওসীলা তালাশ করতে থাকেন। রোজা রেখেছ তো গুনাহ মাফ। তারাবিহ পড়েছ গুনাহ মাফ। রোযাবস্থায় তাওবা করেছ গুনাহ মাফ। মোট কথা কদমে কদমে আল্লাহ তা'আলা মাফের দরজা খুলে দিয়েছেন। আর হাদীস শরীফে আছে, রমযানুল মোবারকে জান্নাতের সব কটি দরজা খোলা থাকে, জাহান্নামের সব দরজা বন্ধ থাকে, কেন? এ জন্য যে আল্লাহ তা'আলা রহমতের বাহানা খোঁজেন। এ সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি পাপকে ক্ষমা করিয়ে না নিতে পারে তাহলে বুঝতে হবে সে রমযানুল মোবারকের রহমত থেকে দূরে সরে ছিল। এজন্য তাওবা ইস্তেগফার করে বাকি রোজাগুলো কাটানো চাই।

গোটা দেশ বিপদের শিকার

বিশেষ করে আজকাল, আপনারা সবাই জানেন আমরা কোন্ অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছি। আমাদের দেশে কী ঝড় উঠেছে। বিপদের ধারা অব্যাহত রয়েছে। পুরো জাতি তাতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এমন প্লাবন যে, পাকিস্তানের ইতিহাসে কখনো এমন প্লাবন হয়নি। আপনি একটু চিন্তা করুন, পানির ভিতর যে ঝর্না আছে সেটা নিরাপদ। কাবুল নদী যেটা আফগানিস্তান থেকে বের হয়েছে। কিন্তু আফগানে কোন প্লাবন নেই। প্লাবন পাকিস্তানে, পাঁচটি নদী যেগুলো ইন্ডিয়া এবং কাশ্মীর থেকে নির্গত হয়েছে। সেখানে কোন প্লাবন নেই। কিন্তু পাকিস্তানে এসে প্লাবনের রূপ ধারণ করে। এই প্লাবনের একটা ঝড় আপন জায়গায় রয়েছে। অন্যদিকে, হতাশা, গৃহ যুদ্ধ, আত্মঘাতী হামলা, মানুষ মানুষের রক্ত নিয়ে হলি খেলছে। মানুষকে টার্গেট করছে। এসব বিপদ এবং যন্ত্রণার কারণে শাষক গোষ্ঠী এমনকি গোটা জাতি পেরেশান। কারো উপর ভরসা নেই। কারো উপর বিশ্বাস নেই। এ ভয় হচ্ছে যে, লাগছে, এগুলো আমার আপনার বদ আমলের শাস্তি হিসেবে তো নয়? আল্লাহ আমাদের উপর স্বীয় করুণা বর্ষণ করুন।

আমল যেমন হবে শাসক তেমনি হবে

মানুষ শাসকগোষ্ঠীকে খারাপ বলে। তাদেরকে গালি দেয়। অথচ হাদীস শরীফে এসেছে যে, শাসককে গালি দিও না বরং নিজের আমলকে ঠিক করো। যে বিপদ আসে তা তোমার আমলের কারণেই আসে। যাকে গালি দিচ্ছেন তাকে তো আপনারাই এনেছেন। আপনাদের ভোটের মাধ্যমেই সে সেখানে পৌছতে পেরেছে। তো এখন গালি দিয়ে কি লাভ হবে? হ্যাঁ নিজের ভুলের জন্য তাওবা করুন। انما اعمالكم عمالكم তোমাদের শাসকবর্গ তো তোমাদেরই কর্মফল। সে তোমাদের আমলের আয়না স্বরূপ। এসব পরিস্থিতি যা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তা মূলত বদ আমলেরই শাস্তি। আর বদ আমল তো একটা নয়। নামাজ পড়ে না। রোজা রাখে না ইত্যাদি।

একজন নামাযীও নেই

এখন আমাকে সিন্ধুর এক জমিদার বলছিলেন, আমাদের গ্রামের চিত্র এই যে, একটা মসজিদ ছিল এবং তাতে ইমাম মুয়াজ্জিন এক ব্যক্তিই ছিলেন। কেননা সেখানে আর কোন নামাযি ছিল না। এজন্য তিনিই আযান দিতেন তিনিই নামায পড়তেন। বছরের পর বছর এ অবস্থা ছিল যে আযান দিয়ে তিনি নামাজের অপেক্ষা করতেন। একজন নামাজিও মসজিদে আসত না। মসজিদ বরাবর হোটেলে সিনেমা চলছে, ভিসিআর চলছে, টিভি চলছে। মানুষ বসে বসে

সিনেমা দেখছে। কানে আযানের আওয়াজ আসছে। কিন্তু মসজিদে আসার তাওফিক কারও হচ্ছে না। এই হাল, কালিমা জিজ্ঞাসা করুন। কালেমা আসে না।

প্রাণ ক্যাম্পে আগমনকারীদের চিত্র

আমরাও দারুল উলুমের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করেছি। আল্লাহ তা'আলা তাদের খেদমত করার তাওফিক দান করুন। কিন্তু যারা ক্যাম্পে আসে তাদের অবস্থা দেখে সত্যিই কান্না আসে। পাক নাপাকের কোন খবর নেই। ইস্তেঞ্জার প্রয়োজন নেই। অযু করতে পারেনা। নামায তো দূরে থাক। কালিমাও মুখ দিয়ে বেরোয় না। বেখবরি এবং গাফলতির একটা হালত তো এই।

নামাজিদের অবস্থা এই

কিছু লোক এমন আছে যারা নামাজ রোজা তো নিঃসন্দেহে করছে এবং রীতিমত মসজিদেও আসছে। কিন্তু যখন অফিসে গিয়ে বসে তখন ডাকাত হয়ে বসে। লুটেরা হয়ে বসে। যখন বাজারে যায়, ব্যবসা করে তখন লুটেরা হয়ে ব্যবসা করে। মানুষের চামড়া খুলে নেয়ার চিন্তা করে। এটাও বদ আমলের ঝড়। আল্লাহর তরফ থেকে আযাব আসবে না তো কী আসবে? যখন নামাজী, রোজাদার টাকার পাগল হয়ে যায়। মানুষের চামড়া খসানোর ধান্দায় থাকে এবং গোটা সমাজে হারামখোরী ছড়িয়ে পড়ে তখন কী হবে? আল্লাহর তরফ থেকে পাকড়াও হবে না? আল্লাহ অবকাশ দেন। অবকাশ দিতে থাকেন। এরপর পাকড়াও করেন। এতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দান যে, পুরা উম্মত ব্যাপক আযাবের কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে না। কিন্তু অংশের বিবেচনায় আযাব আসতে থাকবে। আগেও এসেছে এখনো আসতে পারে এবং ভবিষ্যতেও আসতে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহমুখী না হবো। নিজেদের গুনাহ থেকে মাফ না চাইবো, স্বীয় গুনাহকে বর্জন না করবো।

তাওবা ইস্তেগফার করো

এজন্য ভাই! আজ জুমা, রমযানের সম্ভবত শেষ জুমা। বিশেষভাবে সকলের কাছে দরখাস্ত করছি, সকল মুসলমান, ছোট বড়, আলেম জাহেল, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, একবার কাকুতি মিনতি করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন। তাওবা করুন, এবং অঙ্গীকার করুন যে, কখনো গুনাহ করবো না। কখনো নামাজ ছাড়বো না। রোজা ছুটবে না। যাকাত ঠিক ঠিক ভাবে আদায় করবো। মানুষের সাতে নৈতিকতার সাথে লেনদেন করবো। মিথ্যা বলবো না। গীবত করবো না।

অবৈধ পথে সম্পদ উপার্জন করবো না। হীনচক্রান্তে লিপ্ত হবো না। অফিসে বসে ঘুসের জন্য মানুষকে ঘুরাবো না।

ঘুষ জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে

জাতীয়ভাবে আমাদের উপর সবচেয়ে বড় যে আপদ চেপে বসেছে তা হলো আমাদের সমাজে ঘুস প্রচলিত হয়ে গেছে। আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহর ভয় রাখুন। চির জীবনের জন্য এই দুনিয়ায় থাকবেন না। একদিন না একদিন যেতে হবে। আল্লাহর জন্য সে সময়ের কথা স্মরণ করুন এবং হারাম ভক্ষণ পরিত্যাগ করুন। ঘুস গ্রহণ ছাড়ুন। প্রতারণা এবং মিথ্যা আশ্রয় ত্যাগ করুন। মানুষের অধিকার হরণ বন্ধ করুন। অন্যথায় আল্লাহর আযাব যে কোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে। কোরআন বলছে, মানুষ কি বে-খবর হয়ে নিরাপদে বসে আছে। আমার আযাব তাদের উপর নিদ্রিত অবস্থায় আসতে পারে। বিনিদ্র অবস্থায়ও আসতে পারে। আল্লাহ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। এখনও যদি হুঁশ না হয় তাহলে কবে আর হুঁশ হবে।

আল্লাহমুখী হোন

কোরআন বলছে, আযাব আসার আগে আগেই আমার দিকে রুজু করো। তাওবা ইস্তেগফার করো। এখনও কিছু রাত বাকি আছে। আল্লাহর ফযলে এক সপ্তাহ পর্যন্ত বাকি থাকবে। শেষ দশকের রাতও আসছে। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রতি রাতে একজন ঘোষক ঘোষণা করে। সুতরাং ভাই নিজের গুনাহসমূহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তাওবা করো, গুনাহ ছাড়ার অঙ্গীকার করো। সাথে সাথে সমস্ত উম্মতের জন্য দো'আ করো। হে আল্লাহ! আমাদের জাতিকে এই আযাব থেকে রক্ষা করুন। আমাদের অবস্থাকে পরিশুদ্ধ করুন। আমাদের দেশে শান্তি ও স্বস্তি দান করুন। একে প্রকৃত অর্থে পাকিস্তান বানিয়ে দিন। সঠিক মুসলমানদের দেশ বানিয়ে দিন। সঠিক অর্থে মুসলিম জনসাধারণ হওয়ার তাওফিক দান করুন। কাকুতি মিনতি করে এভাবে দো'আ করুন। আল্লাহর ফযল ও করমে অসম্ভব নয় যে, রমযানের শেষ দিনগুলো আমাদের জন্য মাগফিরাতের মাধ্যম হয়ে যাবে। আল্লাহর রহমতে জোশ আসবে। এবং আমাদের মাগফেরাত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে পরিপূর্ণ মাগফেরাত দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রমযান পরবর্তী জীবন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○ (البقرة : ١٨٥) اٰمَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

সূচনা

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'লা স্বীয় ফযল ও করমে আমাদেরকে রমযান মাস দান করেছেন। আজ রমযানুল মোবারকের সর্বশেষ দিন। আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা এই সময়ের জন্য এই আয়াতটি নাযিল করেছেন। যা আমি এখন আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন।

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

(سورة البقرة ١٨٥)

অর্থাৎ আমি এই মাসের রোজা তোমাদের উপর ফরয করেছি। এজন্য ফরয করেছি যাতে তোমরা ত্রিশ দিন গণনা পূর্ণ করতে পার।

এই ফযিলত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে

আল্লাহ তা'আলা এই অদ্ভূত শব্দ ব্যবহার করেছেন। যদি চিন্তা করা হয় তাহলে আমাদের জন্য এ শব্দে সান্ত্বনার বাণী রয়েছে। যে মুসলমানের রোজা রাখার তাওফিক হয়েছে, তার মনে কখনো না কখনো এই চিন্তা আসে যে, আমার থেকে তো রোজার হক আদায় হয়নি। যেভাবে রোজা রাখা উচিত ছিল সেভাবে রাখতে পারিনি। তাহলে কোরআন এবং হাদীসে রোজার যে ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে, আমি কি তা থেকে বঞ্চিত থাকবো? আমি কি তার বরকত সমূহ, রহমতসমূহ থেকে মাহরুম থাকবো। উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তি রোযা রাখবে, তার পিছনের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তার প্রবেশের জন্য জান্নাতে একটি বিশেষ দরজা থাকবে। যার নাম 'বাবুর বাইয়্যান, অর্থ, তৃপ্তদেরদের দরজা। যেহেতু এ বান্দা আমার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পিপাসার্ত ছিল। আমার খাতিরে পিপাসা সহ্য করেছে। আজ তার জন্য ঐ দরজা নির্দিষ্ট করা হয়েছে যার নামই পানতৃপ্তদের দরজা। রোজা আমার জন্য, আমি স্বয়ং তার বিনিময় দিব। অর্থাৎ অন্যান্য ইবাদতের জন্য তো বলা হয়েছে অমুক ইবাদতের উপর এত ছাওয়াব অর্জিত হবে। অমুক ইবাদতের উপর এত ছাওয়াব লাভ হবে। এই ইবাদতের ফলে জান্নাতে সুরম্য অট্টালিকা তৈরি হবে। কিন্তু রোজার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলছেন এটা আমার জন্য এবং আমিই তার বিনিময় দিব। যে বিনিময় দিব তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করো

এ সকল আজর, ছাওয়াব, এ ফযিলত বরকতসমূহ, রহমতসমূহ রোজাদারের জন্য রাখা হয়েছে। কখনো কখনো আমাদের মনে এই ধারণা আসে, আমাদের থেকে তো রোজা সঠিক অর্থে আদায় হতে পারেনা। তাহলে আমরা কি এসকল ফাযায়েল, বারাকাত থেকে বঞ্চিত হব? তার উত্তরে কোরআন বলছে, তোমরা রোজার হাকীকত বা পূর্ণতা কতটুকুই বা সম্পন্ন করবে, তার কিইবা হক আদায় করবে। আমি তো শুধু এতটুকুই চাই যে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ কর। আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা কর। আমি এই সংখ্যার মাঝেই বরকত দিব। ইনশাআল্লাহ! তোমাদেরকে ত্রিশটি রোজা রাখার জন্য বলা হয়েছে। তোমরা ত্রিশটি দিন পূর্ণ করো। যেমন তোমরা ত্রিশটি রোজা পালনে সফল হয়েছ এজন্য যে, তোমরা আমার হুকুমকে সম্মান করেছ। তোমরা আমার বিধান মেনেছ ঠিক আছে আমার হুকুমের খাতিরে খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করেছ ঠিক। তোমরা অক্ষম হয়েছ, দুর্বল হয়েছ। আর তোমাদের থেকে এই মহান ইবাদত পূর্ণাঙ্গ হয়নি যা

করা উচিত ছিল। কিন্তু আমি তোমাদের ইবাদত দেখবো না স্বীয় রহমত দেখবো। আমার রহমতের দাবি তো হলো এই যে, যখন তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে তখন তোমরা আমার নিকটে চলে আসবে। আমি নিজেই তোমাদেরকে প্রতিদান দিব।

'লাইলাতুল জায়েযা, পুরস্কারের রাত

আজ ঈদুল ফিতরের রাত। হাদীস শরীফে একে 'লাইলাতুল জায়েযা, অর্থাৎ পুরস্কারের রাত বলা হয়েছে। ঐ বান্দারা যারা রমযান মাসে আমার খাতিরে ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত ছিল। যারা আমার খাতিরে রাত জেগেছিল। আমার খাতিরে তারাবিতে দাঁড়িয়ে ছিল। আজকের রাত এই বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করার রাত। এই রাতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফযল ও করমে আমাদের মত দুর্বলদেরও পুরস্কৃত করেন।

আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করুন

এই আয়াতের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে, وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব বর্ণনা করো। তাকবীর বলো যেভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। যাতে তোমরা শোকর গুজার বান্দা হও। তোমরা তাকবীর বলো, একথা দ্বারা ঈদের নামাজের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ঈদুল ফিতরের নামাজে আপনি দেখেছেন, অন্যান্য নামাজের তুলনায় অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর বলা হয়। প্রথম রাকাতে তিন তাকবীর, দ্বিতীয় রাকাতে অতিরিক্ত তিন তাকবীর। الله اكبر الله اكبر বারবার তাকবীর বলা হয়। আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব বর্ণনা করা হয়। আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা হয়।

শ্রমিকের পারিশ্রমিক পূর্ণরূপে প্রদান কর

ইমাম যখন ঈদের নামাজের খোৎবা দেন তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত হলো যে, খোৎবার মাঝখানে বারবার তাকবীর বলা–

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد.

এটা মূলত কোরআনের আয়াত ولتكبروا الله على ماهداكم এর উপর আমল করা। আর বান্দা যখন ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করার জন্য ঈদগাহে সমবেত হয় তখন যে দৃশ্যের অবতারণা হয়, তা বর্ণনা করতে গিয়ে হুজুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ঈদের নামাজ আদায় করার জন্য ঈদগাহে যখন বিরাট জনসমাগম হয় তখন আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, হে আমার ফিরিশতারা বলো! এই শ্রমিকদের পারিশ্রমিক কী হওয়া উচিত? ফিরিশতারা উত্তরে বলেন, হে আল্লাহ! যে শ্রমিক তার কাজ পূর্ণরূপে সমাপ্ত করেছে, তার পারিশ্রমিকও পরিপূর্ণ হওয়া উচিত। এরপর আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের দিকে ইশারা করে বলেন, দেখ, দেখ, আমি আমার বান্দার উপর একটা বিধান ফরয করেছিলাম। আর তা হলো বান্দা পুরো একমাস রোজা রাখবে। বান্দা তার দায়িত্ব যথাযথ রূপে পালন করেছে। আজ আমার কাছে প্রার্থনা করার জন্য আমার বান্দারা এই ময়দানে জমায়েত হয়েছে। আমি আমার মর্যাদা ও মহত্ত্বের শপথ করে বলছি, আমি আমার মহিমার শপথ করে বলছি। আমি আমার সুউচ্চ ও সুমহান আরশের শপথ করে বলছি, আজ তাদের সকলের দো'আ কবুল করবো। আজকে তাদের মন্দগুলোকে ভাল দ্বারা পরিবর্তন করে দিব।

আমার কথামত সংখ্যা পূর্ণ করো

উপরোক্ত কথার দুটি উদ্দেশ্য। একটা উদ্দেশ্য হলো আমার বান্দা দুর্বল কমজোর। যেভাবে ইবাদত করা উচিত ছিল সেভাবে হক আদায় করতে পারেনা। বান্দা সব সময় এই চিন্তাই করে যে, আমি ইবাদতের হক আদায় করতে পারছিনা। কারণ বান্দা যখন ইবাদত করে তখন ইবাদতের মাঝেই বিভিন্ন চিন্তা মাথায় এসে ভর করে। খারাপ চিন্তা যেমন শামিল হয় তেমনি মন্দ চিন্তাও ঢুকে পড়ে। খুব কম সময়ই মানুষের মন মস্তিষ্ক সুস্থির থাকে। নামাজের জন্য আল্লাহু আকবার বলে নিয়ত বেঁধেছে। কিন্তু মন চলে গেছে কোন ভিনদেশে। মুখে যদিও কিরাত পড়ছে, কিন্তু মনে মনে অঙ্ক করছে। অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে, সম্পূর্ণ ধ্যান খেয়াল একত্র করে আমার অভিমুখী হতে পারেনি এসব কিছুই বান্দার মন্দ দিক। আজ তার এই মন্দের পরিবর্তে ভাল দিয়ে পূর্ণ করে দিব। কেননা সে তো আমার কথা অনুযায়ী সংখ্যা পূরণ করেছে। এখন আমি তার সাথে দয়ার আচরণ করবো। তার গুনাহকে নেকি বানিয়ে দিবো।

ক্ষমার ঘোষণা

এই ঘোষণার পর বান্দা যখন ঈদগাহ থেকে ফিরে আসে, তখন তার সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আপনি একটু চিন্তা করুন, ঈদুল ফিতরের দিন বান্দাকে কি মহান পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। আল্লাহ তা'আলার রহমতের দিকে

তাকান! যারা রমযানুল মোবারকে রোযা রেখেছে এবং তাদের সাধ্য অনুযায়ী ইবাদত করেছে, তারা যখন ঈদগাহ থেকে বের হবে তখন নিস্পাপ নিষ্কলুষ হয়ে বের হবে। অর্থাৎ তাদের আমল নামায় গুনাহের কোন দাগই থাকবে না। সব ধুয়ে মুছে একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কবীরা গুনাহের জন্য তাওবা আবশ্যক

তবে হ্যাঁ কবীরা গুনাহ বা বড় বড় গুনাহ তাওবা ছাড়া মাফ হবে না। যদি আল্লাহর দয়া হয় তাহলে তাওবা ছাড়াই যে কাউকে মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু নিয়ম হলো কবীরা গুনাহ তাওবা ছাড়া মাফ হবে না। ছোট গুনাহসমূহ আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন অসিলায় মাফ করে দেন। যেমন অযুর কারণে গুনাহ মাফ, মসজিদে গমনের কারণে গুনাহ মাফ, নামায পড়ার কারণে গুনাহ মাফ। পক্ষান্তরে বড় গুনাহ (মিথ্যা বলা, গীবত করা) ক্ষমার যোগ্য হওয়ার জন্য তাওবা শর্ত।

আমি তোমাদের ভিতরকেও পরিষ্কার করে দিব

একজন মুসলমানের বাহ্যিক অবস্থা হলো এই, যখন সে রোজা রাখে তারাবির নামাজ পড়ে রমযান মাস অতিবাহিত করে তখন সে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবা করে থাকে। হে আল্লাহ! গুনাহ করেছি তাওবা করছি, আপনি মাফ করে দিন। এজন্য ঈদের দিন আল্লাহ তা'আলা তার রমযানের তাওবা কবুল করে ঘোষণা করেন, যাও তোমাদের গোনাহকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দিলাম। তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিলাম। এখন ক্ষমার মালা পরে পুতঃপবিত্র হয়ে বাড়ি ফিরে যাও। প্রভাতে উঠে ঈদের নামাজের পূর্বে যখন তুমি গোসল করেছ তখন তুমি তোমার দেহকে পবিত্র করেছ। এখন যখন নতুন জামা পরে ঈদগাহে এসেছ এখন আমি তোমার ভেতরকে ধুয়ে মুছে পবিত্র করবো। ফিরে যাও। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আল্লাহ তা'আলা ঈদের দিন বান্দাকে যে পুরস্কার দিচ্ছেন এটা কি কোন সাধারণ পুরস্কার।

ঈদগাহ থেকে বের হয়ে কী করবো?

অবশ্য দেখার বিষয় হলো, এদিনে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আপন অনুগ্রহে পুতঃপবিত্র করেছেন, আমাদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। আমাদের গুনাহসমূহ নেকী দ্বারা বদলে দিয়েছেন। এটা তো তার পক্ষ থেকে পরম দয়া। কিন্তু আমাদের কাজ কী? ঈদগাহ থেকে বের হয়ে আবারও গুনাহে লিপ্ত হবো? আবার গুনাহের জীবনে ফিরে যাব? স্বীয় আত্মায় গুনাহের কালিমা লেপন

করবো। আল্লাহ তা'লা তো তোমার দেহকে, তোমার ঈমানকে, তোমার রূহকে পবিত্র করেছেন। তোমাকে ক্ষমা করেছেন। তোমার অচল আমল কবুল করেছেন। তুমি তো ইবাদতের যথাযথ হক আদায় করোনি, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা অসীম অনুগ্রহে অশেষ করুণায় একথা বলেছেন, তুমি শুধু সংখ্যা পূর্ণ করো আমি তোমার হিসাব পূর্ণ করবো।

কোনো মুসলমানের কাজ এটা নয়

তোমাদের অবস্থা তো এই, তোমরা এদিকে পুতঃপবিত্র হয়ে ঈদগাহ থেকে বের হয়েছ অন্যদিকে গুনাহের জীবন পুনরায় শুরু করে দিয়েছ। আর লুটপাটের চিন্তা, ঘুস খাওয়ার ধান্ধা, মানুষের সাথে প্রতারণা করা, মিথ্যা বলা, গীবত করা, উলঙ্গপনা ও অশ্লীলতায় মেতে উঠেছো। এসব করে কি তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত মহান নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করছ? এমন চিন্তার কোন অবকাশ নেই যে, রমযান শেষ আমরা স্বাধীন। যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াবো, যে পথে খুশি মাল কামাবো। মনমত খরচ করবো। মনে রাখবেন এটা মুসলমানের কাজ নয়।

দ্বিতীয়বার গুনাহের কালেমা লেপন করবেন না

মুসলমানের কাজ তো এমন যেমন একটি ধ্বধবে সাদা কাপড়। একে খুব যত্ন করে রাখা যাতে কোন দাগ না লাগে। ময়লা ধূলা বালি থেকে যোজন যোজন দূরত্বে নিরাপদে তুলে রাখা হয়। কারণ সাদা কাপড়ে দাগ খুবই বিশ্রী দেখা যায়। দূর থেকেই দৃষ্টিগোচর হয়। তবে কাপড়টা যদি আগে থেকেই ময়লা থাকে। একশটা দাগ ভর্তি। সাথে আরেকটা দাগযুক্ত হলো। এতে কি কোন পার্থক্য থাকে? এজন্য আল্লাহ তা'আলা যখন স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে ধুয়ে মুছে পাক করেছেন তখন আমাদের খুব চেষ্টা করা উচিত যাতে নতুন করে কোন দাগ না ভরে। যেভাবে রমযান মাসে প্রচণ্ড খরতাপে আপনি পিপাসার্ত ছিলেন, এক ফোঁটা পানির জন্য হৃদয় উন্মুখ ছিল কিন্তু আপনি আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভয়ে, রোজা ভেঙ্গে যাবে এ কারণে পানি পান করেন নি। ঠিক তেমনি নিরন্তর সাধনা করে, প্রাণান্তপ্রচেষ্টা চালিয়ে আল্লাহর ভয়কে সামনে রেখে তার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে গুনাহ বর্জন করুন।

চোখকে গুনাহ থেকে হেফাজত করুন

রমযানুল মোবারকের পর আপনার দিকে চতুর্দিক থেকে গুনাহের হাতছানি আসবে। গুনাহের দাবি পুনঃপুন আপনার সামনে উত্থাপিত হবে। মন চাইবে একটু গুনাহ করি। কিন্তু যেভাবে রমযান মাসে আপনি পানি পান থেকে বিরত

ছিলেন ঠিক তেমনি এখন গুনাহের সময় গুনাহ থেকে বিরত থাকুন। উদাহরণ স্বরূপ মন বলছে, চোখের আনন্দের জন্য নফসের তৃপ্তির জন্য সিনেমা দেখ। এতে আমার চোখ আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করবে। মনে রাখবেন শয়তান আপনার মনে এই তাগাদা দিচ্ছে। আর আপনার নফ্স আপনাকে মানসিকভাবে প্ররোচিত করছে। কিন্তু আপনি আল্লাহর জন্য চক্ষুকে গুনাহ থেকে হেফাজত করুন। একথা ভাবুন, আমার মালিক আমাকে এ চোখ দু'টি নেয়ামত হিসেবে দিয়েছেন। বিনামূল্যেই আমি এই নেয়ামত পেয়ে গেছি। যখন এই নেয়ামত আমার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে তখন বুঝতে পারবো কত বড় নেয়ামত ছিল। দৃষ্টি শক্তিতে সামান্য দুর্বলতা এলে মানুষ তাকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে দুনিয়ার অর্থ খরচ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। অতএব এ মহান নেয়ামত আমি আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিরুদ্ধে ব্যবহার করবো না। এ চিন্তা করে মানুষ তার চোখকে গুনাহ থেকে বিরত রাখবে।

আমি গীবত করবো না

এটাই হলো ঈমানের দাবি যে, মনে একটি বাধা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে যাবে। সেই বাধা ও বিদ্বেষের নামই হলো তাকওয়া। যা মানুষের প্রবৃত্তির লাগাম টেনে ধরে। যেমনিভাবে রমযানে এই বাধা ছিল তেমনি ভাবে প্রত্যেক গুনাহের প্ররোচনার সময়ও এই বাধা থাকা চাই। উদাহরণস্বরূপ, বন্ধুদের জমজমাট আসর বসেছে। হাসি তামাসা হচ্ছে। কাউকে নিয়ে মজা করছে। তার দোষ চর্চা করছে আর সবাই মজা নিচ্ছে। এটা গুনাহের তাগাদা। রমযানে পানি পান করা থেকে যেভাবে বিরত ছিলে এভাবে এখন নিন্দা করা থেকে বিরত থাক। আমি কোন মুসলমান ভাইয়ের অগোচরে তার নিন্দা করবো না। তাকে এমন কোন ঠাট্টা করবো না যার কারণে সে কষ্ট পায় কিংবা তার মন ভেঙে যায়।

আমি ঘুষ নিব না

অথবা আপনি কোন সরকারি অফিসের বড় কর্মকর্তা। কিংবা সরকারি কার্যালয়ের কোন বড় দায়িত্বে আছেন। এখন ঐ অফিসে কোন মানুষ কোন কাজের জন্য আপনার কাছে এসেছে। আর আপনি ঐ কাজটা করে দেয়ার জন্য তার কাছে হাজার বা লাখ টাকা ঘুস দাবি করলেন। তখন আপনার রোজার পরীক্ষা হবে, আপনি রমযানে যে রোজা রেখেছেন তার দ্বারা আপনার মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি হয়েছে না হয়নি? আমি কি ঐ লাখ টাকার উপর ঠোকর দিব। কেননা এটা হারাম উপার্জন। এটা আমার রিযিক হারাম করে দিবে। এই টাকা পেয়ে আমার দেহে যে গোস্ত বৃদ্ধি পাবে তাও হারাম হবে। যদি এই হারাম টাকা

দিয়ে আমার সন্তান লালন পালন করি তাহলে তারাও হারামভাবে বেড়ে উঠবে। আমি আমার সন্তানদের হারাম অর্থে লালন পালন করবো না। আমার দেহে হারাম গোস্ত বাড়তে দিবো না। চাই আমার কপালে ডাল রুটি না জুটুক। চাই আমি অনাহারে থাকি। ক্ষুধায় কষ্ট পাব। তবুও আমার জীবনে সুদের একটা পয়সাও ব্যয় করবো না। যেদিন মনমস্তিষ্কে এ চিন্তার নবোদয় হবে সেদিন রোজার হাকিকত অর্জিত হবে। ব্যাস্ মানুষ চেষ্টা করবে এবং দো'আ করবে।

আল্লাহ্ তাআলার কাছে তাওফিক তলব করুন

এখন রমযানুল মোবারকের কিছু মুহূর্ত বাকি আছে। ঈদের নামাজের সমাগম দো'আ কবুলের সময়। আজকের রাতও দো'আ কবুলের রাত। আল্লাহ তা'আলার কাছে খুব দো'আ করুন। হে আল্লাহ! এই রোজার হাকিকত (তাৎপর্য) আমাদেরকে স্বীয় জীবনে বাস্তবায়ন করার তাওফিক দান করুন। এবং ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন। অন্যায় অনাচার থেকে, ধোঁকা-প্রতারণা থেকে, দুর্নীতি ও হারামভক্ষণ থেকে আমাদের রক্ষা করুন। এই দো'আ করুন। এরপর সংকল্প করুন, ব্যস্ মানুষ দুইটা কাজ করবে। এক দৃঢ় সংকল্প ও প্রত্যয়ের সাথে কাজ করবে। দ্বিতীয় আল্লাহ! তা'আলার কাছে প্রার্থনা করবে। হে আল্লাহ! আমি তো প্রতিজ্ঞা করেছি। কিন্তু হে আল্লাহ! আপনার তাওফিক ছাড়া আমি কিছু করতে পারবো না। এ দো'আ করুন। যদি চাওয়ার মত করে চান মনকে পবিত্র রাখেন এবং স্বীয় জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক পরিচালিত করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ এই দো'আ কবুল হবে। আপনার প্রতিজ্ঞা বিফলে যাবে না। আল্লাহ তা'আলা সঠিক জীবন দান করবেন।

আমাদের দেশের উপর আযাব ঝুলে আছে

এখন আমাদের দেশের উপর আমাদের বদআমলের, হারাম কর্ম কাণ্ডের আযাব ঝুলে আছে। আল্লাহ তা'আলার কাছে আমরা হারাম ভক্ষণ থেকে পানাহ চাইবো। বর্তমানে আমাদের দেশে যে প্লাবন এসেছে, যে বিপদ দেখা দিয়েছে, মানুষ টার্গেটে পরিণত হচ্ছে। কারো জানমাল নিরাপদ নয়। এসব কী? আল্লাহর ওয়াস্তে ফিরে আসুন। আল্লাহর জন্য নিজেকে দুরস্ত করুন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফযল ও করমে আমাদেরকে বুঝার তাওফিক দান করুন। স্বীয় জীবনকে আল্লাহর মর্জি মোতাবেক সাজানোর তাওফিক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

যিলক্বদ মাসের ফযিলত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ. وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ إِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَآ شَرِيْكَ لَهُ. وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ وَالْفَجْرِ ○ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ○ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ○ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ○ هَلْ فِي ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ○ آمَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

ভূমিকা

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! এখন যিলক্বদ মাস চলছে। এমনি তো সব মাস আল্লাহ তা'লা সৃষ্টি করেছেন এবং দিনের সব সময়ও আল্লাহর সৃষ্টি। কিন্তু আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা কিছু নির্দিষ্ট সময়কে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। সেই নির্ধারিত দিনগুলোর ধারাবাহিকতা শুরু হয় শাবান থেকে এবং মোহাররম মাসে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। শাবান মাসে রোজা রাখা ফযিলতপূর্ণ। এ মাসে বরাআতের (গুনাহ মুক্তির) রাত আসে। যে রাত্রে ইবাদত করার বিশেষ ছাওয়াব আছে। এরপর রমযান মাস। যার দিনগুলো বরকতময়। রাতগুলো সম্মানিত। যে মাসকে আল্লাহ তা'আলা ইবাদতের জন্য বানিয়েছেন এবং বিশেষ ফযিলত দান করেছেন।

হজ্বের আড়াই মাস

রমযানের পরের মাস হলো শাওয়াল মাস। আর শাওয়াল থেকেই 'আশহুরে হজ্ব, তথা হজ্বের মাসসমূহ শুরু হয়ে যায়। কোরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ ○ (سورة البقرة ١٩٧)

অর্থাৎ "হজ্বের জন্য নির্দিষ্ট কিছু মাস আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন যে, হজ্বের মাস হলো, শাওয়াল, যিলক্বদ, এবং যিলহজ্বের দশ দিন। হজ্বের মাস হওয়ার অর্থ হলো, হজ্বের নিয়ত করে হজ্বের দিনগুলোতে ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হওয়া। চাই সেটা হজ্বে তামাত্তু[১] কিংবা হজ্বে কিরান[২] বা হজ্বে ইফরাদ[৩] হোক। অর্থাৎ শাওয়ালের পূর্বে যদি কোন ব্যক্তি হজ্বের নিয়ত করে বের হতে চায় তাহলে তার জন্য ইহরাম বাঁধা জায়েয হবে না। কিন্তু শাওয়ালের প্রথম দিনের পর যে দিনেই হজ্বের জন্য রওয়ানা হবে ঐ দিনেই হজ্বের ইহরাম বাঁধতে পারবে। এজন্য সোয়া দুইমাসকে হজ্বের মাস বলে। পূর্বে যেহেতু মানুষ পায়ে হেঁটে হজ্বে গমন করত। সেহেতু দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে আসতে একমাস দুই মাস সময় লেগে যেত। তাই উক্ত মাসগুলোকে হজ্বের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে।

তার উপরও হজ্ব ফরজ হয়ে যাবে

এছাড়াও একটি মাসআলা এই যে, কোন ব্যক্তি যদি হজ্বের মাসগুলোতে মক্কায় পৌঁছে এবং সেখানে অবস্থান করতেও সক্ষম হয় তাহলে চাই এর পূর্বে তার উপর হজ্ব ফরয না হোক কিন্তু এই মাসসমূহে সেখানে পৌঁছার কারণে তার উপর হজ্ব ফরয হয়ে যাবে। এই বিবেচনায় আড়াই মাস, অর্থাৎ শাওয়াল, যিলকদ, যিলহজ্ব এর প্রথম দশ দিনকে কোরআনে কারীমে হজ্বের মাস হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছে।

যিলক্বদ সম্মানিত মাস

উক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, যিলক্বদ মাসও হজ্বের মাস। আর বাহ্যত আল্লাহ তা'আলা হজ্বের জন্য যে দিনগুলো নির্বাচিত করেছেন। যে মাসগুলো মনোনীত করেছেন। তা ঐ মাসগুলোর সম্মান এবং পবিত্রতার প্রমাণ বহন করে।

১। মীকাত (ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থান) থেকে প্রথমে ওমরার ইহরাম বেঁধে ও ওমরা সম্পন্ন করে মক্কা থেকে হজ্বের ইহরাম বেঁধে একই সঙ্গে উভয় ইবাদত করাকে 'তামাত্তু, বলে।

২। মীকাত থেকে হজ্ব ও ওমরার ইহরাম বেঁধে একই সঙ্গে উভয় ইবাদত করাকে হজ্বে কিরান বলে।

৩। মীকাত থেকে শুধু হজ্বের ইহরাম বেঁধে উক্ত সফরে শুধু হজ্ব আদায় করাকে হজ্বে ইফরাদ বলে।

দ্বিতীয় কথা হলো আল্লাহ তা'আলা এমন কয়েকটি মাস নির্ধারণ করেছেন যে মাসগুলোতে লড়াই করা, যুদ্ধ করা জায়েয নেই। সেই মাসগুলোর একটি হলো যিলক্বদ মাস। যদিও ওলামায়ে কেরাম বলেছেন এই মাসে লড়াই নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান পরবর্তীতে বাতিল হয়ে গেছে। যাই হোক, এ মাসসমূহকে সম্মানিত মাস বা আশহুরে হুরুম বলে। অর্থাৎ এ মাসে লড়াই করাকে আল্লাহ তা'আলা নিষিদ্ধ করেছেন। এই বিধানও যিলক্বদ মাস সম্মানিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

যিলক্বদ মাস সম্পর্কে ভুল ধারণা

আমাদের সমাজে কিছুকাল যাবত যিলক্বদ মাসকে বরকতশূন্য মনে করা হয়। জানি না কেন এই মাসকে অবরকতময় বলা হয়। কিছু মানুষ তো একে অমঙ্গলজনক বলে। এখন আর তো সেই কথা অতটা প্রচলিত নয়। এক সময় মানুষ বলতো এটা 'খালি, মাস। এ মাসে বিবাহ শাদী করা দোষণীয়। মানুষ বলত, রমযান মাস বরকতের মাস। শাওয়াল মাস ঈদের মাস আনন্দের মাস, তারপরের মাসও ঈদের মাস। মাঝখানে যিলক্বদ হলো নিরানন্দ মাস। বরকত শূন্য মাস। এ কারণে এমাসে বিবাহ শাদী করা অনুচিত। কেননা এ মাসের বিবাহ-শাদী হবে বরকতশূন্য।

যিলক্বদ মাসের ফযিলত

এটা যাহেলী যুগের ধ্যান-ধারণা। শরিয়তের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। কোন ভিত্তিও নেই। আমি ইতোপূর্বে বলেছিলাম যে, এটা হজ্বের মাস এবং এই মাসে যুদ্ধ জিহাদ, লড়াই হত্যা ইত্যাদি হারাম করা হয়েছে। এই মাসের একটা ফযিলত হলো এই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হায়াতে তয়্যিবায় চারবার ওমরা আদায় করেছেন। এর মধ্যে একটা আদায় করেছেন যিলহজ্ব মাসে আর বাকি তিনটা আদায় করেছেন যিলক্বদ মাসে। একটা ওমরাতো 'ওমরাতুল কাযা, নামে প্রসিদ্ধ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে বাইতুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করছেন এবং ওমরা আদায় করছেন। যেহেতু নবীদের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে। তাই তিনি এই স্বপ্নকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দেশ মনে করেছেন। যেন এটা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা আমি সাহাবীদের নিয়ে ওমরার জন্য যাই।

মক্কাবাসীর সাথে সন্ধি

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের এক জামাত নিয়ে ওমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হন। হারামে কোরবানি করার জন্য

সঙ্গে করে কোরবানির পশুও নিয়ে নেন। কিন্তু যখন মক্কার নিকটবর্তী হন তখন মক্কার কাফেররা তাকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার কাফেরদের কাছে বার্তা পাঠালেন, আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি। আমরা তো শুধু এই উদ্দেশ্যে এসেছি যে, ওমরা পালন করবো, এবং পশু কোরবানি করে ফিরে যাবো। কিন্তু মক্কার কাফেররা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কা প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। বরং লড়াই করতে মনস্থ করেছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠান এবং বলে দেন, যদি এরা সন্ধি করতে সম্মত হয় তাহলে তো ঠিক আছে অন্যথায় লড়াই হবে। আর লড়াই-ই-হবে মীমাংসা। অবশেষে মক্কার কাফেররা কতিপয় সর্দারকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সন্ধি করার জন্য পাঠায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে সন্ধি করেন ঐ সন্ধির একটা শর্ত এই ছিল যে, এই বছর আমরা আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিব না এবং ওমরাও করতে দিব না। এখন আপনি ফিরে যাবেন। আগামী বছর আসবেন। মক্কায় তিনদিন অবস্থান করবেন। তরবারি আনবেন সঙ্গে করে তবে কোষবদ্ধ অবস্থায়। যাতে কোন ধরনের লড়াই না হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ শর্ত মেনে নেন এবং কোরাইশদের সাথে সন্ধি করেন। তিনি বললেন, আমি এ শর্তসমূহ মেনে নিচ্ছি। আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও এই নির্দেশই এসেছে।

সন্ধির মাঝে অনেক হিকমত নিহিত ছিল

আল্লাহ তা'আলার কোন কাজই হিকমতশূন্য নয়। এই ঘটনা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অনেক মাসয়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। একটি মাসয়ালা এই যে, মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে যদি কখনো কাফেরদের সাথে সন্ধি করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে সন্ধি করা যায়েয আছে। এই ঘটনা থেকে দ্বিতীয় যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তাহলো, যদি কোন ব্যক্তি হজ্ব কিংবা ওমরা করার উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে ঘর থেকে বের হয় এবং পথিমধ্যে কোন সমস্যার কারণে মক্কায় পৌঁছতে না পারে তাহলে ঐ অবস্থায় সে কী করবে? কীভাবে সে নিজের ইহরাম খুলবে? সে সম্পর্কে কোরআনে কারীমের আয়াত নাযিল হয়েছে–

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ○ (سورة البقرة ١٩٦)

ইহরাম বাঁধার পর তোমাদেরকে যদি মক্কায় যেতে এবং তাওয়াফ করতে বাঁধা দেয়া হয় তাহলে ঐ অবস্থায় তোমাদের জন্য বিধান হলো এই যে, একটি পশু কোরবানি কর। এরপর হালাল হয়ে যাও। নিজের ইহরাম খুলে নাও এবং আগামী বছর কাযা করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করো।

যিলক্বদ মাসে নবী (স.) ওমরাতুল কাযা করেছেন

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটি করেছেন। তখন ইহরাম খুলেছেন, কোরবানি করেছেন এবং মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে এসেছেন। অতঃপর সন্ধির শর্ত মোতাবেক পরের বছর এসেছেন। ওমরা আদায় করেছেন। মক্কা মোকাররমায় তিনদিন অবস্থান করেছেন। এরপর মদীনায় ফিরে এসেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিলক্বদ মাসেই ঐ ওমরা আদায় করেছেন। আর এই ওমরাকে ওমরাতুল কাযা বলে। কারণ এটা ছিল প্রথম ওমরার কাযা।

নবী (স.) যিলক্বদ মাসেই সকল ওমরা আদায় করেছেন

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় দ্বিতীয়বার ওমরা পালন করেন। মক্কা বিজয়ের পর যখন তিনি হুনাইনের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিলেন। জিঈররানাতে ওমরার ইহরাম বাঁধেন। এই ওমরাও যিলক্বদ মাসেই আদায় করেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যত ওমরা পালন করেছেন সবকটি যিলক্বদ মাসেই পালন করেছেন। শুধুমাত্র একটা ওমরা ছাড়া যা তিনি হজ্বের সাথে আদায় করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি দেখুন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিলক্বদ মাসকেই ওমরার জন্য বেছে নিয়েছেন। এদিক থেকে যিলক্বদ মাস অন্যান্য মাস থেকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। অতএব এমাস সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করা যে, এটা অশুভ মাস। এ মাসে কোন বরকত নেই। এটা একেবারেই ভুল এবং অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা।

কোনো দিনই অশুভ নয়

আসল কথা হলো আমরা দীর্ঘ একটা সময় ভারতবর্ষে হিন্দুদের সংস্পর্শে ছিলাম। ফলে হিন্দুদের অনেক সংস্কৃতি আমাদের মাঝে ঢুকে পড়েছে। হিন্দুদের মাঝে শুভ অশুভের মহামারি রয়েছে। অমুক দিন শুভ, অমুক দিন অশুভ। অমুক দিনে কল্যাণ আছে। বাস্তবে কোনদিনই অশুভ নয়। বছরের ৩৬৫ দিন আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। কোনো দিনই অপয়া নয়। কোনো দিনই বরকতশূন্য নয়। হাঁ কোন কোনো দিনকে আল্লাহ তা'আলা নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে তার ফযিলত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ জন্য ফযিলতপূর্ণ অসংখ্য দিন, মাস, সপ্তাহ রয়েছে। যার ফযিলত স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কোন দিন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা একথা বলেন নি অমুক দিন অশুভ। অমুক দিন বরকতশূন্য।

মন্দ আমলের কারণেই অমঙ্গল হয়

হ্যাঁ, বে-বরকতি আর অমঙ্গল হয় আমাদের বদ আমলের কারণে। যেদিন আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হওয়ার তাওফিক হয়েছে। যে দিন আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হওয়ার তাওফিক হয়েছে সেদিনই বরকতময়। আল্লাহ না করুন যেদিন কোন পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যাই, কোন নাফরমানি করে ফেলি ঐদিনই আমাদের জন্য অশুভ, অমঙ্গল। সত্তাগতভাবে ঐদিন অশুভ নয়। কিন্তু আমাদের আমলের কারণে ঐ দিনে অমঙ্গল সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট কোন দিনে অমঙ্গল নেই। অশুভ তো হলো আমাদের অবাধ্যতা, পাপাচারে লিপ্ততা। হ্যাঁ, যেদিন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইবাদত করার তাওফিক দান করেছেন, এবং আমরা আল্লাহমুখি হই সেই দিনই বরকতময়।

প্রতিরাতেই শবে ক্বদর হতে পারে

হযরত শায়েখ সাঈদী (রহ.) বলেন,

ہر شب شب قدر است گر قدر بدانی

সকল রাতই তোমার জন্য শবে ক্বদর হতে পারে, যদি তুমি তার মর্যাদা বুঝ। অর্থাৎ যে রাতে আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়ার তাওফিক হবে সে রাতই তোমার জন্য শবে ক্বদর হতে পারে। কারণ শবে কদরের 'মানশা' বা উদ্দেশ্য এটাই যে সে রাতে আল্লাহর ইবাদত করা হবে, এবং আল্লাহ তা'আলা ঐ ইবাদত কবুল করবেন। কথা ঠিক তবে বিশেষ শবে ক্বদরের ফযিলত সহস্র মাসের সমান। কিন্তু যে রাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রুজু হওয়ার তাওফিক দান করবেন এবং তোমার তাওবা কবুল হয়ে যাবে, তোমার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ছাওয়াব দান করবেন। তোমার উদ্দেশ্যপূর্ণ হবে সেই রাত উদ্দেশ্যেই বলেছে, "সব রাতই তোমার জন্য শবে ক্বদর হতে পারে, যদি তুমি তার কদর বুঝ। আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি দিনই বরকতময় তবে শর্ত হলো তার সঠিক ব্যবহার হতে হবে।

যিলহজ্বের প্রথম দশদিন

যিলক্বদের পর যিলহজ্ব মাস আসছে। যিলহজ্ব সম্পর্কেও কিছু বিধান আছে। বিশেষ করে যিলহজ্বের প্রথম দশ দিন যাকে "আশারা যিলহিজ্জা বলে। আল্লাহ তা'আলা তার বিশেষ ফযিলত বর্ণনা করেছেন। এক হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রমযানুল মোবারক ছাড়া অন্য কোন দিনের আমল আল্লাহ তা'আলার কাছে এত প্রিয় নয়, যিলহজ্বের প্রথম দশদিনে নেক আমল করা আল্লাহর কাছে যত প্রিয়। অর্থাৎ এই দশদিনে যত ইবাদত

করা হবে সেটা আল্লাহ তা'আলার কাছে অনেক প্রিয় অনেক পছন্দনীয়। এজন্য এই দিনগুলোতে ইবাদতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া উচিত। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন এই দিনের একটি রোজা ছাওয়াবের দিক দিয়ে এক বছর রোজা রাখার সমান। যিলহজ্ব থেকে নিয়ে নয়ই যিলহজ্ব পর্যন্ত সকল দিনের একই ফযিলত। দশই যিলহজ্ব যেহেতু ঈদের দিন এজন্য সে দিনে রোজা রাখা হারাম। আর ঐ রাতের কোন এক রাতে জেগে ইবাদত করাকে শবে ক্বদরের রাতে ইবাদত করার সমতুল্য বলা হয়েছে।

সারকথা

যাই হোক! দুটি কথা বলবো। এক, যিলক্বদ মাস সম্পর্কে আমাদের সমাজে যে ভুল প্রচলিত আছে তার সংশোধন হওয়া অত্যাবশ্যক। এই মাসে কোন অমঙ্গল নেই কোন বে-বরকতি নেই। এই মাস সম্পর্কে এই ধারণা করা যে, এ মাসে বিবাহ-শাদী করা ঠিক নয়, এটা একদম ভুল ধারণা। দ্বিতীয় কথা হলো ইনশাআল্লাহ আগামী জুমার পর যিলহজ্ব মাস শুরু হবে। প্রথম যিলহজ্ব থেকে নিয়ে নবম যিলহজ্ব পর্যন্ত যতদিন আছে সবগুলোকে গনীমত মনে করে বেশি বেশি আল্লাহ অভিমুখী হওয়া। এই দিনগুলো আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করার দিন তাই–

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر

এই কালেমা বেশি বেশি পাঠ করা উচিত।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফযল ও করমে আমাদেরকে এ কথাগুলোর উপর আমল করার তাওফিক দান করুন আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হজ্ব এবং কোরবানি আমাদেরকে কী শিক্ষা দেয়?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ إِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَآ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ وَالْفَجْرِ ○ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ○ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ○ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ○ هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ○ آمَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

ভূমিকা

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করমে বিগত দিনগুলোতে দুটি মহান ইবাদত সম্পন্ন করার তাওফিক আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন। একটি মহান ইবাদত ছিল হজ্ব পালন। এই সৌভাগ্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দান করেছেন যারা হজ্বের সফরে গিয়েছেন। এজন্য আল্লাহ তা'আলার যত বেশি শোকর আদায় করা হোক তাও কম হয়ে যাবে। এই অযোগ্যকেও আল্লাহ তা'আলা কোন অধিকার ছাড়াই এই বছর হজ্ব করার সৌভাগ্য দান করেছেন।

হজ্ব এবং কোরবানির জন্য নির্দিষ্ট সময়

দ্বিতীয় মহান ইবাদত হলো কোরবানি। যা প্রত্যেক মুসলমানের পালন করা উচিত সে যে অঞ্চলেরই হোক। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে পালন করার তাওফিক দান করুন। হজ্ব এবং কোরবানি এদু'টি ইবাদত এমন যে, আল্লাহ তা'আলা এর জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ঐ নির্ধারিত সময়ের

মধ্যেই পালন করতে হবে। নির্ধারিত সময় ছাড়া কেউ যদি ঐ ইবাদত করতে চায় তাহলে সে আদায় করতে পারবে না। আর অন্যান্য ইবাদত যেমন নামাজ, যদিও দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরয কিন্তু নফলের নিয়তে আপনি যখন ইচ্ছা আদায় করতে পারবেন। যাকাত যদিও বছরে একবার ফরজ হয়, কিন্তু নফল ছদকা আপনি যখন ইচ্ছা করতে পারেন। রোযা যদিও রমযান মাসে ফরয হয় কিন্তু নফল রোযা আপনি যখন ইচ্ছা রাখতে পারেন। তার ছাওয়াব আছে– আজর আছে।

হজ্ব শুধু ৮ই থেকে ১২ই যিলহজ্ব পর্যন্ত

কিন্তু হজ্ব এমন একটি ইবাদত যা শুধু ৮ থেকে ১২ই কিংবা ১৩ই যিলহজ্ব পর্যন্ত। এ সময় ছাড়া আপনি কোন নফল হজ্ব চাইলে আদায় করতে পারবেন না। আজও আরাফার ময়দান বিদ্যমান। আজও মোযদালিফার উন্মুক্ত প্রান্তর বিদ্যমান। মিনার জামারাত এখনও বহাল আছে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি মুযদালিফায় গিয়ে যদি সারাদিন সারারাত অবস্থান করে তাহলে তার হজ্ব আদায় হবে না। আর কেউ মিনায় গিয়ে শয়তানকে কংকর মারতে চাইলে বড় আসানির সাথে মারতে পারবে। কিন্তু আজ ঐ ইবাদতের সুযোগ নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা এর জন্য নির্ধারিত সময় রেখে দিয়েছেন।

কোন আমলের সত্তাগত কোন মর্যাদা নেই

এর মাধ্যমে এই শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য যে, কোন আমলই সত্তাগত ভাবে মর্যাদা রাখে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহর হুকুমের সাথে না মিলাব। যতক্ষণ পর্যন্ত না নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের সাথে শামিল হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ আমল ইবাদত হতে পারে না। যেমন, জামরায় পাথর মারা। আজকে পাথর মারেন কোন ইবাদত হবে না। অথচ সেদিন জামরায় পাথর মারা মহান ইবাদত। সেখানে দো'আ কবুল হতে থাকে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হতে থাকে। আরাফার ময়দান, আজ সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। আল্লাহকে ডাকেন। তিলাওয়াত, যিকির আযকার করতে থাকেন। যিকিরের ছাওয়াব তো পাবেন কিন্তু আরাফায় অবস্থানের ছাওয়াব অর্জিত হবে না।

এর মাধ্যমে এই শিক্ষাই দেয়া হচ্ছে যে, যে আমলকে আমি (আল্লাহ) ইবাদত বলব সেটাই ইবাদত। মানুষ চিন্তা ভাবনা করে যদি কোন কাজকে ইবাদত বলে স্বীকৃতি দেয় তাহলে সেটা ইবাদত হতে পারেনা। যাই হোক! হজ্ব এমন একটা ইবাদত যা নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট দিনে সম্পন্ন করতে হয়।

কোরবানি শুধু ১০ থেকে ১২ যিলহজ্ব পর্যন্ত

কোরবানির ব্যাপারটিও এমন যে, আল্লাহ তা'আলা সারা বছরে কোরবানির জন্য তিনটি দিন নির্ধারণ করেছেন। তা হলো ১০, ১১ ও ১২ই যিলহজ্ব। এই তিনদিনে কোরবানি ইবাদত। আর তার এত বড় আজর ও ছাওয়াব যে, হাদীস শরীফে এসেছে "আল্লাহ তা'আলার কাছে আজকের দিনে কোরবানির রক্ত প্রবাহিত করা থেকে অধিক প্রিয় কোন ইবাদত নেই"। সকল নফল ইবাদত তার সামনে তুচ্ছ। তবে শুধু এই তিন দিনের মধ্যেই, যখন ১২ যিলহজ্বের সূর্য ডুবে যাবে তখন ইবাদতের সময়ও শেষ হয়ে যাবে। এখন আপনি হাজারো উট জবেহ করেন এতে ইবাদত তো হবে কিন্তু ছাওয়াব পাবেন না। অন্যান্য দিনে মানুষ সদকার নিয়তে পশু জবেহ করে। সদকার ছাওয়াব পায়। কিন্তু কোরবানির ছাওয়াব অর্জিত হয় না। কোরবানি হলো পশুর গলায় ছুরি চালানো। যখন রক্ত প্রবাহিত হল, তখন এটা ইবাদত হয়ে গেল। এরপর চাই আপনি নিজে গোস্ত খান কিংবা অন্যকে খাওয়ান। অথবা সদকা করে দেন। সেটা ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু কোরবানির ইবাদত শুধু গলায় ছুরি চালালেই আদায় হয়ে যাচ্ছে। এ ইবাদত শুধু ঐ তিন দিনেই আদায় হবে অন্য দিনে আদায় হবে না। যদি আপনি নফল কোরবানি করতে চান তাহলেও পারবেন না। কেননা এই দিনকে আল্লাহ তা'আলা কোরবানির জন্য নির্ধারণ করেন নি। হাঁ, পশু জবেহ করে গোস্ত সদকা করে দিতে পারেন। এতে করে সদকা করার ছাওয়াব পাবেন। কিন্তু কোরবানির আজর ছাওয়াব এবং কোরবানির ইবাদত এই তিন দিনের সাথেই নির্দিষ্ট। এটা আল্লাহ তা'আলার হিকমত এবং তাঁর ইচ্ছা। তিনি যে ইবাদতকে চেয়েছেন কোনদিনের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন এবং যে ইবাদতকে চেয়েছেন বছর ব্যাপী করার অনুমতি দিয়েছেন।

হাজীদের কালিমা

যাই হোক! এ দুটি মহান ইবাদত আল্লাহ তা'আলা এই যিলহজ্ব মাসে মুসলমানদেরকে পালন করার আদেশ দিয়েছেন। এক, হজ্বের ইবাদত দুই কোরবানির ইবাদত। এই ইবাদত সমূহের ভিন্ন ভিন্ন কালেমা আছে। যা ইবাদত পালনকারীদের দিয়ে বলানো হয়। হজ্বের একটি কালেমা। কোরবানির আরেকটি কালেমা, হাজীদের কালেমা হলো, لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك له لبيك،

ان الحمد والنعمة لك والملك، لاشريك له۔

হজ্বের দিনে যাকেই দেখবেন, দেখবেন তার মুখে এই কালেমা জারি আছে। এই কালেমাকে আল্লাহ তা'আলা এত মর্যাদা দান করেছেন যে,

রেওয়ায়াত বা বর্ণনা থেকে একথা বুঝা যায়, ওমরা কিংবা হজ্বের ইহরাম বাঁধা অবস্থায় لبيك اللهم لبيك থেকে উত্তম কোন যিকির নেই। যেহেতু হাজী যখন ইহরাম বাঁধে, তো ইহরাম বাঁধা থেকে নিয়ে জামরায়ে আকাবার রামী করা পর্যন্ত তার মুখে এই কালিমা জারি থাকে এবং নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যখন কোন উঁচু স্থানে আরোহণ করো তখন বলো لبيك اللهم لبيك এবং যখন নিচে নামো তখন বলো لبيك اللهم لبيك যখন খাবার খাচ্ছো তখনও বলো لبيك اللهم لبيك পরস্পর যখন সাক্ষাত করো তখনও বলো لبيك اللهم لبيك যখন নামাজ পড়ে অবসর হয়েছো তখনও বলো لبيك اللهم لبيك কোন মোড় ঘুরছ তখনও বলো لبيك اللهم لبيك চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে, প্রতি কদমে কদমে এই কালেমা বলানো হচ্ছে।

এই কালেমার অর্থ

এই কালেমার অর্থ কী? لبيك اللهم لبيك হে আল্লাহ! আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির। আরবী ভাষায় যখন কেউ কাউকে কোন কাজের জন্য ডাকে এবং বলে অমুক কাজ করো। তখন আরবী ভাষায় উত্তর প্রদানের জন্য لبيك এই কালেমা বলা হয়। অর্থাৎ আমি মনে প্রাণে আপনার আদেশ পালনে হাযির।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ঘোষণা

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে আল্লাহ তা'আলা যখন বাইতুল্লাহ নির্মাণের আদেশ দিয়েছেন। এবং তিনি বাইতুল্লাহ নির্মাণ সম্পন্ন করেছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে এই আদেশ দিয়েছেন যে,

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ○

(سورة الحج ٢٧)

অর্থাৎ মানব জাতির মাঝে ঘোষণা করে তাদেরকে হজ্বের জন্য আহ্বান করো। মানুষ হেঁটে হেঁটে এবং দুর্বল উটের উপর সওয়ার হয়ে আপনার কাছে আসবে। তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনার্থে এক পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে মানব জাতিকে লক্ষ্য করে ঘোষণা করেছেন। আস! আল্লাহর ঘরের দিকে আস। এখানে এসে আল্লাহর ইবাদত করো। আল্লাহ তা'আলা তার অসীম কুদরতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর এই ঘোষণা গোটা মানবজাতির কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। যখন কোন হাজী কিংবা ওমরাকারী ইহরাম

বেঁধে এই শব্দ বলে لبيك اللهم لبيك বাস্তবে সে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর আহ্বানে সাড়া দেয়। যার উদ্দেশ্য হলো, হে আল্লাহ! আমি আপনার আদেশ পালনার্থে হাযির।

আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশে লাব্বাইক বলো

কিন্তু বারবার যে শব্দগুলো বলা হচ্ছে, উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে, শয়নে-জাগরণে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরের সময়। নিচে নামার সময়, উপরে ওঠার সময়। বিভিন্ন সময় এই যে শব্দগুলো বলা হচ্ছে এর নিগূঢ় রহস্য রয়েছে যার দিকে বান্দাকে অভিমুখী করা হচ্ছে। সে রহস্য এই যে, এখন তো নিঃসন্দেহে আল্লাহর আদেশ পালন করণার্থে হজ্ব করতে কিংবা ওমরা করতে এসেছো। কিন্তু একজন মুমিনের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মূলত লাব্বাইক। অর্থাৎ মুমিনের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মুমিনের কাজ হলো আল্লাহ তা'আলার ডাকে লা-ব্বাইক বলে সাড়া দেয়া। যখন আল্লাহ তা'আলার কোন নির্দেশ আসবে তখনও বান্দা মাথা নত করে বলবে لبيك اللهم لبيك হে আল্লাহ! আপনার হুকুম পালনার্থে হাযির। যদি আল্লাহ নামাজের জন্য ডাকেন তখনও বলো لبيك اللهم لبيك আল্লাহ তা'আলা রোজার জন্য ডাকছেন তো বলো লাব্বাইক। আল্লাহ তা'আলা যাকাত দেয়ার জন্য ডাকছেন তখনও বলো লাব্বাইক। আল্লাহ তা'আলা অন্যের সাথে উত্তম আচরণের আদেশ করছেন তো বলো লাব্বাইক। আল্লাহ তা'আলা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বলছেন তো বলো লাব্বাইক। অর্থাৎ আমি আপনার সকল কাজের অনুসারী। আর এটাই আমার জীবনের শপথ। যখন আপনার তরফ থেকে কোন নির্দেশ আসবে তখন আমি মাথা পেতে দিব। যখন আপনার পক্ষ থেকে কোন কিছু নিষেধ করা হবে তখন আমি বিরত থাকব। এটা হজ্বের শিক্ষা যা হজ্বের একেকটি রোকনে মানুষকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর সকল বিধানের সামনে মানুষ মাথা নত করে রাখবে।

কোরবানির সময়ে দো'আ

আর দ্বিতীয় ইবাদত, যা কোন দিনের সাথে নির্ধারিত। কিন্তু কোন স্থানের সাথে নির্দিষ্ট নয়, তা হলো কোরবানি। যে বান্দা কোরবানি করছে, তাকে একথা বলানো হয় যে, তুমি কোরবানি করার সময় বলো।

إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○ (سورة الأنعام ١٦٢)

অর্থাৎ যখন আল্লাহর জন্য পশু কোরবানি করছেন তখন আপনার যবানে এই কালিমা থাকা চাই যে, হে আল্লাহ! আমার নামাজ আপনার জন্যই। আমার কোরবানি আপনার জন্যই! আমার জীবন আপনার জন্যই। আমার মৃত্যু আপনার জন্য। অর্থাৎ আমার সব কাজ আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। এই কথাগুলো কোরবানির সময় বলানো হয়। আর কোরবানির সময় এই কালিমাগুলো পড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত।

আল্লাহর প্রতিটি আদেশের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান

কিন্তু এই কালেমাসমূহে শুধু কোরবানির কথা উল্লেখ করা হয়নি বরং এও বলানো হয়েছে যে, আমার নামাজও আল্লাহর জন্য। আমার জীবন আল্লাহর জন্য। আমার মরণ আল্লাহর জন্য। তো এখন প্রশ্ন জাগে যে, কোরবানির সময় অন্য কথা কেন বলানো হচ্ছে? কী এর উদ্দেশ্য? প্রকৃতপক্ষে এই কালেমাসমূহের মাধ্যমে কোরবানিকারীকে স্মরণ করানো হচ্ছে যে, তুমি মনে করো না কোরবানির পর তোমার কাজ শেষ। এটা প্রথাগত কোন কোরবানি নয় যে, একবার আদায় করলে শেষ হয়ে গেল। বরং তুমি যে পশু কোরবানি করছ এটা তো একথারই নিদর্শন যে, আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনের জন্য আমি প্রস্তুত। এবং তার নিদর্শনের উপর ভিত্তি করে আপনি কোরবানি করছেন যার অর্থ, হে আল্লাহ! আপনি বলেছেন, তাই আপনার আদেশ পালনার্থে আমি একাজ করেছি।

আমি প্রতিটি কাজ আল্লাহর জন্য করবো

কিন্তু এটা মনে করবেন না যে, এখানেই কাজ শেষ। কেননা আপনি মুমিন। আর প্রত্যেক মুমিনের কাজ এটাই হওয়া উচিত যে, তার জীবন-মরণ সব কিছু আল্লাহর জন্য হবে। কোরবানির ফরয পালন করে, বাস্তবে আপনাদের থেকে একটি কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। কোরবানি তো এমন কাজ বাহ্যত তার কোনো উপকার দৃষ্টিগোচর হয় না। একটি বকরি ছিল, আপনি তার গলায় ছুরি চালিয়েছেন। একটি গরু ছিল আপনি তাকে জবেহ করেছেন। পয়সা উড়িয়েছেন। আর ঐ প্রাণী আল্লাহর প্রিয় হয়ে গেছে। আপনি যদি আপনার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক দিয়ে এই কাজ সম্পর্কে চিন্তা করেন তাহলে বাহ্যত কোন উপকার চোখে পড়বে না। কিন্তু আপনাদের দ্বারা এই কাজ এজন্যই করানো হচ্ছে যে, আপনারা বলবেন, হে আল্লাহ! যখন আপনার পক্ষ থেকে কোন কাজের নির্দেশ আসবে, চাই আমার বুঝে আসুক বা না আসুক, আমার বোধগম্য হোক বা না হোক, আমি তাতে ফায়দা দেখতে পাই বা না পাই, আমি আপনার আদেশ পালন করবো।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর হুকুম পালন করেছেন

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর হুকুম পালন করেছেন। তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, স্বীয় পুত্রকে কোরবানি কর। যে ছিল নিরাশার মাঝে আশার আলো, মরুর বুকে এক ফোঁটা বারি, শত প্রার্থনার ফসল কেবলমাত্র চলাফেরার যোগ্য হলো। বাবার সাহায্যকারী কর্মের সহযোগী হলো তখন নির্দেশ আসল আপন পুত্রকে কোরবানি করো। এই নির্দেশকে আপনি যদি যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচার করেন, তাহলে ঐ নির্দেশের সামনে সকল যুক্তিতর্ক বিফল হবে। প্রথমত একটি নিষ্পাপ, নিরপরাধ শিশুকে হত্যা করা জঘন্যতম কাজ। কোরআন ইরশাদ করছে–

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ○

(سورة المائدة ٣٢)

যদি কোন মানুষ কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে তাহলে সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করল। আর নিরপরাধ ব্যক্তিটি কে? একটি নাবালেগ শিশু।

জিহাদেও শিশু হত্যা না করার নির্দেশ

শিশুদের ব্যাপারে এই বিধান ছিল যে, যদি কাফেরের সাথে জিহাদ হতো তখনো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম বাহিনীকে এই শিক্ষা দিতেন যে জিহাদ করো, কিন্তু কোন নারী, শিশু, বৃদ্ধকে হত্যা করো না। জিহাদে গমনকারী প্রত্যেক বাহিনীকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই নির্দেশ দিতেন। এই যে আজকের আধুনিক সভ্যতা যারা নিজেদেরকে শান্তির পতাকাবাহী বলে দাবি করে। তাদের কাজ, জনপদগুলোর উপর বোম মেরে শিশু, নারী, বৃদ্ধদের শেষ করা। কিন্তু জনাবে মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠিন থেকে কঠিন মুহূর্তেও সাহাবা কেরামকে এই শিক্ষা দিয়েছেন–

لاتقتلو وليدا ولا امرأة ولا شيخا فانيا۔

কোন শিশু, নারী বা বৃদ্ধকে হত্যা করো না। এজন্য শিশু হত্যা তো সীমাহীন গুনাহের কারণ।

খলীলুল্লাহর পুত্রের উত্তর

কিন্তু ইব্রাহীম (আঃ)কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে শিশু পুত্রকে জবেহ কর। কোন শিশু? স্বীয় পুত্র। পিতা যেন স্বীয় পুত্রকে জবেহ করেন। এর চেয়ে বড় মানবতা বিরোধী কোন কাজ কী হতে পারে। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ, সন্তানকে কোরবানি কর। এরপরও হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেন নি যে, আয়

আল্লাহ! এই আদেশে কোন্ কল্যাণ নিহিত আছে? এতে কী হিকমত আছে? কোন অপরাধে আমি আমার সন্তানকে জবেহ করবো? বরং তিনি এই নির্দেশকে যথারীতি বাস্তবায়নের জন্য পুরোদমে প্রস্তুত হয়ে যান এবং নিজের সন্তানকে পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞাসা করেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবেহ করছি। বলো এখন তোমার কী সিদ্ধান্ত? আর সন্তানও তো ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর সন্তান? এমন সন্তান যার বংশে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেছেন। সেও পাল্টা প্রশ্ন করে বলে নি, আব্বাজান, আমি তো কোন অন্যায় করি নি? আমি তো কোন অপরাধ করি নি? যার পরিণামে আমাকে ছুরির নিচে মাথা রাখতে হবে।

উত্তরে পুত্র বলল,

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ○

(سورة الصافات ١٠٢)

আব্বাজান! আপনাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা আপনি পালন করুন। (আমাকে পরওয়া করবেন না।) ইনশাআল্লাহ আমাকে ছবরকারীদের দলভুক্ত পাবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামত পর্যন্ত এ সুন্নত জারি করে দিয়েছেন

না পিতার এ সন্দেহ হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার এই বিধান বিবেক বিরোধী। একে কীভাবে মানব? না পুত্রের কোন সন্দেহ হয়েছে। শয়তান ধোঁকা দেয়ার জন্য এসেছে। এসে বলে কী করছ? নিজের ছেলেকে হত্যা করছ। এরপর শয়তান হযরত হাজেরার কাছে এসে বলেছে তোমার স্বামীকে দেখ সে তোমার ছেলেকে জবাই করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। তারপর হযরত ইসমাঈল এর কাছে এসে বলেছে তোমার বাবার কী হয়েছে যে তোমাকে মেরে ফেলার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। তিনজনই শয়তানকে ভর্ৎসনা করে আল্লাহর আদেশের সামনে মাথা নত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা কেয়ামত পর্যন্ত এ সুন্নতকে জারি রেখেছেন। তারা তিনজন যেভাবে শয়তানকে ভর্ৎসনা করেছিলেন, আজও প্রত্যেক তাওহিদী সেনা শয়তানকে জামরায় পাথর মেরে ঐ ঘটনা স্মরণ করেন। যখন পিতা পুত্র জবেহের স্থানে পৌঁছলেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সম্পর্কে বলেন ঃ

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ○ (سورة الصافات ١٠٣)

যখন পিতা পুত্র উভয়ে আল্লাহ তা'আলার আদেশের সামনে অনুগত হলেন এবং পিতা পুত্রকে যমীনের দিকে মুখ করে শোয়ালেন।

আল্লাহর আদেশের সামনে মাথা নত করুন

যাই হোক! এই কোরবানির মাধ্যমে এই শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, যখন আমার কোন আদেশ আসে, তখন চাই সে আদেশ তোমার জ্ঞানের ক্ষুদ্র পরিসরে যুক্তিতর্কের মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য হোক বা না হোক, তবুও যেহেতু আমার আদেশ, তাই তার সামনে মাথা নত কর। কোরবানি বাস্তবে বন্দেগীর নিদর্শন। কোরবানির পর ভবিষ্যতের দাবি হলো আমার গোটা জীবনকে আল্লাহর হুকুমের অনুগামী করা। আর কোরবানির মাধ্যমে আপনি এই অঙ্গীকারবদ্ধ হন যে, আমি একথার উপর অঙ্গীকার করছি যে, আমার জীবন, আমার মরণ বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য নিবেদিত। আর এ কোরবানি একটি নিদর্শন হিসেবে পালন করছি। কিন্তু আগামীতে আমার গোটা জীবন আল্লাহর আদেশের অনুগামী হয়ে কাটাবো। এভাবে এখন আমি একথার উপর অঙ্গীকার করছি যে, ভবিষ্যত জীবনে আল্লাহর হুকুমের পূর্ণ আনুগত্য করবো। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে কাজের আদেশ করা হবে সে কাজ করবো। আর যে কাজ থেকে নিষেধ করা হবে সে কাজ থেকে বিরত থাকবো।

এই প্রতিশ্রুতির নবায়ন

এটাই হজ্বের শিক্ষা এবং এটাই কোরবানির শিক্ষা। হজ্বে لبيك اللهم لبيك বলিয়ে এবং কোরবানিতে–

إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

বলিয়ে একজন মুসলমানের কাছ থেকে নতুনভাবে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়। একটা অঙ্গীকার যখন প্রথমবার আপনি করেছিলেন।

اشهدان لا اله الا الله واشهدان محمدا رسول الله ـ

আসল অঙ্গীকার তো আপনি তখন করেছিলেন যখন বলেছিলেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে খোদা মেনে নিতে আমি অপ্রস্তুত এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী মেনে তাঁর শিক্ষার অনুসরণ করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কিন্তু এখন কোরবানির দিনে এবং হজ্বের মাসে ঐ প্রতিজ্ঞা নবায়ন করা হচ্ছে। একে সজীব করা হচ্ছে, এবং স্মরণ করানো হচ্ছে।

এই প্রতিজ্ঞার উপর অটল থাকুন

যাই হোক! আমাদের মধ্য থেকে চাই কেউ হজ্ব করে বসে আছেন কিংবা কোরবানি করে বসে আছেন। আমরা সকলে কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সাথে এক

নতুন প্রতিজ্ঞা করেছি। তাহলো আমরা আমাদের আগামী জীবন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি মোতাবেক তার বিধান মেনে অতিবাহিত করবো। যে আদেশ আসবে, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তা পালন করবো এবং যে গুনাহ থেকে নিষেধ করা হবে তা থেকে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করবো। আল্লাহ তা'আলা তার ফযল ও করমে স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের সকলকে এই প্রতিজ্ঞার উপর অটল থাকার তাওফিক দান করুন এবং তদনুযায়ী আমাল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রবীউল আওয়াল মাসের তাৎপর্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَآ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا ○ (سورة الأحزاب ٢١) آمَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

ভূমিকা

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! রবিউল আওয়াল মাস চলছে, তাই রবিউল আওয়াল মাস সম্পর্কে আপনাদের সামনে কিছু বলার ইচ্ছা করলাম। রবিউল আওয়াল মাস আসলে আমাদের দেশে সিরাতুন নবী মাহফিলের ধুম পড়ে যায়। অলি, গলি, পাড়া, মহল্লায়, রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নবীজির সিরাত নিয়ে বয়ান হয়। দুনিয়া ও আখেরাতের সরদার, জগতবাসীর জন্য রহমতের আধার নবী (স.) এর বরকতময় জীবন চরিত আলোচনা করা এটা মানুষের জন্য মহা সৌভাগ্য ও আনন্দের ব্যাপার এবং অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন একটি ইবাদত। অতএব, যে সকল মুসলমান এসব মাহফিলে অংশগ্রহণ করে, তারা ইবাদত পালন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোবারক আলোচনা শ্রবণের জন্য অংশগ্রহণ করে।

দিনটি ছিল বড় বরকতময়

কিন্তু এখানে কয়েকটি বিষয় বুঝার আছে, প্রথম কথা হলো, সীরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহফিলগুলো সাধারণত এই মাসে হয়ে থাকে। কারণ এই মাসেই জনাবে মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরার বুকে শুভাগমন করেছেন। তিনি যেদিন এ ধরায় আগমন করেছেন, নিঃসন্দেহে বলা যায় এদিনটি ছিল পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি এমন কি কেয়ামত পর্যন্ত মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ও মহান দিন। কারণ এদিনে আল্লাহর ফযল ও করমে জগত সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং মানব জাতি হেদায়াতের পথ পায়। একজন মুমিনের জন্য এর চেয়ে খুশির দিন আর হতে পারে না।

জন্মবার্ষিকী পালনের কোন ভিত্তি নেই

ইসলামে যদি জন্মদিন পালন করার বৈধতা থাকত, এবং ইসলাম এটাকে পছন্দ করতো তাহলে দুজাহানের বাদশা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনের চেয়ে অধিক আনন্দ ও খুশির বিষয় আর কিছুই হতো না। সে দিনটি ঈদ ও উৎসবের দিন হওয়ার যোগ্য হতো। কিন্তু আল্লাহ জাল্লা শা'নুহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে যে ধর্ম দান করেছেন সে ধর্মে অন্য ধর্মের অনুসরণ করে জন্মবার্ষিকী পালনের কোন অবকাশ নেই। সমগ্র কোরআনে, হাদীসের ভাণ্ডারে, সারওয়ারে দু'আলেমের কথায়, সাহাবায়ে কেরামের কাজে, তা'বীঈদের যুগে কোন জন্মবার্ষিকী কিংবা মৃত্যুবার্ষিকীর কোন উল্লেখ নেই।

ইসলাম প্রথামুক্ত একটি ধর্ম

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে দ্বীন দান করেছেন তা, প্রথাবদ্ধ সকল রীতি-নীতির ঊর্ধ্বে। ইসলামে দ্বীনের অনুসারীদেরকে একথাই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আসল কাজ ওটাই যার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেছেন। যদি তোমরা তাঁর কাজ কর এবং তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী জীবন পরিচালিত কর তাহলে তোমরা তাঁর প্রিয় পাত্র হবে। এবং দু'জাহানের বাদশা সারওয়ারে দু'আলমের বারাকাত তোমাদের অর্জিত হবে। আর যদি তোমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, চাই তোমরা যত জন্মবার্ষিকী পালন করো এর মাধ্যমে তোমাদের মুক্তি মিলবে না।

ক্রিসমাসের অলীককাহিনী

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা তাদের ধর্মগুরুর জন্মবার্ষিকী পালন করে। যেদিন গুরু জন্মগ্রহণ করেছেন সেদিন তারা আলোচনা সভা করে এবং ঐদিনের গুরুত্ব

ফযিলত বর্ণনা করে এবং তার জীবনাদর্শের উপর আলোচনা করে। লোকজন যখন সভা থেকে উঠে তখন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে যায়। হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে খ্রিস্টানরা প্রতি বছর ২৫শে ডিসেম্বর ক্রিসমাস উদ্‌যাপন করে। হযরত ঈসা (আঃ) কে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার তিনশত কিংবা চারশত বছর পর থেকে এই দিন উদ্‌যাপন শুরু হয়। ইতোপূর্বে ৩০০ বা ৪০০ বছর পর্যন্ত ঈসা (আঃ) এর জন্মদিন পালনের কোন রেওয়াজ ছিল না। ৪০০ বছর পর জনৈক বাদশা এই প্রথা উদ্ভাবন করে। এটা অবশ্য সঠিকভাবে জানা যায় না যে, ২০ ডিসেম্বর-ই-কি ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন নাকি অন্য কোনদিন জন্মগ্রহণ করেছেন? আর মুসলমানরা যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন পালন শুরু করে তখন তারা বলত, আমরা এই দিন উদ্‌যাপন করছি যাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা স্মরণ হয়। তাঁর শিক্ষা যেন, পুনর্জীবন লাভ করে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই দিন আনন্দ ও ঈদের দিন হিসেবে রূপ লাভ করে। যখন ঈদের দিন হয়ে গেল, এবং মানুষ আনন্দ উদযাপনের অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করে তখন তাতে নাচ, গান, সঙ্গীত ইত্যাদি অলীক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

ইসলামে ঈদ দু'টি

ইসলাম যেহেতু সহজ-সঠিক ধর্ম, এবং মানুষের সুপ্ত বাসনা সম্পর্কে সবিশেষ অবগত সেহেতু ইসলামে দু'টি ঈদ রাখা হয়েছে। ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা। এই দুই ঈদ না কারো জন্মবার্ষিকী না কারো মৃত্যু বার্ষিকী। বরং ঈদুল ফিতর এমন এক সময় রাখা হয়েছে যখন মুসলমানগণ এক মহান ইবাদত অর্থাৎ রমযানের রোজা সম্পন্ন করেন। আর ঈদুল আযহা এমন এক সময় রাখা হয়েছে যখন আরেকটি মহান ইবাদত অর্থাৎ হজ্ব থেকে মুসলমানগণ অবসর হন। এর মাধ্যমে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, তোমরা যে দু'টি মহান ইবাদত সম্পন্ন করেছ এজন্য তোমাদের উৎসব করার অধিকার আছে। পক্ষান্তরে তোমাদের পূর্বপুরুষগণ যা করে গিয়েছেন, তার স্মরণে নিঃসন্দেহে দিনটি উদ্‌যাপন করা উচিত যাতে তাদের অনুকরণ করা হয়। কিন্তু শুধু স্মরণ করে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা এটা ইসলাম কখনো পছন্দ করে না।

সাহাবায়ে কেরাম এবং ১২ই রবিউল আওয়াল

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হায়াতে তায়্যিবায় প্রতি বছর-ই-১২ রবিউল আওয়াল আসত, কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো এই দিন উদ্‌যাপন করেননি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তে

কালের পর সাহাবা (রাঃ) আজমাইন, যাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ইশ্‌ক ও মোহাব্বতের এমন সম্পর্ক ছিল যে, কাফেররা সাক্ষ্য দিত, আমরা দেখতাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অযু করতেন, তো ওযুর পানি মাটিতে পড়ার আগেই কোন সাহাবী তা নিয়ে হাতে মাখত, কেউ চেহারায় মাখত। কেউ শরীরে মুছত। সাহাবায়ে কেরাম এমন নিবেদিতপ্রাণ ভক্ত ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার নব্বই বছর পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরাম দুনিয়াতে ছিলেন। নব্বই বছরের এই দীর্ঘ সময়ে প্রতিবছরই ১২-ই রবিউল আওয়াল আসত। কিন্তু কোন সাহাবীই সারওয়ারে দু'আলমের জন্মদিন পালন করেননি।

তাদের প্রতিটি দিনই ছিল সীরাতে তায়্যেবা

কেন? এজন্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত এবং শিক্ষা প্রতি মুহূর্তে তাদের সামনে ছিল। কোন দিনই তাদের কাছে বিশেষ দিন ছিল না। বরং সকাল সন্ধ্যা তাদের সামনে সারওয়ারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা চর্চা হতো। তাঁর আলোচনা তার চিন্তাও চেতনার চর্চা হতো এবং এর উপর আমল করারও তাওফিক হতো। এজন্য চেষ্টা ও সাধনার সর্বোচ্চ ব্যয় করতেন। কিন্তু বিশেষ কোনদিন ছিল না। ইসলামে জন্মদিন পালনের যদি কোন প্রচলন থাকত তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন থেকে শ্রেষ্ঠ কোন দিন থাকত না। কিন্তু ইসলামে যেহেতু এর স্থান নেই তাই সাহাবায়ে কেরাম এই দিন পালনের প্রতি গুরুত্ব দেননি, বরং সাহাবায়ে কেরামের বার মাস, বার মাসের ত্রিশ দিন, ২৪ ঘণ্টা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শে গড়া।

এটা ইসলামী ত্বরীকা নয়

আমি বলতে চাই, খৃস্টানরা যেভাবে ক্রিসমাস উদ্‌যাপন করে এভাবে মুসলমানদের ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা ইসলাম সমর্থন করে না। মনে রাখবেন এটা ইসলামী পদ্ধতি নয়। তবে হাঁ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত এবং তার আদর্শ সবসময় জীবন্ত রাখুন। বিশেষ করে রবিউল আওয়াল মাসে নয়, বরং বছরের প্রতি মাসে, প্রত্যেক দিনে এবং প্রতি ঘণ্টায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা ও আদর্শকে সজীব রাখুন। এবং তদনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করুন। আমাদের সমাজে ১২ই রবিউল আওয়ালে ঈদে মিলাদুন্নবী নামে যে উৎসব পালন করা হয় তা কখনোই শরীয়ত সম্মত নয়।

১২-ই রবিউল আওয়ালের ১২ তারিখ নিশ্চিত নয়

প্রথমত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১২ই রবিউল আওয়াল জন্মগ্রহণ করেছেন না মৃত্যুবরণ করেছেন এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক মতবিরোধ রয়েছে। অনেক গবেষক ঐতিহাসিক বলেন, ১২ রবিউল আওয়ালের তারিখটি ঠিক নয়। বরং কেউ কেউ বলেন ৩রা রবিউল আওয়াল, কেউ বলেন, ২রা রবিউল আওয়াল, কেউ কেউ বলেন ১লা রবিউল আওয়াল। যাই হোক পরস্পরবিরোধী কয়েকটি মত পাওয়া যায়। এ থেকে এটাই বুঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম এবং উম্মতে মোহাম্মদীয়া এই তারিখটা সংরক্ষণ করেননি কারণ তখনও ৩-মার্কিকী পালন করার কোন ধ্যানধারণা ছিল না। তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা যখনইহোক এটা এক মহান সৌভাগ্য এবং বিরাট ইবাদত। এটা মনে করবেন না যে, উক্ত ইবাদত শুধু রবিউল আওয়ালের সাথে নির্দিষ্ট। বরং যখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা হবে তখনই পরম সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে যাবে। এক মহান ইবাদত পালিত হবে।

সীরাতুন নবী মাহফিল এবং বেয়াদবীমূলক কর্মকাণ্ড

কিন্তু সীরাতুন্ নবীর মাহফিলের কিছু আদব আছে। এ সকল আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কারণ এটা কোন রাজনৈতিক নেতার আলোচনা নয়। এটা দুনিয়া পরিচালনার কোন আলোচনা নয়। বরং দুনিয়াও আখেরাতের সরদার ও জগতবাসীর রহমতের আধার, যাকে সৃষ্টি না করা হলে বিশ্ব সৃষ্টি হতো না সেই মহামানবের মোবারক আলোচনা। এজন্য যে মজলিসে আলোচনা হবে ঐ মজলিসের প্রাথমিক কিছু আদব নিয়ম কানুন রয়েছে। ঐ মজলিস হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা ও আদর্শের নমুনা। এই মজলিসে নবীজির শিক্ষার পরিপন্থী কোন কাজ সংঘটিত হবে না। আফসোস আমাদের সমাজে আদবের প্রতি কোন লক্ষ্য রাখা হয় না। সীরাতুন নবী (সাঃ) মাহফিল, সেখানে পুরুষ ও বে-পর্দা নারী সমবেত হয়। যেন নারী পুরুষের মিলন মেলা। অথচ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারী-পুরুষের একত্র হওয়া এবং অবাধে মেলামেশা করা কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। সীরাতুন নবী মাহফিলে এমন কাজ করা, সীরাতুন নবী মাহফিলের জন্য কতটা অসম্মানজনক। এর মাধ্যমে সীরাতুন নবী মাহফিলকে কলুষিত করা হয়। এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষাকে পদদলিত করা হয়। নবীর শানে এর চেয়ে বড় বেয়াদবি আর কী হতে পারে।

সীরাতুন নবী মাহফিল উপলক্ষে নামাজ ছেড়ে দেয়া

এভাবে সীরাতুন্ নবী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তার ব্যবস্থাপনার ব্যস্ততায় ফরয নামাজ ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। নামাজের সময় হয়েছে, আযানও হয়েছে, মসজিদে জামাত দাঁড়িয়ে গেছে। এদিকে মাহফিল আয়োজকরা তাদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। নামাজ সম্পর্কে বে-খবর। যে তার কাজ করে যাচ্ছে। জামাত ছুটে যাচ্ছে। বলুন! জামাতে নামাজ পড়ার ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী পরিমাণ তাগিদ দিয়েছেন। কিন্তু আমরা তাঁর আলোচনা সভা করছি, নামাজ ছেড়ে, জামাত তরক করে। এটা কতবড় জুলুম এবং কতবড় বেয়াদবি।

সীরাতুন্ নবী মাহফিলে গান ও বাজনা

সারওয়ারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছবি তুলতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু সীরাত মাহফিলে ছবি তোলা হচ্ছে। খোদ সীরাত মাহফিলে হুজুরের আদেশ লঙ্ঘন করা হচ্ছে। সীরাত মাহফিলের সর্বনিম্ন আদব তো এটাই হওয়া উচিত ছিল যে, অন্ততপক্ষে তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ পরিপন্থী কোন কাজ হবে না। কিন্তু অহরহ হচ্ছে। এখন তো মিউজিকের সাথে গানের সুরে নাত গাওয়া হয়। অথচ সারওয়ারে দু'আলমের পবিত্র আলোচনা করা হয় নাতের মাধ্যমে। কিন্তু মিউজিক দিয়ে নাতকে কলঙ্কিত করা হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি পৃথিবীতে আগমন করেছি বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে ফেলার জন্য। অথচ সীরাত মাহফিলে বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বে-আদবি করা হচ্ছে। এ কারণেই এসকল সীরাত মাহফিলের প্রভাব আমাদের সমাজে পড়ে না। কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোবারক আলোচনায় আদবের প্রতি তো লক্ষ্য রাখা হয়ই না বরং তার বিপরীত কাজ করা হয়।

সুন্নতে নববীর আদর্শকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করুন

দ্বিতীয় আদব যা অত্যন্ত প্রয়োজন, তা এই যে, সীরাতে তায়্যেবা 'নাউযুবিল্লাহ' কেচ্ছা-কাহিনী নয়। বরং সারওয়ারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হায়াতে তয়্যিবার আলোচনা। যার একেকটি মুহূর্ত আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা এবং অনুকরণীয়। অতএব সীরাত মাহফিলে যাওয়ার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে, সারওয়ারে দু'আলমের সীরাত বা জীবন সম্পর্কে আমরা যা কিছু শিখবো বা জানবো তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করবো। কিন্তু সাধারণত এমনই হয় যে, এক দুই ঘন্টার জন্য সীরাত মাহফিলে অংশগ্রহণ করে। যখন সেখান থেকে উঠে তখন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে যায় এবং জীবনের চাকা আপন

মনে ঘুরতে থাকে। সীরাত মাহফিলে অংশগ্রহণ করার পূর্বে যে অবস্থা ছিল, সীরাত মাহফিলের পরেও ঐ একই অবস্থা। ইতিপূর্বে মিথ্যা বলত এখনও মিথ্যা বলে। ইতিপূর্বে সুদ খেত এখনও সুদ খায়। ইতিপূর্বে ধোঁকা দিত এখনও ধোঁকা দেয়। আগে নামাজ পড়ত না এখনো পড়ে না। আগে গুনাহ করত এখনও গুনাহ করে।

কয়টি সুন্নতের উপর আমল শুরু করা হয়েছে?

কেউ এসব মাহফিলে এই নিয়তে যায় না যে, এখানে যা শিখবো তার উপর আমল করবো। কেউ এটা যাচাই করে দেখেনা যে, মাহফিলে যাওয়ার আগে কয়টি সুন্নতের উপর আমল করতাম। আর মাহফিল থেকে ফিরে এসে কয়টি সুন্নতের উপর আমল করা শুরু করেছি? এটা সেই সীরাত যা নব জাগরণের সৃষ্টি করেছিল। আঁধারে নিমজ্জিত মানুষকে দেখিয়েছিল আলোর পথ। নিগৃহীত নিপীড়িত মানুষকে দেখিয়েছে মুক্তির পথ। যেখানে জ্বলছিল শত্রুতার আগুন সেখানে রাসূলের সীরাতের বদৌলতে শোভা পেয়েছিল পুষ্পকানন। ২৩ বছরের স্বল্প সময়ে হুজুর সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম এ মহান আন্দোলনের বীজ বপন করেছেন।

হুজুর (সা.) কীভাবে রেনেসাঁর সূচনা করেছেন?

কীভাবে এ রেনেসাঁর সৃষ্টি হয়েছে? তা এভাবে যে, যা সীরাত ছিল তা আমলের অংশ ছিল। তাঁর যবান থেকে যে কথা বের হতো, সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতেন। কিন্তু আজ অলিতে-গলিতে মহল্লায় মহল্লায় সীরাত মাহফিল হওয়া সত্ত্বেও সমাজে তার কোন প্রভাব পড়ছে না। কেন? এর কারণ হল, মনে মনে এ চিন্তা করে যে, সামাজিক প্রথা অনুযায়ী এক ঘণ্টার জন্য সীরাত মাহফিলে বসবো, কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার কোন জযবা বা আগ্রহ থাকেনা আজ মুসলমানদের মনে যদি এই জযবা সৃষ্টি হতো তাহলে ইসলামী বিশ্বের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।

শত্রুকে তোমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন

বাস্তবে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছি। আমরা তাঁর সুন্নতের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছি। যারা ইসলামের শত্রু, যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের দুশমন, যারা দ্বীনের দুশমন, আজ আমরা তাদেরকে আমাদের আদর্শ বানিয়েছি। বানিয়েছি

আমাদের দুঃসময়ের বন্ধু। আমরা তাদের অনুকরণ করছি। তাদের চাল-চলন রপ্ত করছি। তাদের তোষামদে নিজেকে ধন্য মনে করছি। অর্থাৎ তারা যেভাবে চাচ্ছে সেভাবেই করছি। যার ফলে ঐ সম্প্রদায়কে আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। প্রতিদিনই আমাদেরকে আঘাত করছে। কখনো ফিলিস্তিনে, কখনো কাশ্মীরে, কখনো আফগানে, কখনো চেচনিয়ায়।

এগুলো কেন হচ্ছে? এজন্য যে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত এবং শিক্ষাকে ছেড়ে দিয়ে পশ্চিমা সভ্যতাকে আঁকড়ে ধরেছি। ইংরেজদের খুশি করার চেষ্টা করছি। আমেরিকানদের খুশি করার চেষ্টা করছি এবং যেন বলছি, দেখ তোমরা যেমন, আমরা তোমাদের মত হতে চাচ্ছি। যেহেতু আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ক্রুদ্ধ করে তাদেরকে খুশি করার চেষ্টা করছি, যদি হাদীসে সারওয়ারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি তোমরা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে কোন মাখলুককে খুশি করতে চাও তাহলে তিনি ঐ মাখলুক বা সৃষ্টিকে তোমাদের উপর চাপিয়ে দিবেন। এটা রাসূলের হাদীস। আজ দুশমনকে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। দুশমন আমাদের উপর ছড়ি ঘুরাচ্ছে।

এটা বদ আমলের ফল

আজ মানুষ বলে আমরা সর্বত্র মার খাচ্ছি। সর্বত্র আমরা ধ্বংসের সম্মুখীন অবক্ষয়ের শিকার, জুলুম-নির্যাতনের শিকার। ভেবে দেখুন, কেন এমনটা হচ্ছে। এজন্য কোরআনে কারীমের বক্তব্য–

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ○ (سورة الشورى ٣٠)

তোমাদের উপর যে বিপদ আপতিত হয়, তা তোমাদের কৃত মন্দকর্মের কারণে। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অনেক মন্দকর্মকে মাফ করে দেন।

মুক্তির পথ শুধু এটাই

এজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের দিকে ফিরে না আসব এবং তার সুন্নতকে জীবনে চলার পাথেয় রূপে গ্রহণ না করব, জীবনে চলার আলোকবর্তিকা হিসেবে আঁকড়ে না ধরব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মার খেয়েই যাবো। সুতরাং মুক্তির পথ একটাই, নবীজীর সুন্নতের সামনে নিজেকে সমর্পণ করুন এবং জীবনের প্রতিটি অংশকে সুন্নতের সাজে সজ্জিত করুন। এরপর দেখবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে। সারওয়ারে দো'আলমের অনুসরণের ফলে আল্লাহ তা'আলা রহমতের অবারিত ফল্গুধারা বর্ষণ করবেন।

যাই হোক। সীরাত মাহফিলে অংশগ্রহণ করুন। কিন্তু এই নিয়তে যে, সারওয়ারে দু'আলমের সুন্নত এবং সীরাত সম্পর্কে যে আলোচনা শুনব, তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবো। এই উদ্দেশ্যে যখন অংশগ্রহণ করবেন তখন ইনশাআল্লাহ সেখান থেকে কিছু নিয়ে আসবেন। যদি এই নিয়ত না থাকে তাহলে যেভাবে গিয়েছেন সেভাবে ফিরে আসবেন। এক কান দিয়ে শুনেছেন অন্য কান দিয়ে বের করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা তার ফযল ও করমে এবং স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত এবং সুন্নতের যথাযথ মর্যাদা দান করার তাওফিক দান করুন। তার উপর আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভোট কাকে দিব?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَآ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ ○(سورة النساء ١٣٥) اٰمَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

ভূমিকা

সম্মানিত ও সুপ্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা। আপনারা জানেন যে, চলতি সপ্তাহে আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় নির্বাচন হবে। এ কারণে মুসলমানদের পক্ষ থেকে অনেক প্রশ্ন আসছে যে, নির্বাচনের শরয়ী অবস্থা কী? শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাচনে মুসলমানদের কী করণীয়?

নির্বাচনের ব্যাপারে বিভিন্ন খেয়াল

বিগত পঁচিশ বছর কিংবা তার চেয়েও বেশী সময় ধরে নির্বাচনী ফলাফলে জাতি এতটাই আঘাতপ্রাপ্ত যে, মানুষ নির্বাচনের ফলাফলের প্রতি নিরাশ হয়ে পড়েছে। অনেক মানুষ তো এ কারণে নির্বাচনকে নিষ্ফল মনে করে। অনেক তো এমন মনে করে যে, নির্বাচন হলো ময়লার ডোবা। কোন ভদ্র মানুষ তাতে নামেন না। যার ফলে নির্বাচনেই অংশগ্রহণ করেন না।

কিছুসংখ্যক মানুষ তো নির্বাচনকে তাদের দ্বীনি এবং দুনিয়াবী লক্ষবস্তু বানিয়ে নিয়েছে। রাত দিন এর পেছনে ছুটছে। এজন্য জানা জরুরি যে, নির্বাচনের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী এবং তার শিক্ষা কী?

নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার প্রথম খারাবি

আমাদের দেশে বর্তমানে যে নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা প্রচলিত আছে এটা কোরআন এবং সুন্নাহর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ ব্যবস্থাপনার দুটো খারাপ দিক রয়েছে। প্রথম হলো এই নীতি পশ্চিমাদের কাছ থেকে আমাদের কাছে এসেছে। আর যে ব্যক্তি প্রার্থী হয় সে মানুষের কাছে ভোট ভিক্ষা করে। ভোট পাওয়ার আশায় মানুষের কাছে নিজের প্রশংসা, নিজের মর্যাদা ও অবস্থান তুলে ধরে এবং বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রঙিন দুনিয়া দেখায়। শুধু নিজের প্রশংসার উপর ক্ষান্ত থাকলেও হতো। তা না বরং প্রতিপক্ষের বদনামি এবং তার নামে বিভিন্ন অপবাদ জনসম্মুখে তুলে ধরে। অর্থাৎ আমিই ভাল আর সবাই খারাপ। আমিই এই পদের একমাত্র যোগ্য ও হকদার। আমার প্রতিপক্ষ এর যোগ্য নয়। এমন রীতিনীতি কখনো শরীয়তের শিক্ষা হতে পারে না।

নিজ থেকে দায়িত্ব চায় না

হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি কোন দায়িত্ব বা পদ দাবি করে আমি তাকে ওই পদ দিতে প্রস্তুত নই। এক হাদীসে হুযুর সাল্লাল্লাহ ইরশাদ করেছেন।

ان اوتيتها عن مسئلة وُكلت إليها وان أُتيتك عن غير مسئلة أُعنت عليها

او كما قال عليه الصلواة والسلام -

অর্থাৎ নেতৃত্ব এমন বিষয় যদি তুমি এই নেতৃত্ব অর্জন করার জন্য এটাকে তলব করো, প্রাণান্তকর চেষ্টা মেহনত কর, তো আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সাহায্য পাবে না। আর যদি তোমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। দায়িত্ব না চাওয়া হয়। এর জন্য কোন দৌড় ঝাঁপ না কর তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে। যাইহোক! এই ব্যবস্থার একটা মন্দ দিক হল এটা।

সম্পর্কের কারণে ভোট দেয়া হয়

এই ব্যবস্থাপনার আরেকটি খারাপ দিক যা আমাদের সমাজের অংশ হয়ে দাড়িয়েছে। তা এই যে, মানুষ যখন ভোট দেয় তখন অধিকাংশই খেয়াল করে

না কে দায়িত্ব পালনে যোগ্য কে অযোগ্য? বরং ভাই, বা গোত্রীয় বা সাম্প্রদায়িক পরিচয় হিসেবে ভোট দেয়া হয়। অমুক আমার ভাই এজন্য তাকে ভোট দিব। অমুক আমার স্বজাতি তাই তাকে ভোট দিব। অমুক আমার এলাকার তাই তাকে ভোট দিব। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন যাচাই বাছাই নেই যে, লোকটা দ্বীনদার কিনা তার মাঝে আমানত আছে কিনা।

নির্বাচন হলো পুঁজি বিনিয়োগ

এর ফলে আমাদের সমাজের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, আজ অর্ধশত বছর বা তার চেয়ে বেশী সময় আমাদের দেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যেকবার নির্বাচনের সময় প্রতিশ্রুতির বাহার দেখা যায়। যেই নির্বাচনে দাঁড়ায় সেই ওয়াদা করে আমি এই উন্নয়ন করবো। জনসাধারণকে বিভিন্ন ফায়দা পৌছাবো। কিন্তু যখন নেতা হয় তখন দু'ই হাতে মানুষকে লুণ্ঠন করে। এখন নির্বাচনে শুধু টাকার ছড়াছড়ি। মানুষ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। উদ্দেশ্য একটাই যাতে কাউন্সিলর হতে পারে। আর যখন কাউন্সিলর হবে তখন কি এই লাখ টাকার কথা ভুলে যাবে? সেকি এই টাকা আল্লাহর জন্য খরচ করেছে বরং যখন মিনিস্টার হবে তখন দুই গুণ তিন গুণ লাভ করার চেষ্টা করবে। চাই এজন্য দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হোক কিংবা সুদ ঘুষ গ্রহণ করতে হোক।

আমাদের কর্মপন্থা

কিন্তু এখন প্রশ্ন জাগে ব্যবস্থাপনা বা নীতি খারাপ হওয়ায় আমাদের কর্তব্য কী? আমরা কি চুপ করে বসে থাকব? নাকি তুলনামূলক ভালটাকে সমর্থন করবো? এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। এই মূলনীতি সব জায়গায় কাজে আসবে। তিনি ইরশাদ করেন– (পৃষ্ঠা ২৪৪)

إذا ابتليت ببليتين فاختر أهونهما او كما قال عليه والصلواة والسلام۔

'যখন তুমি দুটি বিপদে বন্দী হয়ে যাও। অর্থাৎ তোমাদের সামনে দুটি পথ থাকে, উভয়টাই খারাপ, তাহলে যে পথে খারাবি কম সে পথ গ্রহণ করো।

নির্বাচন বয়কট করার ফল

আমাদের দেশে নির্বাচনী যে ব্যবস্থানা রয়েছে তাতে আমাদের সামনে দুটি পথ খোলা আছে। একটা পথ এই যে, যত শরীফ, দীনদার আমানতদার লোক

আছেন তারা নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করবে। নির্বাচনে অংশ নিবেন না। দ্বিতীয় পথ এই যে, সমাজের শরীফ দীনদার, আমানতদার যারা আছেন তারা সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন যারা ভাল মানুষ আছেন তাদেরকে নির্বাচিত করতে। যাতে পূর্বে ছিল একশতে একশভাগ খারাপ। তো এখন একশতে নিরানব্বই হয়ে যায়। আগে যদি ছিল একশতে নিরানব্বই এখন যেন একশতে আটানব্বই হয়ে যায়। যদি প্রথম পথ গ্রহণ করা হয়। দীনদার, আমানতদার দেশকে ভালবাসে এমন সবাই ঘরে বসে থাকে এবং নির্বাচনে অংশ না নেয় তাহলে এর উদ্দেশ্য হবে পুরো রাজনীতির ময়দান হাতছাড়া করা, যাতে করে দেশ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়। এজন্য প্রথমটার তুলনায় দ্বিতীয়টার ক্ষতি কম। তাই দ্বিতীয় পথ গ্রহণ করা উচিৎ।

নির্বাচনে অংশ নেয়া উচিৎ

যদি দীনদার এবং আমানতদার লোকজন নির্বাচনে অংশ নেন এবং এই নিয়তে নেন যে, আমার দ্বারা যতটুকু মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব আমি বেঁচে থাকব। কেননা আল্লাহ তাআলা নেযামই এমন বানিয়েছেন যে, সামান্য খারাবি কমলে তার বকরতে আল্লাহ তাআলা খারাবির মাত্রা আরো কমিয়ে দেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে উলামায়ে কেরাম আমাদের দেশে বিভিন্ন নির্বাচনের সময় এই ফতোয়া দিয়ে থাকেন যে, বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার খারাবি সত্ত্বেও আমাদের দীনদার আমানতদার লোকদের নির্বাচনে অংশ নেয়া উচিৎ। আর সাধারণ মানুষের কাজ হলো তার নির্বাচনী এলাকায় যে প্রার্থীকে অধিক সৎ ও যোগ্য মনে হবে তাকেই ভোট দেয়া।

ভোটের শরয়ী অবস্থান

ভোট কী? যখন আপনি কোন প্রার্থীকে ভোট দেন তখন শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তার দুটি দিক আছে। একটা দিক এই যে, আপনি আপনার ভোট প্রদানের মাধ্যমে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এই পদপ্রার্থী আমার দৃষ্টিতে অন্যান্য পদপ্রার্থীর তুলনায় ভাল। আর সাক্ষীর ব্যাপারে কোরআনুল কারীম এই আয়াতে একটি মূলনীতি বর্ণনা করছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ ○ (سورة النساء ١٣٥)

"হে ঈমানদারগণ! ইনসাফ কায়েমকারী হও এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য প্রদানকারী হও।" যে সাক্ষ্য প্রদান করবে তা আল্লাহর জন্য হওয়া উচিৎ অন্য কোন সত্তাকে প্রাধান্য না দেয়া উচিৎ। বরং এই কথা চিন্তা করা যে আমাকে আল্লাহ তাআলার সামনে জবাব দিতে হবে। চাই সে সাক্ষ্য তোমার নিজের বিরুদ্ধে যাক কিংবা ঐ সাক্ষের কারণে তোমার ক্ষতি হোক। কিন্তু সত্য সাক্ষ্য দেয়া তোমার ওপর ফরয। কোরআনের ইরশাদ এটাই।

এই প্রেক্ষিতে সাক্ষ্য গোপন করা জায়েয নাই

কোরআনে কারীম এটাও বলেছে যে, সাক্ষ্য গোপন করো না। কোরআন বলছে–

وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ..... (سورة البقرة ٢٨٣)

'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য গোপন করে তার কলব গুনাহগার' যাই হোক ভোট একটা সাক্ষ্য। আপনার কাছে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে আপনার অঞ্চলে যারা নির্বাচনী পদপ্রার্থী আছে তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি আপনার দৃষ্টিতে দীনদারি, আমানতদারি এবং দেশ ও জাতির কল্যাণকামিতার দিক থেকে সর্বোত্তম? এজন্য আপনাকে অনুসন্ধান করতে হবে এবং অবস্থা যাচাই করতে হবে কে দীনদার এবং দেশ ও জাতির কল্যাণকামী? আপনি যদি এই পজিশনে থাকেন তাহলে সাক্ষ্য গোপন করা জায়েয নেই। আপনার ওপর ভোট দেয়া আবশ্যক।

এমন ব্যক্তিকে ভোট দেয়া নাযায়েয

কোন অযোগ্যকে ভোট দেয়া হারাম। এমন অযোগ্য যার সম্পর্কে আপনি জানেন এ দুর্নীতি করবে, বদদ্বীনি ছড়াবে, দেশ ও জাতিকে ভুল পথে পরিচালিত করবে, এমন ব্যক্তিকে ভোট দেয়া শরীয়ত নাযায়েয বলেছে। এটা মিথ্যা সাক্ষ্য। আর মিথ্যা সাক্ষীকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিথ্যা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিসে তাশরীফ নিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, আমি কি তোমাদের বলব أكبر الكبائر অর্থাৎ সবচে' বড় গুনাহ কী কী? সাহাবায়ে কেরাম বললেন অবশ্যই বলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাতে আমরা এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে পারি। তিনি বললেন, الإشراك بالله وعقوق الوالدين সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা। দ্বিতীয় মা-বাবার অবাধ্য হওয়া। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন একথা বলছিলেন হেলান দিয়ে বসেছিলেন। তৃতীয় গুনাহ বর্ণনা

করতে গিয়ে সোজা হয়ে বসেন এরপর বলেন, شهادة الزور মিথ্যা সাক্ষ্য। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম شهادة الزور কয়েকবার বললেন।

شهادة الزور - شهادة الزور - شهادة الزور এভাবে তিনবার বললেন, এর মধ্যে এদিকে ইশারা করেছেন যে, বড় বড় গুনাহের মধ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য সবচেয়ে 'খতরনাক' বিপদজনক। কারণ মিথ্যা সাক্ষ্যর প্রভাব পুরো সমাজের ওপর পড়ে। যার ফলে সমাজে খারাবি ছড়িয়ে পড়ে। দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য এমন কাউকে ভোট দেয়া যার সম্পর্কে আপনি জানেন এ অসৎ। চাই আপনি তাকে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে ভোট দেন বা বন্ধুত্বের কারণে কিংবা ভ্রাতৃত্বের কারণে এসব অবস্থায় আপনি أكبر الكبائر অর্থাৎ বড় গুনাহে লিপ্ত।

এমন ব্যক্তিকে ভোট দেয়া যায়

এজন্য একজন মুসলমানের কর্তব্য হলো এসব অবস্থা ভাল করে পর্যবেক্ষণ করা। পর্যবেক্ষণ করার পর যে ব্যক্তি বা দল সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে এরা তুলনামূলক ভাল তাদেরকে ভোট দেয়া। আজকাল একশতে একশত পার্সেন্ট ভাল মানুষ পাওয়া অসম্ভব। এজন্য এখানে ওই মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে যার সম্পর্কে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে বলেছেন,

إذا ابتليت ببليتين فأختر أهونها، او كما قال عليه الصلوة والسلام۔

যখন দুটি মন্দ তোমার সামনে থাকবে তার মধ্য থেকে যেটাকে তোমার হালকা মন্দ মনে হবে সেটাকে গ্রহণ করো। এজন্য সব প্রার্থী যদি খারাপ হয় তাহলে তাদের যে তুলনামূলক ভালো, এ অবস্থা ঐ ব্যক্তিকে ভোট দেয়া।

এই প্রেক্ষিতে না দেয়ার অবকাশ আছে

হ্যাঁ যদি কোথাও এমন হয় যে, মানুষ ফায়সালা করতে পারছে না। সব প্রার্থীই খারাপ তার দৃষ্টিতে ভাল না। একজন প্রার্থীকে অপরজনের উপর প্রাধান্য দেয়া যাচ্ছে না। বরং সবাইকে বরাবর মনে হচ্ছে। এ অবস্থায় যদি কোন মানুষ ভোট না দেয় তাহলে তার ভোট না দেয়ার অবকাশ আছে। কারণ সে সিদ্ধান্তই নিতে পারছে না কে ভাল মানুষ।

শরীয়তের বিধান

শরীয়তের বিধান এই যে, যদি আপনি কাউকে যোগ্য মনে করেন। তাহলে এরপর আপনার জন্য সাক্ষী গোপন করা জায়েয নাই। যদি সবার মাঝে খারাবি

আছে। কিন্তু কারো মাঝে খারাবি কম। তাকে অন্যের তুলনায় ভাল মনে হয় তখন তাকেই ভোট দেয়া উচিৎ। এটাই হলো ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে শরীয়াতের বিধান।

ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি বানানো

ভোটের দ্বিতীয় একটি অবস্থা এই যে, ভোট এক ধরনের ওকালতি। অর্থাৎ আপনি যাকে ভোট দিচ্ছেন, যদি সে সাংসদ মনোনীত হয়ে সংসদে যায় তাহলে সে আপনার প্রতিনিধি হয়ে গেল। যেন ভোট দিয়ে আপনি তাকে প্রতিনিধি বানিয়েছেন। যখন মানুষ কাউকে প্রতিনিধি বানায় তখন সে তার ভাল মন্দ লক্ষ করে। যখন আপনি দুনিয়াবি কোন কাজের জন্য কাউকে প্রতিনিধি বানান তখন তার সম্পর্কে খুব ভাল করে খোঁজখবর নেন। যাতে করে পরবর্তীতে এর কারণে আপনার কোন ক্ষতি না হয়। তো ভোট দিয়ে যাকে প্রতিনিধি বানাবেন তার ব্যাপারেও লক্ষ রাখা দরকার সে সৎ ও আমানতদার কিনা।

আপনি তো তাকে ভোট দিয়েছেন

আজ আমরা একথা বলে কাঁদছি যে, পুরো দেশে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। শাসক দুর্নীতিবাজ, লুটেপুটে খাচ্ছে। কিন্তু এদিকে তো লক্ষ করুন এই শাসক গোষ্ঠীকে নেতৃত্ব পর্যন্ত কে পৌঁছে দিয়েছে? তাদের হাতে নেতৃত্বের লাগাম কে দিয়েছে? এটা তো পরিষ্কার যে জনাধারণ তাদেরকে ভোট দিয়ে গদিতে বসিয়েছে। যখন ভোটের সময় আসে তখন তাদের মাথা থেকে এই প্রশ্ন সরে যায় যে, কে অধিক যোগ্য কে অযোগ্য। বরং মানুষ দেখে কোন পার্টি টাকা বেশী ঢালছে। ভোট কিনে নিচ্ছে। কারা আমাদের গ্রামের লোক, কারা আমাদের ভাইব্রাদার? বাস এর থেকে আর সামনে বাড়ে না। এজন্য সব সমস্যার হোতা ঐ ব্যক্তি যে অপাত্রে তার ভোট ফেলেছে। ভাইয়েরা আমার। বর্তমানে সে প্রেক্ষাপট আমাদের সামনে এসেছে। প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ কবর এবং আখেরাতকে তার সামনে রাখা। আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে এই চিন্তা মাথায় রেখে, সততা ও নিষ্ঠার সাথে ভোট প্রদান করা।

এমন লোকদের সঙ্গ দেয়া

আপনারা জানেন যে, আমাদের দেশ পাকিস্তান ইসলামের নামের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ অর্ধশত বছর বা তার চেয়ে বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে। আমরা ইসলামের নাম নিয়ে ইসলামের সাথে রসিকতা করছি।

ইসলামকে অপমান করছি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে মাঠে এমন শক্তি আছে যারা দেশ ও জাতিকে বেনিয়াদের হাতের পুতুল বানাতে চায়। যারা আমাদেরকে আমেরিকার গোলাম বানাতে চায়। এমন ব্যক্তিরাও আছেন যারা সর্বশক্তি বিলীন করে দেশকে ইসলামের ওপর কায়েম রাখতে সচেষ্ট। তো মুসলমানদের ফরয এসব লোকদের সহযোগিতা করা। নিজে চেষ্টার সবটুকু ব্যয় করে তাদের সাহায্য করা। আল্লাহ তাআলা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের সবাইকে সঠিক পদ্ধতিতে এই আমানত আদায় করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শ আপন জীবনে বাস্তবায়ন করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ○ (سورة الأحزاب ٢١) اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

ভূমিকা

সম্মানিত ও প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা। গত জুমায় আমি আপনাদের সামনে সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছিলাম। যার সারমর্ম ছিল এই যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে দ্বীন দান করেছেন তাতে জন্মবার্ষিকী পালনের কোন রসম রাখেন নি। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাতে তায়্যেবা কোন দিন বা সময়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং বছরের বার মাস, মাসের ত্রিশ দিন এবং দিনের চব্বিশ ঘণ্টা আমাদেরকে আলোকবর্তিকা হয়ে পথ প্রদর্শন করছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ভালবাসা রাখার সবচেয়ে বড় দাবি হলো হুজুরের সীরাতকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করা।

একটি মিশন নিয়ে হুজুরের দুনিয়ায় আগমন

হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ জন্য পৃথিবীতে আগমন করেন নি যে মানুষ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে এবং তিনি নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হবেন। আল্লাহ না করুন যদি এটা তাঁর উদ্দেশ্য হতো তাহলে মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে যখন হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল যে আপনি যদি নেতৃত্ব চান তাহলে আমরা সবাই মিলে আপনাকে নেতা বানাবো। ধন সম্পদের প্রতি যদি আপনার মোহ থাকে তাহলে আমরা আপনার পদতলে ধন সম্পদের স্তূপ জমা করাবো। সুন্দরী নারীদের প্রতি যদি আপনার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহলে আরবের বাছাইকৃত সেরা সুন্দরীদের আপনার সেবায় নিয়োজিত করবো। তবে শর্ত হলো আপনি একত্ববাদের দাওয়াত থেকে বিরত থাকবেন।

তাদের কথার উত্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি তোমরা আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র এনে দাও তবুও আমি আমার দাওয়াত থেকে ফিরে আসব না। এর মাধ্যমে হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, আমার জীনের একটি নিদিষ্ট লক্ষ্য ও মিশন রয়েছে। যে উদ্দেশ্য আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাকে প্রেরণ করেছেন। নেতৃত্ব ও প্রাচুর্যের প্রতি হুজুরের যে কোন মোহ ছিল না তা হযরত আয়েশা (রা) হাদীস এর প্রতি আলোকপাত করলে বুঝা যায়। তিনি বলেন, এমনও সময় গিয়েছে যে তিন মাস পর্যন্ত আমাদের ঘরের চুলায় আগুন জ্বলে নি। তাই, নেতৃত্বের ও প্রাচুর্যের প্রতি যে কোন আগ্রহ ছিল না তা হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জীবনে করে দেখিয়েছেন। কিন্তু তিনি যে পয়গাম নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন সে পয়গাম ও দাওয়াত থেকে কোন কিছুই তাকে একচুল নড়াতে পারে নি। এই সীরাতে তায়্যেবার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলা রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানব জাতির জন্য এক আদর্শ রূপে প্রেরণ করেছেন।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ○ (سورة الأحزاب ٢١)

"অর্থাৎ রাসূলের জীবনে তোমাদের জন্য রয়েছে একটি উত্তম আদর্শ।" উদ্দেশ্য হলো আমি রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়াতে এ জন্য পাঠিয়েছি যে, তিনি দুনিয়াতে একটি আদর্শ স্থান করবেন। আর মানুষের কাজ

হলো সে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে আদর্শকে অনুসরণ করা। সীরাতে তায়্যেবার আসল উদ্দেশ্য এটাই।

নবীজীর আগমনের সময় আরবের পরিস্থিতি

এই সেই সীরাতে তাইয়্যেবা যা বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে গোটা দুনিয়ায় এক নব জাগরণ সৃষ্টি করেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দুনিয়াতে আগমন করেছেন এবং তাঁকে নবুয়াতের মহান দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তখন তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন। তাঁর কোন সাহায্যকারী ছিল না। গোটা দুনিয়া ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত। অন্যায় অনাচার এবং জুলুম নির্যাতন ও প্রতিমা পূজা পুরোদমে চলছিল। বিত্তশালী এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সাধারণ মানুষের রক্ত চুষে খাচ্ছিল। এহেন পরিস্থিতিতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবুওয়াতের মাহান দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যার উদ্দেশ্য ছিল বিপথগামী পৃথিবীবাসীকে সঠিক পথে আনা। এবং ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে নতুনভাবে সাজানো। হুযুরের ৬৩ বছর জীবনের ১৩ বছর কেটেছে মক্কায় আর মদীনায় কেটেছে ১০ বছর। এই ৬৩ বছরে আরব উপদ্বীপে এবং আর আরব উপদ্বীপের মাধ্যমে গোটা পৃথিবীতে নব জাগরণের ঢেউ আছড়ে পড়েছে।

১৩ বছরে মহান ইনকিলাব

এ কারণে হেরা গুহায় সারকারে দোআলমের উপর সর্বপ্রথম যখন অহী নাযিল হয় তখন তিনি প্রচণ্ড জ্বরাক্রান্ত হন এবং ঘরে আগমন করে বলেন, আমাকে কম্বল মুড়ে দাও। এই জ্বর কেন হয়েছিল? এজন্য যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সারওয়ারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাঁধে এক মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। ৬৩ বছরের স্বল্প সময়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক ইনকিলাব ঘটান যে, যখন তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন তখন গোটা আরবে একজন মুশরিকও ছিল না। তখন সমগ্র আরবে একটা ঝাণ্ডা উড়ছিল যা ছিল রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঝাণ্ডা। যারা অজ্ঞতা ও মূর্খতায় নিমজ্জিত ছিল আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ইলম হিকমত ও মারেফাতের আলোকবর্তিকা বানিয়েছিলেন। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংস্পর্শের কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে ঐক্য এবং সম্প্রীতির বীজ রোপণ করেছেন। যেখানে পদে পদে প্রতিমা পূজা অব্যাহত ছিল সেখানে সমগ্র আরবের কোথাও প্রতিমা পূজার অস্তিত্বও ছিল না।

জাহেলী যুগের একটা যুদ্ধ

জাহেলী যুগে একটি যুদ্ধ হয়েছিল যাকে "হারবে বাসূস" বলে। এই যুদ্ধের সূচনা ছিল একটি মুরগির বাচ্চা নিয়ে। এক লোকের মুরগি আরেক লোকের খেতে গিয়ে শস্য খেয়ে ফেলে। খেতের মালিক এটা দেখে খুব ক্রুদ্ধ হয় এং মুরগির বাচ্চাটা মেরে ফেলে। মুরগির মালিক ঘর থেকে বের হয়ে আসে। তুমি কেন মুরগিটা হত্যা করলে? প্রথমে তর্কাতকি, এরপর হাতাহাতি। সর্বশেষ উভয় দল রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। কয়েক পুরুষ ধরে এই যুদ্ধ চলতে থাকে। এভাবে দীর্ঘ চল্লিশ বছর এ যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। বাপ যখন মরে যেত তখন সন্তানকে এই বলে অসিয়ত করত যে বেটা যাই কর কিন্তু আমার শত্রুকে মাফ করো না। এই লড়াই চালিয়ে যেও। কত মানুষের প্রাণ যে এই চল্লিশ বছরে অকালে ঝরেছে।

হযরত আলী (রা) এর এক ঘটনা

একবার এক ইহুদি হযরত আলী (রা)-এর সামনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে বেয়াদবিমূলক উক্তি করে। হযরত আলী (রা) তা শুনে খুব ক্রুদ্ধ হন। তিনি ঐ ইহুদিকে আক্রমণ করে তার বুকের ওপর চড়ে বসেন। ইহুদি যখন দেখল যে, হযরত আলী (রা) তার বুকে চড়ে বসেছেন, তখন সে হযরত আলী (রা) এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করে। ইহুদি থুথু নিক্ষেপের সাথে সাথেই হযরত আলী (রা) ইহুদিকে ছেড়ে তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে যান। যে ব্যক্তি এই ঘটনা দেখছিল সে বলল, হযরত ঔ ব্যক্তি আপনার চেহারায় থুথু নিক্ষেপ করেছে এবং জঘন্য উক্তি করেছে। তাকে অধিক শাস্তি দেয়ার দরকার ছিলো। কিন্তু আপনি তাকে ছেড়ে দিলেন। উত্তরে হযরত আলী (রা) বলেন, আমি আমার নিজের জন্য তার সাথে লড়িনি। হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে বেয়াদবি করার কারণে আমি তার সাথে লড়ছিলাম। কিন্তু যখন সে আমার মুখে থুথু দিল এখন যদি আমি তার সাথে লড়াই করি তাহলে এটা হবে নিজের জন্য লড়াই করা। আর নিজের জন্য লড়াই করা আমি পছন্দ করি না ! তাই আমি তাকে ছেড়ে পৃথক হয়ে গেছি।

সাহাবায়ে কেরামের উচ্চ মর্যাদা

এক লাখ চব্বিশ হাজার সাহাবা রেখে হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। এসকল সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম গর্ব করে পূর্ণ আস্থার সাথে বলতেন–

أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم۔

"আমার সাহাবীরা নক্ষত্রের ন্যায়। তাদের যাকেই তোমরা অনুসরণ করবে হেদায়াত প্রাপ্ত হবে।" কীভাবে এই মানুষগুলোকে গড়ে তুললেন? সীরাতে তায়্যেবার মাধ্যমেই গড়ে তুলেছেন। না তলোয়ারের মাধ্যমে, না বলপ্রয়োগ করে। বরং সরকারে দু'আলাম তাঁর সীরাতে তায়্যেবার মাধ্যমে, তাঁর চরিত্র মাধুর্য, উত্তম আমাল এবং আদর্শিক জীবনাদর্শের মাধ্যমে তাঁদের প্রত্যেকের জীবনে এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন যে পুরো সমাজ ব্যবস্থা পাল্টে গিয়েছে।

আজও সীরাত বিদ্যমান

আল হামদুলিল্লাহ আজও সীরাত বিদ্যমান এবং সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত আছে। পৃথিবীর কোন জাতি এ দাবি করতে পারবে না যে, তাদের নেতার জীবন এত সুনির্ভরভাবে সংরক্ষিত আছে যেমনটা সংরক্ষিত আছে হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন। সারওয়ারে দু'আলম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতিটি ঘটনা ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। উম্মতে মোহাম্মদীর ওলামায়ে কেরাম প্রতিটি বিষয় গুণে অনুসন্ধান করে নিজের জীবনকে ব্যয় করে সম্পদের সঠিকতা নির্ণয় করেছেন। এরপরেই সীরাতে তাইয়্যেবা আমাদের কাছে নির্ভুল রূপে সংরক্ষিত করা সম্ভব হয়েছে।

জাগরণ না হওয়ার কারণ

সীরাতে তায়্যিবার ফলে সমাজে কোন পরিবর্তন আসছে না, কোন জাগরণ হচ্ছে না। সামাজিক অবস্থার সংশোধন হচ্ছে না। এর কারণ কী? এর কারণ এই যে, আমরা সীরাতে তায়্যেবাকে তাকের ওপর সাজিয়ে রেখেছি। পাঠাগার ও আলমিরার শোভা বানিয়েছি। সীরাতকে নিজের জীবনে অন্তর্ভুক্ত করার ভাবনা ছেড়ে দিয়েছি। রাসূলের সুন্নতের অনুসরণের চিন্তা বাদ দিয়েছি। যার ফলে সীরাত আপন স্থানে সংরক্ষিত আছে, জীবনের চাকা তার ওপর ঘুরছে কিন্তু কোন পরির্তন আসছে না। কোন জাগরণ সৃষ্টি হচ্ছে না।

২৪ ঘণ্টা থেকে কিছু সময় বের করুন

যেহেতু আমরা রাবিউল আউয়াল মাসে সীরাতে তায়্যেবার আলোচনা করি, তো কমপক্ষে আমাদের সামনে এ বিষয়টা রাখা উচিৎ যে, সীরাতে তায়্যেবার

আসল উদ্দেশ্য কী? নিজের জীবনে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা। এ জন্য আমি আপনাদেরকে কিছু কথা বলব। যদি এর উপর আমল হয়ে যায় তো আশা করি ইনশাআল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতের উত্তম পাথেয় প্রস্তুত হবে। তা এই যে, প্রত্যেক মুসলমান তার ঘরে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সকাল সন্ধ্যার কিছু সময় সীরাতে তায়্যেবা পাঠ করার জন্য বের করবে। এ সংকল্প করা যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজে সীরাতুন্নাবী থেকে কিছু অধ্যয়ন না করবো এবং আমার সন্তানদের না শিখাবো ততক্ষণ পর্যন্ত রাতে ঘুমাবো না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আধা ঘণ্টা বের করুন এবং ঐ সময় সীরাত পড়ুন। এরপর নিজেকে যাচাই করুন, কোন কাজ আমরা করছি এবং কোন কাজ ছেড়ে দিচ্ছি। যে কাজ আমরা করছি সেটাকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করায় নিরত থাকা।

রাসূল আকরাম (সা.)-এর আদর্শ অধ্যয়ন করুন

হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত ও সীরাতের উপর সব ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে। উর্দু, আরবী, ইংরেজি সব ভাষার কিতাব রয়েছে। তবে আমি আপনাদেরকে একটা কিতাবের সংবাদ দিচ্ছি যা খুব সহজ সরল ভাষায় লেখা হয়েছে। এ কিতাবে হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কিত সুন্নত বিদ্যমান রয়েছে। কিতাবটির নাম 'উসওয়ায়ে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমার শায়েখ ডা. আব্দুল হাই সাহেব রহমতুল্লাহ কর্তৃক লিখিত। এতে হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের যে সকল দিক সনদসহ বর্ণিত হয়েছে সেগুলো সংকলন করা হয়েছে। সেই সাথে দীনি মাসয়ালাগুলো সংকলিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন ধারা কেমন ছিল। এই কিতাব যেন একটা ডায়েরী যার মাধ্যমে একজন মানুষ তার জীবনকে রাসূলের সুন্নতের সাজে সজ্জিত করতে পারে। প্রতিদিন এই কিতাব পড়া, আধা ঘণ্টা, ২০ মিনিট, না হলে ১০ মিনিট। প্রতিদিন ঘুমানোর পূর্বে পড়া। এরপর যখন আপনি নিজের জীবনকে যাচাই করবেন তখন দেখবেন এমন কত সুন্নত আছে যা পালন করার আপনার ক্ষমতা ছিল। কোন সমস্যাই ছিল না, অমনোযোগিতা ও উদাসীনতার কারণে আমরা এসকল সুন্নতের বরকত থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

একটি সুন্নত যিন্দা করার সাওয়াব

হাদীস শরীফে আছে যে, একটি সুন্নত যিন্দা করা একশত শহীদের সমান ছাওয়াব। মানুষ যখন কোন একটা সুন্নতের উপর আমল করে তখন সে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করে। এজন্য প্রতিদিন এই কিতাব অধ্যয়ন করা এবং তাতে যে সকল সুন্নত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার উপর আমল করার চেষ্টা করা তো ইনশাআল্লাহ খুব দ্রুতই আল্লাহ তা'আলা জীবন পাল্টে দিবেন। আমাদের জীবন হবে সুন্নতের নমুনা এবং সীরাতে তায়্যেবার কিছুটা হক্ব আদায় হবে। আল্লাহ তাআলা আপন দয়া ও অনুগ্রহে আমাকে এবং আপনাকে আমল করার তাওফিক দান করেন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اٰمَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْم وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিনটি বৈশিষ্ট্য

হযরত আনাস (রা) একমাত্র সাহাবী যিনি দীর্ঘ দশ বছর মদীনা মুনাওয়ারায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করেছেন। তাঁর পিতা-মাতাও তাকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংস্পর্শে থাকার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বর্ণনা করেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন দুনিয়ার সকল সৌন্দর্যের আধার। দানশীলতা ও বদান্যতার সমাহার এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার অতুলনীয় সম্ভার। এই তিনটি গুণ নিয়ে এখন আলোচনা করবো।

হুযুর ছিলেন সকল সৌন্দর্যের আধার

প্রথম যে গুণটি বর্ণনা করেছেন তা এই যে, হুযুর ছিলেন বর্ণ ও আকৃতির দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ। এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা) একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। একরাতে আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসাছিলাম। আকাশে ছিল চতুর্দশীর চাঁদ। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ডোরাকাটা চাদর পরিধান করে আগমন করেন। আমি একবার চাঁদের

দিকে তাকাচ্ছিলাম একবার হুযুরের চেহারার দিকে তাকাচ্ছিলাম। আমার কাছে মনে হচ্ছিল হুযুর চাঁদ থেকেও বেশী সুন্দর।

মানুষের মাঝে প্রচলিত আছে যে, হযরত ইউসুফ (আ) সবচেয়ে সুন্দরতম মানুষ ছিলেন। সূরা ইউসুফে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা এসেছে। আর আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআলা ঘটনাক্রমে তাকে বড় সৌন্দর্য দান করেছিলেন। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখার সৌভাগ্য যারা লাভ করেছেন তারা বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অধিক সুন্দর এ পৃথিবীতে আর কাউকে দেখিনি।

হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সৌন্দর্য এবং হযরত ইউসুফ (আ) এর সৌন্দর্য

শেরখানে হযরত ইউসুফ (আ) এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে হযরত ইউসুফ (আ) তার ঘরে গোলাম হিসেবে ছিলেন। আর জোলেখা ছিল তাঁর মনিবপত্নী। জোলেখার বান্ধবীরা তাকে ভর্ৎসনা করে যে, তুমি মনিবপত্নী হয়ে এক দাসের প্রতি আসক্ত হয়েছ। জোলেখা এর সমুচিত জবাব দেয়ার জন্য বান্ধবীদের দাওয়াত করে। তাদের প্রত্যেকের সামনে একটা করে ফল ও সাথে ছুরি রাখা হয়। এরপর জোলেখা হযরত ইউসুফ (আ) কে বলেন তুমি ভিতরে যাও। হযরত ইউসুফ (আ) যখন কামরায় প্রবেশ করেন তখন জোলেখার বান্ধবীরা বসে ছিল। হাতে ছুরি এবং ফল ছিল। আচানক ইউসুফ (আ) কে দেখে তার সৌন্দর্যে নির্বাক। ফল না কেটে হাত কেটে ফেলে। জোলেখা যখন দেখল তারা হাত কেটে ফেলেছে তখন জোলেখা বলল, কোরআনের ভাষায়, فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ 'এই সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করেছিলে।" যে তুমি তার সৌন্দর্যে আসক্ত হয়ে পড়েছ।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, জোলেখার বান্ধবীরা তাকে ভর্ৎসনা করেছিল। হযরত ইউসুফ (আ) কে দেখে তাদের হাত কেটে ফেলেছিল। তারা যদি কখনো হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কপালের দ্যুতি দেখত তাহলে তারা হাত না কেটে নিজেদের বক্ষ বিদীর্ণ করে ফেলত। আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ (আ) কে এমন সৌন্দর্য দান করেছেন।

সবচেয়ে বেশি দানশীল

দ্বিতীয় বর্ণিত গুণটি এই যে, হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে বেশী উদার এবং দানশীল ছিলেন। কেউ কোন প্রয়োজন নিয়ে কখনও তাঁর

কাছে এলে ফিরে যেত না। হাদীস শরীফে আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কোন সাহায্য প্রার্থীকে না বলেন নি।

হুযুরের বীরত্বের ঘটনা

তৃতীয় যে গুণটি বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাহাদুরির একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। এক রাতে মদীনা মুনাওয়ারার লোকদের মাঝে আতংক ছড়িয়ে পড়ে, তৎকালে মদীনা মুনাওয়ারা ছিল ছোট্ট একটি জনপদ। বর্তমানে যে হেরেম শরীফ আছে সেটা পুরো জনপদকে বেষ্টন করে নিয়েছে। এত ছোট ছিল মানুষ ঘুমে বিভোর ছিল আচানক জঙ্গল কিংবা মরুর দিক থেকে এক ভয়ংকর আওয়াজ ভেসে আসে। মনে হচ্ছিল রক্ত নেশায় উন্মুক্ত কোন শত্রুদল হামলা করেছে। মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসে। হযরত আনাস বলেন, মানুষ ঘর থেকে বের হয় আওয়াজ লক্ষ করে অগ্রসর হতে শুরু করে। কিছুদূর অগ্রসর হতেই দেখা যায় হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসছেন। তিনি হযরত আবু তালহা (রা) এর ঘোড়ার জীনবিহীন পিঠে আরোহণ করেছিলেন। তাঁর গর্দানে তলোয়ার ঝুলছিল। তিনি সবাইকে দেখে বলেন, ভয়ের কোন কারণ নাই। কিছুই হয় নি। হুযুর বলেন, আমি এমন এক ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করেছি যে, আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমি কোন উত্তাল সমুদ্রে আছি।

হযরত আনাস বলেন, সবাই যখন ভয়ে পেরেশান একা যাওয়ার হিম্মত হচ্ছে না। সবাই এক সাথে যাচ্ছে। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম একা একা ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করে আসেন এবং সকলকে সান্ত্বনা দেন। আশ্বস্ত করেন।

তিনি ছিলেন আশ্রয়স্থল

সাহাবায়ে কেরাম বলেন, যখন জিহাদের ময়দানে হামলা তীব্রতর হতো এবং আমাদের মাঝে আতংক ছড়িয়ে পড়ত, তখন আমরা হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিতাম। তিনি আমাদের আশ্রয় দিতেন। আমাদেরকে সান্ত্বনা দিতেন।

হুযুরের বাহাদুরির দ্বিতীয় ঘটনা

কোন এক যুদ্ধের সফরে হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক জায়গায় যাত্রাবিরতি করেন। দ্বিপ্রহর ছিল। পুরো বাহিনী আরাম করতে চাচ্ছিল। তো হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামান্য সময় বিশ্রাম নেয়ার জন্য

একটি ছায়ায় শুয়ে পড়েন। তলোয়ার পাশেই রাখেন। এরপর চোখ লেগে আসে। এক মুশরিক দেখল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাকী শুয়ে আছেন। তলোয়ার তার পাশেই পড়ে আছে। সে সুযোগটা লুফে নিল। ছুটে তলোয়ারটা উঠিয়ে নেয়, যখন মুশরিক তলোয়ার উঁচু করে ধরে তখন হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘুম ভেঙ্গে যায়। মুশরিক বলল, হে মুহাম্মদ! বল, আজকে তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চিন্ত মনে উত্তর দিলেন আল্লাহ আমাকে বাঁচাবেন। মুশরিক যখন দেখল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখছেন, তরবারি তার মাথার উপর এবং তিনি নিরস্ত্র, আমি যদি চাই হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষতি করতে পারি। কিন্তু বড় অদ্ভুত ব্যাপার হলো এ ব্যক্তি সামান্য বিচলিত নয়। কোন দ্বিধা নাই, বরং পূর্ণ আস্থা ও নিশ্চিত বিশ্বাসের সাথে বলছে আল্লাহ বাঁচাবেন। হুযুরের এই উক্তি তার মাঝে এত প্রভাব ফেলে যে, সে কাঁপতে থাকে। কম্পনের কারণে তার হাত থেকে তরবারি পড়ে যায়। হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তরবারি উঠিয়ে মুশরিককে বলেন, বল এখন তোমাকে কে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? মুশরিক এই পরিস্থিতি দেখে ঘাবড়ে যায়। হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি তোমাকে হত্যা করব না এ কারণে যে, তুমি নিরস্ত্র। আর আমি নিজের জন্য কারো থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করি না। তো এই মুশরিক যখন হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র মাধুর্য দেখল তখন আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা তাকে ঈমান আনার তাওফিক দেন। তখন সে أشهد الا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله পড়ে মুসলমান হয়ে যায়। হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহসিকতার এক দুটি নয় বরং হাজারো দৃষ্টান্ত রয়েছে।

মুমিনের আকীদা বিশ্বাস

এই ঘটনা বর্ণনা করে এটাই শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য যে, একজন মুমিন যখন আল্লাহ তাবারকার উপর ঈমান আনে তখন তার উচিৎ ভীরু না হওয়া বরং সাহসী হওয়া। বাহাদুর হওয়ার দাবি হলো একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করার উদ্দেশ্যে মানুষ আমল করবে। এরপর নিজের বিষয়কে আল্লাহ তাআলার হাওয়ালা করে দেয়া যে, আল্লাহ আমার ভাগ্যে যা লিখেছেন তাই হবে। জগতের এমন কোন শক্তি নেই যা তকদীরের বিপক্ষে আমার কোন ক্ষতি করতে পারে। প্রত্যেকের মনে এই বিশ্বাস থাকা উচিৎ যে, সারা জগত মিলে যদি আমার ক্ষতি করতে চায়, কিন্তু তা যদি হয় আল্লাহ তাআলার মর্জি ও মানশার বিপরীত তাহলে কেউই আমার কিছু করতে পারবে না। আর সারা

আলম মিলে যদি আমার উপকার করতে চায় তো আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা, সন্তুষ্টি এবং অনুমতি ব্যাতীত কোন উপকার করতে পারবে না। এক হাদীসে হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি এই কথার উপর ঈমান এনেছে যে, জগতসমূহে যা কিছু হচ্ছে তা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা, সন্তুষ্টি এবং অনুমতি ছাড়া না কোন বস্তু ক্ষতি করবে না কোন উপকার করতে পারবে। তাহলে এই ভীরুতার কী কারণ। কেননা সে তো আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া উচিত

সতর্কতামূলক যত ব্যবস্থা আছে তা গ্রহণ করার নির্দেশ আল্লাহ তাআলাই দিয়েছেন। আলোচ্য ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো যে, বিপদের মুহূর্তে হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম জঙ্গলের দিকে যাত্রা করেছেন, কিন্তু ঘাড়ে তরবারি ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। তো এখান থেকে আমরা এই শিক্ষা পাচ্ছি যে, সতর্কতা অবলম্বন না করা এবং ব্যবস্থা না নেয়া এক ধরনের আত্মপ্রতারণা। এটা কোন বাহাদুরি না। হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি কাজ করেছেন আল্লাহ তাআলার নির্দেশে এবং তার মানশা মাফিক। যেমনটা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, خُذُوْا حِذْرَكُمْ 'তোমরা তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী আত্মরক্ষার উপকরণ গ্রহণ করো।' তো আত্মরক্ষার সকল উপকরণ গ্রহণ করার পর বাকি কাজ আল্লাহর উপর ছেড়ে দিন। আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআলা যা লিখে রেখেছেন তাই হবে। কোন মানুষ আমার উপকার-অপকার কিছুই করতে পারবে না। এই বিশ্বাস যার মনে বসে গিয়েছে সে দুনিয়ার কোন পরাশক্তিকেই ভয় করে না।

একত্ববাদ বিশ্বাসী তো সেই যার পায়ের নিচে স্বর্ণমুদ্রা রাখা হয়েছে, মাথার উপর তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এতে তার কোন আসক্তি হবে না এবং আল্লাহ ছাড়া কারো প্রতি ভয়ও জন্মায় না। তাওহীদের অর্থ হলো আল্লাহকে এক মানা। আল্লাহকে এক মানার দাবি এই যে, বিশ্বজগতে কোন একটি অণু, কোন একটি পাতাও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছাড়া নড়ে না। তিনিই ঐ সত্তা যিনি ভালবাসার যোগ্য, তিনিই ভয় ও আশার নিরাশার উপযুক্ত। অর্থাৎ তাকে ছাড়া বান্দা কাউকে ভয় করবে না এবং কারো প্রতি আশাও রাখবে না।

মুমিনের সাহসের ঘটনা

হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম। তিনি আব্বাজান (রহ) এর উস্তাদ ছিলেন। তিনি ছিলেন দারুল

উলূমের প্রধান নির্বাহী। এক বার কিছু সংখ্যক মানুষ তার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে। আর শত্রুতার রেশ খুন পর্যন্ত গড়ায়। তখন ছিল গরমকাল, প্রচণ্ড গরমের কারণে তিনি দফতরে ঘুমাতে পারতেন না। তিনি নিয়ম অনুযায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা করে ছাদের উপর ঘুমাতেন। একদিন এক লোক এসে বলল, হযরত চারদিকে শত্রুর আনাগোনা, সবাই আপনার শত্রুতায় এক পায়ে খাড়া, সেখানে আপনি ছাদে একাকী শুয়ে আছেন। এটা তো যুক্তিসংগত মনে হচ্ছে না। হযরত বললেন, ঠিক আছে ভাই, সতর্কতা অবলম্বন করা শরীয়তের নির্দেশ। ইনশাআল্লাহ নির্দেশ পালন করবো। তবে যতটুকু প্রয়োজন। মানুষ আমার শত্রুতে পরিণত হয়েছে, আমাকে খুন করতে চাচ্ছে। মনে রেখ আমি ঐ পিতার সন্তান, চারজন মিলে যার জানাযা উঠাতে পারছিল না। হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব ছিলেন হযরত উছমান (রা) এর বংশধর। হযরত উসমান (রা) কে যখন বিদ্রোহীরা শহীদ করেছিল তখন রাতের অন্ধকারে গোপনে তাকে দাফন করে।

হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব বলেন, অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ, তবে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু। তবে একজন মুমিনের এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ ছাড়া জগতে এমন শক্তি নাই যা উপকার করতে পারে কিংবা ক্ষতি করতে পারে। তাহলে কিসের ভয়, কিসের শংকা। হ্যাঁ যা কিছু হচ্ছে তা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পালনার্থে। আল্লাহ বলেছেন হাতিয়ার নাও, তো হাতিয়ার নাও। আল্লাহ বলেছেন, সতর্কতা অবলম্বন করো। তো সতর্কতা অবলম্বন করো। তাহলে কিসের ভয়। ভাগ্যে যা লেখা আছে তাই হবে।

ইহুদিদের হিংসা

প্রথম থেকেই ইহুদিরা দুষ্ট প্রকৃতির সম্প্রদায়। অনিষ্ট প্রবণতা তাদের রক্ত-মাংসে মিশে গিয়েছিল। এ সম্পর্কে কোরআনে বহু আয়াত আছে। তারা হযরত মুসা (আ) কে এত কষ্ট দিয়েছে যার কোন হিসাব নাই। হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত কররেন তখন মদীনার আশে পাশে ইহুদি বসতি ছিল। হুযুরের আগমনের ফলে তারা হিংসায় জ্বলে ওঠে। তাদের হিংসার একটা কারণ ছিল যে, তাওরাতের বিভিন্ন অধ্যায়েও শেষ যামানার একজন নবী আগমনের সু-সংবাদ ছিল। তো ইহুদিদের খায়েশ ছিল, শেষ নবী তাদের মধ্য থেকে আগমন করবেন।

আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির কিছু নিয়ম এমন রেখেছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আ) দুইজন ছেলে ছিল। একজন হযরত ঈসমাইল (আ), আরেকজন হযরত ইসহাক (আ)। হযরত ইব্রাহীম (আ) এর পর থেকে হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যত নবী এসেছেন সবাই হযরত ইসহাক (আ) এর সন্তান। যেমন,

হযরত ইসহাক (আ) এর সন্তান হযরত ইয়াকুব (আ)। হযরত ইয়াকুব (আ) এর সন্তান হযরত ইউসুফ (আ)। এভাবে সকল নবীকে বনী ইসরাঈল বলে। কেননা হযরত ইয়াকুব (আ) এর আরেকটি নাম ছিল ইসরাঈল। হযরত ইবরাহীম (আ) এর দ্বিতীয় সন্তান হযরত ইসমাঈল (আ) তার বংশধর থেকে মাত্র একজন নবী এসেছেন। যিনি সর্বশেষ নবী, সকল আম্বিয়া (আ) এর সর্দার, রাসূলে আকরাম হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যেহেতু সকল নবী রাসূল এসেছেন নবী ইসরাঈল থেকে। আর ইহুদিরাও ইসরাঈলদের বংশধর। এজন্য তাদের চাহাত ছিল সর্বশেষ নবী বনী ইসরাঈল থেকে আগমন করবেন। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী ইসরাঈল থেকে আগমন করেন। যার ফলে তিনি ইহুদিদের হিংসার পাত্রে পরিণত হন।

ইহুদিদের হিংসার দ্বিতীয় কারণ

তৎকালে মদীনা মুনাওয়ারায়, আওস এবং খাযরাজ নামে দুটি গোত্রের বসবাস ছিল। এদের মাঝে বিরোধ ছিল তুঙ্গে। সব সময় লড়াই লেগে থাকত। ইহুদিরা সব সময় এই ফিকিরে থাকত কীভাবে তাদেরকে যুদ্ধে লিপ্ত রাখা যায়। তাহলে তাদের ব্যবস্থা ফুলে উঠবে। যুদ্ধে সর্বস্ব খুইয়ে ইহুদিদের কাছে ঋণের জন্য আসবে। ইহুদিরা তাদেরকে চড়া সুদে ঋণ দিবে। ইহুদিরা সফলভাবে তাদের মিশন পরিচালনা করছিল।

হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় আগমনের পূর্বে আউস-খাযরাজ উভয় গোত্রের মাঝে বুআস নামক একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছিল। একশত বিশ বছর পর্যন্ত এই যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। এই যুদ্ধে উভয় গোত্রের বড় বড় নেতারা নিহত হয়েছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন উভয় গোত্রকে ঈমানের দাওয়াত দেন। তাওহীদ ও একাত্ববাদের বিশ্বাসে উৎসাহিত করেন। হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতে এবং উত্তম আদর্শের কারণে উভয়ের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে ওঠে।

কোরআনের ভাষায়–

إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔

"ঐ সময়কে স্মরণ করো যখন তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে। এরপর আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরে জোড় ও মিল সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়েছ।"

শত্রুতা এবং ঘৃণার যে আগুন তাদের মাঝে জ্বলছিল, তার স্থানে আল্লাহ তাআলা এমন মুহাব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে একে অপরের ভাই হয়ে যায়।

লড়াই বন্ধ করে সকলে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এতে করে ইহুদিদের সুদি কারবার মুখ থুবড়ে পড়ে। যার কারণে হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাদের হিংসার মাত্রা আরো বেড়ে যায়। তারা তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ইহুদির যখন হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশ দিয়ে যেত তখন তারা বলত السام عليكم কখনো السلام عليكم অর্থ তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর السام عليكم তোমার উপর মৃত্যু আসুক। তুমি ধ্বংস হও। শ্রোতা বুঝতেই পারত না সে কি বলছে।

নম্র আচরণের প্রতি হুযুরের উপদেশ

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদিন কয়েকজন ইহুদি আমাদের কাছে আসে। তারা এসে বলে السام عليكم তখন হযরত আয়েশা (রা) তাদের উত্তরে বলেন, عليكم السام والزام واللعنة তোমার উপর মৃত্যু আসুক, তোমরা ধ্বংস হও তোমরা অভিশপ্ত হও। তারা শুধু একটা শব্দ বলেছে, السام কিন্তু উত্তরে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) তিনটা বলেছেন। এরপর তারা চলে যায়। তখন হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা (রা) কে বলেন, হে আয়েশা! তুমি অনেক শক্তভাবে উত্তর দিয়েছো। এটা উচিৎ হয়নি, উচিৎ ছিল নরম ভাষায় বলা। কটু কথা না বললেও পারতে। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আপনি কি শুনেননি তারা কি বলেছে। তারা আমাদের বোকা বানাতে চেয়েছে, ভেবেছে আমরা নির্বোধ। আপনার শানে বড় বেয়াদবি মূলক উক্তি করেছে। আমার সহ্য হয়নি। আমি উত্তর দিয়েছি। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি উত্তর দিয়েছি সেটা তো তুমি দেখনা। যখন তারা বলেছে السام عليكم তখন আমি বলেছি وعليكم, অর্থাৎ তোমাদের উপরেও আর وعليكم السلام, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। যে যেভাবেই সালাম দেক, وعليكم বললে তার উত্তর হয়ে যায়। وعليكم ছাড়া না আমি অভিশাপের শব্দ ব্যবহার করেছি না উচ্চারণ করেছি মৃত্যু বা ধ্বংসের কথা। তবে মনে রেখ তারা যাই বলুক তাদের বদদোআ আমার জন্য কবুল হয় না কিন্তু আমাদের বদদোআ তাদের জন্য কুল হয়ে যায়। এ কারণে তোমার عليكم السام والزام واللعنة বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। এরপর বললেন, আয়েশা

إن الله يحب الرفق فى الأمر كله او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ

হে আয়েশা! আল্লাহ তাআলা সর্বক্ষেত্রে নম্রতা পছন্দ করেন। কোন কোন রেওয়াতে আছে, নম্রতা যখন কারো কার্যে পরিণত হয় তখন আল্লাহ তাআলা তার মাঝে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন। আর যখন কারো থেকে নম্রতা বের করে নেন তখন তার মাঝে দোষ-ত্রুটি সৃষ্টি করে দেন।

আমাদের জন্য শিক্ষা

আপনি একটু ভেবে দেখুন, ইহুদি সম্প্রদায় যারা সব সময় এই ফিকিরে থাকত যে, কি করে হুযুরের ক্ষতি করা যায়। সাহাবীদের ক্ষতি করা যায়। এজন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হত। গোপনে যে তা নয় বরং প্রকাশ্যেই আল্লাহর রাসূলকে বলছে السام عليكم হযরত আয়েশা (রা) একটু রূঢ় ভাষায় উত্তর দেয়াতে হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সতর্ক করছেন। আয়েশা এত শক্ত কথা বলার কোন প্রয়োজন নাই। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই বলো। আয়েশা নম্রতা অবলম্বন করো। কাফের, দুশমন, ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে কথা বলায় হুযুর কতটুকু সতর্কতা গ্রহণ করেছেন। সেখানে আমাদের পরস্পর কথা বলার সময় ভাষাটা কেমন হওয়া উচিৎ? একটু ভাবুন। হযরত আয়েশা (রা) কে হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন শিক্ষা দিয়েছেন যে তিনি বলেন, এরপর আমার মুখ থেকে লানত, ধ্বংস এজাতীয় কোন বদদোআ উচ্চারিত হয় নি।

ফেরআউনের সাথে নম্রতার নির্দেশ

আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতি শফি সাহেব (রহ) বলতেন যে, যখন আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা (আ) এবং তার ভাই হারুনকে ফেরআউনের কাছে পাঠালেন তখন আল্লাহ তাআলা বললেন যাও এবং তাকে উপদেশ দাও فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا তার কাছে গিয়ে নরমভাবে কথা বলো, কেননা তাকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে। আর একজন দাঈর কাজ হলো নরমভাবে কথা বলা। কারণ সে তো নিজেকে বড় খোদা দাবি করত। সে বলত أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى আমিই তোমাদের মহান রব। আল্লাহ বলছেন لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى মুসা নরম ভাষায় কথা বলো, যাতে সে উপদেশ গ্রহণ করে কিংবা ভয় করে। ফেরআউনের কাছে পাঠানোর সময় আল্লাহ তাআলা এই উপদেশ দিয়েছেন। হতে পারে, তিনি গিয়ে বলবেন, খোদার দাবিদার, অভিশপ্ত, বিতাড়িত ইত্যাদি বলে গালমন্দ করতেন। এজন্য আল্লাহ উপদেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন নম্রভাবে কথা বলো।

ফেরআউন থেকে বড় গোমরাহ কেউ নেই

আব্বাজান হযরত মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব (কাদ্দসাল্লাহু সিররুহ) বলতেন, আজ তোমরা হযরত মুসা (আ) থেকে বড় সংশোধনকারী হয়ে যাও নি এবং তার মুখাতাব ফেরআউন থেকে বড় গোমরাহ হতে পারনি। এরপরও আল্লাহ তাআলা হযরত মুসাকে (আ) ফেরআউনের সঙ্গে নরম ভাষায় কথা বলতে বলেছেন। অথচ আল্লাহ জানতেন যে ফেরআউন কখনো ঈমান আনবে না। তা সত্ত্বেও তার সাথে নম্রতার নির্দেশ দিয়েছেন। তাহলে আমি আপনি কোন মেরুতে আছি। আমাদের কেউ তো আরো তাকিদের সাথে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যখন আমরা কারো সাথে কথা বলবো, কাউকে দ্বীনের দাওয়াত দিব, কিংবা সংলাপের আদেশ করব অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবো তখন আমাদের উচিৎ নম্রতা অবলম্বন করা। এটা কোরআনের বাণী এবং হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ। এজন্য কঠোরতা করা নির্দয় হওয়া চাই তা দ্বীনের জন্য হোক না কেন এটা আম্বিয়া (আ) দের তরীকা নয়।

হযরত হুদ (আ) এর উত্তর প্রদানে নম্রতা

আব্বাজান (রহ) বলতেন, (আল্লাহ তার মর্যাদা সমুন্নত করেন) দেখ হযরত হুদ (আ) যখন স্ব-গোত্রের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে একত্ববাদের প্রতি আহব্বান করলেন এং অন্যায় কাজের ব্যাপারে সতর্ক করলেন তখন সম্প্রদায় তাকে বলল, إِنَّا لَنَرَاكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ "আমরা তো তোমাকে নির্বুদ্ধিতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি, আমাদের প্রবল ধারণা তুমি পাক্কা মিথ্যাবাদী।"– নাউযুবিল্লাহ আব্বাজান (রহ) বলতেন, এখন যদি কেউ কোন দাঈকে, কোন ওয়ায়েজকে বা কোন সংশোধনকারীকে বলে তুমি বেকুফ, তুমি মিথ্যাবাদী, উত্তরে দাঈ বলবে তুমি মিথ্যুক, তোমার বাপ মিথ্যুক, তুমি বেকুফ তোমার বাপদাদা বেকুফ। কিন্তু দেখ নবী কী উত্তর দিয়েছেন يَا قَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ "হে আমার সম্প্রদায় আমি বেকুফ নই।" কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে তোমাদের হেদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন। বেকুফ বলে সম্প্রদায় যে গালি দিয়েছে হযরত হুদ (আ) সেই গালিকে উপেক্ষা করে বললেন, আমি তোমাদের জন্য হেদায়েতের বার্তা নিয়ে এসেছি।

আল্লাহ্ পাক হুযুর (সা.)-কে কোমল বানিয়েছেন

পয়গাম্বর গালির উত্তর গালি দিয়ে দেন না। মন্দ আচরণের প্রতিদানে মন্দ আচরণ করেন না। তাদের সাথে যতরূঢ় আচরণ করা হোক তারা কোমল আচরণ করতেন। এই কোমলতার মাধ্যমে মন জয় করতেন। কোরআন বলছে فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ আল্লাহ তাআলা হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন, "এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে কোমলতা দান করেছেন।" وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ 'আপনি যদি তাদের সাথে শক্ত কথা বলতেন এবং তাদের সাথে নির্দয় আচরণ করতেন তাহলে সবাই আপনার কাছ থেকে সরে যেত। আমি আপনাকে কোমলতা দান করেছি এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। পয়গাম্বরদের তরীকা ছিল 'শাফাকত, বা স্নেহশীলতা। তাঁরা সকল সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়ার্দ্র হতেন।

হাদীস শরীফে আছে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, দাউস গোত্র মুসলমান হয়নি। তখন মানুষজন হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলেন, হুযুর দোআ করেন, আয় আল্লাহ! দাউস গোত্রকে হেদায়াত দান করুন এবং আমার কাছে নিয়ে আসুন। এই দো'আর বরকতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মুসলমান হওয়ার তাওফিক দান করেছেন।

এক বুযুর্গের কোমলতার ঘটনা

হযরত মারুফ কারখি অনেক বড় মাপের ওলি আল্লাহ ছিলেন। অনেক উঁচু স্তরের বুযুর্গ ছিলেন। বাগদাদে তার মাজার রয়েছে। একবার তিনি তার এক মুরিদকে নিয়ে দজলা নদীর তীর দিয়ে হাঁটছিলেন। এ সময় একটি প্রমোদতরী দজলা দিয়ে যাচ্ছিল। তরীতে কিছু ভবঘুরে লম্পট ধরনের যুবক ছিল। তারা বিনোদনের উদ্দেশে বের হয়েছিল। নওজোয়ান মানুষ, না আছে দ্বীনের ফিকির না আখেরাতের ফিকির। তারা গান বাজনা করে যাচ্ছিল। যখন তারা বুযুর্গদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল তখন মোল্লা টাইপের দু'জনকে তামাশার খোরাক পেয়ে যায়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে এমনই হয় যখন, কোন ভবঘুরে বদমাশ কিসিমের লোকজন ঘুরতে বের হয় তখন যদি সামনে মওলভী দেখতে পায় তারা যেন আনন্দদায়ক কোন বস্তু পেয়ে যায়। যুবকদের কার্যকলাপ দেখে মুরিদ বলল, কেমন বেয়াদব, নিজেরা তো অবাধ্যতায় লিপ্ত, গুনাহে রত, শুধু তাই নয় বরং আল্লাহর নেক বান্দা, হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত মোতাবেক আমল করছে তাকে নিয়ে তামাশা করছে। হযরত আপনি তাদের

জন্য বদদোআ করেন আল্লাহ যেন এদেরকে নাফরমানি এবং অবাধ্যতায় ধ্বংস করেন। হযরত মারুফ কারখী (রহ) হাত উঠান, দোআ করেন, আয় আল্লাহ! আপনি তাদেরকে দুনিয়াতে আনন্দে রাখুন এবং খুশি রাখুন। আপনি তাদেরকে আখেরাতেও খুশি রাখুন, মুরিদ বলল, হযরত আপনি তো তাদের ব্যাপারে বেশী দোআ করলেন। ভাই তোমার কি ক্ষতি? আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ায় আনন্দে রেখেছেন আখেরাতেও আনন্দে রাখবেন। আর আখেরাতে তো আনন্দ তখনই মিলবে যখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সংশোধন করবেন এবং নেককার বানাবেন। আমি এমন দোআ করেছি যে, আল্লাহ তাদেরকে নেক্কার বানান যাতে দুনিয়াতেও আনন্দে থাকে আখেরাতেও আনন্দে থাকে। এটা হলো একজন মুসলিহ এবং দাঈর জযবা। অন্যরা কী বলল তিনি তা শুনেন নি। বরং তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের উপর আমল করেছেন।

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرفق فى الأمر كُلِّه নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সব কাজে কোমলতা পছন্দ করেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সৃষ্টির প্রতি দয়া করো

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ. وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ. وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : عن انس بن مالك رضى الله عنه، قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم ارحم الناس بالعيل، وكان له ابن مسترضع فى ناحية المدينة وكان ظئره قينا، كنا تأتيه، وقد وخن البيت بأذخر، فيقلبه ويشمه (الأدب المفرد، باب رحمة العمال) اٰمَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

হযরত আনাস (রা) এর বৈশিষ্ট্য

পিছনে যে হাদীস চলছিল তা ছিল রহমত এবং রহম সম্পর্কিত। যেখানে হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের আদেশ করেছেন। আর এটাই ছিল তার সুন্নত। হযরত আনাস (রা) ঐ ছাহাবী যাকে তার পিতা দশ বছর বয়সে হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে পেশ করেন। আল্লাহ তাআলা তাকে দীর্ঘ দশ ছর হুযুরের খেদমতে থাকার সৌভাগ্য দান করেন। এই দশ বছরে তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পরিপূর্ণ তারবিয়াত লাভ করেন।

দশ বছরে একবারও ধমকাননি

তিনি বলেন, দশ বছর হুযুরের খেদমতে ছিলাম। এই সুদীর্ঘ সময়ে কখনো তিনি আমাকে ধমক দেননি। বকাঝকাও করেন নি। কখনো বলেননি একাজ

কেন করলে। এটা কেন করলে না। হযরত আনাস (রা.) বলেন, একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কোন এক কাজে পাঠান, আমি ছোট ছিলাম। ঘর থেকে বের হয়ে বাচ্চাদের খেলতে দেখে আমিও খেলতে থাকি। যে কাজের জন্য পাঠিয়েছেন তা একেবারে ভুলে যাই। হুযুর আমার অপেক্ষা করছিলেন, আমি কাজ করে আসব। একটু পর তিনি নিজেই বের হন, নিজে গিয়েই কাজ শেষ করেন। কিন্তু আমাকে কিছুই বলেন নি। হযরত আনাস ছিলেন সেই সাহাবী যিনি এই সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

তাঁর জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোআ

তিনি এই সৌভাগ্যও লাভ করেন যে হুযুর তার মাথায় হাত রেখে দোআ করেন, আয় আল্লাহ! তার মাল এবং সন্তানে বরকত দান করেন। তাকে দীর্ঘ হায়াত দান করেন। তিনি সকল সাহাবী থেকে বেশী হায়াত লাভ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল একশর বেশী। তিনিই একমাত্র সাহাবী যার কারণে অনেক মানুষ তাবেঈয়ী হওয়ার মর্যাদা লাভ করে। আমাদের ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও তাকে দেখার কারণে তাবেঈয়ী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর সন্তান-সন্ততিতে বরকত দান করেছেন। তিনি বলতেন, আমার এত সন্তান আমি নিজেও জানি না আমার কতজন সন্তান। তারা কে কোথায় থাকে আমি তাও জানি না।

হুযুর (সা.)-এর ঘরওয়ালাদের প্রতি স্নেহ

হযরত আনাস (রা.) বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরওয়ালাদের প্রতি সবচেয়ে বেশী সহনশীল ছিলেন। আর এ ব্যাপারে হযরত আনাস (রা.) এর চেয়ে কে বেশী জানতে পারে। তিনি দশ বছর হুযুরের খেদমতে ছিলেন। সর্বদা প্রত্যক্ষ করতেন হুযুর ঘরওয়ালাদের সাথে কিরূপ আচরণ করছেন। স্ত্রী-সন্তান এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি তিনি অত্যন্ত কোমল আচরণ করতেন।

ছেলের সাথে সাক্ষাতের জন্য গমন

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহেবজাদা ছিলেন। তাঁর নাম ইবরাহীম। তিনি হযরত মারিয়া (রা) এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তিনি ইন্তেকাল করেন। সে সময় আরবের প্রথা ছিল কোন সন্তান জন্ম হলে তাকে লালন-পালন এবং দুধ পান করানোর জন্য শহরের বাহিরে কোন দুধমার কাছে পাঠানো হত। স্বয়ং হুযুর যখন জন্মগ্রহণ করেন,

তাকে বনী সাদ গোত্রে হযরত হালীমা সাদিয়ার কাছে দুধ পান করার জন্য পাঠানো হয়। যখন হযরত ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেন তখন তাকেও দুধপান করার জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শহরের বাহিরে এক দুধমাতার কাছে পাঠান। ওই দাই তাকে দুধ পান করাতেন এবং দেখভাল করতেন। ওই দাই মহিলার স্বামী ছিল কর্মকার। লোহার কাজ করার জন্য ঘরে আগুন জ্বালাত। ঘাস ইত্যাদি খড়কুটা পোড়াত। ঘর ধোয়ায় ভরে যেত। হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ছেলেকে দেখার জন্য মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ওই দুধমার কাছে যেতেন। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসবের পরওয়া করতেন না। ঘরে তাশরীফ নিতেন, সাহেবজাদাকে কোলে নিতেন, আদর করতেন। আল্লাহ তাআলা এই বান্দাকে ওই স্থান যেয়ারত করার তাওফিক দিয়েছেন। মসজিদে নববী থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে একটি জায়গা। প্রসিদ্ধ আছে যে এখানে হযরত ইবরাহীম লালিত হয়েছেন।

পুরো উম্মতের বোঝা নিয়ে সন্তানের সাক্ষাৎ

আপনি একটু ভাবেন, হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাঁধে আল্লাহ তাআলা পুরো উম্মাতের দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন। জিহাদ হচ্ছে, গাযওয়া হচ্ছে, তালীম চলছে, তাবলীগ চলছে। সাহাবায়ে কেরামের তরবিয়ত হচ্ছে, মানুষের সাথে লেনদেন করছেন। এরপর সন্তানকে দেখার জন্য দীর্ঘ সফর করে দাইমার ঘরে যেতেন। সন্তানকে কোলে নিয়ে আদর করতেন। এর মাধ্যমে এই শিক্ষা দেয়াই উদ্দেশ্য যে, পরিবারস্থ এবং অধীনস্থদের ভালবাসা হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত।

বাচ্চাদের উপর দয়া করা দ্বীনের তাকাযা

হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এক ব্যক্তি আসেন। সাথে এক বাচ্চা ছিল, সে বারবার বাচ্চাটাকে কোলে নিচ্ছিল এবং সীনার সাথে লাগাচ্ছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বাচ্চার প্রতি দয়া করছ? সে বলল হ্যাঁ, হুযুর বললেন, তুমি বাচ্চার প্রতি যতটুকু দয়া করছ, আল্লাহ জাল্লাজালালুহু তোমার প্রতি তার চেয়ে বেশী দয়া করবেন। আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। ঘরওয়ালাদের সাথে নিজের সন্তানদের সাথে ভাল আচরণ করা, তাদের দয়া করা এটা শুধু মানবিক চাহিদাই নয় বরং দ্বীনের ও তাকাযা আল্লাহ তাআলার হুকুমের তাকাযা এবং হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত।

সুন্নতের অনুসরণের নিয়ত করুন

কে এমন আছে যে ঘরে বাচ্চাদেরকে আদর করে না। প্রায় সব মানুষই বাচ্চাদেরকে আদর সোহাগ করতে ভালবাসেন। কিন্তু পার্থক্য হলো, একজন মানুষ, উদাসীনভাবে, বেখেয়ালির সাথে স্বভাবের কারণে করছে। অথচ সে ঐ কাজ হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের নিয়তে পালন করতে পারে। প্রথম ছুরতে যদিও মানবিক দাবি হিসেবে করছে তারপরও আল্লাহর রহমতে ছাওয়াব পাবে। গুনাহ হবে না তবে রাসূলের সুন্নতের ছাওয়াব পাবে না। হ্যাঁ একই কাজ যদি নিয়ত করে তাহলে রাসূলের সুন্নত অনুসরণের ছাওয়াব পাবে এবং আল্আলাহ তাআলা তাকে রাসূলের সুন্নত পালন ইবাদতের মধ্যে গণ্য করবেন।

আমার শায়েখ হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই সাহেব (কুদ্দিসা সিরুহু) বলতেন, ঘরে প্রবেশ করেছি, বাচ্চারা খেলছে ভাল লাগছে। মনে চাচ্ছে কোলে উঠিয়ে নেই। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য ইচ্ছা থেকে ফিরে আসি। এরপর দ্বিতীয় বার ইচ্ছা জাগে যে, হাদীস শরীফে এসেছে হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাচ্চাদের আদর করতেন। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের তাকাযায় বাচ্চা কোলে উঠিয়ে নেই এবং আদর করি। তিনি বলতেন, কিছু সময় অনুশীলন করার কারণে আল হামদুলিল্লাহ এই অভ্যাস হয়ে গিয়েছে যে, যখনই কোন কাজ করি তখন এই নিয়তেই করি যে রাসূলের সুন্নতের অনুসরণ করছি। এরপর কবিতা আবৃত্তি করতেন,

جگر پانی کیا ہے مدتوں غم کی کشاکشی میں
کوئی آسان ہے کیا خور گرآزار ہو جانا

তিনি বলতেন বলা তো অনকে সহজ কিন্তু মেহনত ও মশক করা প্রয়োজন। ঘরে প্রবেশ করেছি, সমানে খাবার এসেছে, খুব মজাদার খাবার। মন চাচ্ছে যে খাই। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য বিরত থাকি যে খাব না। এরপর মনে এই নিয়াত করা তাজা করি যে, হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত ছিল, সামনে ভাল খাবার এলে আল্লাহর শোকর আদায় করে খেতেন। আমি তখন হুযুরের সুন্নতের অনুকরণ করার নিয়তে খাব। আমি কিছুকাল মশক বা অনুশীলন করেছি। তোমরাও অনুশীলন করো। দুনিয়া এমন কোন কাজ নাই যা মশকের মাধ্যমে রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণের ফয়েয বরকত লাভ করবে না।

বুযুর্গদের দৃষ্টি জীবন বদলে দেয়

শোকরের মাদ্দা বুযুর্গদের সান্নিধ্যে লাভ হয়, বলা হয় বুযুর্গদের দৃষ্টি মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। চিন্তার লাগাম টেনে ধরে। ফলে মানুষের সব আমলকে গোটাজীবনকে এবাদত বানিয়ে দেয়। সুন্নতের অনুগামী বানিয়ে দেয়। এটাই বুযুর্গদের কাজ, যখন দিক সোজা করে দেয় এই এবং ওই দিকে মানুষ চলে তখন ইনশাআল্লাহ সোজা জান্নাতে পৌছে যাবে। পূর্বে যখন যাচ্ছিল তখন তার লক্ষ্য ছিল অন্যদিকে। যার অন্য কোথাও গিয়ে পৌছার আশংকা ছিল। আল্লাহ তাআলা বুযুর্গদের সান্নিধ্যে সোজা পথে চলার নেয়ামত দান করেন। এ কারণেই বুযুর্গরা বলেছেন–

یک زمانہ صحبت با اولیاء

بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

কিছু সময় কোন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের সান্নিধ্যে থাকাটা একশত বছর অকৃত্রিম আনুগত্য করা থেকে উত্তম।

এটা কোন বাড়াবাড়ি নয়, বাস্তবতা

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ) বলতেন যে, কিছু মানুষ এটা বাড়াবাড়ি মনে করে, একটা মানুষ একশত বছর এমনভাবে এবাদত করে যার কোন লৌকিকতা নাই। আর একটা মানুষ কিছু সময় বুযুর্গের সান্নিধ্যে থেকে তার চেয়ে উত্তম কি করে হতে পারে। হযরত থানভী বলতেন যে, বাড়াবাড়ি হলে তোনি হয়েছে যদি কবিরাও বলেন–

بہتر از صد لاکھ سالہ طاعت ہے ریا

শত সহস্র বছর আনুগত্য করা থেকে উত্তম। তাহলেও বাড়াবাড়ি হত না। কারণ হলো বুযুর্গদের সান্নিধ্যে গিয়ে যে সৌভাগ্য হয় তা এই যে মানুষের লক্ষ্য সোজা করে দেন। মানুষের দৃষ্টি পাল্টে দেন। যার ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে মানযিল পর্যন্ত পৌছে দেন। মনে করুন যদি কোন মানুষ কোন লৌকিকতা ছাড়াই একশত বছর এবাদত করতে থাকে। কিন্তু তা ভুল পদ্ধতিতে করতে থাকে তাহলে তার সব ইবাদত বারবাদ। কিন্তু একজন আল্লাহ ওয়ালা তাকে সোজা পথ দেখান যার ফলে তার সব ইবাদত কার্যকরী হয়। বুযুর্গদের সান্নিধ্যে এই সম্পদ লাভ হয়।

আমরা যত কাজ করি সেখানে দু'টি বিষয়ে খুব গুরুত্ব দেয়া উচিৎ এক নিয়ত শুদ্ধ করা। অর্থাৎ সুন্নতের নিয়ত করা। দ্বিতীয় হলো সঠিক পথে চলা।

এই দুইটা কাজ হয়ে যাবে তো গোটা জীবন ইবাদত হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়াতেই জান্নাত বানিয়ে দিবেন।

প্রাণীদের ওপর রহম করো

ইমাম বোখারি (রহ) একটি হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন,

عن ابي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بينما رجل يمشى بطريق اشتد به العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب منه العطش مثل الذى كان بلغنى فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكها فيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له۔ قال : يا رسول الله! وإن لنا فى البهائم أجرا؟ قال فى كل رطبه أجر -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে একথা বলা উদ্দেশ্য যে স্বীয় আত্মীয়-স্বজন পরিবার পরিজন এবং বন্ধু-বান্ধবের ওপর দয়া তো করবেই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা প্রাণীদের ওপর কিছু হক রেখেছেন। একজন মুমিনের উচিৎ এই সব প্রাণীদের ওপর দয়া করা।

কঠিন পিপাসার মুহূর্ত

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, একবার হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি মরুভূমি দিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে প্রচণ্ড পিপাসা লাগে। অনেক খুঁজে একটি কুয়ার সন্ধান পায়। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখে কুয়া তো ঠিক আছে, তবে পানি উঠানোর না আছে কোন বালতি না আছে কোন দড়ি, তীব্র পিপাসা লেগেছে। পানি উত্তোলনের কোন উপায় নাই। সে চিন্তা করল আমিই কুয়াতে নামব। কুয়ায় নামা কোন সহজ কাজ ছিল না। তবে তৃষ্ণার প্রচণ্ডতার কারণে কষ্ট সহ্য করে কুয়ায় নেমে লোকটি পান করে। এরপর যাত্রা শুরু করে।

তৃষ্ণার্ত কুকুর

মুসাফির পানি পান করে সামনে অগ্রসর হলো। দেখল একটা কুকুর খুবই পিপাসার্ত। পিপাসার তীব্রতার কারণে কাদা মাটি চেটে খাচ্ছে। তখন সে চিন্তা

করল। আল্লাহর সৃষ্টি, আমি পিপাসার কারণে যেমন কষ্ট পেয়েছি এই কুকুরটাও এভাবে কষ্ট পাচ্ছে। আমি তো কুয়ায় নেমে পানি পান করেছি। কিন্তু এ কীভাবে পানি পান করবে। কোন বালতিও নেই যে পানি উঠিয়ে খাওয়াবে। পথিকের পায়ে ছিল চামড়ার মোজা। অনেক ফিকির করে আবার কুয়ায় নামে। এরপর চামড়ার মোজায় করে পানি উঠিয়ে নিয়ে আসে। কুকুর সেখান থেকে পানি পান করে তৃপ্ত হয়।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুসাফিরের এই পান করানো আল্লাহ তাআলার এত পছন্দ হয় যে, তিনি বলেন, আমি আজ এই বান্দার জীবনের সব পাপ ক্ষমা করে দিয়েছি। বান্দা আমার সৃষ্টির প্রতি যেরূপ দয়া করেছে আমিও তার প্রতি দয়া করছি। তাকে মাফ করে দিচ্ছি।

একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নাম

হযরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عذبت أمرأة فى هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار يقال والله أعلم : لا انت أطعمتها و سقيتها حين حبستيها ولا انت ارسلتيها فأكلت من حشاش الأرض -

এক নারীকে জাহান্নামে শুধু এই কারণে শাস্তি দেয়া হবে যে, সে একটা বিড়ালকে আটকে রেখেছিল। তাকে না খাবার দিয়েছে না পানি দিয়েছে। ছেড়েও দেয় নি, এক পর্যায়ে ক্ষুধা পিপাসায় বিড়ালটা মারা যায়। আর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন ওই নারীকে বলেন, না তুমি তাকে খাবার দিয়েছ না পানি পান করিয়েছ। ছেড়েও দাও নি যাতে ঘুরে ফিরে খেতে পারে। তুমি আমার সৃষ্টির প্রতি নির্দয় আচরণ করেছ। অতঃএব তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করো। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, সৃষ্টির প্রতি দয়া করার কারণে আল্লাহ তাআলা প্রথমজনকে পূর্ণ মাগফেরাত করেছেন। আর দ্বিতীয় জন সৃষ্টির প্রতি নির্দয় হওয়ার কারণে আল্লাহ তার প্রতি নির্দয় হয়েছে। তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছেন।

এখলাসের সাথে অল্প আমলই নাজাতের জন্য যথেষ্ট

একটা কথা মনে রাখবেন যে, যদি কোন ব্যক্তি এখলাসের সাথে আল্লাহর সৃষ্টির নিয়তে কোন কাজ করে। এর কারণে আল্লাহ খুশি হয়ে যান তাহলে সে

পার পেয়ে যাবে। এজন্য হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন নেক কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। কেননা কোন নেক কাজ দেখতে যদিও সাধারণ মনে হয় কিন্তু জানা নাই এর বদৌলতে আল্লাহ তাআলা হয়তো তোমাকে পুলসীরাত পার করে দিবেন।

একটি ভাল কাজ অন্য আরেকটি ভাল কাজের দিকে টানে নেক কাজের বৈশিষ্ট্য এই যে, যখন আল্লাহ তাআলা একটি নেক কাজের তাওফিক দান করেন তখন একটি নেক কাজ আরেকটি নেক কাজ টেনে আনে। এরপর আল্লাহ তাআলা আরো নেক কাজ করার তাওফিক এ কারণে কারো জানা নেই কোন নেক কাজ কি আগ্রহ নিয়ে করা হয়েছে। যার কারণে আল্লাহ তাআলা রহমতের দৃষ্টি দেন এবং মানুষ বেড়া পার হয়ে যায়। এমন ঘটনা আপনি শুনেছেন, কুকুরকে পানি পান করিয়েছে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জানা নাই কোন আমল কখন কবুল হয়ে যায়। এজন্য যখনই মনে কোন নেক আমলের খেয়াল আসবে তখন সেটাকে সাধারণ মনে করে ছেড়ে না দেয়া। কখন একথা ভেবো না যে, আমি তো এর চেয়ে বড় বড় নেক আমল ছেড়ে দিয়েছি। এই ছোট নেক আমল করে কি হবে। শয়তান মানুষকে এভাবে ভ্রষ্ট করে। শয়তানের ধোঁকায় পড়বে না। যে কোন ছোট আমল সামনে পেলেই করে ফেলবেন। যেমন আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, দেখলেন কোন ময়লা বা কষ্টদায়ক বস্তু পড়ে আছে। মানুষের কষ্ট এই চিন্তা করে আপনি বস্তুটি সরিয়ে ফেললেন। এই সামান্য কাজটা হতে পারে আপনার মাগফিরাতের মাধ্যম।

আল্লাহর বিধান এবং রহমত দুই জিনিস

অনেকে এই জাতীয় ঘটনা থেকে ভুল বুঝে। অমুক কুকুরকে পানি পান করিয়েছে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিয়েছেন। আমিও কুকুরকে পানি পান করাবো আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিবেন। শয়তান মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। দেখুন একটা হলো আল্লাহর বিধান কেউ ভাল কাজ করলে সে তার পুরস্কার পাবে কেউ মন্দ করলে সে তার বিনিময় পাবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ○

(سورة الزلزلة ٧-٦)

"কোন মানুষ যদি অণুপরিমাণ নেক কাজ করে, তার পরিণামও দেখবে, আর যে অণু পরিমাণ মন্দ করে সেও তার পরিণাম দেখবে।" এটা হলো আল্লাহর নিয়ম। পক্ষান্তরে তাঁর রহমত দয়া ও অনুগ্রহ বহির্ভূত। তিনি যদি চান

তাহলে বান্দাকে ছোট আমলের বিনিময় দান করেন। তবে বান্দার উচিৎ নয় কোন ছোট নেক আমল করে এই আশা করে বসে থাকা আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিবেন। কারণ বান্দার জানা নাই কোন আমলের প্রতিদান পাবে, কোন আমলের প্রতিদান পাবে না। এজন্য উত্তম হলো নিয়মের অনুসরণ করা।

গালির কারণে ভাতা প্রদান

হযরত হাকিমুল উম্মত মাওলানা থানভী (রহ) বড় সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কোন কোন সময় এমন হয় যে, মানুষ ভুল করে পুরস্কার পায়। মানুষ নাফরমানি করে আল্লাহর রহমতের দেখা পায়। এর উদাহরণ দিতে গিয়ে থানভী (রহ) বলেন, হায়দারাবাদে নিযামে হায়দারাদ নামে একজন প্রসিদ্ধ নবাব ছিলেন। একবার নবাবের উযির নবাবকে তার বাড়িতে আপ্যায়ন করে। নবাব উযিরের বাড়িতে ঢুকে দেখেন বাচ্চা খেলছে। ছোট বাচ্চা দেখলে সবাই একটু দুষ্টুমি করে, বিরক্ত করে। নবাব বাচ্চাটাকে একটু রাগিয়ে দেন। বাচ্চাতো আর জানে না ইনি নবাব না বাদশা। বাচ্চা বিরক্ত হয়ে নবাবকে গালি গালাজ করে পালায়। উযির পেরেশান, আমার বাচ্চা নবাব সাহেবকে গালি দিয়েছে। খোদা জানেন আমার কী হবে। উযির কাকুতি-মিনতি করে বলল, জাঁহাপনা আমার ছেলে আপনার সাথে চরম বেয়াদবি করেছে। আমি এখনই তার শিরচ্ছেদ করবো। নবাব বললেন, ভাই বাচ্চা মানুষ, ওকে তো আর কেউ শিখিয়ে দেয় নি। তবে তাকে আমার খুব মেধাবী মনে হচ্ছে। খুব হুঁশিয়ার এবং চৌকস। কেউ তাকে বিরক্ত করলে সে ছেড়ে দিবে না, উত্তর দিবে। আজ থেকে আমি তার ভাতা জারি করব। ওই ভাতার নাম ছিল وظيفة دو شتام অর্থাৎ গালির ভাতা।

আপনি গালি দিলে জেলে যাবেন

হযরত বলেন, বাচ্চা গালি দেয়ার কারণে ওযীফা পেয়েছে। তখন একটা বিশেষ হুহূর্তের কারণে নবাব তার জন্য ভাতা চালু করেছে। এখন আপনি যদি মনে করেন আমি নবাবকে গালি দিব। তাহলে বাচ্চার মতো ভাতা পাবো। এমন ভাবা চরম নির্বুদ্ধিতা ও বেকুফি ছাড়া আর কিছুই না। নবাব আপনাকে সোজা জেলখানায় ঢুকাবে। ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার একটা নিয়ম আরেকটা রহমত। তো বান্দা আইন বা বিধান অনুযায়ী আমল করার মুকাল্লাফ আল্লাহ যেটা হালাল করেছেন সেটাকে হালাল মনে করা যেটাকে হারাম করেছেন সেটাকে হারাম মনে করা। ওয়াজিব এবং ফরয আমল যথাযথ আদায় করা।

এরপর আল্লাহর রহমতের আশা করা। কিন্তু এ চিন্তা করা চলে না গুনাহ করি, এক আধা আমলের কারণে মাফ পেয়ে যাবো তাহলে অবস্থাটা হবে গালি দিয়ে ভাতা চালু করার মত।

ছোট গুনাহের কারণে পাকড়াও

যেভাবে আল্লাহ তাআলা কোন ছোট আমলের কারণে কোন সময় অনুগ্রহ করে মাফ করে দেন তেমনি ভাবে কখনো ছোট গুনাহের কারণে পাকড়াও করেন। এজন্য মানুষ যদি কোন ভুল করে ফেলে তাহলে খুবই বিনয়ের সাথে আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া তাওবা ইস্তেগফার করা। আল্লাহর দরবারে নিজেকে অপরাধী হিসেবে পেশ করা। ব্যস্ এ কাজ করলে, বাকি যত আমলের ব্যাপারে হাদীসে মাগফেরাতের ওয়াদা এসেছে নিঃসন্দেহে তা লাভ হবে। আল্লাহ তাআলা রহমত বর্ষণ করবেন। এজন্য কোন নেক আমল ছোট মনে হলেও অবহেলা না করা। এভাবে কোন গুনাহ ছোট মনে হলেও ছোট মনে না করা। কারণ গুনাহের বৈশিষ্ট্য হলো এক গুনাহ আরেক গুনাহের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

ছগীরা গুনাহ এবং কবীরা গুনাহর ধোঁকা

কখনো কখনো শয়তান মানুষকে ধোঁকায় ফেলে দেয় এটা ছগীরা গুনাহ না কবীরা গুনাহ। আমি অনেক মানুষকে এই মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে দেখেছি। এটা হারাম না নাযায়েয? যদি বলা হয় হারাম, তাহলে এটা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কিন্তু যদি বলা হয় না যায়েয তাহলে করা যায় মানে সমস্যা নাই। তেমনিভাবে অনেকে জিজ্ঞাসা করে এটা সগীরা গুনাহ না কবীরা গুনাহ? কবীরা গুনাহ বললে করা যাবে না। পক্ষান্তরে সগীরা গুনাহ বললে, করে ফেল সমস্যা হবে না। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ) এর দৃষ্টান্ত দেন যে, মনে করুন একটা বড় আগুনের অঙ্গার আর একটা ম্যাচের কাঠি। কোন ব্যক্তি চিন্তা করল এটা বড় অঙ্গার এটা ম্যাচের কাঠি। বড় অঙ্গারটা কাপড়ের আলমিরাতে রাখা যাবে না তবে ম্যাচের কাঠিটা রাখা যায়, এটা ছোট আছে। একজন সুস্থ মানুষ কখনো এমনটা করতে পারে না। কারণ সে জানে এই ম্যাচের কাঠি পুরো ঘর ভস্ম করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। সগীরা এবং কবীরা গুনাহর বিষয়টা এমনি। সগীরা গুনাহ দেখতে যদিও ছোট মনে হচ্ছে কিন্তু মানুষ যদি বে-পরোয়াভাবে ছগীরা গুনাহ করতে থাকে তাহলে এক সময় সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে। এ কারণে বুযুর্গরা বলেন, ছগীরা গুনাহকে মামুলি মনে করাটাই কবীরা গুনাহ। কেননা উভয়টাই নাফরমানি। আল্লাহ তাআলা ছগীরা থেকেও বাঁচতে বলেছেন কবীরা থেকেও বাঁচতে বলেছেন। তবে আল্লাহ তাআলা উভয়টার স্তর ভিন্ন

রেখেছেন। ছগীরা গুনাহে লিপ্ত থাকা এবং কখন বর্জন করার চিন্তা করা মানুষকে কবীরা গুনাহে লিপ্ত করে এবং তাকে কবীরা গুনাহের আযাবে মুবতালা করে দেয়। এজন্য গুনাহর কাজ থেকে বেঁচে থাকা। ছোট হোক বা বড় হোক। কারণ আল্লাহ তাআলা গুনাহ করতে নিষেধ করেছেন। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও নিষেধ করেছেন।

জবেহ করার সময় প্রাণীর প্রতি লক্ষ রাখা

পূর্বে দুটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এটাই যে সদাচারণ শুধু মানুষের সাথেই নয় প্রাণীর সাথেও করতে হবে। একারণে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন প্রাণী যদি জবেহ করতে হয় আল্লাহ তাআলা আমাদের জবেহের অনুমতি দিয়েছে। এসব প্রাণী তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সাথে সাথে এও বলেছেন, إذا قتلتم فأحسنوا القتل واذا ذبحتم فأحسنوا الذبح "যখন তোমরা হত্যা করো তখন উত্তমভাবে হত্যা করো এবং যখন তোমরা জবেহ করো তখন উত্তমভাবে জবেহ করো।"

ছুরিটা ভাল করে ধার কর, প্রাণীটাকে আরাম পৌছানোর সর্বোচ্চ ব্যবস্থা করো। শরীয়ত যেভাবে জবেহ করতে বলেছে সেভাবে জবেহ করো। গলার দু'পাশের রগগুলো ভাল করে কাটো। এটা জবেহের সবচেয়ে আসল পদ্ধতি। শরীয়ত আমাদের জন্য এ পদ্ধতি রেখেছেন। শরীয়ত বলছে জবেহ করো তো এমনভাবে করো যাতে কষ্ট কম হয়। তবে বর্তমানে মেশিনে যেভাবে জবেহ করে এতে প্রাণীর কষ্ট হয়।

পশু-পাখি পালনের হুকুম

শরীয়ত মানুষকে পশু-পাখি পালার অনুমতি দিয়েছে। যে কেউ ইচ্ছেকরলে পশু-পাখি পালতে পারে। তবে এক্ষেত্রে দুটো বিষয় লক্ষণীয়। অন্যথায় গুনাহগার হবে। এক. খাবারের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। যাতে প্রাণী খাবারে কষ্ট না পায়। দ্বিতীয় যে খাঁচায় রাখা হবে খাঁচাটা একটু বড় হতে হবে। যাতে পশু-পাখি সংকীর্ণতা অনুভব না করে। কিংবা জায়গাটা বড় হতে হবে যাতে প্রাণীটা চরে বেড়াতে পারে। হযরত থানভী (রহ) এ ব্যাপারে একটা কিতাব আছে। যার নাম ارشاد الهائم فى حقوق البهائم শরিয়ত পশু-পাখির যে হক্ব নির্ধারণ করেছে তা তিনি এই কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন শরীয়ত দান করেছেন যেখানে সব কিছুর প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে।

পাখির ডিমের ঘটনা

এক সাহাবী বর্ণনা করেন যে, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমরা কোথাও যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে আমরা একটা গাছের নিচ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। ওই গাছে একটা চড়ুই পাখি ডিম পেড়েছিল। কোন এক সাহাবী একটা ডিম সরিয়ে রেখেছিল। আচমকা চড়ুই পাখি হুযুরের মাথার উপর দিয়ে চক্কর দিচ্ছিল। আর এমন কিচির মিচির করছিল যেন অভিযোগ করছে। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের কে এই চড়ুই পাখির ডিম নিয়েছ। যদি কেউ নিয়ে থাক তাহলে সে ভুল কাজ করছ। তখন এক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এমন করেছি। হুযুর বললেন, এখনেই নিয়ে এসো জায়গা মত রেখে দাও। কেননা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর পশু পাখির হক্ব রেখেছেন। তোমরা এমন আচরণ করো না যাতে এগুলোর কষ্ট হয়। এটা করা চরম গুনাহের কাজ। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একেকটি আমল এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল সুন্নতের উপর আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কোরআনুল কারীম হেফাজতের দায়িত্ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ. وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ. وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا ○ اٰمَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

সম্মানিত ও প্রিয় দীনী ভাইয়েরা। আমি আপনাদের সামনে কোরআনুল কারীম থেকে একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি। স্বল্প সময়ে এর ওপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করার চেষ্টা করবো। আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআলা তার সন্তুষ্টি মোতাবেক বয়ান করার তাওফিক দান করুন। আমীন। আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ۔

"আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি আমিই তার সংরক্ষণকারী।" অর্থাৎ কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন সহীফা ও কিতাব আম্বিয়া (আ) দের উপর নাযিল করেছেন। কিন্তু কোন সহীফা বা কিতাবের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা এই গ্যারান্টি দেন নি যে, এটা কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে।

হুযুর আকরাম (সা.)-এর নবুয়াত কেয়ামত পর্যন্ত

এর কারণ এই যে, যত আম্বিয়া কেরাম হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূর্বে আগমন করেছেন তার নির্দিষ্ট সময় এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য তাশরীফ এনেছেন। কিন্তু যখন হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে পাঠানো হলো তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا "আমি আপনাকে মানব জাতির জন্য সু-সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি।" আপনি সর্বশেষ নবী, আপনার ওপর অবতীর্ণ কিতাব সর্বশেষ কিতাব। এ জন্য আল্লাহ তাআলা দায়িত্ব নিয়েছেন যে, আমি তা সংরক্ষণ করবো। এই দায়িত্ব তখন নিয়েছেন যখন প্রেস ছিল না, ফটোকপির মেশিন ছিল না। হাতে লিখা বা হাতে লিখে সংরক্ষণ করাটা অত সহজ সাধ্য ছিল না। তখন আল্লাহ তাআলা এই গ্যারান্টি দিয়েছেন যে, আমি তা সংরক্ষণ করবো।

বাইবেলের বর্তমান অবস্থা

অন্যান্য আসমানী কিতাবের মধ্যে আপনি বাইবেলের কথাই ধরুন। বর্তমানে বাইবেলের চল্লিশটিরও বেশী সুসযা কপি আছে। যার সম্পর্কে বলা হয় এগুলো আম্বিয়া (আ) এর ওপর নাযিল হয়েছে। কিন্তু যদি আপনি কাউকে জিজ্ঞাসা করেন এটা যে, আসল তাওরাত যা হযরত মুসা (আ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এ ব্যাপারে তোমার কাছে কী প্রমাণ আছে? তাদের কোন বড় পণ্ডিত দলীল পেশ করতে পারে না যে, এটা হযরত মুসা (আ) এর ওপর অবতীর্ণ তাওরাত বা বাইবেল।

ইঞ্জিল বিশুদ্ধ ও ভুল হওয়ার অদ্ভুত মীমাংসা

ইঞ্জিলের অবস্থা এর চেয়েও শোচনীয়। চারটি ইঞ্জিল কিতাব দুনিয়াতে প্রসিদ্ধ আছে সেগুলোকে ২১ সালে আসল বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। স্বীকৃতি দেয়ার ধরণটা ছিল এমন, একুশ সালের সূচনা লগ্ন পর্যন্ত ইঞ্জিল কিতাবের ২০টি প্রসিদ্ধ কপি ছিল। প্রত্যেকের দাবি ছিল এটাই আসল ইঞ্জিল। এখন কোনটা আসল আর কোনটা নকল এটা সাব্যস্ত করার জন্য একজন কন্সাল ওলামায়ে ইঞ্জিলকে শহরের এক স্থানে একত্র করে। এরপর বিতর্ক শুরু হয়। প্রত্যেকে নিজের স্বপক্ষে যুক্তি পেশ করে আমারটা সঠিক ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিতর্কের ঝড় বইতে থাকে। কেউই সমাধানে আসতে পারছিল না। সর্বশেষ এই সিদ্ধান্ত হল যে, আমরা বিষয়টি আল্লাহ তাআলার উপর ছেড়ে দিব। তিনিই ফায়সালা

করবেন কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক? এখন প্রশ্ন হলো আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করবো কীভাবে? সে বলল, যত কিতাব আছে সবগুলো একটা মিম্বারের উপর রাখবো তারপর মিম্বারটা একটা কামরায় রেখে তালা মেরে দিব। এরপর ওলামায়ে ইঞ্জিল সারারাত সিজদায় পড়ে কাঁদবে এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, ইয়া আল্লাহ! এই কিতাবগুলোর মধ্যে থেকে যেগুলো মিথ্যা সেগুলো যেন মিম্বার থেকে নিচে পড়ে যায়। যেটা সত্য সেটাই যেন বাকি থাকে। সবাই মিলে রাতভর এই প্রার্থনা করবো।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সব কিতাব মিম্বারের উপর রাখা হয়। এরপর একটা কামরায় ভরে তালা মেরে দেয়। সবাই সেজদায় পড়ে দোআ করতে লাগল ইয়া আল্লাহ! মিথ্যেগুলো যেন পড়ে যায়। সকালে গিয়ে দেখে চারটা ইঞ্জিল ছাড়া সবকটি ইঞ্জিল মিম্বার থেকে পড়ে গেছে। এখন সবাই মেনে নিয়েছে যে চারটা ইঞ্জিল আসল বাকিগুলো নকল। ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন, কেউ অনুসন্ধান করে দেখল না চাবি কার কাছে ছিল? কেউ প্রয়োজন বোধও করেনি। ঘটনা ছিল, আসসার সাইফ নামে এক ব্যক্তির কাছে চাবি ছিল। সেই এইসব কাহিনী করে চারটি কিতাব আসল বলে স্বীকৃতি দেয়। এটা সেই কিতাবের কাহিনী যার ব্যাপারে দাবি করা হয় যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত কোন নির্ভরযোগ্য সনদ পেশ করতে পারেনি।

শব্দ এবং মর্ম উভয়টাই সংরক্ষিত

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔

"আমিই এই কোরআন নাযিল করেছি আমিই তার হেফাযত করব।" কোরআন শুধু আলফাজ, শব্দের নাম নয়, বরং কোরআন আলফাজের নাম এবং মা'আনির মর্ম ও নাম। আল্লাহ তাআলা যে গ্যারান্টি দিয়েছে তা শব্দ ও মর্ম উভয়ই সংরক্ষণ করার। শুধু আলফাজ ও শব্দ হেফাজত করবেন না বরং তার সঠিক মর্মও কেয়ামত পর্যন্ত হেফাজত করবেন।

হুযুর (সা) এর প্রতিটি হাদীস সংরক্ষিত আছে

কোরআন তো অনেক উঁচু বিষয়, হুযুরের প্রতিটি নফল হরকত মাহফূজ আছে। আজ সম্মান এবং মর্যাদা শুধু মুসলমানগণই অর্জন করেছে। আল-হামদুলিল্লাহ! আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে, আমাদের কাছে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনা সূত্র বিদ্যমান আছে।

সনদের যত রাবী আছেন প্রত্যেকের জীবনবৃত্তান্ত রিজাল শাস্ত্রের কিতাবে বিদ্যমান আছে। যার মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন হাদীসটা ঠিক না বেঠিক? তো আল্লাহ তাআলা এমনভাবে হেফাজত করেছেন যে, আমি বলি কোরআন শব্দ ও মর্ম উভয়ের নাম।

আলফাজ এবং মা'আনি হেফাজতের পন্থা

আলফাজের হেফাজত আল্লাহ তাআলা ছোট ছোট বাচ্চাদের দ্বারা করেছেন। সাত বছরের বাচ্চা, দশ বছরের বাচ্চা তাদের অন্তরকে আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআলা কোরআনের খাযানা বানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআলা মা'আনির হেফাজত করেছেন ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে করেছেন। যারা ইলমে কোরআন, তাফসীর, ফিকহ, কালাম এবং মাধ্যমে উলূমকে সীনায় হেফাজত করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে আমরা নিশ্চয়তা ও নির্ভরতার সাথে এই কথা বলতে পারি যে, কোরআনের আলফাজ এমনভাবে সংরক্ষিত যে, এক বিন্দু পরিমাণ তার মাঝে পরিবর্তন ঘটেনি। কোরআনের মা'আনি এমনভাবে সংরক্ষিত যে, বড় থেকে বড় কোন মানুষ যদি বিকৃত করতে চায় ইনশাআল্লাহ সে পারবে না। তা সর্বদা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। কারণ হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামিন।

ওলামা ও তালাবাদের মাধ্যমে দায়িত্ব পূর্ণকরণ

আল্লাহ যে যিম্মাদারি নিয়েছেন তা তিনি হাফেজদের মাধ্যমে পূর্ণ করেছেন। পূর্ণ করেছেন আলেমদের মাধ্যমে। যেন আল্লাহ তাআলা তার যিম্মায় যে দায়িত্ব নিয়েছেন তা এই বাচ্চাদের মাধ্যমে পূর্ণ করেছেন এবং ওই সব তালিবুল ইলমদের মাধ্যমে যারা দ্বীনি ইলম হাসিল করছে। দ্বীনি মাদ্রাসাগুলোতে কোরআনের আলফাজ শিক্ষা দেয়া হয় তার মা'আনিও শিক্ষা দেয়া হয়। এবং কোরআন থেকে আহরিত মাসয়ালাও শিক্ষা দেয়া হয়। আমি মনে করি যমীনে তার চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কেউ নাই। কেননা আল্লাহ তার দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে মনোনীত করেছেন।

দ্বীনি মাদ্রাসা বন্ধ করতে পারবে না

আজ দ্বীনি মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা চলছে। মাদ্রাসা হলো জঙ্গিবাদের আখড়া ইত্যাদি কথা বলে। কিন্তু এসব প্রপাগাণ্ডা এজন্যে যে, তারা

বুঝে ফেলেছে দ্বীন হেফাজতের জন্য আল্লাহ তাআলা এই শ্রেণীকে মনোনীত করেছেন। তারা চায় এই শক্তি শেষ হয়ে যাক। পথের কাঁটা দূর হয়ে যাক। কিন্তু মনে রেখ ইসলামকে হেফাজত করার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা নিয়েছেন। কোন পরাশক্তি একে দমাতে পারবে না। এই দ্বীন ইনশাআল্লাহ আলফাজের সাথে এবং মা'আনির সাথে কেয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে।

আল্লাহর নূর নিভাতে পারবে না

কোরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ -

অর্থ ঃ "মানুষ চায় যে, আল্লাহর নূর (অর্থাৎ দীনে ইসলাম)কে মুখ দ্বারা (ফুঁ) দিয়ে নিভাতে, অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর নূর পূর্ণ করছেন। কাফেররা যদিও অসন্তুষ্ট হয়েছে।"

এই দিক থেকে দ্বীনি মাদ্রাসাগুলো যে খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছে এবং আল্লাহর জন্য কাজকে জীবনের মিশন বানিয়েছে এটা মোবারকবাদের যোগ্য। মোবারকবাদ ওই লোকদের যারা এই কাজ পরিচালনা করছেন। মোবারকবাদ ওই লোকদের যারা এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে জানি এবং মালি সম্পর্ক রাখেন। আর যারা এ কাজে তারা কারো ওপর ইহসান করছেন না। না দ্বীনের ওপর ইহসান করছেন না ইহসান করছেন আল্লাহর ওপর। এটা আপনার সৌভাগ্য যে, আল্লাহ আপনাকে এ কাজ (মাদ্রাসার খেদমতের) তাওফিক দান করেছেন। তবে শর্ত হলো আমাদেরকে সততা, একনিষ্ঠতা এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য এ কাজ করতে হবে। এজন্য নিজের জীবন ওয়াকফ করতে হবে। যাতে কামিয়াবি হাসিল হয়।

সাধারণ মুসলমানকে পায়গাম

সর্বসাধারণের প্রতি আমার আহ্বান এই যে, আপনারা দ্বীনি মাদারেসগুলো গুরুত্ব অনুধাবন করুন। আপনার সন্তানদেরকে এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্বীনের খাদেম হিসেবে গড়ে তুলুন। এসব দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের সাথে সব ধরনের সম্পর্ক কায়েম করুন। এটা মনে করুন আপনার সৌভাগ্য। বর্তমানে মুসলমান যে বিপদের মুখোমুখি, যে জুলুমের শিকার, এর পরিত্রাণের ব্যাপারে ভাবা উচিৎ। ওলামায়ে কেরামেরও এ ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। ইসলামের সাথে মাদ্রাসার হেফাজত এবং বহাল রাখার ফিকির করা। ইনশাআল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ○

(سورة محمد ٧)

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করো তাহলে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম সুদৃঢ় করবেন।"

আল্লাহর সাহায্য যদি না আসে তাহলে এর উদ্দেশ্য হলো إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ এর মাঝে কমতি রয়েছে। এই কমতি কীভাবে পূর্ণ করা যায় এ ব্যাপারে চিন্তা ফিকির করা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন। আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে, আপনারা আমার আলোচনা শোনার জন্য এসেছেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে দ্বীন ও দুনিয়ার কামিয়াবী দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ